হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

উনবিংশ ভাগ।

১৩১৮ সালের বৈশাখ হইতে ১৩১৮ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত

দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,

জন্মভূমি-কার্য্যালয় হইতে

সত্ত্বাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রাদার্স কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

Printed by N. Dutt.

at the Janmabhumi Press.

39, Manick Bose's Ghat Street,

CALCUTTA.

1910

বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা] [ডাঃ মাঃ ।৵০ ছয় আ

সূচীপত্র।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

ঊনত্রিংশ ভাগ।

১৩১৮ সালের বৈশাখ হইতে ১৩১৮ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত

দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,

জন্মভূমি-কার্য্যালয় হইতে

সত্ত্বাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রাদার্স কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

Printed by N. Dutt.

at the Janmabhumi Press.

39, Manick Bose's Ghat Street,

CALCUTTA.

19[illegible]0

বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা] [ডাঃ মাঃ ।৵০ ছয় আ

সূচীপত্র।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৯শ বর্ষ। | ১৩১৮ সাল, বৈশাখ। | ১ম সংখ্যা।

নব বৈশাখ।

সৌর রাশিচক্রের বার্ষিক আবর্ত্তনে আমাদের আর একটি বৎসর অনন্ত কাল-সাগরে বিলীন হইয়া গেল। ১৩১৭ বঙ্গাব্দের বিদায়, ১৩১৮ অব্দের আগমন। বর্ষ বিদায়ে জীবের পরমায়ুর এক বৎসর ক্ষয় হইল। ভ্রান্ত মানব ভ্রান্তিবশে বর্ষ বিদায়ে বর্ষ বৃদ্ধির উৎসব করে; বৃদ্ধি কিংবা ক্ষয়, তাহা মনে পড়ে না। একজন পরিণামদর্শী উচ্চ ভাবুক সৎকবি একটি গীত রচনা করিয়াছিলেন; অগ্রে আমরা এই স্থলে সেই গীতটি গ্রহণ করিলাম :—

পূরবী,—আড়াঠেকা।

"দিবা অবসান হলো, কি কর বসিয়া মন ?
উত্তরিতে ভবনদী করেছ কি আয়োজন ?
আয়ুঃসূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়ে দেখ না তায়,
পড়িয়ে মহামায়ায়, হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান ঃ—
যদি নিজ হিত চাও, তাঁহারি শরণ লও,
ভব কর্ণধার যিনি, সত্য নিত্য নিরঞ্জন॥"

নিত্য-নিরঞ্জনের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া অদ্য আমরা নবীন কার্য্যক্ষেত্রে পুনঃ প্রবেশ করিলাম। অনেকগুলি নববৈশাখ আমরা দর্শন করিয়াছি, পুনর্ব্বার আর একটি নববৈশাখের ক্রোড়ে আমাদের স্থান হইল। এই নববৈশাখে আমাদের জন্মভূমি পত্রিকা অষ্টাদশবর্ষ অতিক্রম করিয়া ঊনবিংশ বর্ষে প্রবেশ করিল। এক বর্ষকাল আমরা জগৎপিতার প্রসাদে, সরস্বতীদেবীর কৃপায়, আমাদের অনুগ্রাহক গ্রাহক, পাঠক, লেখক এবং উৎসাহদাতৃগণের অনুকম্পায় যথাশক্তি যত্নে এই পত্রিকার উৎকর্ষ সাধনে প্রয়াস পাইয়াছি, ফললাভ কিরূপ হইয়াছে. আমরা তাহার বিচারক হইতে পারি না, সুবিজ্ঞ পাঠকমহাশয়েরাই তদ্বিষয়ের বিচারপতি। কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মফলদাতা সেই একমাত্র সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ। এই এক বৎসরকাল যাঁহারা যে যে বিষয়ে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ। এক্ষণে আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে, কৃপা করিয়া গতবর্ষে তাঁহারা আমাদের প্রতি যেরূপ সস্নেহ দৃষ্টি রাখিয়া আসিয়াছেন, এ বৎসরেও আমরা সেইরূপ অনুগ্রহলাভের আশা করি।

সহৃদয় মহোদয়গণ! মনে রাখিবেন, আপনারাই জন্মভূমির জন্মপোষক, প্রতিপালক, আশ্রয়, অভিভাবক এবং সর্ব্ববিধ অঙ্গরাগের কর্ত্তা। আমরা কেবল উপলক্ষ মাত্র। সত্য নিত্যনিরঞ্জন. জগৎ পিতা আপনাদিগকে কুশলে রাখুন, সর্ব্ববিষয়ে আপনাদের মঙ্গল হউক, জন্মভূমিকে দীর্ঘজীবিনী করিতে আপনারা নিরন্তর সদয়ভাবে আমাদের পৃষ্ঠপোষক থাকুন; আমাদের আশা, ভরসা, উৎসাহ চেষ্টা এবং সর্ব্ববিধ কল্যাণের মূলভিত্তি আপনারা, ইহা আর পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না।

শারদীয় মহোৎসবের বিজয়োৎসবে আমরা যেমন বন্ধুবান্ধবের সদ্ভাব-সম্মি-

লনে আনন্দ উপভোগ করি, এই নব বর্ষেও সেইরূপ সদ্ভাব-সম্মিলনের পূর্ণ আশা আমরা হৃদয়ে পোষণ করি। স্বাস্থ্য, শান্তি, কুশল, কল্যাণ ও আনন্দকামনায় আপনাদিগকে কোটি কোটি নমস্কার।

সাহিত্যের অভ্যুদয়েই ধর্ম্মের অভ্যুদয়; সাহিত্যের অভ্যুদয়কল্পে দেশের কৃতবিদ্য-সম্প্রদায় অধুনা সবিশেষ যত্ন করিতেছেন, সাহিত্যের সেবা করিবার নিমিত্তই জন্মভূমির জন্ম; জন্মভূমি যাহাতে চিরজীবন সাহিত্যের সেবা করিয়া চিদানন্দ ভোগ করিতে পারে, ইহাই আমাদের কামনা। সহৃদয় সাহিত্যবন্ধু মহোদয়গণ! আপনারা সমান অনুগ্রহে, সমান যত্নে আমাদের কামনা পূরণে সহায়তা করিলেই আমরা কৃতার্থ হইব।

নব বর্ষাগমে সকলেই মঙ্গলাচরণ করেন, সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলময়ের নামে আমরাও মঙ্গলাচরণ করিতেছি। এই শুভ অবসরে প্রসঙ্গানুরোধে নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে আমরা একটি শোকনিশ্বাস ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। গত বৎসর আমাদের সাহিত্য-গগণের কয়েকটি উজ্জ্বল নক্ষত্র অস্তমিত হইয়াছে। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু ও শিশিরকুমার ঘোষ তন্মধ্যে প্রধান। ইন্দ্রচন্দ্র, বায়ুবরুণাদির পতন আছে, আবার তাঁহাদের পুনরুত্থানও আছে, কিন্তু আমাদের ইন্দ্রচন্দ্রাদি পাত হই য়া গেল। তাঁহাদের আর পুনরুত্থান নাই। আবার কতদিনে কোন সময়ে কোন কেন্দ্র হইতে কোন শুভগ্রহ সমুদিত হইয়া তাঁহাদের শূন্য স্থান পরিপূরণ করিবে, তাহা সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভস্থ।

সমস্তই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। ইচ্ছাময়ের একটি নাম মঙ্গলালয়। সেই পরাৎপর মঙ্গলালয় পরাৎপর পরমেশ্বরের সমস্ত ইচ্ছাই মঙ্গলময়ী; সৃষ্ট জীবের অমঙ্গল ঘটে, মঙ্গলময়ের তেমন ইচ্ছা কথনই হইতে পারে না। অতএব সেই মঙ্গলময়ের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া, আমরা এই নব বর্ষের অভিনন্দন করিতেছি।

ইচ্ছাময়! তব ইচ্ছা হউক সফল,
সর্ব্বসুখে সুখী হউক পৃথ্বীবাসিগণ;
বাধা, বিঘ্ন, রোগ, শোক সব যাক দূরে.
বিঘ্নহর, বিঘ্নহর! হইয়ে সদয়,
কৃপা কর কৃপাময়! এই ভিক্ষা মাগি।
তোমারি সৃজিত এই ব্রহ্মাণ্ড নিচয়,
ভূচর খেচর আদি বিশ্ব চরাচর,

স্থাবর জঙ্গম গ্রহ বারিধি পর্ব্বত,
চির সাক্ষী তব দেব! সৃষ্টি কৌশলের।
এ সৃষ্টি রক্ষিতে প্রভু কার সাধ্য আছে—
তুমি বিনা; চরাচরে ত্রিলোকের নাথ!
আনিয়াছ নববর্ষ, করুণা বিতরি,
নিত্য সুখে কাটে যেন এ নব বরষ।
আনন্দ উল্লাসে স্মরি তোমার শ্রীপদ,
এ নব বৈশাখে পূজা কি দিব তোমায়?
ভকতি কুসুমাঞ্জলি লহ উপহার!

বৈরাগ্যাবলম্বনেচ্ছু কোন বন্ধুর প্রতি।

লেখক,—শ্রীমৎ স্বামী যোগেশ্বরানন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। বাঙ্গালোর।

কাল, কাল, কাল, করি কাল চলি যায়,
জীবন-বেলায় ক্রমে আঁধার আগত;
রাবণের স্বর্গপ্রদ সোপানের প্রায়,
না হয় সঙ্কল্প শুভ কার্য্যে পরিণত।
ত্যজিতে বাসনা যদি দুঃখের আগার।
এ সংসার, লম্ফি উঠ সিংহ পরাক্রমে,
ছিঁড়ে ফেল মায়া-জাল মানসবিকার,
সংশয় দোলায় কেন দুলিতেছ ভ্রমে?
মূঢ় নর অন্ধকারে আকুলঅন্তরে,
হেরি বিভীষণ রূপ বৃক্ষে কল্পনায়,

দিবসে পুলক কত তাহারি ছায়ায় ;
অজ্ঞানে তেমতি সখে ! বিচলিত ডরে—
ভাব বৃথা ক্লেশকর বৈরাগ্য-পন্থায়,
অথ আনন্দ নিত্য অভয় যাহায়

—•✱•—

হরি-ভক্তি।

(গল্প।)

লেখক,—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

এক পল্লীগ্রামের একটী ভাঙ্গা বাড়ীর অন্তঃপুর মধ্যে দাওয়া বাঁধান, কাঠের খুঁটী ও গুল্‌ম্যাক-আঁটা কপাট-দেওয়া একখানি ঘর, তাহার আশে পাশে একটী লিচু, একটী গোলাপ জাম ও দুইটী কলমের আমগাছ ; আরও কয়েকখানি ভাঙ্গা ঘরের দেওয়াল দণ্ডায়মান থাকিয়া গৃহস্থের বিনষ্ট সৌভাগ্যের পরিচয় দিতেছিল। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত, সেই ঘরটীর মেজের উপর একটী শিশু সন্তান ও একটী বালিকা খাইতে না পাইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একটী আটদশ বৎসরের, আর একটী ছয়সাত বৎসরের বালক একখানি পাথরে চারিটী পান্তা ভাত খাইতেছে, মেঘাচ্ছন্ন শশিকলার ন্যায় মলিনা তাঁহাদের জননী তাহাদিগকে লুকাইয়া তাঁহার পদ্মপলাশলোচনে অশ্রুপাত করিতেছেন। এমন সময়ে বনমালী দত্ত মহাজন একজন দেওয়ানী আদালতের পেয়াদা, পাড়ার চৌকিদার ও দুই তিনটী ভদ্রলোক লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া স্ত্রীলোকটিকে বলিল, "তোমাদের দেনার দায়ে এই বাড়ী বিকাইয়া গিয়াছে, আমি ইহা নিলামে খরিদ করিয়া লইয়াছি, আজ হইতে এ বাড়ী আমার হইল। আজই আমি তোমাদিগকে উঠাইয়া দিতে পারি, কিন্তু সেটা ভাল দেখায় না বলিয়া সাতটী দিন সময় দিতেছি, এই সময় মধ্যে তোমরা এই বাড়ী আমাকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া যাইবে। যদি না

যাও, তবে আমি সাত দিন পরে আসিয়া উঠাইয়া দিব।”

স্ত্রীলোকটী কোন উত্তর করিলেন না। পেয়াদা ঢুলী সঙ্গে আনিয়াছিল। আপনার ভাষায় সে দস্তর মত কথাগুলি বলিলে ঢুলী ঢোল বাজাইয়া দিল। তাহার পর সকলেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

স্ত্রীলোকটী সধবা, নাম জয়ন্তী; সীমন্তে সিন্দুর ও বামহস্তের মণিবন্ধে লৌহ-কঙ্কণ ছিল। স্বামী জলদকান্ত মাসাধিক কাল বিদেশবাসী,—যাত্রাকালে সহধর্ম্মিনী ও পুত্রকন্যার অন্নসংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই; এইকথা বলিয়া গিয়াছেন, “যিনি জীব দিয়াছেন, তিনিই আহার যোগাইবেন। টাকা পাইলেই পাঠাইয়া দিব।” কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি টাকা পাঠাইবার সুবিধা পান নাই। যিনি জীব দিয়াছেন তিনিই কোন রকমে এই পাঁচটি জীবের আহার জুটাইতেছেন; সব দিন সমান রকমে জুটান না, কোন দিন অর্দ্ধাশন, কোন দিন বা পূর্ণাশন জোটে। হিন্দু চিরদিন আতিথেয়,—প্রতিবাসীরা দয়া করিয়া যে যে দিন পারে তাহাদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। জয়ন্তী সরদিন আপনার অন্নাভাবের কথা তাহাদিগকে জানাইতে পারেন না, লজ্জা প্রতিবন্ধকতা করে।

চারি পাঁচ দিন পূর্ব্ব হইতে কোন ভদ্রলোক একটী স্ত্রীলোককে দিয়া চাউল ডাউল, তরকারী পাঠাইয়া দিতেছিলেন, আজিও সেই স্ত্রীলোক অন্যান্য দিনের ন্যায় তাহা আনিয়াছিল, কিন্তু সে একটা কদর্য্য প্রস্তাব করায় জয়ন্তী তাহা ফিরাইয়া না দিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন; নবরত অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। পূর্ব্বদিনের যে কিছু পান্তা ভাত ছিল, তাহাই পুত্র দুটীকে খাওয়াইয়া আপনি অনশনে কাটাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু অচিরে সেই দুটী নিদ্রিত শিশু জাগ্রত হইয়া কাঁদিতে লাগিল, দেখিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিতে বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই খাবার প্রস্তুত হইল। তাহার কিছু আপনি খাইলেন, কিছু শিশু দুটিকে দিলেন অবশিষ্ট চাউল ডাউল পরদিনের জন্য রাখিয়া দিলেন, তাহাতে বালকবালিকাদের একবেলা চলিবে।

জয়ন্তীর একটী সখী ছিল, সে অতি নিকটেই বাস করিত। তাহার নাম ভুবনেশ্বরী, সকলে তাহাকে ভুবন বলিয়া ডাকিত; ভুবন বিধবা, তাহার দুটী পুত্র বই আর কেহ ছিল না। তাহার স্বামী তাহাদের জন্য কিছু সংস্থান করিয়া গিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা কষ্টেশ্রেষ্টে তাহাদের দিনপাত হইত। ভুবনের সহিত জয়ন্তীর খুব সদ্ভাব ছিল। বৈকালে তাহারা একত্র বসিয়া গ্রাম্য শিল্প যথা,—

কড়ির আন্‌লা গাঁথা, চুলের দড়ি বিনান। ইত্যাদি কাজ করিতে করিতে সুখ দুঃখের কথা কহিত। সে দিন ভুবন আসিয়া সেই স্ত্রীলোকের কদর্য্য প্রস্তাবের কথা ও তজ্জন্য মনের দুঃখে অনেক বেলা পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিবার কথা, জয়ন্তীর মুখে শুনিল, শুনিয়া সেই স্ত্রীলোকটার উপর বিষম চটিয়া গেল; সে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পাড়ার অনেক স্ত্রীলোককে সে কথা শুনাইল। যে ভদ্রলোক চারি পাঁচদিন জয়ন্তীর আহার যোগাইতেছিলেন, তাঁহার কর্ণেও সে কথা উঠিল। তিনি বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়া জয়ন্তীর নিকট ক্ষমা চাহিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "তিনি কখনও সেরূপ প্রস্তাব করেন নাই। জয়ন্তী অনেকটা সান্ত্বনা পাইলেন বটে, কিন্তু আর সে ভদ্রলোকের অনুগ্রহে আপনাকে বাধ্য করিলেন না; পরদিন তিনি পূর্ব্ববৎ খাদ্যদ্রব্য পাঠাইলেও জয়ন্তী তাহা ফেরত দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি নিরপরাধ হইলেও অনেকে তাঁহার চরিত্রে সন্দেহ করিতে পারে।

জয়ন্তী স্বামীকে সকল কথাই লিখিয়া পাঠাইলেন।

(২)

জলদকান্ত পিতার একমাত্র পুত্র। পিতা হরিভূষণ অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন, একটী কারবারে বিশ্বস্তভাবে কাজ করিয়া বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। দোষের মধ্যে তাঁহার যেমন আয় তেমনি ব্যয় ছিল বলিয়া কিছু সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। বাড়ীতে দোলদুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকলাপ ছিল, পুত্রের লেখা পড়ার জন্য তিনি যথেষ্ট অর্থব্যয়ও করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যয়ের তাদৃশ সার্থকতা জন্মে নাই। জলদকান্ত পাঠে অভিনিবিষ্ট ছিল না বলিয়া ভাল লেখাপড়া শিখিতে পারে নাই। সে গায়ক পাইলেই তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইত, বিশেষতঃ হরিনাম শুনিলে তাহার আমোদের পরিসীমা থাকিত না। যাহার মুখে হরিনাম শুনিত, তাঁহার কাছ ছাড়া হইত না; মাতৃদেবী ধরিয়া না রাখিলে সে তাহার সঙ্গেসঙ্গে গ্রামান্তরেও যাইতে ছাড়িত না। বড় হইয়াও সে এই অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে নাই। সে পিতামাতার পরলোক প্রস্থানের পর বিষয় আশয় যাহা কিছু ছিল বিক্রয় করিয়া আপনাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিত; পরিশেষে যখন ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িল। দিন আর যায় না, তখন সে পিতার প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার দুঃখের বার্ত্তা জানাইল; তিনি তাহার খোরাক পোষাকের

অতিরিক্ত মাসিক দশটী করিয়া টাকা বেতন ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু জলদের নিকট তিনি দশটাকার কাজ পাইতেন না। ক্রমে তিনি তাঁহার অন্যান্য কর্ম্মচারীর নিকট শুনিতে পাইলেন, "জলদ বড় সঙ্গীতানুরাগী, সঙ্গীত পাইলে সে আহার নিদ্রা ভুলিয়া যায়। প্রভুর কাজ করিতে গিয়া পথে যদি হরিনাম শুনিতে পায়, তাহা হইলে কাজ ভুলিয়া সে হরিনামে মত্ত হয়, কাজ করিয়া ফিরিতে কাজেই বিলম্ব হয়। প্রভু একদিন খোল করতালের শব্দ শুনিতে পাইয়া জলদকান্তকে বাহিরে কোন কাজ করিতে পাঠাইয়া, তাহার পশ্চাতে একজনকে দেখিতে পাঠাইলেন—সে কি করে।

জলদ প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া কাজে বাহির হইল. পথে একদল সংকীর্ত্তনকারিকে পাইয়া তাহাদের সঙ্গে জুটিয়া গেল, হরিনামের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার পশ্চাতে যে লোক প্রেরিত হইয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া প্রভুকে জানাইল, "জলদ কাজে না গিয়া হরিনামের সঙ্গে নাচিতেছে।" সে কিন্তু অশ্রুবর্ষণের কথাটী বাদ দিল।

প্রভু একটু বিরক্ত হইলেন। কিছু বলিলেন না, জলদকান্ত ফিরিয়া আসিলে তাহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসায় সে সত্য কথাই বলিল, মিথ্যার আশ্রয় লইল না। অন্যান্য কর্ম্মচারীরা ভাবিল, "এবার জলদের অন্ন মারা গেল," কিন্তু প্রভু তাহার অন্ন না মারিয়া তাহাকে বলিয়া দিলেন, "হরিনাম করা ভাল বই মন্দ নহে, কিন্তু সংসারী লোকের সংসারের কাজ ফেলিয়া হরিনাম করিতে গেলে, সংসার চলে না, আপনার ও স্ত্রীপুত্র পরিজনবর্গের অসনবশনের কষ্ট মিটাইয়া তবে হরিনাম করিলে হরি তুষ্ট হয়েন, নতুবা তিনি নারাজ হইয়া থাকেন। অতএব কাজ কর্ম্ম সারিয়া হরিনাম করিলে কেহ কিছু বলিতে পারে না।"

এই বলিয়া প্রভু তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। এই দিনই জয়ন্তীর লিখিত পত্রখানি আসিয়া পৌঁছিল, জলদ তখন বাহিরে গিয়াছিল। কারবারের প্রধান কর্ম্মচারী চারিটী পয়সা দিয়া চিঠিখানি লইয়া রাখিয়াছিলেন পত্রখানি ব্যারিং ডাকে আসিয়াছিল, জয়ন্তীর দুইটী পয়সা দিয়া একখানি ডাক টিকিট কিনিবার সঙ্গতি ছিল না। জলদ ফিরিয়া আসিয়া চিঠিখানি লইয়া পড়িল। সংসারে অন্নাভাব, স্ত্রীপুত্র কন্যাগণ অনাহারে কষ্ট পাইতেছে, তাহার উপর আশ্রমপীড়া জন্মিয়াছে; মহাজনের ঋণের দায়ে পূর্ব্বপুরুষের বাস্তু ভিটা বিকাইয়া গিয়াছে। এতদিনের পর বাস্তু ছাড়িয়া অন্যত্র উঠিয়া যাইতে হইবে। পত্রখানি পাঠ করিতে করিতে

জলদের মুখখানি মলিন হইয়া গেল, নাসারন্ধ্র হইতে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস নির্গত হইল, চক্ষু দুইটিও অশ্রুধারে ভিজিয়া গেল। তাহার প্রভু আড়ালে থাকিয়া সমস্ত দেখিতেছিলেন। পাঠান্তে জলদ পত্রখানি রাখিয়া দিল, যেখানে রাখিল, সেখানে প্রভুর দৃষ্টি পড়িল। তখন স্নানাহারের সময় হইয়াছিল, জলদ স্নান করিতে যাইলে প্রভু পত্রখানি লইয়া পাঠ করিয়া আবার সেইখানে রাখিয়া দিলেন। জলদ স্নান করিয়া আসিলে তাহাকে তিনি দশটী টাকা ও দুই আনার পয়সা দিয়া তখনি ডাকঘরে গিয়া মনি অর্ডার করিতে, আর তাহার পুত্রকন্যাগণকে লইয়া তাহার স্ত্রীকে আসিবার কথা লিখিতে বলিয়া দিলেন।

জলদ প্রভুর আজ্ঞানুযায়ী তাহাই করিল। যথাকালে জয়ন্তী আপনার পুত্র-কন্যা লইয়া স্বামী সকাশে উপস্থিত হইলেন।

(৩)

প্রভু জলদের স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনবর্গের থাকিবার জন্য একটী ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া করিয়া দিলেন। জলদ সেই বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী প্রভুর অন্তঃপুরে পাকাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া জয়ন্তী প্রভুর অন্তঃপুরে সমস্ত দিন এবং রাত্রি ৯।১০টা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতেন, তাহার পর বাড়ীতে আসিতেন; পুত্র তিনটী স্কুলে যাইত, স্কুল হইতে আসিয়া আপনারা লেখাপড়া করিত। জলদের প্রভু তাহাদের লেখাপড়ার খরচ যোগাইতেন। জলদ সমস্ত দিন প্রভুর কারবারের কাজকর্ম্ম করিতেন। সায়ংকালে আপন বাড়ীর মধ্যে একটী নিভৃত স্থানে বসিয়া ইষ্টচিন্তা করিতেন। সে সময় তিনি আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাইতেন, অশ্রুধারে গণ্ডস্থল প্লাবিত হইত, প্রয়োজন বশতঃ কেহ নিকটস্থ হইয়া সহস্রডাক ডাকিলেও তিনি তাহার সংবাদ লইতেন না। পুত্রকন্যাদি কেহ বিপন্ন হইয়া চীৎকার করিলেও তিনি আসিয়া দেখিতেন না।
উপাসনাকালে হরিপাদপদ্ম চিন্তা ও হরিগুণগান ব্যতীত তিনি আর কিছু করিতেন না। জয়ন্তী প্রায় তাঁহাকে বলিতেন, "ভগবানকে এত করিয়া ডাক, তিনি ত কই আমাদের দুঃখ দূর করিতেছেন না; দুসন্ধ্যা দুবেলা কাঁদিলে, তিনি দয়াময়, কত ক্ষণ তাঁহার দয়া না হইয়া থাকিতে পারে?"

জলদ তাহাতে এই উত্তর করিতেন, সে কখন তাহা করে না ও করিবেও না। তাহার আপন কর্ম্মফলে যদি প্রার্থনা পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে পাছে হরির প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির অপচয় হয়, তাহা হইলে তাঁহার সকলি পণ্ড হইবে, কখন তাঁহার সাংসারিক দুঃখের জন্য উপাসনা কালে চক্ষে জল আইসে না। হরিকে চিন্তা করিলেই প্রেমে ও পুলকে তাঁহার চক্ষু ভাসিয়া যায়, তিনি আপনাকে বিস্মৃত হন, এরূপ অবস্থার তিনি আর দুঃখ জানাইবেন কি ?

এইরূপে তাঁহার দিন যায়, প্রভুর বিশ্বস্তভাবে কাল কাটে, একদিন তিনি এক-জায়গা হইতে কারবারের হিসাবে ১২০ একশত কুড়ি টাকার ১২ বারখানি দশ টাকার নোট আদায় করিয়া আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া, প্রভুর নিষেধ ভুলিয়া তিনি হরিনাম গান করিতে থাকেন। আপন অভ্যাসমত সংজ্ঞা হীন হইয়া পড়েন, এই সুযোগে সংকীর্ত্তনের দলস্থ কেহ তাঁহার কটিদেশ হইতে নোট ১২ খানি বাহির করিয়া লয়, হরিনামান্তে জলদ আপন কটিদেশের বস্ত্রমধ্যে নোট কয়েকখানি না পাইয়া বিষম চিন্তিত হইলেন। যাহাকে জিজ্ঞাসেন কেহই 'না' বই 'হাঁ' বলে না। তখন তিনি কেমন করিয়া কি বলিয়া প্রভুর নিকট উপস্থিত হইবেন, প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেই বা কি বলিবেন, ইহাই ভাবিয়া আকুল হইলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া বাড়ীতে আসিলেন, জয়ন্তী প্রভুর অন্তঃপুরমধ্যে ছিলেন, তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া সমস্ত কথা বলিলেন, প্রভুপত্নী জয়ন্তীর সদাচার ও সচ্চরিত্রের জন্য তাঁহাকে আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ যত্ন করিতেন; জলদ তাহা জানিতেন। তিনি জয়ন্তীকে বলিলেন, "তাঁহার নিকট হইতে একশত কুড়ি টাকা ধার করিয়া আনিয়া দিলে, আমি প্রভুর নিকট মাসে মাসে যে দশটী টাকা পাই, তাহা তাঁহাকে দিয়া এক বৎসর মধ্যে শোধ করিব। জয়ন্তী বিশেষ চিন্তিত হইলেন, তিনি ভাবিলেন, "প্রভুপত্নীর নিকটে চাহিবামাত্র টাকা দিবেন, কিন্তু শোধ লইবেন না, কালে একথা প্রভুর কর্ণগোচর হইলেও হইতে পারে, তখন বড়ই লজ্জার বিষয় হইবে।"

জয়ন্তী ভাবিতে ভাবিতে স্বামীর কাছে বসিলেন, জলদ বলিলেন, "বসিলে যে ? যে কোন উপায়ে হউক টাকা গুলি আনিয়া দিতে হইবে, না আনিলে, বিষম বিপদ ঘটিবে।"

জয়ন্তীর চিন্তাচ্ছন্ন মুখ যেন শরতের মেঘমুক্ত শশীকলার ন্যায় কিয়ৎকালের জন্য প্রফুল্ল হইল, তিনি স্বামীকে বলিলেন, "কাপড়খানা ভাল করিয়া খুজিয়া দেখ

দেখি।"

কাপড় খুজিতে গিয়া জলদ দেখিলেন, কাছায় নোটগুলি বাঁধা আছে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই যেন হাত বাড়াইয়া আকাশ পাইলেন, জলদ তৎক্ষণাৎ প্রভুর নিকট গেলেন, প্রভু তৎপূর্ব্বেই নোট হারাইবার কথা শুনিয়াছিলেন। এরূপ দুঃসংবাদ শুনাইবার লোকের অভাব হয় না। জলদকে হাসিমুখে ফিরিতে দেখিয়া প্রভুর আশ্চর্য্য বোধ হইল, কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন যে, জলদ আপনি এবং সংকীর্ত্তন-কারিরা প্রত্যেকে তাহার কাপড় খুলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও নোট পায় নাই। জলদ প্রভুর নিকটস্থ হইয়া নোট বারখানি তাঁহার হাতে দিলেন। নোট পাইয়া তিনি বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "নোটগুলি হারাইয়াছিল, কোথায় কেমন করিয়া পাইলে ?"

জলদ তাঁহাকে সকল কথাই খুলিয়া বলিলেন, কিছুই গোপন করিলেন না।

জলদের কথায় প্রভুর মনে একটু সন্দেহের ছায়া পড়িল। প্রভু ভাবিলেন, জয়ন্তী বড় বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক, হয়ত তাঁহার সঞ্চিত অর্থ ছিল; স্বামীকে বিপন্ন দেখিয়া তাহাই দিয়া থাকিবেন। তাঁহার মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, জিজ্ঞাসিলে জয়ন্তী তাঁহার নিকট কোন কথা লুকাইবে না। কিন্তু তৎপূর্ব্বে জলদ যাহাদের নিকট হইতে নোট আনিয়াছিলেন, তাহারা দশটাকার নোটের নম্বর রাখে কি না, প্রভু তাঁহা জানিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন এবং বলিয়া দিয়াছিলেন যদি নম্বর থাকে, তাহা হইলে নম্বরগুলি লিখিয়া দেয়। তাহারা কেবল মাত্র তিনখানি নোটের নম্বর পাঠাইয়া বলিয়া দিল, এই তিনখানি নোট আধখানা করিয়া ডাকের চিঠির মধ্যে আসিয়াছিল বলিয়া নম্বর পাওয়া গেল। জলদ যে নোটগুলি আনিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ঐ তিনটী নম্বরের সহিত তিনখানি নোট মিলিল। ইহাতে প্রভুর আরও কৌতুহল বৃদ্ধি পাইল, তিনি অন্তঃপুরে গিয়া জয়ন্তীকে নোটের কথা জিজ্ঞাসিলে, জয়ন্তী সমস্ত কথা তাঁহাকে বলিলেন, পতিকে বিষম চিন্তিত ও তাঁহার মুখশ্রী মলিন দেখিয়া যখন তিনি চিন্তা করিতেছিলেন, তখন কে যেন তাঁহাকে বলিলেন, "নোট যে তোমার স্বামীর কাছায় বাঁধা রহিয়াছে।"

কাছার কাপড় খুলিয়া নোটগুলি পাওয়া গেল।

(৪)

এইঘটনার কয়েকদিন পরেই জলদের প্রভু পীড়িত হইলেন, সে যাত্রা তাঁহার

আরোগ্যলাভ ঘটিয়া উঠিল না। তিনি পরলোকে প্রস্থান করিলেন, মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র দুটীকে ও প্রধান কর্ম্মচারীকে বলিয়া গেলেন, "যতদিন তাঁহার কারবার চলিবে, ততদিন জলদ যেমন আছে, তেমনি ভাবে যেন থাকিতে পায়। তাহার বা তাহার পরিজনবর্গের উপর কেহ কোনরূপ অত্যাচার না করে।"

তাঁহার সৎকার্য্যে বিলক্ষণ ব্যয় ছিল, দশবৎসর পূর্ব্বে একবার কারবারে বিস্তর ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতি পূরণ হয় নাই, তজ্জন্য অনেকগুলি টাকা ঋণ ছিল। তিনি আপনি বড় বুদ্ধিমান ও শিষ্টাচারী ছিলেন, তাই গোছে গাছে কারবারটী খাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। পুত্র দুটী কেহ তাঁহার মত ছিল না, তাঁহার পরলোকান্তে তাঁহারা পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইল। যিনি প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি কার্য্যদক্ষতা জন্য কারবারের শূন্য বখরাদার অর্থাৎ নিজের মূলধন না থাকা সত্তেও বেতনের পরিবর্ত্তে মুনফার অংশ পাইতেন। কারবারটীর উপর তাঁহার বিলক্ষণ লোভ জন্মিয়াছিল, কোন গতিকে তাহা উঠাইয়া না দিয়া আপনার নামে চালাইবার জন্য জলদের প্রভু-পুত্রদের বিবাদ মনান্তরে সে ব্যক্তি বাতাস দিতে লাগিলেন। ক্রমে মহাজনেরা আপনাপন প্রাপ্য আদায়ের জন্য নালিস করিল, ডিক্রী পাইল, সেই ডিক্রী জারি করিয়া কারবারের মজুত মাল নিলাম করিয়া লইল। প্রধান কর্ম্মচারী আপন নামে কারবার আরম্ভ করিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে জলদকে আর একবার আশ্রয় হারাইতে হইল। কিন্তু এবারে জয়ন্তীর হাতে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ ছিল; তাহাতে একবৎসর চলিবার ভাবনা ছিল না। এই সময় মধ্যে জয়ন্তী আর একটী পরিবারের আশ্রয় পাইলেন, কিন্তু প্রভু পূর্ব্ববৎ নহে। তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত হইল জয়ন্তী ও তাঁহার বালিকা কন্যাটী খাইতে পরিতে পাইবে, আর মাস মাস ছয়টী করিয়া টাকা বেতন পাইবেন। সেই ছয়টি টাকায় স্বামী ও পুত্র তিনটীর খাওয়া পরা চলে না; পুত্র তিনটীর সকলেই বেশ বুদ্ধিমান ও মেধাবী, শিষ্টশান্ত এবং মিষ্টভাষী বলিয়া প্রতিবাসীরা তাহাদের স্কুলের বেতন ও লেখা পড়া শিখিবার অন্যান্য খরচ দিতে স্বীকার করিলেন, আর সময়ে সময়ে নগদও কিছু কিছু দিতেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদন সচ্ছল হইল না, তজ্জন্য জলদের কিছু কিছু উপার্জ্জন করা আবশ্যক হইয়া উঠিল; চাকরীর জন্য তিনি নানাস্থানে চেষ্টা করিলেন, চাকরী কোথাও মিলিল না, অগত্যা সামান্য শ্রামিকের কাজ করিতে প্রস্তুত হইলেন, তাহাতেও সুবিধা হইল না। ভদ্রসন্তান কুলি মজুরের কাজ কখনও করেন নাই, আজি পারিবেন কেন? একজন

কাঁসারী বাসন কুঁদিবার জন্য তাঁহাকে সঙ্গে লইল, সেও তাহার কাজে সন্তোষলাভ করিতে পারিল না। জলদ কুঁদ টানিতে টানিতে হয়ত "হরি হরি" বলিয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন, কিয়ৎকাল অজ্ঞান অচেতনের মত পড়িয়া থাকিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিলেন, যে ব্যক্তি কুঁদ ধরিয়াছিল, টানিবার লোকের অভাবে তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইল। কাজেই কুলিমজুরের কাজেও তাঁহার দুর্নাম রটিল। অতঃপর জলদকান্ত হরিনামে ভিক্ষা করা স্থির করিলেন, কিন্তু কেবলমাত্র হরিবোল বলিয়া গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হইলে মুষ্টিভিক্ষার বেশী কিছু মিলিবে না, সমস্ত দিন ঘুরিতে হইবে। অতএব তাহা না করিয়া যদি হরিনাম গান করিয়া বেড়ান যায়, তাহা হইলে মুষ্টিভিক্ষার উপর দু'একটা পয়সাও মিলিতে পারে, সকাল সকাল বাড়ীতেও আসা যায়, তাহাই ঠিক করিয়া তিনি একটী গোপীযন্ত্র প্রস্তুত করাইলেন, গোপীযন্ত্র বাজাইবার অভ্যাস পূর্ব্বাবধিই ছিল। প্রথম দিন গোপীযন্ত্রটী লইয়া তাহার উপর বেশ করিয়া নূতন তার চড়াইলেন, তার পর ভিক্ষায় বাহির হইলেন, হরিনামের একটী সুন্দর গানও পছন্দ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেইটীই গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গাইবেন ঠিক করিলেন। বাড়ীর নিকট হইতে কিছু দূরবর্ত্তী পল্লীতে প্রবেশ করিয়া তিনি একটী ঋদ্ধিমান গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হইলেন; তাহার পর শ্রীহরি স্মরণ করিয়া গোপীযন্ত্রে মূর্চ্ছনা দিলেন, মূর্চ্ছনা দিয়া গান ধরিলেন :—

"হরিনামের তুল্য ধন কি জগতে আছে;
হরিভ'জে ত্রিপুরারি মৃত্যুকে জয় করেছে।"

এইটুকু গাইতে গাইতেই জলদের চক্ষে জল আসিল,—
প্রেমিক বৈষ্ণব জলদকান্ত হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া তাহার পর—

"হরিনাম সত্য, পরম পদার্থ,"

এইটুকু গাইতে গাইতে তাঁহার কণ্ঠে জড়তা জন্মিল, যেন বাক্‌রোধ হইবার উপক্রম হইল ;—

"হরি চেয়ে হরিনামের বেশী মাহাত্ম্য।"

এইটুকু সুরের সহিত গাইবার চেষ্টা করিতে করিতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। গোপীযন্ত্রটী মাটীতে গড়াইতে লাগিল। গৃহস্বামী বৈরাগীঠাকুরের সুকণ্ঠের স্বর কাণে পাইয়া গান শুনিবার জন্য তাঁহার কাছে আসিয়াছিলেন, বৈরাগীকে মূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি একঘটী জল আনিয়া মুখে চোখে দিলেন, বাতাস করিতে লাগিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন হইল। গৃহ-

স্বামী বলিলেন, "ঠাকুর, আজি আর তোমাকে অন্য কোথাও ভিক্ষা করিতে হইবে না।" এই বলিয়া তিনি সের দুই আড়াই চাউল, আধসেরটাক ডাউল, কিছু তৈল ও লবণ আর কিছু তরকারী এবং আটটী পয়সা দিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! প্রতিদিন যেন আমার ভিটায় আপনার পদধূলি পড়ে। আমি আপনার প্রতিদিনের খরচ জুটাইব। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার ছেলেপিলেরা ভাল থাকে।"

জলদ শ্রীহরির নাম লইয়া গৃহস্থকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে আপন আবাসে ফিরিলেন। ইহার পর তিনি প্রতিদিন নয়, দুই একদিন অন্তর সেই গৃহস্থের বাড়ীতে আসিলেই পূর্ব্ববৎ চাউল ডাউল ও পয়সা পাইতে লাগিলেন। গৃহস্থেরও ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

(৫)

জয়ন্তী প্রতিদিন প্রভুর বাড়ীতে রন্ধন করিতেন, প্রভুর পরিজনবর্গের আহারাদি হইলে আপনার অন্নব্যঞ্জন গৃহে আনিতেন, কন্যাটী সেইখানেই আহার করিয়া আসিত; পুত্র দুটী আপনারা যেমন পারিত, রন্ধন করিয়া পিতার খাবার রাখিয়া আপনারা খাইয়া স্কুল যাইত। জয়ন্তী বাড়ী আসিয়া কোন কোন দিন দুই একটা তরকারী রাঁধিতেন, কোনদিন নাও রাঁধিতেন, স্বামীকে আহার করাইয়া আপনি আহার করিতেন। জলদ কোন কোন দিন বেলা অতিরিক্ত হইলে জয়ন্তী আসিবার পূর্ব্বেও আহার করিতেন।

এইরূপে দিন যায়;—ধনীরও যায়, দরিদ্রেরও যায়, দিন কাহার জন্য অপেক্ষা করে না; তবে সুখে আর দুঃখে। সংসারের বিচিত্র গতি, কিসে কি হয়, আমরা তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সংসারের রহস্য ভেদ করা সাধারণ বুদ্ধির কার্য্য নহে; দেখা যায়, মহাপাপী দুরাচার ব্যক্তি স্ত্রীপুত্র পরিজন লইয়া, সুখে স্বচ্ছন্দতায় দিনপাত করিতেছে; পরস্বাপহরণ পরপীড়ন করিয়াও তাহার সুখের অপচয় দেখি না। আবার পরম পুণ্যবান, ধর্ম্মনিষ্ঠ ঈশ্বর-পরায়ণ পুরুষও দারিদ্র্যদুঃখের দহনে দগ্ধপ্রায়, দিনান্তে অন্ন জোটে না। পুত্রকন্যাদি পরিজনগণের দুঃখনিবৃত্তির জন্য প্রাণপণ করিয়াও কিছু করিতে পারিতেছেন না। এই সংসারের কোথাও অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বিলাসব্যসনে পাপস্রোত প্রবাহিত, আবার কোথাও বা দুঃখের দাবদাহ তৃণজলশূন্য মরুভূমিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, মানবদৃষ্টি সে দিকে নিপতিত হয় না, সেই মরুক্ষেত্র মধ্যে কত লোক

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইয়া প্রাণ হারাইতেছে। এ রহস্য কে বুঝিবে? তুমি আমি চক্ষু থাকিতে অন্ধ, বুদ্ধি পাইয়া নির্ব্বোধ। তবে যদি ভাবিয়া দেখি যে পতি-প্রাণা কুটীরবাসিনী অন্নবস্ত্রের জন্য লালায়িতা, পতিসোহাগে বঞ্চিতা, আর কুলটা সুশোভিত সৌধ-শিখরবাসিনী, স্বর্ণরত্নালঙ্কারে ভূষিতা, প্রেম সোহাগের সোহাগিনী; আর যদি চিন্তা করি, যে প্রাণের পোষক, স্বাস্থ্যসাধক দুধের ভার স্কন্ধে লইয়া গোপনন্দন নগরের পথে পথে "চাই দুধ—চাই দুধ" বলিয়া চীৎ-করিয়া অতি কষ্টে দুই একজন গ্রাহক জুটায়, আর সর্ব্বনাশিনী সুরার জন্য শৌণ্ডিকালয়ে অগ্রিম পয়সা দিয়া মদের গেলাসটী পাইবার জন্য লোক লালায়িত, তাহা হইলে সংসার-রহস্যের কিয়দংশ বুঝিলেও বুঝিতে পারি।

জলদের ক্ষুদ্র পরিবারটীর দুঃখের দিন খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে যাইতেছে, যাইতে যাইতেও যায় না।

একদিন জয়ন্তী বেলা প্রায় দুইটার সময় প্রভুর বাড়ী হইতে অন্নব্যঞ্জন লইয়া আসিয়া দেখিল, স্বামী বাড়ীতে নাই, প্রতিদিন এ সময় পর্য্যন্ত তিনি পূজাহ্নিক করেন, জয়ন্তী আসিলে তবে জলগ্রহণ করেন, অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজি কিছু বেলাটা অধিক হইয়াছে বলিয়া কি তিনি বিরক্ত হইয়া কোথাও চলিয়া গিয়াছেন, জয়ন্তী এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বেলা চারিটা বাজিল, ছেলেরা স্কুল হইতে আসিল, তথাপি জলদের দেখা নাই। ছেলেরা তাঁহাকে সুসংবাদ শুনাইলেন, বড়টী পরীক্ষা দিয়া কতকগুলি পুস্তক ও কিছু নগদ টাকা পুরস্কার পাইয়াছে, আর মধ্যমটী মাসিক পাঁচটী করিয়া টাকা তিন বৎসর বৃত্তি পাইবে। জয়ন্তী যেন সে কথায় কাণ দিলেন না, তিনি পতির ভাবনায় অস্থির, কিছুই তাঁহার ভাল লাগিল না; তবে পাছে ছেলেরা ক্ষুণ্ণ হয়, এজন্য একটু কৃত্রিম হাসিয়া, তাহাদিগকে কোলে লইলেন, পুত্র দুটীও পিতার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইল, পিতার অনুসন্ধানে যাইতে উদ্যত হইল, জয়ন্তী যাইতে দিলেন না, শীতকাল, রাত্রি আসিতে ছিল, তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারিলেন না। পুত্র দুটী দেখিল, অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত, জননী আহার করেন নাই, জননীকে জিজ্ঞাসিয়া উত্তর পাইল, "রাত্রিতে রাঁধিতে পারিব না বলিয়া তোমাদের জন্য রাখিয়াছি।" এ কথায় তাহারা সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। আহার করাইবার জন্য তাঁহাকে জেদ করিতে লাগিল, জননী যেখানে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, পুত্রেরা সেইখানে অন্নব্যঞ্জন আনিয়া দিল, আহারের জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিল, কিন্তু তিনি খাইতে রাজী হইলেন না।

সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক ঢাকিল ; প্রতিদিনের ন্যায় জয়ন্তী পুত্রদিগকে পড়িতে বসাইয়া প্রভুর বাড়ীতে গেলেন।

এদিকে জলদ যখন স্নান করিতে যান, তখন দেখিলেন কয়েকজন লোক ভগবান বিষ্ণুর দারুমূর্ত্তি লইয়া যাইতেছে, সেই বিগ্রহ মুর্ত্তি তাহারা প্রতিষ্ঠা করিবে। তাহাদের সঙ্গে একদল কীর্ত্তনিয়াকে দেখিয়া তিনি তাহাদের সঙ্গ লইলেন এবং গান গাইতে গাইতে গ্রামান্তরে উপস্থিত হইলেন, সেখানে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইল, তাহার পর তাহার স্ত্রীপুত্র পরিজনবর্গকে মনে পড়িল, জয়ন্তী এখনও আহার করেন নাই, যখন ইহা তাঁহার মনে হইল, তখন তিনি সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। যখন তিনি বাড়ীতে পৌঁছিলেন, তখন রাত্রি প্রায় আটটা। ছেলে দুটী দৌড়িয়া গিয়া জননীকে সংবাদ দিল, জননী আকাশ হাতে পাইলেন। জয়ন্তীর প্রভুপত্নী যখন তাহাদেরই মুখে শুনিলেন, জয়ন্তীর সমস্ত দিন আহার হয় নাই, তখন তিনি তাহাকে বাড়ী যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, জয়ন্তী তাহাতে সম্মত হইলেন না, একবার মাত্র বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন, স্বামী আহার করিতে বসিয়াছেন ; তাঁহার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন, "তোমার খাবার হইতে কিছু আমাকে দাও, এই কথা শুনিয়া জলদ বলিলেন, "তুমি সমস্ত দিন কিছু খাও নাই কি ?"

জয়ন্তী লজ্জাবনত মুখে উত্তর করিলেন, "তাও কি পারি ? খাবার জিনিষ মুখে উঠিবে কেন ?"

জলদ জয়ন্তীর হাতে আপনার ভুক্তাবশিষ্ট দুটি অন্ন দিলেন, জয়ন্তী তাহাই খাইয়া প্রভু-বাড়ীতে গেলেন,প্রভুপত্নী তাঁহার উত্তমরূপ জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, জয়ন্তী তাহা খাইয়া আপন কাজ শেষ করিলেন,প্রতিদিনের ন্যায় সকলকে আহারাদি করাইয়া বাড়ী আসিলেন। বাড়ীতে আসিয়া স্বামীর সহিত পুত্রাদিগের পুরস্কার প্রাপ্তির কথায় অনেকক্ষণ কাটাইলেন। তাহার পর নিদ্রিত হইলেন।

(৬)

উপরি উক্ত ঘটনার চারি পাঁচদিন পরে একদিন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বদিক ফরসা হয় নাই, কাককোকিল ডাকে নাই, এমন সময়ে জলদের যে পুত্রটী বৃত্তি পাইতেছিল, সেইটী জননীকে জাগ্রত করিয়া বলিল, তাহার দেহ যেন অবসাদগ্রস্ত, ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই একবার ভেদ হইল, তাহাতেই

দৌর্ব্বল্যানুভব হইল, মুখশোষ জন্মিল, গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। জয়ন্তী স্বামীকে জাগাইয়া সে কথা বলিতে না বলিতেই পুত্রের আর একবার ভেদ হইল, জয়ন্তী চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন, তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। জলদ তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিতে গেলেন। এদিকে পুত্রের উপসর্গ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গের পেশীগুলি আক্ষেপযুক্ত হইল, বালক যারপরনাই কাতরতা প্রকাশ করিতে করিতে পিতাকে খুঁজিল, পিতা ডাক্তার আনিতে গিয়াছেন শুনিয়া সে বলিল, "আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইব না, ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বেই প্রাণ যাইবে মনে হইতেছে।"

তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছিল, বালকটী বড় শিষ্টশান্ত ও মিষ্টভাষী বলিয়া প্রতিবাসীরা তাহার পীড়ার কথা শুনিবামাত্র সকলে তাহাকে দেখিতে আসিল। জয়ন্তীর প্রভুপত্নী প্রভৃতি কেহই আসিতে বাকী রহিল না। জলদের অপেক্ষা না করিয়া, তাহারা পাড়ার একজন ডাক্তার আনিল, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধপ্রয়োগে উপকার না পাইয়া আধ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ খাওয়াইতে লাগিল, ক্রমে রোগীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, বাক্‌শক্তি লোপ পাইল, অস্থিরতা বাড়িল,—অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, যেন পিতাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল। শুশ্রূষার জন্য অনেকেই উপস্থিত, বালক একবার উঠিয়া বসিল, বারম্বার জননীর পা দুটী ধরিয়া এরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল যেন কথা কহিবার শক্তি থাকিলে সে বলিত, "আমি আপনাদের কুসন্তান জন্মিয়াছিলাম, আপনাদের কিছুই করিতে পারিলাম না; আপনাদের কষ্টই সার হইল।"

অগ্রজ নিকটেই ছিল, জননীর হাতটী ধরিয়া তাহার হাতে দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; অনুজ প্রাণ অগ্রজ কাঁদিতে লাগিল। প্রতিবাসীদের মধ্যে কেহই সে দৃশ্য দেখিয়া অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিল না। কেহ কেহ সে দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া বাহিরে আসিল। দেখিতে দেখিতে বালকের শ্বাস-শ্বাস আরম্ভ হইল, কিয়ৎকাল পরেই বালকের প্রাণবায়ু বহির্বায়ুর সহিত মিশিয়া গেল!

জয়ন্তীর চীৎকারে যেন আকাশ ফাটিল, পশুপক্ষীও কাঁদিল। জয়ন্তীর বক্ষে যেন পাষাণ চাপা পড়িল,—তিনি মূর্চ্ছিতা হইলেন। প্রতিবাসিনীরা তাঁহার মুখে চোখে জল দিল, বাতাস করিতে লাগিল, দাঁতে দাঁত বসিয়া গিয়াছিল, অনেক

চেষ্টাযত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন হইল। জয়ন্তীর প্রভু যাহাতে এই শোকাবহ দৃশ্য অধিকক্ষণ দেখিতে না হয়, তাহার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু জলদের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। জলদ আসিয়া উপস্থিত হইলে আর একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শনের ভয় আছে। অতএব তিনি প্রতিবাসীদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন, কেহ বলিলেন, "তাঁহার অপেক্ষার প্রয়োজন নাই, তাঁহাকে আনিতে পাঠাইয়া শব স্থানান্তরিত করা হউক। তিনি এ দৃশ্য দেখিলে কাহাকেও কিছু করিতে দিবেন না।"

কেহ বলিল, "বলেন কি মহাশয়! তাঁহাকে উন্মত্তের ন্যায় হইতে হইবে, জলদে আর জলদ থাকিবে? ভগবানের এমন মার কি আর আছে? বুকের হাড়-গুলা যেন পৃথক পৃথক হইয়া পড়িবে। বলেন কি, পুত্রশোকের মত শোক আর আছে, নিতান্ত দুরদৃষ্ট না হইলে পুত্রশোক পায় না।

আর একজন বলিল, "দুরদৃষ্টের বাকী কি বলুন! লোকটা আপনার অবস্থা ভাবিয়া ভাবিয়া যেন পাগল; তাহাতে এ শোক পাইয়া তিনি কি অধিক দিন বাঁচিতে পারিবেন মনে করেন। বিশেষতঃ ছেলেটী ৫৲ টাকা করিয়া স্কলারসিপ পাইত। এ শোক কি সহিতে পারিবে; ইহাতে বড় বড় বিচক্ষণ, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান লোককে কাতর করিয়া তোলে, কোথায় আপনার জলদের মত লোক থাকেন।

জলদ ডাক্তার বাড়ী যাইতেছিলেন, পথে এক জায়গায় অষ্টপ্রহরী হইতেছিল, তিনি তাহা দেখিয়া নামসংকীর্ত্তনে মত্ত হইয়াছিলেন। অষ্টপ্রহরীর ধূলট হইয়া গেল, নামসংকীর্ত্তন থামিল তিনি ডাক্তারবাড়ী গেলেন, ডাক্তার তৎপূর্ব্বেই রোগীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছিলেন, তিনি আর সে সংবাদ তাহাকে না দিয়া একটী শিশিতে একটু গোলাপজল দিয়া বলিয়া দিলেন, একটু পরেই যাইতেছি, আমার যাইতে যতটুকু বিলম্বের সম্ভাবনা, ততক্ষণ আধঘণ্টা অন্তর এই ঔষধটুকু যেন খাওয়ান হয়।

জলদ ঔষধ বিশ্বাসে সেই শিশিটী লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়া বুঝিতে পারিলেন, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাঁহার পুত্র আর নাই। তিনি ধীরে ধীরে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া জনতা দর্শনে যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই প্রত্যক্ষ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র জয়ন্তী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "হরি আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন!"

এই কথা শুনিয়া জলদ বলিলেন, "আহা!—ওকথা মুখে আনিও না, মুখে

আনিও না!" আমার হরির কোন দোষ নাই, দোষ আমাদের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের, হরি কি করিবেন? তবে পুত্রের অন্তিমে তাহাকে হরিনাম শুনাইতে পারিলাম না, এই দুঃখ রহিয়া গেল!"

এই বলিতে বলিতে তিনি প্রতিবাসীদের নিকটস্থ হইয়া, জয়ন্তীর প্রভুকে বলিলেন, "বালকের অন্তেষ্টিক্রিয়ার জন্য আমাকে সাহায্য করে এরূপ দুই একজন লোক দিবার ব্যবস্থা করুন।"

জয়ন্তীর প্রভু বলিলেন, "তোমার অপেক্ষা করা হইতেছিল, নতুবা অনেকক্ষণ তাহা হইত।"

জলদ হরিবোল দিয়া পুত্রের শব শ্মশানে লইয়া গেলেন। প্রতিবাসীরা তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন, "শেষাবস্থায় তাহার কাণে হরি নাম শুনান হয় নাই, ইহাই আমার ত্রুটী হইয়াছে, অন্তেষ্টিক্রিয়া না করিলে আমায় পাপ স্পর্শ করিবে।"

প্রতিবাসীরা সকলে হতবুদ্ধির ন্যায় রহিল, জলদ আপনার কাজ করিয়া যথাকালে ফিরিয়া আসিলেন।

(৭)

এই ঘটনার এক মাস পরে একটু দূরবর্ত্তী একখানি গ্রামের জমীদার শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবার জন্য একজন ভক্তিবান্ বৈষ্ণবের অনুসন্ধান করিতেছিলেন; অনেকেই তাঁহাকে জলদকান্তের কথা বলে। জমীদার জলদের এরূপ হরিভক্তির কথা শুনিয়া স্বয়ং তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বিগ্রহসেবার জন্য আমি বার্ষিক ৬ হাজার টাকা উপসত্ত্বের জমিদারী অর্পণ করিয়া ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়াছি, যতদিন আপনি জীবিত থাকিবেন, ততদিন আপনি দেবসেবা করিবেন, কেহ আপনাকে ছাড়াইতে পারিবে না। প্রতিদিন পাঁচটী ব্রাহ্মণভোজন হইবে, আর অতিথি অভ্যাগত যত আসিবে কেহ বৈমুখ হইবে না, প্রসাদ পাইবে। আপনার স্ত্রীপুত্র-পরিজনবর্গ সকলেই অন্নবস্ত্র পাইবেন। তদতিরিক্ত আপনার পুণ্যধর্ম্মের জন্য মাসিক পনরটী করিয়া টাকা পাইবেন। আপনি প্রতিদিন ভক্তিভাবে সেবা করিবেন মাত্র। দেবালয়ের জন্য পৃথক পাচক ও ভৃত্য থাকিবে, আপনাকে কোন কাজ করিতে হইবে না। দিবা

ভাগে ভোগের সময়, সায়ংকালে শীতলের সময় খোল বাজাইবার ও নামসংকীর্ত্তন করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহারা প্রতিদিন দুইবেলা প্রসাদ ও মাসিক ৮৲ আট টাকা করিয়া বেতন পাইবে। আপনার পুত্র দুইটীর বিদ্যাশিক্ষার ও কন্যাটীর বিবাহে যাহা ব্যয় হইবে, তাহা দেবোত্তরের সম্পত্তি হইতে দেওয়া হইবে।

জমীদার যে পরম ভাগবৎ, সে পক্ষে সন্দেহ নাই ;কিন্তু জলদ তাঁহার অনুরোধ রক্ষায় সম্মত হইলেন না, বলিলেন, "আমি বিগ্রহসেবা করিতে পারিব না, কেননা, পদে পদে অপরাধের ভয় আছে ; যদি কোনদিন সেবাপরাধ হয়, তাহা হইলে আমার জন্ম পণ্ড হইবে।"

জমীদারের অনুরোধে প্রতিবাসীরা সকলে ও জয়ন্তীর প্রভু জলদকে অনুরোধ করিলেন, তদুত্তরে জলদ বলিলেন, "আপনারা আজিকার রাত্রিটী অপেক্ষা করুন, কল্য প্রাতে আপাদিগকে জানাইব, আমি সেবার ভার লইতে পারিব কি না ?

জলদ যেখানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে স্থানটীও উক্ত জমীদারের অধিকারভুক্ত। তিনি সে রাত্রি আপনার জমীদারী কাছারীতে অবস্থিতি করিলেন, পরদিন প্রাতে জলদ প্রফুল্লচিত্তে জমীদারের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। জমীদার সেই দিনই তাঁহাকে সপরিবারে লইয়া গিয়া দেবসেবায় নিযুক্ত করিলেন। জলদের অবস্থানুযায়ী কাজ জুটিল, তিনি যতদিন জীবিতছিলেন, ততদিন প্রীতি ও যত্নসহকারে শ্রীশ্রী৺শ্যামসুন্দরের সেবায় মনপ্রাণ ঢালিয়া দিলেন। তাহার পুত্র দুটিও বড় হইয়া বেশ দশটাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিল ; কন্যাটিও সৎপাত্রে পরিণীতা হইল। জয়ন্তী পুত্রদের বিবাহ দিয়া সুখের ঘরকন্না করিতে লাগিলেন।

হরিভক্তের কিসের দুঃখ। ভক্তের জন্য ভগবান আছেন, তিনি ভক্তগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন।

আত্মোৎকর্ষ

ও

আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি

এতৎ সম্বন্ধে কাউণ্ট টলষ্টয় প্রভৃতি প্রতীচ্য চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের অভিমত।

লেখক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস,

(১)

"ব্যক্তিগত জীবন জাতীয় জীবন পরিগঠন করে।" রুষিয়াবাসী সুবিখ্যাত সুলেখক কাউণ্ট টলষ্টয় (Tolostoy) এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ইদানীন্তন সে সকল মত জনসাধারণে প্রচার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মতটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টলষ্টয় বলিয়াছেন, একটী জ্বলন্ত দীপশিখার সংযোগে যেমন শত শত দীপ প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ ধর্ম্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য ও বিশ্বাস কাহারও হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইলে, তাহার সান্নিধ্যে যে কেহ আসে, তাহারও হৃদয়ে সেই সত্য ও বিশ্বাস সংক্রমিত হয়। সুতরাং বলা যাইতে পারে, মানুষের দুর্গতির অবসানের একমাত্র উপায় প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মোৎকর্ষের জন্য সাধনা। তাঁহার কথাগুলি এই ঃ—

"As only a burning material, can ignite other material, so also only the true faith of one man, being communicated to other men can spread and confirm religious truth. And it is only the spreading and confirmation of religious truth which improves the position of men.

And therefore the means of delivercnce from all those eirls from which men soffer—lies, however, strange it may seem only in one thing, the inner work of each man upon himself."

কাউণ্ট টলষ্টয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে যদিও আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে যে, জাতীয় অধঃপতন অপনোদনের একমাত্র উপায় ব্যক্তিগত আত্মোৎকর্ষ সম্পাদনের চেষ্টা, আর ধর্ম্মবুদ্ধি সেই চেষ্টার ভিত্তিস্বরূপ অবস্থিত, তাঁহার মতে ইতিহাস জাতীয় উৎকর্ষের যে চিত্র আপন অঙ্কে এযাবৎ অঙ্কিত করিয়া আসি-

তেছেন, তাহাতে আমরা দেখি কেবল সামাজিক উন্নতিই ব্যক্তিগত উৎকর্ষের মুখাপেক্ষী ; জাতীয়জীবনের উন্নতি বা অবনতি ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতির সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সংস্পৃষ্ট নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে, শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ, নানক, কবীর, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মাগণ স্ব স্ব ধর্ম্মজীবনের প্রভাবে সমাজ বিশেষকে সমুন্নত করিলেও তাঁহাদিগের সান্নিধ্যে যে চরিত্র বা সমাজ পরিগঠিত হইয়াছে, তাহার যে শক্তি, যে শক্তির সহিত তুলনা করিলে, প্রকৃতিপুঞ্জের সমবেত চেষ্টা বহুল পরিমাণে দুর্ব্বল। পরন্ত বলশালী স্বার্থকে মধ্যকেন্দ্র করিয়া পরার্থের সহিত এই যে সংঘর্ষ, আপাতদৃষ্টিতে ইহা বলশালী বলিয়া বিবেচিত হইলেও, ইহাতে জয় পরাজয় আছে ; কিন্তু যেখানে ধর্ম্ম মধ্যকেন্দ্রে অবস্থিত, এবং সত্য তাহার পৃষ্ঠ-পোষক, সেখানে পরাজয় ও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জয়ের পদবীতে উন্নীত হইয়াছে। ধর্ম্মবীর নানকের শিষ্য-সম্প্রদায়ের চেষ্টার ফলস্বরূপ শিখ-সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান কে না স্বীকার করিবেন ; আজি শিখ সম্প্রদায় সম্মানিত। কিন্তু শিবজীর বিশ্বাস-ঘাতকতা ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিতর দিয়া আগমন করায় এদেশবাসিদিগের চক্ষে কথঞ্চিৎ পরিমাণে জয়যুক্ত হইলেও, সত্যের সহকারিতা হইতে পরিভ্রষ্ট হওয়ায়, ইহাকে বিজয়রূপে সকলেই এ যাবৎ গ্রহণ করিতে পারে নাই। সকলেরই মনে সন্দেহ হয় এইরূপ ধর্ম্মোন্মত্ততা প্রশস্ত কি না। প্রবল শক্তি যাহা তাহা ধর্ম্ম ও সত্যের সংমিশ্রণ, এই জন্যই কাউণ্ট টলষ্টয় বলিয়াছেন, তাহাতে ঐকান্তিকতার সংযোগ থাকা চাই। আর সত্য হইতে পরিভ্রষ্ট ধর্ম্মবিশ্বাস শক্তিস্থানীয় হইলেও তাহা মানবকে মুগ্ধ করিয়া আপনার দিকে সজোরে আকর্ষণ করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ নহে। দশজন আইসে বটে, কিন্তু আরও দশজন ইতস্ততঃ করে, ইহাতে যোগদান করিবে কি না। সুতরাং বলা যাইতে পারে, সত্যহীন ধর্ম্ম-বিশ্বাস কখন প্রবলশক্তিরূপে দণ্ডায়মান হইবার অধিকারী নহে। ধর্ম্ম ও সত্যের ভিত্তি হইতে বিশ্লিষ্ট শক্তির ত কথাই নাই! এরূপ শক্তি জয়ের আকারে আকারে হইলেও, ইহার ভিতর এমন কোন উপাদান নাই যাহা দীপশিখার মত ব্যক্তি হইতে ব্যক্তিমাত্রে সংক্রামিত হইয়া মহাশক্তিরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারে। বর্ত্তমান জাতীয়তা আমাদের সহিত তোমাদের সংঘর্ষ মাত্র। তাহা যে কোনক্রমে সর্ব্বজনীন হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয়ই। বর্ত্তমানে জাতীয়তা সঙ্কীর্ণতারই রূপান্তর, ইহা 'জয়পরাজয়ের প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্ত। ইহার অপর নাম জীবন-সংগ্রাম।'

যোগ্যতমের জয় Survival of the fittest এই নব ধর্ম্মের একটা দুরন্ত অপবাদ আজকাল প্রতীচ্যদেশে এই মত জাতীয় জীবনমঞ্চে আদর্শরূপে দণ্ডায়মান। নব্য ভারতও এই অনুদার সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে এখন আদর্শরূপে আপনার সম্মুখে সংস্থাপন করিবার জন্য প্রয়াসশীল।

ধর্ম্ম ও সত্য এবং তাহার সহিত ঐকান্তিকতা, এই ত্রিধারার শুভসম্মিলনে যে পুণ্যতোয়ার সমুৎপত্তি. একমাত্র তাহারই সান্নিধ্যে ব্যষ্টিবোধ তিরোহিত হইয়া সমষ্টিবোধে আপনা হইতে প্রত্যেকের হৃদয়-ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে উন্মেষিত হইয়া উঠে। এই ত্রিধারাই প্রকৃতি প্রবল শক্তি। ইহাই উচ্চ এবং আদর্শস্থানীয়। নির্ব্বাণ দীপকে প্রজ্জ্বলিত করিতে এই শক্তিত্রয়ের সমন্বয়ই একমাত্র সামর্থ্যশীল।

ধর্ম্ম এবং সত্যের কথা বলিয়া তাহারই পরক্ষণে কাউণ্ট টলষ্টয়কে তাই বলিতে হইয়াছে ;—

"And it is only the spreading and confermation of religious truth which improves the position of men."

ক্রমশঃ

দন্ত ও জিহ্বা।

লেখক,—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।

দন্তে তুষিবারে জিহ্বা দেখ না সতত।
অতি যত্নবান কার্য্য করে নানামত॥
দন্তের মাঝারে যদি কোন দ্রব্য পশে।
চেষ্টা তার যত শীঘ্র সেই দ্রব্য খসে॥
তথাপি নিষ্ঠুর দন্ত পেলে সুবিধায়।
সে অবলা রসনাকে কাটে শতধায়॥

এই পাপে ঘটে হায় দন্তের পতন।
রসনা সে দেহে রহে দেহ যতক্ষণ॥
উপকারীপরে যেই শত্রুতা আচরে।
পায় পাপে প্রতিফল দেখে চরাচরে॥

কান্তা।

স্ত্রীশিক্ষা।

অনুবাদক,—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ,

(৪) সরলা। পতিসেবা কি ?

কান্তা। পতির প্রকৃতি ও উপাধি অনুসারে পতিসেবা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। যথা :—পতি যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবসম্পন্ন হন, তবে তাঁহার সেবা একরকম হইবে। যদি ক্ষাত্র-গুণ-কর্ম্ম-স্বভাবযুক্ত হন তো তাঁহার সেবা তদুপযুক্ত হইবে। ইহার দ্বারা বোধ হয় স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে যে, যেমন পতির ধর্ম্ম, যেমন নীতি, যেমন তাঁহার কুলগত ব্যবহার (আচার) এবং যেমন দেশকাল, পতিসেবাও তদনুযায়ী ভিন্নপ্রকার হইয়া থাকে।

এই বিষয়ে সর্ব্বমান্য সেবাপ্রকরণ সংক্ষেপে বলিতেছি, শোন। পতি যেরূপ বলিবেন, সেইরূপ ধর্ম্ম, নীতি ও কুলাচার অনুসারে চলিবে। যে বস্তু তাঁহার প্রয়োজন সেটি যথাসময়ে তাহার জন্য প্রস্তুত রাখিবে। যথা :—প্রাতঃকালে পতির অগ্রে শয্যাত্যাগ করিয়া তাঁহার মুখ ধুইবার জলাদি যথাস্থানে রক্ষা করিবে শৌচাদির জন্য আবশ্যক দ্রব্যগুলি প্রস্তুত রাখিবে। যদি দাস দাসী থাকে তো তাহাদের দ্বারা করাইয়া লইবে, নচেৎ নিজে করিবে। স্বামী কার্য্যান্তর হইতে বাটিতে আসিলে, উঠিয়া তাঁহার সৎকার (অভ্যর্থনাদি) করিবে। কোন হাবভাব না দেখাইয়া হাস্যমুখে সরলভাবে কথাবার্ত্তা করিবে। যে সময়ের যাহা, যেমন স্বামীর রুচি তদনুরূপ রন্ধনাদি করিবে এবং নিকটে বসিয়া যত্নপূর্ব্বক ভোজন করাইবে।

ঐ সময়ে চিন্তাসূচক কোন বাক্যাদি বলিবে না। কথা কহিবার সময় নতমুখে নম্রভাবে মিষ্ট ভাষায় কথা বলিবে। তাঁহার শয্যাদি প্রস্তুত করিবে বা করাইয়া লইবে। এবম্বিধ সেবা করিবার জন্য যে যে বস্তুর প্রয়োজন, তাহা আনাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে বা করাইয়া লইবে। গৃহে অভ্যাগত অতিথি উপস্থিত হইলে পর তাঁহার সৎকারের জন্য পতিকে যাহাতে কোন চিন্তা না করিতে হয়, তজ্জন্য পরিচর্য্যার ভার স্বহস্তে লইয়া তাঁহার সেবা করিবে। স্বামীর মন যাহাতে প্রসন্ন থাকে এবং তাঁহার শরীর যাহাতে নীরোগ থাকে, তদুদ্দেশ্যে গৃহ, বস্ত্র, জল, অন্ন বায়ু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। এইরূপে নিজের শক্তি ও পারিবারিক অবস্থা অনুযায়ী পতিসেবা করিবে। পতি যে যে কার্য্য করিতে বলিবেন, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবে বা করাইয়া লইবে। পতির দোষের দিকে মোটে দৃষ্টি রাখিবে না (১)। গৃহের কোন ভেদ ভ্রম, দুঃখ, দোষ বা গুপ্তকথা অপরকে কথন বলিবে না (২)। কারণ এই দুইটি নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিলে পতির মনে অবশ্য ক্লেশ হইবে। সংক্ষেপে এইটি জানিয়া রাখিবে, যে যে কার্য্যের বা ব্যবহারের দ্বারা স্বামীর মনে ক্লেশ উপস্থিত হইতে পারে, তাহা কখন করিবে না। পরন্তু যাহাতে তাঁহার শারীরিক ও মানসিক সুখ ও আনন্দ সম্পাদন হইতে পারে, এরূপ আচরণ সদাই করিবে। পতির সম্মুখে ক্রোধ প্রকাশ করিবে না ও তাঁহাকে কদাচ কটু বাক্য বলিবে না, কোন উপলক্ষে কোন কথায় তাঁহাকে কটাক্ষ করিবে না। রাত্রে পতির পদসেবা করিবে এবং যে দিন তিনি যেখানে শয়ন করিতে আজ্ঞা করেন, সেইদিন সেই খানেই শয়ন করিবে এবং প্রাতঃকালে তাঁহার শয্যাত্যাগের পূর্ব্বেই উঠিবে। এই প্রকার প্রত্যহ করিবে। লজ্জা, শীলতা ও সন্তোষ কখন ত্যাগ করিও না। তুমি যদি পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে চলিতে পার তবে, ইহা নিশ্চয় জানিবে এবং সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে, স্বামীর নিমিত্ত কখন তোমাকে কোনপ্রকার দুঃখভোগ করিতে হইবে না। পতি যদি উত্তম গুণস্বভাবযুক্ত না হন, তন্নিমিত্ত কদাচিৎ যদি তোমার কোন ক্লেশ বা দুঃখ হইতে থাকে, তথাপি উক্ত নিয়মানুসারে চলিলে তাহা অচিরে নিবৃত্ত হইবে। তোমার উপর পতির দয়া ও প্রেম আসিবে, এমন কি, তোমার সেবার ফলে ও পাতিব্রত্যে তাঁহার গুণ, স্বভাব, সমস্তই ক্রমশঃ শুধরাইয়া যাইবে।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তদতিরিক্ত সেবা যেমন বর ও ঘর তদনুরূপ হইবে। অর্থাৎ বাটীর মধ্যে উচ্চগুণসম্পন্না ও বহুদর্শী বৃদ্ধাদের নিকট তাহা শিক্ষা করিবে। মনুসংহিতায় ও রামায়ণে যাহা উপদেশ আছে, পতির কাছে তাহা শুনিয়া লইবে।

সরলা। স্ত্রী অশুচি হইলেও কি পতিসেবা করিবে?

কান্তা। না, অশুচি হইলে পতিসেবার প্রকারভেদ আছে। ৪ চারিদিন পতিকে যদি মুখ দেখান না যায়, তবে খুব ভাল। কারণ ঐ চারিদিন স্ত্রীজাতির রোগের সময়। পরস্পরের দর্শনে যদি মনে অন্যভাবের উদ্রেক হয়, তাহা হইলে উভয়েরই পীড়া হইবার সম্ভাবনা। এবং ঐ সময়ে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, সেও রোগী বা অঙ্গহীন হইতে পারে; এইজন্য অশুচি কালে যতদূর সম্ভব স্বতন্ত্র থাকা আবশ্যক। ঐ সময়ে পরস্পরের স্পর্শ পর্য্যন্ত মহাপাপ, কারণ ঐ স্পর্শদোষে স্বামী স্ত্রী উভয়কেই সমগ্র জীবন দুঃখভোগ করিতে হয়, ইহাই পাপ।

সরলা। পাপ যদি হয়, তবে তো ঐ সময়ে পতির আজ্ঞা পালন করিতে পারা গেল না?

কান্তা। কেন পালন করা যাইবে না? পত্নী যখন অশক্ত, রুগ্ন ও অশুচী হন, পতি তখন সেবা করিবার আজ্ঞা করেন না। যেহেতু তাঁহার জানা আছে, ঐ ঐ সময়ে পত্নীকে দেবতা ও গুরুজনের সেবায় নিযুক্ত রাখিলে, সদাচারের অন্যথা হয়।

সরলা। স্ত্রীর অশুচি অবস্থায় পতিসেবা কে করিবে?

কান্তা। দাসদাসী বা অপর কোন আত্মীয় সেইকার্য্য সম্পাদন করিবে; কিম্বা তিনি নিজের কায নিজে করিয়া লইবেন। কারণ অশুচি স্ত্রী যদি কোন খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করে, উহা একপ্রকার দূষিত বৈদ্যুতিক শক্তিতে কলুষিত হয়। তজ্জন্য উক্ত দ্রব্যাদি যে ব্যবহার করিবে, তাহার রোগ উৎপন্ন হইবে। (১)

সরলা। আপনার পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মগুলি ব্যতীত যদি পতিসেবা আর না থাকে, তবে স্ত্রীলোকদিগকে গর্ভধারণ ও গৃহস্থালীর নানাবিধ কাযকর্ম্মের গোলমালে পড়িবার প্রয়োজন কি?

কান্তা। (হাস্য করিয়া) তুমি যথার্থই সরলা। পত্নীর সকল কার্য্যই পতিসেবার অন্তর্গত। যে যে কার্য্য পতির সন্তোষ ও মঙ্গলপ্রদ, তৎসমস্তই পতিসেবা। গর্ভ-

(১) উত্তরপশ্চিমে এবং অপরাপর দুইচারি স্থানে স্ত্রীলোকের অশুচিকালকে 'ছেটে' বলে। "ছেটে" অর্থে 'দূর' অর্থাৎ এই কয়দিন দূরে থাকা কর্ত্তব্য

ধারণ করিবার কারণ বলি শোন ;—

(১) পুরুষ প্রকৃতি সংযোগে যেমন এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ স্ত্রীপুরুষ সংযোগে সন্তান উৎপন্ন হয় এবং তাহার দ্বারা সৃষ্টির উপযোগ, উপকার, সেবা ও প্রত্যুপকার হইয়া থাকে ; ইহা নৈসর্গিক নিয়ম অথবা ঈশ্বরের মায়া। এই নিয়মাধীন হওয়াতে মাতাপিতা নিজের উপকারের প্রত্যুপকার (প্রতিদান) পাইবার জন্য এবং জগতের সেবার জন্য সন্তান কামনা করেন। সন্তান তাঁহাদের দ্বারা লালিতপালিত হইয়া ও জগতের অপরাপর ব্যক্তি ও দ্রব্যাদির সাহায্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সংসারের নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করিয়া থাকে এবং ধর্ম্ম-অর্থ, কাম ও মোক্ষের অধিকারী হইয়া থাকে। প্রসূত সন্তানেরা আবার কাল-বশে জীব সৃষ্টি করে। তুমি আমি ও আমাদের পতি এবং অপর সকলেই সেই এক নিয়মে উৎপন্ন। পিতামাতার ন্যায় পতিপত্নীরও ইহা কর্ত্তব্য যে, জগতের উপ-কারের প্রত্যুপকার করিবার জন্য সন্তান উৎপাদন করিয়া যাহাতে তাহারা জগ-তের সেবা করিতে পারে, এরূপভাবে তাহাদের পালন ও পরিবর্দ্ধিত করা।

(২) ঈশ্বর স্ত্রী পুরুষ উভয় শরীরে শুক্রশোণিত দিয়াছেন, ইহা হইতেই শরীরে আশক্তির আবির্ভাব হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, (রূপ ব্যাধি) নিবারণের জন্য যেমন খাদ্য ও জলের প্রয়োজন, সেইরূপ আশক্তির পরিতৃপ্তির জন্য স্ত্রীপুরুষের সংযোগ আবশ্যক হইয়া থাকে। তাহারই ফলে সন্তানোৎপত্তি।

(৩) সুশীলা, বুদ্ধিমতী ও সাধ্বী রমণী ঐ বৃত্তির নিতান্ত অধীন হয়েন না। তথাপি যখন অপর কারণাদি বশতঃ পতি আজ্ঞা করেন, তখন তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার ও প্রফুল্ল রাখিবার জন্য পতি আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন। ইহাও গর্ভধারণ করিবার অন্যতম কারণ।

(৪) আপদকালে বা বৃদ্ধাবস্থায় সেবা করিবার জন্য কোন আত্মীয় থাকা বিশেষ দরকার, সেই কারণবশতঃ সন্তানোৎপত্তির প্রয়োজন হয়। উল্লিখিত চারিটি বিষয়ই পতিসেবার অন্তর্গত জানিবে।

এইবার গার্হস্থ্যকর্ম্মাদি কেন করা প্রয়োজন, তাহার কারণ বলিতেছি, মনো-যোগ দিয়া শোন। রাজার পক্ষে নিজেকে রক্ষা করা ও প্রজাপালন করা উভ-য়ই কর্ত্তব্য। কিন্তু এই দুইটি কার্য্য মন্ত্রী ব্যতিরেকে সুসাধ্য হয় না। তজ্জন্য রাজা তাঁহার মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া থাকেন। মন্ত্রীর সকল কার্য্যই রাজসেবার অন্তর্গত। অর্থাৎ রাজা ও প্রজা উভয়ই সেব্য। প্রত্যেক স্ত্রীর কার্য্য এই

মন্ত্রীর কার্য্যের অনুরূপ। পুরুষ গৃহের রাজা ও স্ত্রী মন্ত্রী। পত্নীর যখন পতিসেবা কর্ত্তব্য, তখন তাঁহার গৃহকর্ম্ম, অপত্য পালনাদি সকল কর্ম্মই পতিসেবার অন্তর্গত হইতেছে। এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিবে যে পত্নীর পক্ষে পতির প্রিয়চিকার্য্য তাঁহার ইষ্ট পদার্থের সংরক্ষণ যথা, পত্নীর আত্মশরীর, গৃহের ধনধান্য, বস্ত্রাদির রক্ষা, সন্তানাদির শিক্ষা, অতিথিসৎকার প্রভৃতি সমস্তই পতিসেবার অন্তর্গত। সেইজন্য পতিসম্বন্ধীয় সকল গৃহকার্য্যই জায়ার এরূপভাবে করা বিধেয় যে, পতিকে সে সম্বন্ধে কোন চিন্তা না করিতে হয় এবং সেই সকল কার্য্যের জন্য পতিকে কোন প্রকার দুঃখ না পাইতে হয়।

রাজকার্য্য চালাইবার জন্য মন্ত্রী বা দেওয়ানকে যেমন অনেকপ্রকার বিদ্যা রীতি ও চলিত প্রথার বিষয়ে সুনিপুন হওয়া আবশ্যক, কারণ এই সকল বিষয়ে পারদর্শী না হইলে রাজতন্ত্র চালাইতে তিনি অক্ষম হয়েন, সেইরূপ গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম দক্ষতার সহিত করিতে হইলে, জিনিষপত্রের অপচয় নিবারণ পূর্ব্বক পতিসেবাতে নিয়োজিত করিবার জন্য, পত্নীরও বহুবিধ বিদ্যাশিক্ষা ও বুদ্ধির প্রয়োজন। কারণ তদ্ব্যতিরেকে যেরূপ আবশ্যক সেরূপ সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না। উপরোক্ত বিষয় একটু পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, কন্যা এবং পত্নীদিগকে গৃহস্থাশ্রমের উপযোগী এবং আবশ্যক-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক মাতা, পিতা এবং স্বামীর একান্তকর্ত্তব্য। অন্যথা তাঁহারা তাঁহাদের সন্তানাদির হিতাকাঙ্ক্ষী নহেন; পরন্তু শত্রুর মধ্যে গণ্য হইবেন।

লিখিতে পারা, পড়িতে পারা, পুস্তকাদির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা, পাক প্রণালী, অল্পপরিমাণে চিকিৎসা-বিদ্যা, ব্যবহার-নীতি, সহজ গণিত, গৃহস্থালী কর্ম্ম ইতিহাস, সন্তানপালন নিয়মপ্রণালী, প্রচলিত কুসংস্কার নিবারক জ্ঞান, সাধ্বী, সুশীলা ও পতিব্রতা রমণী চরিত্র, ধর্ম্ম, স্বীয় হিতসংস্কার প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে যদি বর্ত্তমানকালে স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানলাভ ও অভিজ্ঞতা জন্মায়, তাহা হইলেই যথেষ্ট। কারণ উক্ত বিষয়গুলি সম্যক অবগত হইলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই গৃহস্থাশ্রমের আনন্দ ও সুখ উপভোগ করিতে পারেন। কিন্তু যদি স্ত্রীলোকদিগের কেবল লেখা ও পড়া শিক্ষা হইয়া থাকে ও ব্যবহারিক জ্ঞান বা বুদ্ধি না জন্মিয়া থাকে, তবে স্ত্রীজাতির সেরূপ লেখাপড়া শিক্ষা নিতান্ত বিফল। সেইজন্য ব্যবহারিক জ্ঞানের কুশলতা লাভ করা বিশেষ প্রয়োজন। যে রমণীর শিক্ষালাভ

করিবার অধিক যোগ্যতা আছে, তাহার অধিক পরিমাণে বিদ্যাভ্যাস করা উচিত। তাহার দৃষ্টান্ত ;—লোপামুদ্রা ও গার্গীদেবী বেদশাস্ত্রে জ্ঞানবতী হইয়া ছিলেন। দুর্গা, কালিকা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সারদা প্রভৃতি আমাদেরই মত রমণী ছিলেন ; কিন্তু দুর্গা, কালিকা এরূপ শক্তিশালিনী হইয়াছিলেন যে, বড় বড় দুষ্ট অসুরদিগকে যুদ্ধে বধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সীতা দময়ন্তী, সাবিত্রী প্রভৃতি "পতিব্রতা" আখ্যা পাইয়া জগৎমান্য হইয়াছেন। অজাবাই "ঈশ্বরভক্ত" বলিয়া প্রখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। ঝান্সীর রাণী, লক্ষ্মীবাই স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতেন ও রণক্ষেত্রে বিপুল পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। উদয়পুরের মহারাণী (মহারাণা স্বরূপসিংহজীর মহিষী) স্বামীর লোকান্তরের পর স্বয়ং রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। লীলাবতীর গণিতশাস্ত্র জগতবিখ্যাত। ভারতসাম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়া ৬২ বৎসরকাল সাম্রাজ্য শাসন করিয়া দশ বৎসর হইল স্বর্গবাসিনী হইয়াছেন। ভোপালের মাননীয়া বেগম রাজধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতেছেন। রমণীকুলের ভিতর এইরূপ অসাধারণ বুদ্ধি, কার্য্যকুশলতার ও গুণবত্তার বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল শক্তিমতী ও গুণবতী রমণী। তোমার আমার মত রমণীই আখ্যাধারিণী ছিলেন ও হইতেছেন। পরন্তু উঁহারা সকলেই শুদ্ধ উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া উত্তম শিক্ষা পাইয়া ছিলেন বলিয়া কেহ দেবী, কেহ সাধ্বী, সতী ও অপরাপর আখ্যায় ভূষিতা হইয়া চিরকালের জন্য জগতে সৎকীর্ত্তি রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলির দ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, কতকগুলি সঙ্কুচিত বিচারশীল পুরুষদিগের ধারণা যে, "স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা প্রদান করিলে অনীতি বৃদ্ধি পাইবে, তাহাদিগের শিক্ষার কোন আবশ্যকই নাই," উহা অত্যন্ত অমূলক ও ভ্রান্তিপূর্ণ। এবম্বিধ ধারণা তাদৃশ পুরুষগণের মুর্খতা, অজ্ঞানতা ও মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। বুঝিয়া দেখ,—যেমন স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষের পুরুষত্ব জানিতে পারা অসম্ভব ও অস্বাভাবিক, তদ্রূপ পুরুষদিগের পক্ষেও স্ত্রীলোকের স্ত্রীত্ব বুঝিতে পারা অস্বাভাবিক। এই নিয়মটির অনভিজ্ঞতা বশতঃই পুরুষগুলীর স্ত্রীজাতিকে এইপ্রকার বর্ত্তমান সামাজিক দুর্দ্দশার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছে।

স্ত্রীলোকদিগের অপরাপর গুণের মধ্যে বক্ষ্যমান গুণগুলি মুখ্য (প্রধান) বলিতে পারা যায় ; কোমলতা, দয়া, শীলতা, প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সহিষ্ণুতা, মধুর কণ্ঠস্বর, লাবণ্য, লালিত্য, সৌন্দর্য্য ও নম্রতা। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে

যে, নারীজাতির ভিতর পুরুষদিগের মত পরিণামদর্শী যোগ্যতা নাই। কতক স্ত্রী-লোকদিগের মধ্যে যে কঠোরতা দুঃসাহসিকতা ও শারীরিক শক্তি দেখিতে পায়, তাহা ঐ যেমন কোন পুরুষকে ব্যসনের দাস ও কাপুরুষ দেখিতে পাই সেইরূপ জানিবে। আর এরূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যাও বিরল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ইহাই বুঝিতে পারি যে, স্ত্রীজাতিকে যদি যোগ্য শিক্ষা দেওয়া যায় ও তাহাদের স্বাভাবিক সদ্‌গুণের বিকাশের জন্য যোগ্য সামগ্রী দেওয়া যায়, তবেই তাহা-দের সন্তান-সন্ততি ভাল হইবে ও তাহার ফলে আর্য্যপ্রজা উন্নতিলাভ করিয়া সুখী হইতে পারিবে, অন্যথা নহে।

আমার ধারণা এই যে, রমণী যদি সুশীলা, লজ্জাশীলা, সন্তোষযুক্তা, মর্য্যাদা-সম্পন্না ও পতিব্রতা হয়েন তো তাঁহার স্বামী ব্যসনাশক্ত ও কুকর্ম্মপরায়ণ হইলেও তিনি ২।৪ দিন অগ্রপশ্চাৎ শুধরাইয়া যাইবেন। কারণ তাঁহার হৃদয়ে ক্রমশঃ এইরূপ বিচার আসিয়া উপস্থিত হয় ;—যে স্ত্রী যেমন তাঁহার সরলাগত ও আজ্ঞা-নুবর্ত্তিনী এবং তাঁহার স্বামী যেমন তাহার ভরণপোষণ করিয়া থাকেন ও তাহাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করেন, এবং সন্তোষশীলা স্ত্রী যেমন দুঃখী হন না, তদ্রূপ যদি আমি জগতপতি পরমেশ্বরকে আমার স্বামী মনে করিয়া তাঁহার আজ্ঞা (নৈসর্গিক নিয়ম) মত চলি, কুকর্ম্ম না করি, সত্যশীল হই, তাহা হইলে আমিও পাপ হইতে রক্ষা পাইতে পারি।

ক্রমশঃ

ভ্রমসংশোধন।—গত ফাল্গুনমাসের জন্মভূমি-পত্রিকায় "কান্ত:" নামক প্রবন্ধের ৪৩৬ পৃষ্ঠার ২৭ পুংক্তিতে কর্ত্তা স্থলে রাজা ও সংসারপালক স্থলে প্রজাপালক। এই ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন।

—— ০:*:০ ——

বকুলকুমারী

লেখক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, বি, এল,

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নির্জ্জন দর্শন।

আরো এক সপ্তাহ অতীত। সৌদামিনী নিত্য যেরূপ কাজকর্ম্ম করে, মনো-নিবেশপূর্ব্বক সেইরূপ করিতে লাগিল। নিতম্বিনীর মুখে যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার অনেকটা বিশ্বাস জন্মিল, কিন্তু কাহারও কাছে তাহা প্রকাশ করিল না।

ইতিমধ্যে মোক্ষদার সহিত মাখনলালের কয়েকবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, মাখনলাল দুই একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যে কথা বোলেছিলেম, দু'তিন দিনের মধ্যে খবর দিবে বোলেছিলে, সে কথার কি হলো ?"

মোক্ষদা বলিয়াছিল, "না বাবু আমা হোতে কিছু হলো না আমি তাকে রাজী কোত্তে পাল্লেম না। আমার বক্সিস্‌টা মারা গেল।"

পাঠক মহাশয় বুঝিয়া রাখিবেন এগুলি মোক্ষদার মিথ্যা কথা। গোপনে দাঁড়াইয়া প্রথম দিন নিতম্বিনীর মুখে যাহা শুনিয়াছিল, তাহাতে মোক্ষদার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই ; সুতরাং সে ভাবিয়াছিল, একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে কুলকন্যার গোপনে সাক্ষাৎ বড় শক্ত সমস্যা! সৌদামিনীর নিকটে সে কথা উত্থাপন করিতে মোক্ষদা সাহস করে নাই।

দ্বিতীয় দিবসে নিতম্বিনীর কথা শুনিয়া মনে মনে কত প্রকার আলোচনা করিয়া সৌদামিনী একদিন মোক্ষদাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া ব্যগ্রতা জানাইয়া চুপি চুপি বলিল, "ওলো পদ্মা! তুই আমার একটী উপকার কোত্তে পারিস্ ?"

পদ্মা। কি রকম উপকার ?

সৌদা। ঐ যে ঐ বাবুটী কর্ত্তার কাছে এসে বসে, রাত্রে কর্ত্তার সঙ্গে আহার করে, তার সঙ্গে তোর কি দেখা হয় ?

পদ্মা। মাঝে মঝে হয়। কেন ?

সৌদা। আমি যখন পরিবেশন করি, বাবুটী তখন আড়ে আড়ে আমার দিকে চায় ; তার মনের ভাবটা কি, কিছুই আমি বুঝ্‌তে পারি না। কোন কৌশলে তুই কি একদিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিতে পারিস্ ?

পদ্মা। (চকিত-নেত্রে চাহিয়া চমকিতস্বরে) ওমা! এ আবার কি রঙ্গ ? তোমার আবার এ রোগ কবে হলো ? এ অভ্যাস তো তোমার ছিল না ; কল্‌-কেতার হাওয়া লেগে কি স্বভাবটা পর্য্যন্ত উল্‌টে গেল ?

সৌদা। স্বভাব উল্‌টে যায় নি, তার সঙ্গে আমার একবার দেখা কোত্তে ইচ্ছা হয়।

পদ্মা। (সবিস্ময়ে) সে কি কথা ? অচেনা পুরুষের সঙ্গে দেখা কর্‌বার সাধ, এটা তো ভাল কথা নয়! কেন,—দেখা কোরে কি হবে ?

সৌদা। আমার দরকার আছে।

পদ্মা। কি দরকার শুনি।

সোদা। তা এখন আমি বোল্‌বো না।

পদ্মা। তবে আমিও পার্‌বো না।

সোদা। পাত্তেই হবে। মাইরি বোল্‌চি কোন মন্দকথা নয়, আমার মনে একটুও মন্দভাব নেই। স্রেফ্ একবার দেখা কোর্‌বো, এইমাত্র কথা।

আপন মনে কি চিন্তা করিয়া পদ্মাবতী অবশেষে সম্মত হইল; একদিন রাত্রে সঙ্গোপনে মাখনলালের সহিত দেখা করিয়া চুপি চুপি বলিল, "ওগো বাবু, যা তুমি বোলেছিলে; সেটা ঠিক হয়েছে। আগে রাজী হয় নি, এখন রাজী; দেখা কোত্তে চায়।"

আগ্রহ জানাইয়া মাখনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে হবে, কবে হবে? আজ রাত্রেই দেখা হবে কি?

পদ্ম বলিল, "তা আমি ঠিক্ বোল্‌তে পারি না, একদিন হবে কিন্তু।"

এইরূপ আশ্বাস দিয়া পদ্মাবতী চলিয়া আসিল, মাখনের হৃদয়ে উৎসাহানল জ্বলিল। সে রাত্রে তিনি বিদায় হইলেন।

তিন দিন অতীত। মঙ্গলবার। আফিস্ হইতে রামজীবন বাবু বাড়ী আসিবার পর মাখনলালও আসিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণ আকাশমণ্ডল হঠাৎ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; ক্রমেই বায়ুর প্রবলতার সহিত বৃষ্টির বেগও বাড়িয়া উঠিল। রাত্রি যখন প্রায় দশটা, আহারাদি করিয়া মাখনলালকে সঙ্গে লইয়া, রামজীবন বাবু সেই সময় বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে জোর হাওয়া। গতিক দেখিয়া, কর্ত্তা বলিলেন, "আজ তোমার রাত্রে আর যাওয়া হবে না, ভারী দুর্য্যোগ। পাশের ঘরে বিছানা আছে, সেই থানেই শয়ন করিও।"

অতঃপর আফিস-সংক্রান্ত দুটী পাঁচটী কথা হইল। কর্ত্তা উঠিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন; পদ্মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মোক্ষদা! মাখনলাল আজ রাত্রে এইখানে থাক্‌বেন, তুমি গিয়ে বিছানা ঝেড়ে দিয়ে পাশের ঘরে আলো জ্বেলে রেখে এসো।"

মাখনলাল যে সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, বৃষ্টির কৃপায় সেই সুযোগ ঘটিল; কতক সংশয়ে, কতক আনন্দে, কতক উৎসাহে, তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। কতক্ষণে শুভসংযোগ সংঘটিত হইবে, সেই প্রতীক্ষায় অধীর

হইয়া তিনি বৈঠকখানার জাজিমের উপর পাইচারি করিতে লাগিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে পানের ডিবা হস্তে লইয়া মোক্ষদা সেই গৃহে প্রবেশ করিল, অধরে মৃদু মৃদু হাস্য, চক্ষু চঞ্চল।

মাখনলাল বসিলেন। দুটী একটী কথা হইতেছে, মোক্ষদা এক একবার কথা কহিতে কহিতে চক্ষু ঘুরাইয়া দ্বারের দিকে চাহিতেছে; মাখনলালও সেই দিকে চাহিলেন। কবাটের অন্তরালে কি যেন দেখিতে পাইয়া, ঈষৎ হাসিয়া কাহার উদ্দেশে সকৌতুকে তিনি বলিলেন, "দ্বারের বাহিরে বিদ্যুৎ নল্‌পাচ্ছে, নওলা-নওলা খেল্‌চে, উটি কি?"

মুখ টিপিয়া টিপিয়া মোক্ষদা হাস্য করিতে লাগিল, হাস্যের সঙ্গে সঙ্গে দ্বারের দিকে নয়নের ইঙ্গিত।

সর্ব্বাঙ্গ বসনাবৃতা একটী মোহিনী মূর্ত্তির ধীরে ধীরে প্রবেশ। অবগুণ্ঠনবতী মৃদু-পদ সঞ্চারে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া ঘরের এক কোনে দেওয়ালে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইল। সস্মিতনয়নে সেই দিকে দৃষ্টিদান করিয়া সস্মিতবদনে মাখনলাল বলিয়া উঠিলেন, "এই যে মূর্ত্তিমতী সৌদামিনী!"

মোক্ষদা নাপিতের মেয়ে, ধূর্ত্ততায়, রসিকতায় নাপিতের মেয়েরা বংশপর্য্যায়ে এ দেশে চির-বিখ্যাত। মাখনলালের মুখের কথাটি বাহির হইবামাত্র, মৃদু হাসিয়া মোক্ষদা তৎক্ষণাৎ বলিল; "আকাশে মেঘ উট্‌লেই সৌদামিনী খেলা করে, চাতক-পাখী ফটিক জল বলিয়া চেঁচায়, এখানে আর চাতককে জল চাইতে হবে না ঝমাঝম্ বৃষ্টি, আকাশেও সৌদামিনী, ঘরের ভিতরেও মূর্ত্তিমতী সৌদামিনী।" ঘরের সৌদামিনী আরো একটু ঘোম্‌টা টানিল, পাশের ঘরের বিছানা ঝাড়িয়া বিছানার উপর পানের ডিবা রাখিয়া, ঘরে আলো দিয়া উভয়ের দিকে আড়ে আড়ে চাহিতে চাহিতে মোক্ষদা বাহির হইয়া গেল; সম্মুখের দরজাটা ভেজা-ইয়া দিতে ভুলিল না।

মাখনলাল উঠিলেন; পার্শ্বগৃহের দরজার নিকটে থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া, অবগুণ্ঠিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এসো সৌদামিনী, এই গৃহে প্রবেশ কর।"

অনুরোধ বাহুল্য। মাখনলাল অগ্রসর হইলেন, ধীরপদে সৌদামিনী অনু-গামিনী। মাখনলাল বিছানার উপর বসিলেন, শঙ্কিতা, সঙ্কুচিতা, বিকম্পিতা

সৌদামিনী একটু দূরে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাখনলাল বসিতে বলিলেন, সৌদামিনী বসিল না।

মাখন বলিলেন, "আমার অনেক দিনের সাধ মিটিল, কিন্তু সৌদামিনী আমার কাছে আসিল না। কেন সৌদামিনি, আমার কাছে আসিতে এত লজ্জা কেন? দয়া কোরে যদি এসেছ, কাছে এসো বাসনা সফল করি।"

অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে সৌদামিনী বলিল. "তুমি তো জলধর নও,—তোমার কাছে সৌদামিনী কেন যাবে?"

মাখন। চাতক জলধরের আশা করে, তুমি তো চাতকিনী নও, তবে তুমি জলধর কেন চাও? যদি বল, জলধর না পেলে সৌদামিনী দেখা দেয় না। মনে কর, সৌদামিনীর আশায় আশায় আমি এখন জলধররূপ ধারণ কোরে বোসে আছি। কাছে এসো সৌদামিনি, কাছে এসো, জলধরের প্রতি সদয় হও।"

সৌদা। একটী কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, আগে তার উত্তর দাও, তারপর—

মাখন। কি তোমার প্রশ্ন?

সৌদা। যখন আমি পরিবেশন করি, তখন তুমি বার বার আমার পানে চেয়ে থাকো কেন?

মাখন। চেয়ে থাকি কেন? সে কথাও কি জিজ্ঞাসা কোত্তে হয়? অনেক স্ত্রীর মুখ আমি দেখেছি, কিন্তু তোমার মুখের মতন মুখ একখানিও আমি দেখি নাই। ঘোম্‌টার দৌরাত্ম্যে যদিও পূর্ণচন্দ্র আমার নয়নগোচর হয় নাই, তথাপি অর্দ্ধচন্দ্র দর্শনেই আমি পাগল। কাছে এসো, মিনতি করি কাছে এসো, ঘোম্‌টাটি একবার খোলো, মুখখানি ভাল কোরে দেখে নয়ন সার্থক করি, পূর্ণচন্দ্র দর্শনে মনের অন্ধকার দূর করি।

অচঞ্চল হস্তে সৌদামিনী অল্পে অল্পে মুখের অবগুণ্ঠন মোচন করিল। যথার্থই পূর্ণচন্দ্র; মেঘমুক্ত পূর্ণশশী। কবিবাক্যে সকলঙ্ক পূর্ণশশী অপেক্ষাও অধিক সুন্দর,—অধিক উজ্জ্বল। কেননা, এ মুখখানি অকলঙ্ক পূর্ণশশী।

মাখনলালের চক্ষে আর পলক পড়িল না,—চক্ষু এককালে অনিমিষ। বিস্ময় চকিত কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "যথার্থই এমনসুন্দর মুখ এ জন্মে আর কোথাও আমি দেখি নাই। যে পুরুষ তোমার পাণিগ্রহণ কোরে এই চন্দ্রমুখের অধিকারী হয়েছে, জগতে সে পুরুষ পরম ভাগ্যবান। আচ্ছা সৌদামিনী,

তোমার বিবাহ হয়েছে কোথায় ?"

সৌদা। তা আমি জানি না। শ্বশুরবাড়ী আমি কখনো দেখি নাই। কলিকাতা থেকে বর গিয়েছিল, এইটুকুমাত্র মনে আছে। তুমি বোল্লে, যার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছে, সে পুরুষ পরম ভাগ্যবান; আমি কিন্তু বিয়ের রাত্রের পর সেই ভাগ্যবান পুরুষকে একটী বার চক্ষেও দেখি নাই।

মাখন। (অধোবদনে কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া) তবে তো তুমি ভারী কষ্টে আছ!

সৌদা। অদৃষ্ট!

মাখন। (আবার কি ভাবিয়া) এই বাড়ীতেই কি তুমি বরাবর থাক্‌বে?

সৌদা। ভগবানের ইচ্ছা।

মাখন। (অন্যমনস্কভাবে নীরবে অবস্থিতি)

সৌদা। (বক্রনয়নে মাখনের বদন নিরীক্ষণ করিয়া) তোমার বিয়ে হয়েছে?

মাখন। কুলীনের ছেলে কি এতো বয়স পর্য্যন্ত আইবড় থাকে?

সৌদা। কোথায় বিয়ে কোরেছ?

মাখন। প্রথম বিয়ে হয়েছিল কোন্নগরে।

সৌদা। সেই বউটী কি কোল্‌কেতাতেই আছে?

মাখন। না।

সৌদা। রাত্রে তবে তুমি কোথায় যাও?

মাখন। দ্বিতীয়বার আমি কোল্‌কেতাতেই বিয়ে কোরেছি। এই পাড়াতেই বিয়ে হয়েছে।

সৌদা। (একটু চিন্তা করিয়া) শ্বশুরের নাম?

মাখন। নাম বোল্লেই কি তুমি চিন্‌বে? গৌরীপ্রসাদ দত্ত।

সৌদা। (আবার কি একটু কি ভাবিয়া) প্রথম পক্ষের বউটীর নাম কি তোমার মনে আছে?

মাখন। নাম? সম্প্রদানের সময় শুনেছিলেম, সুকুমারী।

সৌদা সম্প্রদানের সময় শুনেছিলে? তারপর কি আর দেখাশুনা হয়নি?

মাখন। না।

সৌদা। বেঁচে আছে কি মরে গেছে, সে খবর কিছু পেয়েছ?

মাখন। তাও ঠিক জানি না, বোধ হয় বেঁচে আছে।

সৌদা। পক্ষের শ্বশুর কি তোমার তত্ত্ব করেন না? তাঁর নাম কি?

মাখন। তুমি কি কোন্নগরের খবর রাখো?—তাঁর নাম ছিল ত্রিলোচন মল্লিক।
সৌদা। ছিল বোল্‌চো, তিনি কি তবে বেঁচে নাই?
মাখন। শুনেছি তাঁর লোকান্তর হয়েছে।

সৌদামিনী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; মনে মনে ভাবিল, তবে আর কেন? নিতম্বিনীর কথা শুনে যে সংশয়টা জেগেছিল, সেটা তো ভঞ্জন হ'য়ে গেল, চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিট্‌লো। এ ঘরে আর আমি বেশীক্ষণ থাক্‌বো না। মৌন ভঙ্গ করিয়া সতীকন্যা বলিল, এখন তবে আমি চোল্লেম।
মাখন। চোলে যাবার জন্যই কি আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে এসেছিলে? সেই যে নিধুবাবুর একটী গান আছে;—

"মনোরাথা দেখা দিতে কে তোমারে সেধেছিল?
এসে যদি যাবে চোলে, কে আসিতে বোলেছিল?"

তুমি যে তাই কোল্লে!
সৌদা। কি কোর্‌বো তবে?
মাখন। কাছে এসে বোসো, ভালকোরে মুখখানি দেখি, তোমারও মনের কথা গুলি শুনি। এতক্ষণ ওসব তো বাজে কথা হ'য়ে গেল, নূতন আলাপের মতন দুটী একটী মিষ্টকথা বল, প্রাণ শীতল হোক্।
সৌদা। না,—আজ আর না। অনেকক্ষণ এসেছি, তাঁরা কি মনে কোর্‌বেন, মোক্ষদাই বা কি মনে ভাব্‌বে?
মাখন। আবার কি দেখা দিবে?
সৌদা। বিধাতার ইচ্ছায় সকলি হতে পারে।

এই উত্তর দিয়াই সৌদামিনী বাহির হইয়া আসিল; যে ঘরে শয়ন করে, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, সৌদামিনী আপন ঘরে ছিল কি না, বাড়ীর অপর কেহ তাহা জানিল না। সৌদামিনী আর মোক্ষদা এক ঘরে শয়ন করে, কেবল মোক্ষদা ততক্ষণ পর্য্যন্ত জাগিয়াছিল। সৌদামিনীকে দেখিয়া মোক্ষদা হাস্য করিল না, গম্ভীরবদনে বলিল, "এতক্ষণ পর্য্যন্ত নূতন লোকের সঙ্গে কি রকম আলাপ কোরে এলে?"

আসল কথা গোপন করিয়া, মনঃকল্পিত নূতন নূতন কথায় সৌদামিনী তাহাকে এক রকম বুঝাইল।

সৌদামিনী সত্য কথা গোপন করিল বটে, কিন্তু মোক্ষদার কিছুই অগোচর ছিল না। সৌদামিনীকে ঘরে রাখিয়া, বৈঠকখানার দরজা ভেজাইয়া, মোক্ষদা বাহির হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু বাড়ীর ভিতর যায় নাই; যে গৃহে মাখনলালের শয্যা, সেই ঘরে পূর্ব্বদিকের একটা গবাক্ষ উন্মুক্ত ছিল, প্রচ্ছন্নভাবে বাহিরদিকে দাঁড়াইয়া মোক্ষদা তাহাদের উভয়ের সমস্ত কথা স্থিরকর্ণে শ্রবণ করিয়াছিল, একটী বর্ণও এড়ায় নাই। সৌদামিনী যখন মাখনলালকে বলিল, "আমি চলিলাম।" ঠিক সেই সময়ে মোক্ষদা সুট্ করিয়া সরিয়া গিয়া, আপনাদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল; কিছুই যেন জানে না, সৌদামিনীর সাক্ষাতে সেই ভাব দেখাইয়া, জাতিসুলভ চতুরতার অভিনয় করিয়াছিল। উভয়ের কথোপকথন শ্রবণে মোক্ষদার মনে বিস্ময়, কৌতুহল ও আনন্দ এই তিন ভাব একত্র হইয়াছিল; সৌদামিনী যখন আসল কথা ভাঙ্গিল না, তখন মোক্ষদা নেকা বনিয়া রহিল।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর, উভয়ে শয়ন করিল। মোক্ষদা শীঘ্র শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়িল; ভাগ্যচিন্তায় সৌদামিনীর শীঘ্র নিদ্রা আসিল না, সে কল্পনায় কতক আহ্লাদে, কতক সংশয়ে, কতক আশ্বাসে অনেকক্ষণ বিছানার উপর এ পাশ ওপাশ করিল; তাহার পর একটু স্থির হইয়া, আপন মনে গুন্ গুন্ স্বরে এই গীতটী ধরিল :—

"সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি॥
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দাও মা রাজত্বপদ, কারে কর অধোগামী॥"

গীতটী গাহিয়া সৌদামিনীর হৃদয়ে অনেকটা শান্তি আসিল, নিদ্রাদেবীও সেই অবসরে কৃপা করিয়া, তাহার নেত্রপল্লব আশ্রয় করিলেন।

ক্রমশঃ

গীত।*

(সখিগণের প্রতি উষা।)

যামিনীতে একাকিনী, ঘুমঘোরে অচেতন।
হেরিনু স্বপনে সখী, কামিনী মনোরঞ্জন॥
ধীরে ধীরে গুণমণি, রমণী হৃদয়মণি,
আসিয়ে প্রাণসজনী, চুরী করি গেছে মন :—
অলসে ঘুমের ঘোরে ধরিতে নারিনু চোরে,
অনাথিনী ক'রে মোরে, পলায়েছে প্রাণধন॥

———:•*•:———

সমালোচনা।

বিদ্যাসাগর। শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার প্রণীত। ২০১ নং কর্ণ-ওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

যে খণ্ড আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি, সেখানি তৃতীয় সংস্করণ। পুস্তকের নাম দর্শন করিয়াই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, এখানি স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের জীবনী। পূর্ব্বের উভয় সংস্করণ অপেক্ষা এই তৃতীয় সংস্করণে অনেকগুলি নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়াছে। বাবু বিহারিলাল সরকার বহু পরি-শ্রমে দেশবিদেশীয় বহুগ্রন্থ আলোচনা করিয়া, সুললিত বঙ্গভাষায় এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থখানি সুসজ্জিত করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের গুণাবলী জগদ্বি-খ্যাত। বিদ্যাসাগর উপাধির উপরে লোকমুখে তাঁহার সম্মানের উপাধি হইয়া-

---

* ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বাগবাজারে সখের যাত্রায় "উষা-অনিরুদ্ধ" নাট-কের অভিনয় হয়। নাট্যসম্রাট শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একরাত্রে উক্ত পালার সমস্ত গান বাঁধিয়া দেন। একটি অপ্রকাশিত গীত আমরা পাঠক-গণকে উপহার দিলাম। জং সং।

ছিল, দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর। তিনি নিরন্নের অন্নদাতা, বিবস্ত্রের বস্ত্রদাতা, রোগীর শান্তিদাতা, বিদ্যার্থির বিদ্যাদাতা, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা, ভয়ার্ত্তের ভয়ত্রাতা, এবং বিপন্নের উদ্ধারকর্ত্তা, এই সকল মহৎগুণে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিভূষিত ছিলেন, তাঁহার পিতৃ মাতৃ-ভক্তি অসাধারণ ও আদর্শস্থানীয় ছিল। বিদ্যালয় স্থাপন ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন. তাঁহার জীবনের অতুল কীর্ত্তি। বাস্তবিক তিনি শাক্তিশলিনী প্রতিভার আদরণীয় আদর্শ মহাপুরুষ ছিলেন। উনবিংশতি বৎসর গত হইল, তিনি স্বর্গবাসী হইয়াছেন। এই সময় মধ্যে আমরা তাঁহার অনেকগুলি জীবন-চরিত পাঠ করিয়াছি; বাবু বিহারীলালের বহু পরিশ্রম প্রসূত এই জীবনীখানি তৎসর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, বিনা পক্ষপাতে গৌরব করিয়া এ কথা বলা যাইতে পারে। প্রসঙ্গের পূর্ণতাসিদ্ধির অভিলাষে বাবু বিহারিলাল এই পুস্তকের পরিশিষ্টাংশে বঙ্গের গৌরবান্বিত সিবিলিয়ান বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের ও প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-বিশারদ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বৈকণ্ঠনাথ বসুর অভিমত উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

বঙ্গ সাহিত্য-সংসারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান গৌরবের উপাধি তিনি বঙ্গভাষার জন্মদাতা পিতা। এই উপাধির সার্থকতা বুঝাইবার উদ্দেশে বাবু বিহারিলাল সরকার এক খানি অভিনব পুস্তকের নাম করিয়াছেন; পুস্তকের নাম বাসুদেব চরিত। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ অবলম্বনে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই বাসুদেব চরিত প্রণয়ন করেন, সেইখানি তাঁহার প্রথম রচিত পুস্তক। বাসুদেব চরিত প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় যতগুলি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একখানিও বাসুদেব চরিতের ন্যায় প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হয় নাই; সে সকল পুস্তকের ভাষা কদর্য্য বলিয়াই বহু লোকের ধারণা। বাসুদেব চরিতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রকটিত ছিল বলিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ সাহেবেরা সেখানিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় হইতেই বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধিত হইতেছে, সাহিত্যের বিচারক মহাশয়েরা কেহই তাহা অস্বীকার করেন না।

প্রসঙ্গের অনুরোধে অথবা স্বীয় ইচ্ছাবশে বাবু বিহারিলাল এই পুস্তকে এতদ্দেশের কতিপয় প্রধান প্রধান সাহিত্যবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজিত করিয়াছেন, জীবনী লিখনপ্রণালীর ইহা একটি অভিনব প্রথা। এজন্য আমরা গ্রন্থকারকে সবিশেষ প্রশংসা করিতেছি। শুদ্ধ জীবনী নহে, জীবনীর সহিত সেই

সকল প্রধান লোকের সুন্দর সুন্দর চিত্র-মূর্ত্তি সমঙ্কিত আছে। যাঁহাদের প্রতি-মূর্ত্তি, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এইস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইল ঃ—বিদ্যাসাগর, শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণদেব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা প্রতাপনারারণ সিংহ, রাজা ঈশ্বরনারায়ণ সিংহ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু প্যারীচরণ সরকার, বাবু কৃষ্ণদাস পাল বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু দীনবন্ধু মিত্র, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি।

পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। ১৬ পেজি ডবলক্রাউন আকারে প্রায় সাত শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ছাপা, কাগজ, চিত্র বাঁধাই সমস্তই উৎকৃষ্ট। ইহার সহিত তুলনায় সামান্য একটাকা বারো আনা; মূল্য যৎসামান্য বলিলেই হয়। বাবু বিহারিলালকে ধন্যবাদ দিয়া আমরা আমাদের দেশের সাহিত্যানুরাগী পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এক একবার এই উৎকৃষ্ট উপাদেয় গ্রন্থখানি পাঠ করুন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই জীবনীতে বিস্তর নূতন নূতন গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন। আশা করি, এই জীবনীখানি সর্ব্বসাধারণের প্রীতিকর ও আদরণীয় হইবে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা ৪০নং গরানহাটার সুবিখ্যাত স্বর্ণালঙ্কার বিক্রেতা মণিলাল এণ্ড কোম্পানীর নববার্ষিক মহরৎ উৎসবের বিবরণ।—১লা বৈশাখে মহরৎ হইয়াছিল। রাজা, মহারাজা, জমীদার প্রভৃতি বিস্তর মান্যগণ্য ভদ্রলোক সভাস্থ হইয়া সমাদৃত হইয়াছিলেন। কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী বাবু রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ও শিষ্টাচারে সকলেই বিশেষ পরিতৃপ্ত ও পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। সভায় শিশু মাষ্টার মদন সঙ্গীতালাপে সর্ব্বজনের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র সর্ব্বসম্মতিতে মাষ্টার মদনকে একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার দিয়া গুণের গৌরব করিয়াছেন; আমরা মণি-মণিলাল কোম্পানীর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সতত কামনা করি।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৯শ বর্ষ। | ১৩১৮ সাল, জ্যৈষ্ঠ। | ২য় সংখ্যা।

আত্রেয়ীর দীক্ষা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ।

"পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" এই মহা বাক্য স্মরণ ক'রে সনন্দ বানপ্রস্থাশ্রমে যাবার মনস্থ কল্লেন, সে কথা শুনে তাঁর প্রিয়তমা ধর্ম্মপত্নী সজলনয়নে সনন্দের সাম্‌নে উপস্থিত হ'লে, সনন্দ সাদরে পত্নীকে বল্লেন,—"অয়ি কুসুম-কোমলা আত্রেয়ি! এতদিন সংসারে ভোগলালসার মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে রেখে প্রবৃত্তির আরাধনা কোল্লেম, প্রাণের সমস্ত চেষ্টা অন্তরের মোহময় আবেগ, ভালবাসার সুখ-স্বপ্নময়ী জীবন্তশক্তি দিয়ে যে লতাটিকে মুঞ্জরিত রেখে, হেসে খেলে,

জীবনের সমস্ত দিনমান কাটিয়ে দিলেম্, কিন্তু কৈ প্রবৃত্তিকে ত তৃপ্ত কর্ত্তে পাল্লেম না, কামনার ত শেষ পেলেম্ না।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপ-ভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভুয়ঃ এবাভিবর্দ্ধতে॥"

বরং যেন কামনার অগ্নি উপভোগের ঘৃতক্ষেপে আরও প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠ্‌লো। কৈশোরের স্মৃতি, যৌবনের মোহ হৃদয়ের উচ্ছ্বলিত ভালবাসায় সংসারকে এতদিন সুখময়-স্মৃতি-বিজড়িত শান্তিকানন ব'লে ভেবে এলেম, কিন্তু কৈ প্রকৃত আপনার কাজ কি হ'ল আত্রেয়ী ?

ঐ শুন, মার মত সস্নেহ ভাষায় শ্রুতি বল্‌চেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" তুমি যদি বাসনার লীলাস্থল, যৌবনের সুখকানন, বার্দ্ধক্যের স্বর্ণযষ্টি, এই চিরপরিচিত সংসার, গ্রাম, গৃহ, আত্মীয় স্বজনের মায়া কাটা'তে পার, তবে চল যাই, পৃথিবীর উর্দ্ধে, স্বর্গের পারে, আকাশের উৎপত্তি ক্ষেত্রে, যেস্থানে অভাব নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, অতীতের স্মৃতি পর্য্যন্ত নাই; সেই আনন্দধাম উদ্দেশে এস চলে যাই।

"ন চ কর্ম্মণা সংভিন্নং ন চ গ্রস্তং জরাদিভিঃ।"

আত্রেয়ী। স্বামিন্! আমার আবার স্বতন্ত্র ইচ্ছা অনিচ্ছা কি ? যেথানে তপন, রশ্মি সেথানে, যে স্থানে পুরুষ, প্রকৃতিও সেই স্থলে; দ্রব্য ত্যাগ ক'রে গুণ কখন স্বতন্ত্র থাকে না। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,—"এতদিন ধ'রে যে বেদ পাঠ কল্লেন, আজীবন যজ্ঞে আহুতি দিয়ে এলেন, প্রাণ দিয়ে দেবতার উপাসনা, সংসারের কঠিন কর্ত্তব্যপালন ক'রে এলেন, তাতে কি প্রকৃত আপনার কাজ হয় নি ?"

সনন্দ। এতদিন পূজার ঘণ্টা বাজিয়ে এসেছি, এখন পূজা কোত্তে হবে; পুস্তকের ভূমিকা লেখা শেষ হয়েছে, এখনও পুস্তক লেখা শেষ হয়নি; যজ্ঞে আহুতি দিয়েছি বটে, কিন্তু এখনও পূর্ণাহুতি বাকি।

"নায় মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"

আরও কি করেছি জান ? অজ্ঞান হ'তে মুক্ত হবার জন্য অজ্ঞানের আরাধনা ক'রে অজ্ঞানের স্বরূপ বুঝ্‌তে পেরেছি। আর জেনেছি, প্রবৃত্তিতে শান্তি নাই, শান্তি শুধু নিবৃত্তিতে।

আত্রেয়ী। অজ্ঞানের স্বরূপ কি বুঝ্‌লেন ?

সনন্দ। বুঝেছি,—যা আপনার ভেবে এতদিন সুখে, দুঃখে, মোহে, জড়তায় আচ্ছন্ন ছিলেম, সে কেবল বাসনার বিভিন্ন বিকাশ, বুদ্ধির অলীক অভিমান মাত্র। এতদিন মিথ্যা দিয়ে, মিথ্যা কাটিয়ে এসেছি, এখন জানতে হবে, যাহা সত্য "নিত্যো নিত্যানাশ্চেতনশ্চেতনানাং।" পেতে হবে, সেই বাহ্য জ্যোতির প্রকাশক স্বয়ম্প্রকাশ, তখনই এই সঞ্চিত ক্রিয়মান কর্ম্ম অন্ধকারের মত বিলীন হ'য়ে যাবে।

"তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।"

আত্রেয়ী। সে সত্য কিরূপ তা বুঝিয়ে দিন্।

সনন্দ। তা যে কি? এখনও শ্রুতি বুঝাতে পারি না, পুরাণ রূপকে বুঝাতে চেষ্টা করেছে। ভাষার যদি জীবন থাক্‌ত, কল্পনার যদি চক্ষু থাক্‌ত, ভাবের যদি প্রাণ থাক্‌ত, তবে বুঝতে চেষ্টা কর্ত্তে পার্ত্তেম্। অতীত, বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ যার সীমা ধর্ত্তে পারে নি, বাক্য মনের সহিত যে স্থান হ'তে ফিরে আসে;

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

তাঁর স্বরূপ কি বোঝাব। তবে ইন্দ্রিয় মনে, মন প্রাণে, প্রাণে জীবাত্মায়, আর সকলগুলি যদি এক শান্ত পরমাত্মায় মিশিয়ে যেতে পার্ত্ত, তা 'হলে বোধ হয়, তাঁকে বুঝ্‌তে পারা যেত। "বিদিতাদধি অবিদিতাদধি" (অধি উপরি ভিন্নার্থক)

আত্রেয়ী। তবে এ অচিন্ত্য অননুভাব্য তত্ত্ব জান্‌বার আশা পোষণ করেন কেন? এ বৃথা চেষ্টার ফল কি?

সনন্দ। আমরা অজ্ঞান, ভক্তিহীন। আমাদের কাছে অচিন্ত্য ব'লে কি সকল সময়েই অচিন্ত্য? পদ্মের নালদণ্ড দিয়ে বৃক্ষ ছেদন করা যায় না ব'লে কি বৃক্ষ অচ্ছেদ্য? যদি অনুভবের আকারে তাঁকে না পাওয়া যেত, তবে তিনি লীলাময়, ভক্তবৎসল, সর্ব্বশক্তিমান কেন? তিনি অজ্ঞানীর কাছে অনন্ত যোজন দূরে, কিন্তু জ্ঞানীর কাছে করতলধৃত আমলকীর মত; ভক্তের কাছে নয়নের সাম্‌নে অবস্থিত।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্যসর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

আত্রেয়ী। তাঁকে জান্‌বার উপায় কি?

সনন্দ। ভক্তি, "পরানুরক্তিরীশ্বরে" ভক্তির টানে তাঁকে নেমে আস্‌তে হয়।

পুত্রের মা, মা রোদনে যেমন মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠে, তেমনি ভক্তের ভক্তিপূর্ণ আকুল আহ্বানে তাঁর আসন কেঁপে উঠে।

আত্রেয়ী। নির্গুণ নিরাকার বল্ছেন, অথচ আবার তাঁর আসন কেঁপে উঠে, এ কেমন কথা প্রভু ?

সনন্দ। সর্ব্বশক্তিমান্ মহামায়াবীর পক্ষে আশ্চর্য্য কি ?

"ব্রহ্মণা সৃজতে বিশ্বং বিষ্ণুনা পালয়েৎ মহীং।
রুদ্রেণ সংহরেৎ যো হি তস্য শক্তেঃ সীমাকৃতঃ॥

মনোময় প্রাণশরীর ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয় যিনি, তিনি যে আকার ধারণ কর্ত্তে ইচ্ছা করেন, তা যদি নাই পার্ব্বেন, তবে তাঁর শক্তির সীমানির্দ্দেশ হল না কি ? তিনি নীরূপ কিন্তু জগত যে তাঁর রূপ। পৃথিবীর অভ্যন্তরে দেখ, বায়ুর সবেগ চলনে দেখ, তিনি আছেন ; স্বচ্ছ আকাশের গাত্রে তাঁর পবিত্রতা, তপনকিরণে তাঁর জ্যোতিঃ ; পরমাণু মিশ্রণে তাঁর শক্তি। তিনি সত্তাহীন জগতকে সত্তা দিয়ে, জড়কে চৈতন্য দিয়ে, প্রাণহীনকে বিদ্যুৎ দিয়ে সজীব কোরে রেখেছেন। তবে আবাব তাঁর আকার নাই কৈ ? রূপ নাই কৈ ? যে নিরাকার ভেবে সাকারের পূজা করে, সেও নিরাকার ভাবে।

আত্রেয়ী। এ কেমন কথা হ'ল প্রভু !

সনন্দ। যে উপনিষৎ নিরাকারের উপাসনার ব্যবস্থা দিয়েছেন, তিনিই'ত বল্ছেন,

"অপাণি পাদোজবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যিকর্ণঃ।

যে ভাগবৎ সাকারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, তিনিই ত বলেছেন :—

"আসীজ্ জ্ঞানময়োহ্যর্থ একমেবা বিকল্পিতং॥

যে নিরাকারবাদী বলেন, সাকার মিথ্যা, তিনি নিরাকারের কিছুই বোঝেন না। আবার যিনি সাকারবাদী নিরাকার উপাসনাই হয় না বলেন, তিনিও সাকারের তত্ত্ব কিছুই বোঝেন নাই। আবার যিনি বলেন, আমি বেশ বুঝিয়াছি তিনি আংশিক বুঝিয়াছেন মাত্র।

"যম্মন্য সে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেল্য ব্রহ্মণো রূপং।"

পরমভক্ত প্রহ্লাদ ইহার বেশ মীমাংসা করে দিয়েছেন ;—

"ন কেবলং যে হৃদয়ং সে বিষ্ণুঃ
রাক্রম্য লোকানখিলানবস্থিতঃ।

স মাং হৃদাদীংশ্চ পিতঃ! সমস্তান্
সমস্ত চেষ্টাসু যুনক্তি সর্ব্বগঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ

যে নিরাকার ধ্যান করে, সে নিরাকারের বিভূতিই ধ্যান করে। আকাশের স্বচ্ছতা মেঘ বিচ্ছুরিত তপনকিরণ, ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতাই চিন্তা করে, সে কি সাকারবাদী নহে? যে সাকার উপাসনা করে, মনোমত মূর্ত্তি গড়ে, তাঁর চরণে কুসুম দিয়ে পূজা করে; সে কি জানে না, ইনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতেই ইঁহার বাস। তবে এইটি বিশ্বাস করে, তিনি সকল আকারেই দেখা দিতে পারেন। তবে সাকারবাদী কি নিরাকারের উপাসনা করিল না? ভগবানই বলে দিয়েছেন,

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।"

আত্রেয়ী। সাকার চিন্তা করা যায়, নিরাকার কি চিন্তা করা যায়?

সনন্দ। সাকারের মধ্যে দিয়ে নিরাকার চিন্তা কর্ত্তে হয়। প্রকৃতির স্বহস্ত রচিত দৃশ্যপটের মধ্যে তাঁর মহিমা চিন্তা কর্ত্তে হয়; যেমন দয়া, মায়া, স্নেহ, বৃত্তিগুলির আকার নাই, কিন্তু কার্য্যের মধ্যে দিয়ে তাদের অভিব্যক্তি দেখে চিন্তা কর্ত্তে হয়। তবে এমন কেহ নিরাকার উপাসক জন্মে নাই, যিনি সাকার মিথ্যা বল্‌তে পারেন। তাঁরই সৃষ্ট উদ্যানের পুষ্প দিয়ে, তাঁরই নির্ম্মিত মৃত্তিকা দিয়ে, তাঁরই কল্পিত নাম ধ'রে তাঁর উপাসনা করা যায় না, ব'লে যদি কারো ভ্রান্তি থাকে (জানি না আছে কি না?) তাঁকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি কি তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি দিয়ে উপাসনা ক'রে থাকেন? তিনি কি নিজসৃষ্ট উপাদানে নিজস্ব চিন্তাদ্বারা উপাসনা কর্ত্তে পারেন?

আমাদের কি আছে যে, তাঁকে দিয়ে সন্তুষ্ট কর্ত্তে পারি? ভক্তি, সেও তাঁর, আর পুষ্প, বিল্বদল, চন্দনচর্চ্চিত ক'রে তাঁকে অর্পণ করাও তাঁরই জিনিষ তাঁকেই দেওয়া ভিন্ন আর কি? আকাশ, মেঘ, তপন, শশাঙ্ক, গ্রহ, তারা, বিদ্যুৎ অগ্নি, বায়ু, সলিল, ইহাদের মধ্যে তাঁর যেমন ছবি দেখ্‌তে পাওয়া যায়, স্বহস্ত রচিত মূর্ত্তি মধ্যেও কি সে ছবি নাই? সবই তাঁর কার্য্য, সবই ত ফটো, তবে ইতর বিশেষ কি? গীতায় ভগবানই ব'লে দিয়েছেন :—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

এই নিরাকার সাকার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা পুস্তকভার বাহিনী বিদ্যার আয়ত্তে নাই, বুদ্ধির আয়ত্বে ইহার মীমাংসা হয় না। এই স্বরূপতত্ত্ব না বুঝ্‌তে পেরে,

নিরাকারবাদী সাকারবাদী পৃথক হয়ে পড়েছে!

আত্রেয়ী। তবে কি এই উভয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে; পূর্ব্বাচার্য্যগণ কি তাহাই করেছেন?

সনন্দ। বেদ, উপনিষৎ, গীতা, ভারত, ভাগবৎ, পুরাণ, সংহিতা, তন্ত্র, সকল শাস্ত্রে সাকারে আরম্ভ, নিরাকারে পরিণতি। প্রহ্লাদের সাকার ভক্তির প্রতি অবয়বে নিরাকারের ছবি পরিস্ফুট। হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদকে সারভূত পাঠ পড়্‌তে বল্লেন, প্রহ্লদে পড়্‌লেন :—

"অনাদি মধ্যান্ত মজ মবৃদ্ধি ক্ষয়মচ্যুতং"

স্তব কর্‌লেন :— "রূপং মহত্তে স্থিতমত্র বিশ্বং
ততশ্চ সূক্ষ্মং জগদেতদীশ।
রূপাণি সূক্ষ্মাণি চ ভূতভেদা
স্তেষন্তরাত্মাখ্যমতীব বিশ্বং ॥"

আবার জ্ঞানী বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতীর হৃদয়ের পানে তাকাও, দেখ্‌বে ভক্তির বিমলধারা কি সুন্দরভাবে ক্ষরিত হচ্চে,—"কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্ব মহং ন জানে।" দার্শনিকজগতের একচ্ছত্র সম্রাট্ পরম জ্ঞানী শঙ্করাচার্য্যের শিব-স্তোত্র ত পড়েছ, সে স্তোত্রে কি ভক্তি উচ্ছ্বলিত না হয়েছে।

"ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে কি মা তার,
প্রাণে জাগে ধূর্জ্জটী যাহার।"

আত্রেয়ী। জ্ঞানী বা ভক্ত, এই উভয়ের প্রকৃতি ত ভিন্ন। জ্ঞানী সুখ, দুঃখ বিমুক্ত, জগতের দুঃখে অভিভূত হয়েন না। ভক্ত প্রেমময় জগতের দুঃখে সদা দুঃখী।

সনন্দ। "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোত্যোর্থমহং সচ মম প্রিয়ঃ ॥"

প্রকৃত জ্ঞানী প্রকৃত ভক্তে কিছুই বিভিন্নতা নাই। প্রথম স্তরে সনক সনাতন, নারদ, গোপীকাদির নাম পাওয়া যায়। ভাগবত কি বল্‌ছেন দেখ :—

ছায়া প্রত্যাহ্বায়া ভামা হ্যসন্তোপ্যর্থকারিণো।
এবং দেহাদয়ো ভাবা যচ্ছন্ত্যা মৃত্যুতোভয়ং ॥ ১১স্কন্ধ ১৮শ অধ্যায়।

"মিথ্যা দেখ প্রতিবিম্বে সত্য ভ্রম হয়।
সত্য সম প্রতিধ্বনি যেমত শুনয় ॥

শুক্তিকায় রৌপ্যজ্ঞান যে প্রকারে হয়।
মরীচিকা আদি যেন জন সে বুঝয়॥
এরূপ শরীর আদি যত ভাব হয়।
মরণ অবধি ভ্রম কভু না ঘুচয়॥
জ্ঞান হইলে শরীরাদি সব মিথ্যা দেখে।
আর তার মৃত্যু ব'লে ভয় নাহি থাকে॥"

আত্রেয়ী। তবে কি জ্ঞানীই ভক্ত, ভক্তই জ্ঞানী।

সনন্দ অবশ্য একটু প্রভেদ আছে, "জ্ঞানী আমারই আত্মা জানিও।" "জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং" আর ভক্ত আমার অতি প্রিয়। "ভক্তেচমেঽতীব প্রিয়ঃ" এই দুই ভগবদুক্তি দ্বারাই বুঝা যায়। তবে এ প্রভেদ উপায়ের বিভিন্নতা বোধ করায় মাত্র। বুদ্বুদসাগর হইতে আপনাকে পৃথক বোধ করুক, বা নাই করুক, সাগরে গেলেই তার সহিত মিশে, আপনার সত্তা হারিয়ে ফেলে, ভক্তও তেমনি ভগবানে আপনার অস্তিত্বটুকু মিশিয়ে দেয়। জ্ঞানী ভগবানের সহিত অভিন্ন ভেবেই থাকে, কিন্তু সেই অভিন্নতার প্রতিবন্ধক কাটাতে চেষ্টা করে এলে দুই এক।

আত্রেয়ী। আমাকে এ দুইটী উপায়ের কোনটি নিতে বলেন।

সনন্দ। ভক্তি। স্ত্রীলোকের পক্ষে এই পথ বিনা অন্য পথ নেবার অধিকার নেই।

আত্রেয়ী। তবে চল প্রভু! দু-জনে একসঙ্গে পরমধাম উদ্দেশে চলে যাই। আজ কি পুণ্যদিন। আমার আজ দীক্ষা হ'ল, গুরুদত্ত মন্ত্র আজ সার্থক হ'ল, স্বামীসেবার সার্থক হ'ল।

নমস্তেঽহং পতিরূপী মহাত্মন্।

প্রেম।

লেখক,—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।

গিরিপরে কলাপিনী পয়োদ অম্বরে।
লক্ষান্তরে দিনমণি সরোজিনী সরে॥

বহুদূরে শোভে শশী কুমুদিনীনাথ
কেমন মিলন মরি দোঁহাকার সাথ ॥
তাই বলি হৃদিনিধি বহিলেও দূরে।
নেহারে তাহারে প্রিয় নিজ অন্তঃপুরে ॥

দশহরা।

মাতর্গঙ্গে! বিষ্ণুপদে উদ্ভব তোমার।
বিষ্ণুপদী নাম তব জগতে প্রচার ॥
বিধাতার কমণ্ডলু করিয়া আশ্রয়,
পবিত্র করিয়াছিলে অমর-আলয়।
সূর্য্যবংশে অবতংশ রাজা ভগীরথ—
আনিলা অবনীতলে দেখাইয়া পথ।
দ্রবময়ীরূপে দেবি! নামিলে ভূতলে,
কে ধরিবে তব বেগ, চিন্তিলা সকলে।
জটাতেতোমারে ধরি শশাঙ্ক-শেখর—
ধরিলেন ধরাধামে নাম গঙ্গাধর।
সাগরে সগরবংশ করিয়া উদ্ধার,
মহীতলে করেছিলে মহিমা প্রচার।
জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষ দশমী তিথিতে,
মা তোমার পূজা হয়, ইহ পৃথিবীতে।
এই দিনে তুয়াজলে স্নান করি নরে,
দশ জন্মার্জ্জিত সব পাপক্ষয় করে;
সেই হেতু তব নাম দেবী দশহরা,
পাপ বিনাশিনী তুমি হর-মনোহরা।
পতিত-পাবনী তুমি, দেবী সুরেশ্বরি!
ভক্তিভাবে তব পদে প্রণিপাত করি ॥

জীবজন্তুর বুদ্ধি।*

লেখক,—শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন।

পশু, পক্ষী ও সরীসৃপের মধ্যে, উকিলের ফিচ্‌লামি, ইঞ্জিনিয়ারের গৃহ-নির্ম্মাণকৌশল, এবং নায়েবের "পরের ধনে পোদ্দারি" প্রভৃতি দোষগুণের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়।

যবদ্বীপের চেলিনাস্ (Chelinous) নামক মৎস্যের খাদ্যসংগ্রহপ্রণালী বিস্ময়কর। জলাশয়ের তীরবর্ত্তী গাছের ডালে কোনও পতঙ্গ বসিয়া আছে দেখিলে, এই মৎস্য মুখ দিয়া পিচকারির ন্যায় জল বাহির করিয়া, সেই পতঙ্গের গাত্রে নিক্ষেপ করে। ফুৎকৃতি-স্রোতে পতঙ্গ গাছের ডাল হইতে জলের উপর পড়িলে, অবিলম্বে কথিত মৎস্যের উদরাভ্যন্তরে আশ্রয়লাভ করে। প্রথমবার বিফল হইলে উক্ত মৎস্য দুই তিন বার চেষ্টা করিতে পরাঙ্মুখ হয় না, এবং ইহার মুখ-নিঃসৃত জল প্রায় তিন হস্ত উচ্চ পর্য্যন্ত পৌঁছে।

শজারুর শরীরের লম্বা লম্বা কাঁটার দাপটে অনেক জন্তু ইহার নিকট ঘেঁসিতে ভয় পায়। গায়ে জল পড়িলে, বিড়ালের ন্যায়, শজারু অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়ে। শৃগাল সেইজন্য শজারুকে তাড়া দিয়া নর্দ্দমা, ডোবা বা পুকুরে ফেলিবার চেষ্টা করে; কাছে জল পাইবার সুবিধা না থাকিলে শৃগাল শজারুর গায়ে প্রস্রাব করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করে। শৃগালের এই ফিচ্‌লামি সম্বন্ধে একজন প্রাণী-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত লিখিয়াছেন :—

"It may happen that there is no puddle in the neighbourhood suitable for his both; in this case the fox is not embarassed for so small a matter, and provides from his own body the where-withal to moisten the hedgehog."

ভূমধ্যসাগরে এক জাতীয় মৎস্য পাওয়া যায়, তাহার বৈজ্ঞানিক ইংরাজী নাম ইউর‍্যানস্কোপস স্কেবার (Uranoscopus Scaber.)। ইহার চিবুকে একটী দীর্ঘ ও নমনীয় মাংসসূত্র আছে; ক্ষুধিত হইলে এই মৎস্য জলাশয়ের অভ্যন্তরস্থ গুল্মাদির মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া, ঐ মাংসসূত্রটী বাহির করিয়া নাড়িতে আরম্ভ করে। ক্ষুদ্রজাতীয় মৎস্যকুল ঐ সূত্রটীকে পোকা মনে করিয়া, উদরস্থ করিবার লোভে দৌড়িয়া আসিয়া, কথিত মৎস্যের কুক্ষিস্থ হয়।

---

* Houssay's "Industries of Animals" নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত।

টাইগার বীটল্ (Tiger Beetle) নামক পোকা, সাত আট ইঞ্চ গভীর ও অর্দ্ধ ইঞ্চ ব্যাসযুক্ত একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া, চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। গর্ত্তের মুখের কাছে পিপীলিকা কিম্বা তজ্জাতীয় কোন ক্ষুদ্র কীট উপস্থিত হইলেই, টাইগার বীটল্ উহাকে হিঁচড়াইয়া গর্ত্তের ভিতর লইয়া যায়। হঠাৎ অন্ধকূপের মধ্যে নীত হইলে তাহার এরূপ "ভ্যাবাচ্যাকা" লাগে, যে তাহাকে হত্যা করিতে উক্ত পোকার বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না।

আল্‌পস পর্ব্বতে একজাতীয় দ্রোণকাক বাস করে, শশক তাহাদের প্রিয় খাদ্য। তাহাদের ভয়ে যদি একটী খরগোস গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে, তাহা হইলে যখন একটী কাক গর্ত্তের এক মুখে তাড়া দেয়, অপর কয়েকটী কাক তখন গর্ত্তের অপর মুখগুলির নিকট পাহারা দেয়। শশক বাহির হইলেই, কাকের দল তাহার মাথায় ঠোকর মারিয়া ঈপ্সিত কার্য্য সাধন করে।

মেষপাল রক্ষণের জন্য ইউরোপে একপ্রকার বলবান কুকুর শিক্ষিত ও প্রতি-পালিত হয়। তাহাদের হস্ত হইতে বিনাযুদ্ধে খাদ্যসংগ্রহের জন্য, সময়ে সময়ে দুইটী নেকড়ে বাঘ এক সুন্দর কৌশল অবলম্বন করে। একটী নেকড়ে যখন মেষপাল হইতে কিছুদূরে লুকাইয়া থাকে, অপরটী তখন উহাদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। কুকুরের দল অমনি তাহাকে তাড়া করিতে করিতে অনেক দূরে চলিয়া যাইলে, বনান্তরালে লুক্কায়িত নেকড়ে আসিয়া অরক্ষিত মেষদলের কয়েকটীকে লইয়া পলায়ন করে।

হরিণের দৌড়াইবার ক্ষমতা নেকড়ে বাঘের অপেক্ষা অধিক, কিন্তু নেকড়ের কৌশলে হরিণকে পরাস্ত হইতে হয়, বাঘ দূর হইতে হরিণকে এমনভাবে দৌড় করাইয়া আনে, যেন তাহাকে বাঘের বাসার নিকট দিয়া যাইতে হয়। বাসার নিকটে আসিলে ব্যাঘ্র বিশ্রামে মন দেয়, বাঘিনী বাহির হইয়া, হরিণের পশ্চাদ্ধাবিত হয়। বাঘ বাঘিনী উভয়ের সঙ্গে দৌড়াইয়া হরিণ হাঁপাইয়া পড়ে, তাহার পরে নিধন-প্রাপ্ত হয়। ডাকবদলের সঙ্গে তুলনা করিয়া, একজন প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ইহাকে "Organised system of relays" বলিয়াছেন।

শৃগাল যখন মৌচাক হইতে মধুপান করে, তখন ক্রুদ্ধ মধুমক্ষিকাগণ তাহাকে আক্রমণ করিলে, শৃগাল মাটীতে দুই চারি বার গড়াগড়ি দেয়, তাহাতে একেবারে অনেকগুলি মৌমাছি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। যতক্ষণ না পেট্‌টা খানিক ভরে, ততক্ষণ ধূর্ত্ত শৃগাল একটু একটু করিয়া মধু চুরি করে ও তৎপরে বার কয়েক গড়া-

গড়ি দেয়।

Goshawk নামে একপ্রকার পক্ষী আছে, তাহা দেখিতে চিলের ন্যায়। পারাবতের মুণ্ডপাত করিতে ইহারা সিদ্ধহস্ত। আকাশপথে একটী "গোশাক" দেখিলে পায়রার ঝাঁক বাসায় পলাইয়া আসে। পায়রার বাসার বা তন্নিকটস্থ কোনও ছাদে বসিয়া গোশাক ডানার সাহায্যে এমন বিকট শব্দ করে, যে পায়রার দল ভয়ে বাহিরে আসে। তাহার ফল কি হয় বলা নিষ্প্রয়োজন।

মর্কটের নারিকেল ভক্ষণ একটী দ্রষ্টব্য ব্যাপার। দুই হস্তে নারিকেল ধরিয়া তাহারা দন্ত ও নখের সাহায্যে ছোবড়া ছাড়াইয়া লয়। তৎপরে ঠুকিয়া ঠুকিয়া মালা ভাঙ্গিয়া নারিকেলের শাঁস ভক্ষণ করে।

সিংহল দ্বীপে একজাতীয় বায়স আছে, তাহার নাম গ্লসী ক্রো (Glossy Crow.) ফাঁকি দিতে ইহারা খুব মজবুত। দুই তিনটী কাক যদি দূর হইতেদেখে যে,কোনও কুকুর এক টুক্‌রা মাংস ভক্ষণে নিযুক্ত আছে, অমনি একটী কাক তাহার পিঠে বসিয়া ঠোকর মারে; ক্রোধান্ধ কুকুর যখন ঘাড় বেঁকাইয়া মাংসখণ্ডস্থিত দন্তাবলী বেয়াদব বায়সের জন্য বাহির করিতে ব্যস্ত হয়, তখন অপর একটী কাক ছোঁ মারিয়া ঐ মাংসখণ্ডটা গাছের উপর লইয়া যায়।

কঠিন আবরণযুক্ত ডিম্ব গলাধঃকরণ করিয়া সময়ে সময়ে কোন কোন সর্প মুস্কিলে পড়ে। অনেকক্ষণ চাপ দিবার পর যদি ডিম্ব না ভাঙ্গে, তখন সে নিজে কোন কঠিন পদার্থের উপর আছাড় খাইয়া বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয়।

অষ্ট্রেলিয়াবাসী কাঙ্গারুকে কুকুরে তাড়া করিলে কাঙ্গারু জলে পড়িবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। জলে পড়িলে কুকুর সাঁতার দিয়া তাহাকে ধরিতে যাইলে, কাঙ্গারু তাহার পশ্চাদ্ভাগের দুইটী দীর্ঘ পদের উপর ভর দিয়া, গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দণ্ডায়মান হয় এবং সম্মুখের দুই পদের সাহায্যে কুকুরকে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করে। ইহাতে কুকুরকে হয় রণে ভঙ্গ দিতে হয়, নয় জীবলীলা সম্বরণ করিতে করিতে হয়।

কানাডাদেশে পার্ট্রিজ(Partridge) নামক তিতিরজাতীয় একপ্রকার পক্ষী আছে, তাহার শাবককুল কোন আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিলে, সে ঝুপ করিয়া শত্রুর কাছাকাছি আসিয়া বসে, যেন তাহার ডানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এরূপ ভাণ করে। যখন তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করে, অমনি সে উড়িয়া গিয়া একটু দূরে গিয়া ঝুপ করিয়া বসে। এইরূপে আন্দাজ অর্দ্ধক্রোশ গিয়া যখন পক্ষী

ভাবে, যে এতক্ষণে তাহার শাবককুল নিরাপদ, তখন সে এক দমে উড়িয়া বাসার দিকে ফিরিয়া আসে।

বেবুন জাতীয় বানর ভয়ে পলাইবার সময় প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করে। অনেক সময় এই শিলাবৃষ্টি ভেদ করিয়া, আক্রমণকারীর অগ্রসর হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে।

এণ্ডিসপর্ব্বত নিবাসী ম্যাকা(Macaw) নামক এক প্রকার শুকজাতীয় পক্ষী অরণ্যে বিচরণকালে খুব শব্দ করে। কিন্তু লোকালয়ের সন্নিকটে ভুট্টার ক্ষেত্রে নামিয়া দস্যুবৃত্তি করিবার সময় একটুও আওয়াজ করে না। সেই সময়ে তাহারা কাছা-কাছি গাছের ডালে প্রহরী বসাইয়া রাখে। দূর হইতে মানুষ আসিতেছে দেখিলেই প্রহরী পাখী একপ্রকার শব্দ করে, আর সমস্ত পাখী ডানার সদ্ব্যবহার করিতে যত্নশীল হয়।

পিপীলিকা তাহার বাসার মধ্যে কয়েক দিনের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। মেক্সিকো দেশের কোটাপ্টেস্(Cotaptes)পক্ষী, গাছের গুঁড়ির গর্ত্তে, ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য ফল লুকাইয়া রাখে।

সাইবিরিয়া দেশের ভোল (Yole) নামক জীব অনেক দিবসের ব্যবহার্য্য বৃক্ষমূল সাবধানে লুকাইয়া রাখে। শীতকালে বরফে বাহির হওয়া কষ্টকর বলিয়া, উক্ত জীব বরফ পড়িবার পূর্ব্বে দুই তিন মাসের আহার্য্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়।

মৌমাছি তাহার চাকের মধ্যে কখনও মলমূত্র তাগ করে না। বেজার(Badger) নামক শৃগালজাতীয় এক প্রকার চতুষ্পদের পরিচ্ছন্নতা প্রশংসাযোগ্য। ঝড়বৃষ্টির সময়েও সে গর্ত্তের বাহিরে আসিয়া মলমূত্র ত্যাগ করে। এই গুণের জন্য তাহাদিগকে সময়ে সময়ে ক্ষতিস্বীকার করিতে হয়। কোনও প্রতিবাসীবেজারের(Badger) রমণীয় গর্ত্তের উপর ধূর্ত্ত শৃগালের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইলে, শৃগাল ঐ গর্ত্তের মুখের নিকট প্রত্যহ মলত্যাগ করিতে আরম্ভ করে। শৃগালের দুষ্কার্য্যে বিরক্ত হইয়া, বেজার (Badger) ঐ গর্ত্ত পরিত্যাগ করে, এবং শৃগাল উহা ভোগদখল করিতে নিযুক্ত হয়।

টুনটুনি ও বাবুই পক্ষীর নীড়নির্ম্মাণে অদ্ভুত কৌশল প্রকাশিত হয়। গাছের দুইটী পাতা শিলাই করিবার জন্য সুতা পাকান, সুতায় গেরো দেওয়া, বাসার জন্য একটী দরজা রাখা, উহার মধ্যে তুলা, পশম, নরম ঘাস ইত্যাদির সাহায্যে শাবকের জন্য গদি প্রস্তুত করা, এই সমস্ত ব্যাপার সূক্ষ্মরূপে দর্শন করিলে বিস্ময়ের অবধি

থাকে না।

ঈগল পক্ষী অত্যন্ত উচ্চ স্থানে নীড় নির্ম্মাণ করে। নীড় প্রস্তুত করিতে প্রায় দুই গাড়ী ডালপালা ও পাতালতার প্রয়োজন হয়। বাসার পরিধি দশ হইতে বার হাত পর্য্যন্ত হয়, এবং উহা এমন দৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত হয় যে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মনুষ্য তাহার উপর দাঁড়াইয়া নাচিলেও, নীড়ের কোনও ক্ষতি হয় না।

কানাডাবাসী বীবর নামক জীবের গৃহনির্ম্মাণ কৌশল দেখিলে অবাক হইতে হয়। জলাশয়ের পাশে তাহারা এমন সুচারুরূপে বাঁধ তৈয়ারি করে, যে হঠাৎ দেখিয়া তাহা সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের তত্বাবধানে প্রস্তুত বলিয়া মনে হয়।

প্রভুভক্তি, অপত্যস্নেহ, গৃহনির্ম্মাণের কৌশল, অধ্যবসায় ও দূরদর্শিতা প্রভৃতি গুণের কথা ভাবিলে, কতকগুলি পশুপক্ষীকে ইতর জীব বলিতে সঙ্কোচ বোধ হয়।

অর্শ (*Piles*)

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ রায় (সেনগুপ্ত)

"সন্নিপাতজানি সর্ব্বদোষ লক্ষণযুক্তানি।" সুশ্রুত

বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা ত্রিদোষের প্রাবল্য থাকায় ত্রিদোষজ অর্থাৎ সন্নিপাতজ অর্শে পূর্ব্বোক্ত বাতপিত্ত ও কফোদ্ভব অর্শের সমস্ত লক্ষণই একত্রে উপস্থিত হইয়া থাকে।

"সহজানি দুষ্ট শোণিত শুক্র নিমিত্তানি ... ...
বিশেষ তঃ অশাংসি সহজাতানি দারুনানি;ভবন্তি হি।
দুদর্শনানি পাণ্ডুনি পরুষাণ্যরুনানিচ॥
অন্তর্ম্মুখানি তৈরার্ত্তঃ ক্ষীণ ক্ষামস্বরো ভবেৎ।
ক্ষীণানলঃ ক্ষীণরেতাঃ শিরা-সন্তত-বিগ্রহঃ॥
অল্পপ্রজঃ ক্রোধশীলো ভগ্নকাংসস্বনান্বিতঃ॥

সহজ অর্শ শুক্র শোণিতের দোষ হেতু উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাতে ত্রিদোষের সকল লক্ষণই বর্ত্তমান থাকে। বিশেষতঃ এই অর্শ অতিশয় কষ্টপ্রদ, দুর্দ্দশন পাণ্ডু বর্ণ বা অরুণ, বর্ণ কর্‌করে, অন্তর্মুখী হইয়া থাকে। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি প্রায়ই ক্ষীণ ক্ষামস্বর ক্ষীণানল অর্থাৎ মন্দাগ্নিযুক্ত, ক্ষীণরেতা, সর্ব্বগাত্রে শিরা-ব্যাপ্ত, কোপনস্বভাব, ভগ্নকাংসের মত স্বর বিশিষ্ট হইয়া থাকে; ইহাদের অধিক সন্তানাদি হয় না।

উপরি উক্ত বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ সহজ এবং রক্তজ প্রধানতঃ এই ছয় প্রকার অর্শের বিভাগ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সংসর্গজ আরও তিন প্রকারের অর্শ আছে,—বাতপিত্তোদ্ভব অর্শ, বাতশ্লেষ্মোদ্ভব অর্শ এবং পিত্ত শ্লেষ্মোদ্ভব অর্শ; এইরূপ উভয় দোষের প্রকোপ হেতু যে অর্শ হয়, তাহাকে দ্বন্দজ অর্শ বলা যায়; এই দ্বন্দজ রোগে বাত-পিত্ত, বাত-শ্লেষ্মা বা পিত্ত-শ্লেষ্মাজনিত মিলিত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অর্শ দেখিতে সামান্য ব্যাধি হইলেও, ইহা অতি কষ্টসাধ্য এবং কষ্টপ্রদ। প্রথমেই বলিয়াছি, ত্রিদোষ প্রকুপিত বা ত্রিদোষ বিকৃত না হইলে, অর্শ রোগ জন্মে না।

অর্শ হইবামাত্র তাহার সুচিকিৎসার আবশ্যক, বৎসরাতীত রোগ হইলেই, সাধারণতঃ অর্শ যাপ্য হইয়া উঠে। এক্ষণে অর্শের মধ্যে কোন গুলি সুখসাধ্য, কোন্ গুলি কষ্টসাধ্য, কোন্ গুলি যাপ্য, কোন্ গুলি অসাধ্য, তাহা ক্রমশঃ কহিতেছি :—

বাহ্যায়ান্ত বলৌজাতান্যেক-দোষোল্বনানিচ।
অর্শাংসি সুখসাধ্যানি ন চিরোৎপতিতানিচ।

যে অর্শ বাহির বলিতে জন্মায়, যাহাতে এক দোষ প্রবল এবং যাহা এক বৎসরের অনধিককাল জন্মিয়াছে, সে অর্শ সহজে সামান্য চিকিৎসাতেই আরোগ্য হয়।

দ্বন্দজানি দ্বিতীয়ায়ং বলৌযান্যাশ্রিতানি চ।
কৃচ্ছ্র সাধ্যানি তান্যাহুঃ পরিসংবৎসরানি চ॥

যে সকল অর্শে দ্বিদোষ প্রবল, যে অর্শ মধ্য বলিতে জন্মায়, এবং যে অর্শ এক বৎসরের অধিক পূর্ব্বে দেহে জন্মিয়াছে, সে অর্শ কষ্টসাধ্য ও কষ্টপ্রদ।

সহজানি ত্রিদোষানি যানি চাভ্যন্তরাং বলিং।

জায়ন্তেহর্শাংসি সংশ্রিত্য তান্যসাধ্যানি নির্দ্দিশেৎ।

যে সকল অর্শে ত্রিদোষেরই প্রকোপ, যে অর্শ অন্তর্বলিতে উৎপন্ন হয়, এবং যে অর্শ সহজ (আজন্মজাত) সে অর্শ অসাধ্য জানিবেন, চিকিৎসা দ্বারা উহা যাপ্য থাকে মাত্র।

এক্ষণে অর্শের অরিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যুজ্ঞাপক লক্ষণের কথা বলিতেছি ঃ—

হস্তে পাদে মুখে নাভ্যাং গুদে বৃষণয়োস্তথা।
শোথো হৃৎপার্শ-শূলঞ্চ যস্যাসাধ্যোর্শশো হি সঃ॥

অর্শরোগে ভুগিয়া যে রোগীর হস্ত, পদ, মুখ, নাভি, মলদ্বার এবং কোষ ফুলিয়া পড়ে এবং যাহার পাঁজরে অথবা হৃদয়ে বেদনা ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে, সে রোগীর মৃত্যু উপস্থিত জানিবেন। এককালে ঐ লক্ষণগুলি উপস্থিত হইলে উহারা নিশ্চিত মরণজ্ঞাপক বলিয়া জানিবেন।

অন্যচ্চ লক্ষণং—হৃৎপার্শশূল-সংমোহশ্ছর্দ্দি রঙ্গস্য রুগজ্বরঃ।
তৃষ্ণা গুদস্য পাকশ্চ নিহন্যুর্গুদজাতুরঃ॥

হৃদয় এবং পাঁজরে ব্যাথাধরা, মোহ, বমি, গাত্রবেদনা, জ্বর এবং মলদ্বারের মুখ পাকিয়া উঠা (তাহা হইতে ক্লেদাদি নির্গত হওয়া) এই সকল উপদ্রব এক-সময়ে প্রকাশ পাইলে, অর্শরোগীর মৃত্যু হইবে জানিবেন।

অপরঞ্চ—তৃষ্ণারোচক-শূলার্ত্ত-মতিপ্রস্রুত-শোণিতং।
শোথাতিসারসংযুক্তমর্শাংসি ক্ষপয়ন্তি হি॥

যে অর্শরোগীর অত্যধিক রক্তস্রাব হইতেছে এবং যাহার মুহুর্মুহু তরল দাস্ত হয়, যাহার অরুচি ও প্রবল তৃষ্ণা বর্ত্তমান আছে, অথচ শূল ব্যাথাও ধরে, এমত অর্শরোগীরও মৃত্যু নিকট।

চিকিৎসা।

১। অর্শরোগের উৎপত্তির কারণ, ব্যাধিবোধক লক্ষণ, সংপ্রাপ্তি লক্ষণ এবং সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ সমস্তই কথিত হইল, এক্ষণে অর্শরোগের সামান্যতঃ একটু চিকিৎসার কথা কহিতেছি। পূর্ব্বেই কহিয়াছি, অর্শ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি। সে জন্য ভাবিব্যাধিবোধক লক্ষণ দৃষ্ট হইলেই, যাহাতে রোগ প্রকাশ না পায়, তাহার চেষ্টা করা এবং তৎপ্রতিশেধক দ্রব্যাদি এবং রোগ প্রকাশ পাইলেই নিদান পরিবর্ত্তন একান্ত কর্ত্তব্য অর্থাৎ অর্শ হইবার পূর্ব্বে যে যে উপদ্রব প্রকাশ

পায়, সেই সেই লক্ষণ পাইলেই যাহাতে সে গুলির নিবৃত্তি হইয়া রোগোৎপন্ন না হয়, তাহার চেষ্টা প্রথম হইতেই করা কর্ত্তব্য এবং রোগ যদি লক্ষণসহ প্রকাশ পাইয়া থাকে, বিভিন্ন লক্ষণ ধরিয়া কোন দোষপ্রবল অর্শ হইয়াছে স্থির করিয়া যে যে কারণে সেই অর্শ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব, সেই সেই কারণগুলিকে বর্জ্জন করিবে। অর্থাৎ যে দ্রব্য সেবনে (আহারবিহার, পানভোজন, দেশকাল প্রভৃতি) ঐ রোগ হইবার কথা উপরে কহিয়াছি, সেই সকল দ্রব্য ত্যাগ করিবে।

২। যে সকল দ্রব্য ব্যবহারে বায়ু অনুলোম হয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি করে, সেই প্রকারের দ্রব্য ভোজনাদি করিবে।

পরামান্ন শালি, আশু ধান্য প্রভৃতি দেশী তণ্ডুলের অন্ন, গমের আটা এবং যবের আটা, ঘৃত ছাগীদুগ্ধ, পল্‌তার ঝোল. নিমঝোল, মাংসের ঝোল, ওল ও বেগুন, মুলোর তরকারীর সহিত ভোজন অর্শরোগের সুপথ্য। নটেশাক, পুঁই-শাক, বেতোশাক কিম্বা মলমূত্র ও অধোবায়ু নিঃসারক অগ্নি দীপ্তিকারক অন্যান্য দ্রব্যের সহিত উপরোক্ত অন্ন ভোজন করান কর্ত্তব্য। অনেকে তাহাদের ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ অর্শ মাত্রেই সারক দ্রব্য নিরন্তর ব্যবহার করিয়া মল পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা করেন, কোন কোন অর্শে কিন্তু স্বভাবতই মল তরল হইয়া থাকে, এবং ক্রমশঃ ঐরূপ সারক ঔষধাদির ব্যবহারে অচিরে রোগীর মলভঙ্গ হইয়া অর্শের সহিত অতিসার রোগ উপস্থিত হয়, এমন স্থলে রোগীকে বাতাতিসা-রোক্ত ঔষধ ব্যবহার করান কর্ত্তব্য।

৩। তক্র অর্থাৎ ঘোল অর্শরোগের একটি মহৌষধ ইহা সেবনে বায়ু অনুলোম হয়, বদ্ধ মল পেটে থাকিতে পায় না, পেট ঠাণ্ডা রাখে, সে কারণে উদরাময়ও আসে না। অথচ অগ্নিবৃদ্ধি হওয়ায় রোগীর বল-বর্ণ উজ্জ্বল থাকে। ঘোল খাওয়ায় রসবাহীস্রোত (শিরা) সকল বিশুদ্ধ হইয়া সর্ব্বদেহে রসের গতি অব্যা-হতভাবে হইতে থাকে।

৪। বায়ুকর্ত্তৃক উদরাধ্মান ও মলবদ্ধ থাকিলে হরীতকী একটা সমস্ত দিন গোমুত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া রাত্রে শিলায় পেষণ করিয়া সৈন্ধবলবণ ও গুড়সহ ২৷৩ দিন অন্তর খাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

৫। ওল অর্শের একটি ঔষধ। বুনো ওল একটা মাটির লেপ দিয়া দগ্ধ করিয়া (পুটপাক করিয়া লইবেন, যেন ভিতরের শাস কাঁচা থাকে উপরটা পোড়া পোড়া হইবে মাত্র) লইয়া ধৌত করতঃ ভিতরের শাস ৫ এক কাঁচ্চা

হইতে ১০ অর্দ্ধছটাক মাত্রায় গ্রহণ করতঃ উহার সহিত কিঞ্চিৎ তৈল ও লবণ মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে অর্শ নিবৃত্তি হয়। ওল যদি মুখে লাগে তবে উহা শীলায় পেষণ করিয়া বড় বড় গুলি পাকাইয়া গিলিয়া খাইলেও চলিবে।

৬। যে অর্শে অধিক রক্তস্রাব হয় এবং পিত্তাধিক্য থাকে ও তজ্জন্য মলদ্বারে জ্বালা থাকে, তাহাতে খোসাবাদ (ঘষা) কৃষ্ণতিল ১ তোলা হইতে দুই তোলা, ছাগীদুগ্ধে পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ চিনিসহ ঐ দুগ্ধে গুলিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

৭। পুরাতন গুড়ও সকল প্রকার অর্শে উপকারী, একটু শুঁঠ চূর্ণ একত্রে মিশাইয়া ৷৷০ আধতোলা পুরাতন গুড়ের (ইক্ষুগুড়) সহিত নিত্য ব্যবহার করিলে সকল প্রকার অর্শে উপকার দর্শে।

বকুলকুমারী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, বি, এল,

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিচ্ছেদের উপর বিচ্ছেদ।

যে রাত্রে রামজীবন বাবুর বৈঠকখানার পার্শ্বগৃহে পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনা, তাহার পর-দিন রাত্রি প্রায় দশটার সময় আহারাদি করিয়া মাখনবাবু বকুলকুমারীর বাড়ীর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। একজন দাসী সেই সমাচার অন্তঃপুরে লইয়া গেল। প্রায় আধঘণ্টা পরে মাখনলাল শয়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় সেই দাসী আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। দাসী চলিয়া যাইবার পর তিনি সেই পত্রখানি পাঠ করিলেন। পত্রে লেখা ছিল :—

"মাখনবাবু!

অনেক দিন তোমারে দেখি নাই, অদ্য একবার দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে,

কোন বিশেষ কার্য্য না থাকিলে এই সময় একবার আমারে দর্শন দিলে বাধিত হইব। ইতি

দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী—

শ্রীমতী বকুলকুমারী।"

হঠাৎ মাখনলালের ভাবান্তর। পত্রখানি হাতে করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এ পত্রের ভাব কি? অকস্মাৎ কি অভিপ্রায়ে আহ্বান? অনুকূল কি প্রতিকূল? যাহাই হউক, ভাগ্যে যাহাই থাকুক, একবার যাওয়া উচিত; মনে মনে অনেক আন্দোলনের পর স্থির করিলেন একবার দেখা করা আবশ্যক।

এইরূপ যুক্তি করিয়া, বসন পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক এসেন্স মাখিয়া, ক্ষুদ্র একগাছি, যষ্ঠি হস্তে মাখনলাল মন্থরগতিতে অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন।

অভ্যাসমত কেশবিন্যাস করিয়া বকুলকুমারী শয়নকক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, একটী গবাক্ষের দিকে মুখ ছিল, গৃহদ্বারে পদশব্দ শ্রবণ করিয়া চঞ্চলচক্ষে সেই দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, আকাঙ্ক্ষিত মূর্ত্তি। অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাস্য আনয়ন করিয়া, গৌরবিণী বলিলেন, "এসো! আজ যে দেখ্‌চি, দিব্য শান্তমূর্ত্তি! দিব্য পরিবর্ত্তন! বোসো।"

একধারে দুইখানি চেয়ার ছিল, দুইজনে দুই চেয়ারে বসিলেন। ঘনিষ্ঠভাবের কোন কথা উত্থাপন না করিয়াই, বকুলকুমারী বলিলেন, "সব আমি শুন্‌তে পাচ্চি। শোনা কথা শোনাবো বোলেই আজ তোমাকে ডেকেছি। মনের মতন বন্ধু মিলেছে, দয়ালু মুরুব্বির জোরে ভাল একটী চাকরী জুটেছে, তবে আর কেন আমার গলগ্রহ হোয়ে থাকা? পরীক্ষা কোরে কোরে আমি বেশ বুঝেছি, আমাকে তোমার ভাল লাগে না; যারে ভাল লাগে না, তার সংসর্গে সদাই অসুখ, মিষ্ট রসও তিক্ত লাগে। নীরোগ শরীরে তিক্ত সেবনের প্রয়োজন রাখে না। তুমি তফাৎ হও; হোয়েই তো আছ এখন আবার ভিন্ন কুঞ্জে নিশাযাপন হোলো! নূতন কুঁঞ্জে তুমি এখন নূতন আদরযত্নে রয়েছ; গতরাত্রে সে বাটিতে নিশাযাপন হয়েছে, গরহাজির দেখে তাও আমি বুঝে নিয়েছি; তবে আর কেনো? তফাৎ হও। আমি সুশিক্ষিতা হোলে আমি তোমাকে ডাইভোর্শ কোত্তেম,—আমাদের দেশের কুৎসিত সমাজে সে পদ্ধতি নাই, তুমি অম্‌নি অম্‌নি আলোয় আলোয় মানে মানে বিদায় পাও। তোমার সন্ধানে সন্ধানে আমার গুপ্তচর আছে, চরমুখে আমি সংবাদ পেয়েছি, প্রত্যক্ষেও আজ

দেখ্‌তে পাচ্ছি, তুমি নেশা ছেড়েছ। সুখের বিষয়; এইবার তোমার ভূত ছাড়্‌বে। তোমার সঙ্গে দেখা হয় না, তাতে আমার কষ্ট নাই; যেখানে তুমি সুখে থাকো, সেইখানেই থাক্‌তে পারো। আমার ভাগ্যে যা ছিল, তা হয়েছে, আর যা কিছু বাকী আছে, তাই হবে। তুমি সুখে থাক্‌লেই আমি সব কষ্টই ভুলে যাবো। আর দেখো, এখন তুমি চাক্‌রী পেয়েছ, তবে আর মাসে মাসে আমার কুড়িটী টাকা দণ্ড লাগাও কেন? এ কুড়ি টাকা আর তুমি পাবে না। এখন তবে বিদায় হোতে পারো; রাত্রি বেড়ে উঠচে, বিদায় হও। সেলাম!

সেলাম দিয়াই আসন হইতে উঠিয়া, তেজস্বিনী কামিনী পর্য্যঙ্কোপরি আরোহণ করিলেন। দ্বিরুক্তি না করিয়া লাঞ্ছনাদলিত ঘরজামাইবাবু নতবদনে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পরক্ষণেই ঝঞ্ঝনশব্দে গৃহদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল।

বিচ্ছেদ তো হইয়াই ছিল, এই রাত্রে অষ্টাঙ্গপূর্ণ পাকাপাকি। বিচ্ছেদের উপর বিচ্ছেদ!

———o:*:o———

বৈষ্ণবধর্ম্মের সূক্ষ্ম-তত্ত্ব।

লেখক,—ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মৌলিক নীতির তুলনায় সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে, উভয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায় একমাত্র পরমেশ্বর-উপাসক, ইহার ভাবার্থ এই যে, শাক্ত, শৈব, গানপত্যাদি যতগুলি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে কোনও সম্প্রদায় একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসক নহেন, পরন্তু তাঁহারা কোন না কোন একটী প্রাকৃতিক দেবতা বা উচ্চজীবের আরাধনার অনুগত আছেন, সুতরাং শাস্ত্র অনুসারে ইহাদের প্রাকৃতিক বা দৈহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবেই হইবে। আমার এই প্রকার সমালোচনায় অনেকে মনে করিতে

পারেন যে, কালী, দুর্গা, শিবাদি দেবতাদিগকে পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া যে অনুরাগী ভক্তগণ পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দৈহিক বা প্রাকৃতিক বন্ধনে পতিত হইতে হইবে না, এই যুক্তি সুসঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না। কেননা, অবস্তুকে বস্তু জ্ঞান করা বা এক বস্তুকে অপর বস্তু বলিয়া প্রতীতি বা আরোপ করা অজ্ঞানতা বা মায়ার কার্য্য। পুনরায় প্রশ্ন উত্থাপন হইতেছে যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় পরিণামবাদী অর্থাৎ এই উপাসক-সম্প্রদায় ব্যাসদেবপ্রণীত প্রাচীন বেদান্তবাক্য স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই বেদান্তবাক্য অনুসারে সমগ্র বৈষ্ণব এবং অন্যান্য হিন্দুসম্প্রদায় স্বীকার করেন যে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে স্থাবর-জঙ্গমাদিক্রমে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই শ্রীভগবানের পরিণতি। এই বিচারে কালী, দুর্গা, শিবাদি কেন, জগতের প্রত্যেক বস্তুকে শ্রীভগবান্ বলিয়া পূজা করিলে দোষ কি? ইহাতে অনেক দোষ; মনে করুন,—দুগ্ধ একটী পরিণামী পদার্থ। এই দুগ্ধ, দধি, মাখন, ঘৃত, ছানা, ঘোল, সর, ক্ষীর, পনির, সন্দেশ, রসগোল্লা ইত্যাদি নানাবিধরূপে পরিণত হইতেছে। এই স্থানে দুগ্ধ—শ্রীভগবান্ স্থানীয় পরিণামী, আর দধি, মাখন, ছানা আদি দেবতা ও জীবাদি বস্তুর তারতম্য, গুণকর্ম্মের দ্বারা বুঝিতে গেলে, অভ্রান্তরূপে বুঝা যাইবে যে, পরিণাম কখন পরিণামী হইতে পারে না অর্থাৎ দুগ্ধ, দধি, মাখন ছানাদিরূপে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু দধি, মাখন ছানাদি কখন দুগ্ধরূপে পরিণত হইতে পারে না, ইহার ভাবার্থ এই যে, শ্রীভগবান্ জগৎরূপে পরিণত হইতে পারেন, তাই বলিয়া জাগতিক সামান্য কীটাণু বা পরমাণু হইতে, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর স্থাবর জঙ্গমাদি এবং দেবতারূপ কখন শ্রীভগবদ্রূপে পরিণত হইতে পারেন না, সুতরাং সামান্য তৃণ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরাদি গুণময় দেবতা পর্য্যন্ত সমগ্র সৃষ্টির কোন পদার্থ শ্রীভগবদ্রূপে পরিণত হইতে পারে না, সুতরাং তাহারা কখন শ্রীভগবানের স্থানীয় হইতে পারে না; অধিকন্তু সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরা শ্রীভগবান্‌কে বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী অসীম অনন্ত বলিয়া এবং স্থান ও কালে কখন তিনি আবদ্ধ নহেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; আর জীবকে সান্ত অর্থাৎ সসীম স্থান এবং কালে আবদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন. এই বিচারেও ব্রহ্মলোক-বাসী ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠ-বাসী নারায়ণ, কৈলাস-পর্ব্বতবাসী মহাদেবকে কখনও শ্রীভগবান্ বলিয়া আখ্যাত করা যায় না। এইক্ষণে গৌড়ীয়

বৈষ্ণবদিগের এই প্রকার পরিণাম-বাদের অবতারণা করায়, নবীন বৈদান্তিক-দল অর্থাৎ শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী মায়াবাদীগণ মায়া, মোহ বা অজ্ঞানতায় জড়ীভূত হইয়া এক আশঙ্কা করেন যে, শ্রীভগবান্ পরিণামী হইলে তিনি প্রাকৃতিক সৃষ্ট পদার্থের ন্যায় বিকারী হইয়া পড়েন। কেননা নবীন বৈদান্তিগণ এই পরিণামী শব্দ বিশেষ বিকৃত অর্থে প্রয়োগ করেন, তাঁহাদের মতে স্বর্ণখণ্ড যদি স্বর্ণবলয়রূপে পরিণত হয়, তবে এই নবীন বৈদান্তিগণ শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের দোহাই দিয়া চীৎকার করিয়া বলিবেন যে, ইহাতেও স্বর্ণের বিকার হইল। সুতরাং এই নবীন মায়াবাদীদিগকে যুক্তি প্রমাণ দ্বারা "পরিণাম বাদে ঈশ্বরের বিকার হয় না" তাহা বুঝান যায় না। তবে যদি তাঁহারা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে এই বিষয়টা বুঝিতে চাহেন, তবে তাঁহারা বুঝেন যে, বিজ্ঞান অনুসারে পরিণাম দুই প্রকার,—একটী বিরুদ্ধ পরিণাম, অপরটী স্বরূপ পরিণাম। ভগবত্তত্ত্ব-বিচারে প্রকৃতি শ্রীভগবানের বিরুদ্ধ পরিণাম, জীব শ্রীভগবানের স্বরূপ পরিণাম; এই দুই প্রকার পরিণামে শ্রীভগবানের কোন প্রকার বিকার হয় না, তাহা একটী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্তদ্বারা অনায়াসে বুঝা যায়। এই কলিকাতা সহরে তড়িৎ-শক্তি দ্বারা ট্রামগাড়ী চলিতেছে, পাখা ঘুরিতেছে, বাটীতে আলো জ্বলিতেছে, ট্রাম চলিবার তড়িৎপ্রবাহী তার কাটিয়া রাস্তায় পড়িয়া গেলে ঐ তার সংস্পর্শমাত্র মনুষ্য, ঘোড়া, গরু, ইত্যাদি জীব তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। এই প্রভূত কার্য্যকারী শক্তিশালিনী তড়িৎ কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? ইহা বিচার করিয়া বুঝিতে গেলে বুঝা যায় যে, কয়েকটী চুম্বক সমাবেশ করিয়া ডাইন্যামো নামক যন্ত্র হইতে এই প্রকার তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হইতেছে, অর্থাৎ চুম্বকের শক্তি তাড়িৎরূপে পরিণত হইতেছে। ইহা চুম্বক শক্তির বিরুদ্ধ পরিণতি, তড়িৎ এবং চুম্বক এই উভয়ের গুণ কর্ম্ম এবং স্বভাব, এক অপর হইতে বিভিন্ন। তড়িৎ-প্রবাহ কাচ, রবার, ইবনাইট ইত্যাদি অপরিচালক (non-conductor) পদার্থের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে পারে না, চুম্বকশক্তি সমস্ত পদার্থের মধ্য দিয়া পরিচালিত হয়। প্রভূত শক্তিসম্পন্ন তড়িৎ স্পর্শ মাত্রেই জীবের মৃত্যু হয়, প্রভূত শক্তিসম্পন্ন চুম্বকে জীবশরীরের কোন অনিষ্ট হয় না, এমন কি জীবশরীরে ইহার কোন প্রকার অনুভূতি পর্য্যন্ত হয় না। ইহা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি যে, পরিণামী অর্থাৎ যাহা হইতে পরিণাম উৎপন্ন হয়, তাহা সর্ব্বস্থানে পরিণামী বা পরিণত পদার্থের তুলনায় একই প্রকার গুণ, কর্ম্ম

এবং স্বভাবযুক্ত হয় না। দ্বিতীয়তঃ পরিণামী পরিণাম হইলেই যে, সর্ব্বস্থানে তাহার বিকার হইবেই হইবে, তাহাও নহে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ উপরোক্ত প্রভূত শক্তিশালী তড়িত উৎপাদক ডাইন্যামো নামক চুম্বকযন্ত্রস্থ চুম্বকগুলি পরীক্ষা করিলে অভ্রান্তভাবে বুঝা যায় যে, চুম্বকের শক্তি তাড়িৎরূপে যতই পরিণত হউক না কেন, চুম্বকের কখন কোন প্রকার বিকার বা চুম্বক শক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, যদি কার্য্যস্থানীয় সামান্য প্রাকৃতিক পদার্থে এই প্রকার নিজে বিকৃতি না হইয়া বিরুদ্ধ পরিণামরূপ অচিন্ত্যশক্তি বর্ত্তমান থাকিতে পারে, তবে সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীভগবানের এই প্রকার নিজে বিকৃত না হইয়া, বিরুদ্ধ পরিণামরূপ অবিচিন্ত্য শক্তি নাই, এই প্রকার সন্দেহ কখন গ্রাহ্য হইতে পারে না। অতএব শ্রীভগবানের বিরুদ্ধ পরিণতি শক্তি, বহিরঙ্গ শক্তি প্রকৃতি বা মায়ারূপে পরিণত হওয়াতে তাহার কোন প্রকার বিকার হয় নাই বা হয় না, ইহা বিজ্ঞান এবং যুক্তিসঙ্গত। এক্ষণে স্বরূপ পরিণতির দৃষ্টান্তের কথা,—একখণ্ড চুম্বক-লোহ যত সংখ্যক লোহখণ্ড সংঘর্ষণ করা যায়, মৌলিক চুম্বকের কিম্বা তাহার চুম্বকীয় শক্তির কিছুমাত্র হ্রাস না হইয়া এই চুম্বকীয় শক্তি পরিণত হইয়া, ততখণ্ড স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চুম্বক উৎপন্ন হয়, তবে মূল চুম্বক হইতে তদুৎপন্ন চুম্বক সকল শক্তিতে কিছু কম হইয়া থাকে,আবার উৎপন্ন চুম্বকখণ্ড সকলের মধ্যে উহাদের উপাদানভূত লৌহখণ্ড সকলের শুদ্ধি অশুদ্ধি অনুসারে কোমল বা soft এবং কঠিন বা hard অর্থাৎ উহাদের পাইনের তারতম্যানুসারে এই উৎপন্ন চুম্বক সকলের মধ্যে এক অপরের তুলনায় শক্তিতে কমবেশী হয়। এক্ষণে এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি যে, যদি প্রাকৃত পদার্থ চুম্বক নিজে বিকৃত না হইয়া তাহার শক্তি পরিণত হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হীনশক্তিসম্পন্ন চুম্বক উৎপন্ন করিতে পারে, তবে সর্ব্বশক্তিমান্ অসীম সচ্চিদানন্দবিগ্রহস্বরূপ শ্রীভগবান, নিজে বিকৃত না হইয়া তাঁহার তটস্থাখ্য জীবশক্তি পরিণত হইয়া সসীম সচ্চিদানন্দস্বরূপ এক অপর হইতে বিভিন্ন প্রকৃতিযুক্ত অসংখ্য জীবরূপে পরিণত হইতে পারিবে না, এই প্রকার সংশয় কখনও হইতে পারে না। অতএব মায়াবাদীদিগের কল্পিত বিবর্ত্তবাদ স্থাপন না করিয়াও পরিণামবাদে ঈশ্বরের অধিকারী হইবার আশঙ্কা নাই।

অস্ত্রার্থী অর্জ্জুন।

লেখক,—নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দ্বৈতাপুরী।

একটি কক্ষ।

যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন।

যুধিষ্ঠির। শুন হে ফাল্গুনি, যাজ্ঞসেনী—
এলাইত বেণী বৈর-নির্য্যাতন-ব্রতে,
দিবস-শর্ব্বরী অপমান সহি,
ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হৃদে,
ভোজনে বা শয়নে স্বপনে
প্রতিহিংসা বিনা নাহিক কামনা আর।
বীর বৃকোদর, রোষানলে দহে নিরন্তর,—
কৌরব-গৌরব নাশ আশ।
সহদেব, নকুল সুধীর—
সতত অধীর প্রতিহিংসা-ঋণ শোধ হেতু।
তুমি মতিমান,—
ধৈর্য্যচ্যুত—অশান্ত নিয়ত—
নিষ্ঠুর রিপুর ব্যবহারে।
চিত্ত মম আকুল এ সব ভাবি।

অর্জ্জু। সত্য হে মহারাজ,
শেলসম অপমান বেজে আছে বুকে।

যুধি। এই হেতু সদা মম অন্তর বিকল।
নিত্য মোরে কহে বৃকোদর—
রণসাজে সাজিতে সত্বর,
কৌরবের দর্প খর্ব্ব হেতু।

অর্জ্জু। কিবা আজ্ঞা কহ তব পাণ্ডবপ্রবর!

যুধি। পূর্ব্বাপর বিচার উচিত—
দুঃসাহসে অনুতাপ ফল।
অর্জ্জু। দেব, অপমান হতে মৃত্যু শ্রেয়ঃ।
যুধি। সত্য মহাবাহু!
পাণ্ডবের বীর্য্য নহে অপ্রকাশ ভবে—
রাজসূয়কালে, ভূপতিমণ্ডলে,
নতশির পাণ্ডব-বিক্রমে;
কিন্তু শুন রিপুহর,
কৌরব ঈশ্বর—
করগত করিয়াছে ধরা।
পরাজিত নৃপতি সকল—
করদান করেছিল ডরে;
ঈর্ষা-নেত্রে হেরিল গৌরব পাণ্ডবের।
জরাসন্ধ বধ, শিশুপাল শিরশ্ছেদ,
মহা সভামাঝে—
বেজে আছে বিরোধী হৃদয়ে।
হীনমতিগণে, কৃষ্ণে নাহি জানে,—
গোপ-অন্নে পালিত ভাবিয়ে,
বংশ অভিমানে হীনজ্ঞান করে নারায়ণে;
পূজা তাঁর রাজসূয়ে করি দরশন,
অপমানে রোষ হুতাশন—
শতগুণে হ'ল প্রজ্জ্বলিত।
দুষ্টগণ কৌরব-সহায় এবে।
অর্জ্জু। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরকালে—
বৃকোদর সনে,
বুঝিয়াছি সবার বিক্রম মহারাজ।
যুধি। সত্য;—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা রথী—
কৌরব আশ্রিত সবে।
মহাঅস্ত্র যত—করগত সবাকার।

দুর্য্যোধন শত ভাই, অস্ত্র-বিশারদ ;
বিন্দ, অনুবিন্দু, ভুরিশ্রবা, জরাসন্ধ,
মহাতুষ্ট কৌরব সম্মানে।
মহাঅস্ত্র যত ভুবন-সংহারকারী—
করগত বিপক্ষ শ্রেণীর।
যুক্তিমত কর এবে উপায় ইহার।
শত্রু-বিনাশন-পণ,—প্রাণ বিসর্জ্জন—
উচিত বিধান এবে,
রিপুক্ষয় উপায় কি করিয়াছ স্থির ?

অর্জ্জু। তব আজ্ঞা বহি আর্য্য,—
কার্য্য মম আদেশ অধীন।
হে ধার্ম্মিক-প্রবীণ, কহ, যদি থাকে হে উপায়।

যুধি। তুমি রথী উপায় কেবল।

অর্জ্জু। কি কার্য্য সাধিবে দাস,—কহ মহাযশা!

যুধি। মহামুনি ব্যাসের প্রসাদে,
মহামন্ত্র বলে—
মূর্ত্তিমতী সিদ্ধি মম কৃপায় অধীনা।
মন্ত্রসনে তোমারে করিব দান ;—
যাহে বীর্য্যবান ;—
হিমাচলে দেবেন্দ্রের পাবে দরশন।
অস্ত্রদীক্ষা মাগিবে চরণে ;—
যে প্রভাবে মহাহবে কৌরবে নাশিবে।
লহ মন্ত্র,—কহি কর্ণমূলে।

অর্জ্জু। মহাভাগ,
উদ্ভাসিত বিশ্ব, চক্ষে, মন্ত্রের প্রভাবে,
হে আর্য্য—হে পাণ্ডব প্রধান,
ধর্ম্মময় ধর্ম্ম অধিষ্ঠান—
অতুল ঐশ্বর্য্যদান করিলে কিঙ্করে—

তব বরে দুষ্কর কি ভবে?
মূর্ত্তিমান মন্ত্র কহে অন্তরে আমার—
কার্য্যসিদ্ধি অনায়াসে হবে।

যুধি। শুভদিন প্রতীক্ষায় রহ রথীর্ষভ!
চল যাই ভীমের সদন।

অর্জ্জু। শ্রীমুখের আজ্ঞা তব সর্ব্বশুভকরী।

(সকলের প্রস্থান।)

বিধাতার নাকাল।

(১)

এক দেশে এক রাজা ছিলেন, অনেক বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তানসন্ততি জন্মে নাই, অনেক জাগযজ্ঞ করিবার পর শেষ দশায় একটী পুত্র হয়। হিন্দুর প্রথা আছে, জন্মের পর ষষ্ঠরজনীতে ষেঠেরাপূজা হইয়া থাকে। বিধাতা সেই রাত্রে প্রসূত সন্তানের কপালে জীবনের কার্য্যফল লিখিয়া দিয়া যান। সেই রাজার পিতার আমলের একজন বৃদ্ধ সরকার ছিল, জাতি কায়স্থ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন। নবকুমারের ষেঠেরা পূজার রাত্রে সেই সরকারটি সূতিকাগারের দ্বারদেশে লম্বা হইয়া শয়ন করিয়া রহিল, অধিক রাত্রে বিধাতাপুরুষ আসিলেন, আসিয়াই দেখিলেন, দ্বারে একটা মানুষ পড়িয়া আছে, ভাবিলেন, উহাকে কিরূপে লঙ্ঘন করিয়া যান। মিষ্টবচনে লোকটিকে বলিলেন, "একটু সরো হে, আমি বিধাতাপুরুষ; সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিব। জীব লঙ্ঘন করিতে নাই, পথ ছাড়িয়া দাও।"

সরকার কথা কহিল না, পরন্তু একটু নড়িলও না। ক্রমে উষাকাল আসিল, বিধাতাপুরুষ ব্যস্ত হইলেন, ব্যগ্রস্বরে সরকারকে কহিলেন, "আর রাত নাই, ভিতরে যাইব—পথ ছাড়।"

সরকার তখন বলিল, "শিশুর কপালে যাহা তুমি লিখিবে, তাহা যদি আমাকে বলিয়া যাও, তবে আমি পথ ছাড়ি।" বিধাতাপুরুষ অগত্যা সম্মত হইলেন, ভিতরে গিয়া যাহা লিখিবার তাহা লিখিলেন, বাহির হইবার সময় সরকারকে বলিয়া গেলেন, "ষোড়শবর্ষ বয়সে এই পুত্র বনবাসী হইবে, গৃহে আর আসিবে না

প্রতিদিন বনে এক একটী হরিণ মারিয়া দিন গুজরাণ করিবে।"

দুই বৎসর পরে সেই রাজার একটী কন্যা জন্মিল, সেই কন্যার ষেঠেরা-পূজার রাত্রেও সেই সরকার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিধাতার মুখে বালিকার ভাগ্য-লিপি শুনিল, বিধাতাপুরুষ বলিয়া গেলেন, "চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে কুমারী-অবস্থায় এই কন্যা গৃহত্যাগিনী হইয়া মানবের শুভাশুভ নিরূপিণী বিদুষী দৈবাজ্ঞা হইবে, প্রতিদিন যাহা কিছু পারিশ্রমিক পাইবে, তাহাই খরচ করিয়া আহার করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে।"

(২)

চতুর্দ্দশ বর্ষ অতীত হইল। রাজপুত্রের বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষ, রাজকন্যার বয়ঃ-ক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ। এই সময় বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইল, রাণী সহমৃতা হইলেন। নাবালক রাজপুত্র তখন সেই রাজসংসারের কর্ত্তা হইলেন।

নাবালকের হস্তে জমীদারির ভার, বৈরীপক্ষের উত্তম সুবিধা। অদূরস্থ নগরবাসী একজন প্রতিযোগী জমীদার ঐ রাজপুত্রের জন্মের পূর্ব্বাবধি ঐ জমী-দারির প্রতি লোভদৃষ্টি ঘূর্ণন করিতেছিলেন, বৃদ্ধ রাজার সহিত তাঁহার সখ্যভাব ছিল না; কিন্তু উক্ত বৃদ্ধ রাজা একজন বিখ্যাত সুশ্রী পুরুষ ছিলেন; প্রজা-রঞ্জন জমীদার বলিয়া রাজ্যের প্রজামণ্ডলী তাঁহার আজ্ঞাবহ ছিল। সুতরাং প্রতি-যোগী জমীদার দ্বন্দ্ব করিবার অবকাশ পান নাই, সাহসও করেন নাই। এই সময় রাজার মৃত্যুতে নানা বিশৃঙ্খল ঘটিল। অর্দ্ধেক কর্ম্মচারী চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া গেল, মন্ত্রীগণের মধ্যেও বিরোধ ঘটিতে লাগিল; প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা সেই অবসরে নানা কৌশল করিয়া রাজ্য আক্রমণ করিলেন, দ্বন্দ্বে তাঁহার জয়লাভ হইল, জমীদারিটি তিনি অধিকার করিলেন, সব দিক ফর্সা হইয়া গেল। রাজ-পুত্র ও রাজকন্যা কোথায় পলায়ন করিল, কেহই জানিল না।

(৩)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রাজপুত্রের বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষ, রাজকন্যার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশবর্ষ। এই বয়সে তাঁহারা নির্ব্বাসিত।

এই ঘটনার পর দুই বৎসর অতীত। রাজপুত্র অষ্টাদশ বর্ষীয়, রাজকন্যা ষোড়শী। যে সরকারটি সূতিকাগারের দ্বারের বাহিরে বিধাতাপুরুষকে বাক্য-বন্দী করিয়া শিশুদের ভাগ্যলিপির নির্ঘণ্ট জানিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার কৌতুহল বাড়িল, কৌতূহলের সঙ্গে উদ্বেগও বাড়িল। বহু অন্বেষণ করিয়া সেই সরকার এক

দিন এক বন মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজপুত্র সেই বনে একটি কুটির বাঁধিয়া বাস করিতেছিলেন। সরকার তাঁহার নিকটে গিয়া নমস্কার করিয়া সজলনয়নে বলিল, "রাজকুমার! আজ আমি তোমার অতিথি।"

সরকারের মুখ পানে চাহিয়া সবিস্ময়ে রাজপুত্র বলিলেন, "তুমি আমায় রাজ-পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছ, কে তুমি?" সরকার উত্তর করিল, "আমি তোমার চাকর। স্বর্গীয় মহারাজ আমাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন, যথেষ্ট বিশ্বাস করিতেন, মহা দুর্দ্দৈব ঘটনায় এখন আমি আশ্রয়শূন্য। বহুদিন রাজসংসারে চাকরী করিয়া এখন আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, চাকরী হারাইয়াছি, তোমরা দেশত্যাগী হইয়াছ, দুই বৎসর কাল আমি কতস্থানে তোমার অন্বেষণ করিয়াছি, দৈবযোগে আজ এই বনে দেখিতে পাইলাম।"

দয়াশীল প্রভু হারাইয়া, বৃদ্ধাবস্থায় কাজকর্ম্মে অক্ষম হইয়া, নানা দুর্ভাবনায় সরকারের চেহারা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, সেই জন্য রাজপুত্র তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। পরিচয় পাইয়া চিনিলেন; কাতর হইয়া বলিলেন, "আমার কুটিরে তুমি অতিথি হইতে আসিয়াছ, তোমাকে আশ্রয় দেওয়া অবশ্য আমার উচিত; কিন্তু দেখিতে পাইতেছ, আমার বড় দুরবস্থা, নিজের আহারের সংস্থান নাই, নিত্য বনে বনে ঘুরিয়া এক একটী হরিণছানা ধরি, এ অঞ্চলে মৃগমাংস অত্যন্ত সস্তা, এখানকার বাজারে হরিণছানা বিক্রয় করিয়া যৎসামান্য মূল্য পাই, তাহাতেই যোগেজাগে দিন চলে, তোমাকে আমি কি খাওয়াইব।"

সরকার বলিল, "আমাকে একটু আশ্রয় দাও, আমি দিনকতক তোমার কুটিরে থাকিব; আমাকে খাওয়াইতে হইবে না, আমার কিঞ্চিৎ সম্বল সঙ্গে আছে, তাহাতেই আমার উদরপোষণ হইতে পারিবে।"

রাজপুত্র সম্মত হইলেন, সরকার সে দিন সেই খানেই থাকিল। পরদিন প্রভাতে রাজপুত্র যখন জালদড়ি লইয়া মৃগশীকারে বাহির হন, ব্যাগ্রতা সহকারে সরকার তখন বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

রাজপুত্র বলিলেন, "তুমি কোথায় যাবে? আমি অনেক দূর যাব। তুমি বৃদ্ধ, তত দূর চলিতে পারিবে না।"

সরকার সে কথা শুনিল না, রাজপুত্রের সঙ্গে সঙ্গে চলিল, খানিক দূর গিয়া বসিয়া পড়িয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আর আমি চলিতে পারি না, এই খানেই তুমি জাল ফেল।"

রাজপুত্র বলিলেন, "এখানে হরিণ আসে না, তুমি বসিয়া থাক আমি দুর-বনে যাই।"

সরকার বলিল, "একা আমি থাকিতে পারিব না, বাঘে খাইয়া ফেলিবে, এই খানেই জাল ফেল, অবশ্য হরিণ আসিবে।"

রাজপুত্র বারকতক না, না করিয়া, অবশেষে সেইখানেই জাল পাতিলেন। সরকারের হাত ধরিয়া একটী বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই একটা হরিণ ছুটিয়া আসিয়া সেই জালে পড়িল; ছানা নয়, বড় হরিণ। রাজপুত্র আহ্লাদে জাল দড়ি গুটাইয়া শীকার লইয়া কুটিরে ফিরিলেন। পৌছিয়া সরকার বলিল, "হরিণ লইয়া বাজারে যাও, যত মূল্য পাইবে, তাহার অর্দ্ধেক সঞ্চয় কর, বাকি অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক এই বনের গরীব দুঃখীকে দান কর; অবশিষ্ট অংশ নিজের ভোজনে খরচ কর।"

রাজপুত্র তাহাই করিলেন। পরদিন শীকারে যাইবার সময় সরকার বলিল, "বনে যাইতে হইবে না, কুটীর সম্মুখেই জাল পাত, এইখানেই হরিণ আসিবে।"

রাজপুত্র সেই কথা শুনিলেন। সেই খানেই জাল পাতা হইল, একটা হরিণ আসিয়া বন্দী হইল, পূর্ব্বদিনের ন্যায় সঞ্চয়, দান ও শেষাংশ ভোজন হইল।

— ছয়মাস এইরূপ। কুটিরের সম্মুখে নিত্য নিত্য হরিণ আসিয়া ধরা দেয়, রাজপুত্র নিয়মমত ব্রতাচরণ করেন।

ছয়মাসে তাঁহার অনেকগুলি টাকা জমিল, বনমধ্যে তিনি একখানি বাড়ী করিলেন। হরিণ ধরিতে দুর বনে যাইতে হয় না, নিত্য নিত্য কুটীরেই হরিণ আসে, দুটি পাঁচটি অতিথিও উপস্থিত হয়—বেশ চলে। অর্থের আর অভাব রহিল না। দিন দিন সঞ্চিত অর্থ বাড়িতে লাগিল। রাজপুত্র সুখী হইলেন। দাস-দাসী নিযুক্ত হইল, সরকারও বিদায় হইলেন।

(৪)

রাজকন্যাটি কোথায়? বহু অনুসন্ধান করিয়া বহু দূরে ক্ষুদ্র একটি নগরে সরকার সেই রাজকন্যাকে দেখিতে পাইল। ছোট একখানি মাটির ঘরের দ্বার-দেশে একটি সুন্দরী কন্যা দাঁড়াইয়া ছিল। সুন্দরী, কিন্তু কৃশাঙ্গী, স্বর্ণবর্ণ বিমলিন মুখ বিশুষ্ক, পরিধান মলিন বসন।

সম্মুখে গিয়া পরিচয় দিয়া সরকার বলিল, "আমি অতিথি, দিন কতক এই-খানে থাকিব।"

কন্যা বলিলেন, "থাকিবে? এখানে আমি নিজে খাইতে পাই না। আমি মানবের ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ব্যক্ত করিয়া দিয়া তাহার পারিশ্রমিক স্বরূপ কোন দিন দুই আনা, কোন দিন চারি আনা, দৈবাৎ কোন দিন বা আট আনা উপার্জ্জন করি; যে দিন জোটে না, সে দিন উপবাস করিয়া থাকি। তুমি এখানে কেমন করিয়া থাকিবে?"

সরকার বলিল, "আমি নিজে খরচ করিয়া খাইব। তোমার উপার্জ্জন হয় কি না, তাহাই আমি দেখিব। তুমি এক কাজ কর; আজ অবধি এক টাকার কমে কাহারও জীবনের ভূতভবিষ্যৎ ব্যক্ত করিও না। সেই একটাকার অর্দ্ধেক জমাইবে, সিকি দান করিবে, সিকি খরচ করিয়া খাইবে।"

অতিথির কথা রক্ষা করিবার জন্য রাজকন্যা দৃঢ় সংকল্প করিলেন। বাহিরদিকে সেই ছোট ঘরের সংলগ্ন একখানা ক্ষুদ্র চালাঘর ছিল, সেই ঘরে সরকারের বাসা হইল।

রাজকন্যার দর্শনী হইল এক টাকা, দিন ফাঁক যায় না, নিত্য নিত্য এক এক টাকা সরকারের পরামর্শমত জমাখরচ। একমাস ঐরূপ। সরকার পুনরায় পরামর্শ দিল, দর্শনীর হার কর দুই টাকা। এক মাস তাহাই হইল; দিন ফাঁক যায় না। তৃতীয় মাসে দর্শনী হইল পাঁচ টাকা। চতুর্থ মাসে রাজকন্যার আর্থিক অবস্থা ফিরিল; ইতিপূর্ব্বে ক্রমাগত দারিদ্রতার চিন্তায় শরীর শুকাইয়া গিয়াছিল; নিত্য ভোগবিলাসে সেই শুষ্ক দেহ পরিপুষ্ট হইয়া আসিল। রাজকন্যার দেহে উজ্জ্বল কাঞ্চনবর্ণের আভা ফুটিল, সুন্দর সুন্দর অলঙ্কারবস্ত্র গাত্রে উঠিল এবং তাহার দৈবজ্ঞান-প্রভাবের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল, দেশ দেশান্তর হইতে রাজা, মহারাজা, জমীদার আপন আপন ভূতভবিষ্যৎ জানিবার জন্য আগমন করিতে লাগিলেন। সেই সময় দৈনিক দর্শনী হইল দশ টাকা। সরকার যাহা বলেন, রাজকন্যা তাহাই করেন। বয়স তখনও সপ্তদশ বর্ষ হয় নাই, অসামান্য রূপবতী যুবতী। ক্রমশঃ দর্শনীর হার বাড়িয়া বাড়িয়া এক শত টাকা পর্য্যন্ত হইল। দিব্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল, কিঙ্কর, কিঙ্করী, পাচিকা নিযুক্ত হইল। দ্বারে দ্বারপাল বসিল, বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলিল, প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী লোকেরা জীবনের ভবিষ্যৎফল জানিবার জন্য সে মন্দিরে গতিবিধি করিতে আরম্ভ করিলেন। সরকারের পরামর্শে ও উদ্‌যোগে রাজোপযুক্ত পাত্রের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ হইয়া গেল।

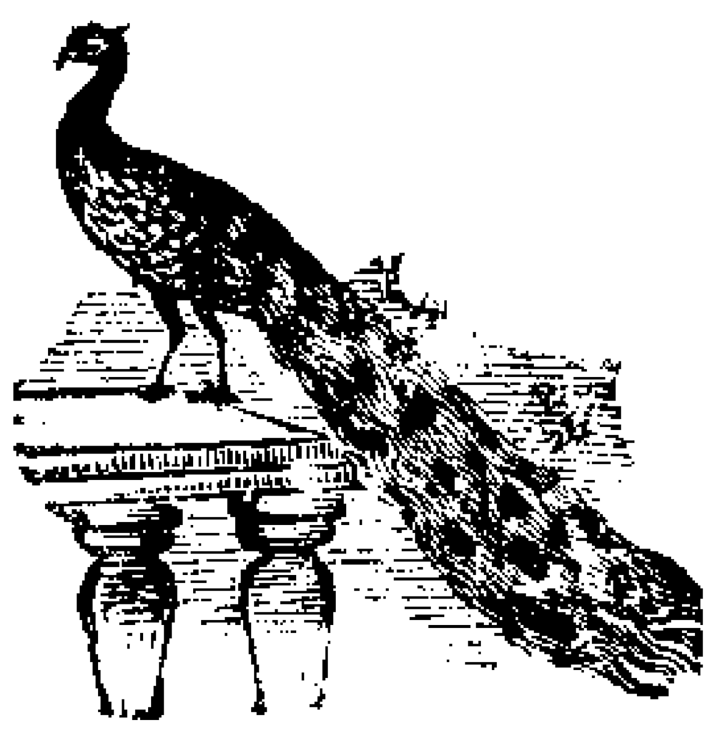
সরকার আর সেখানে রহিল না। একদিন ঊষাকালে উঠিয়া প্রচ্ছন্নভাবে

প্রস্থান করিল। নগর অতিক্রম করিয়া সে যখন পাঁচক্রোশ দূরস্থ এক পল্লীতে গিয়া পৌছিল, বেলা তখন দুই প্রহর অতীত। জ্যৈষ্ঠমাসের প্রখররৌদ্র পান্থ-লোকের গাত্রদগ্ধ করিতেছে। পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সরকার দেখিল, একটা দীর্ঘাকার লোক—রক্তবস্ত্র পরা, মস্তকে রক্তবর্ণ উষ্ণিস্, সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মধারা, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস, সেই প্রখর সূর্য্যকিরণে তপ্তাঙ্গ হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে; তাঁহার হাতে পঞ্জিকা, কটিদেশে বৃহৎ একটা টাকার তোড়া স্কন্ধদেশে দীর্ঘ শৃঙ্গযুক্ত একটা বৃহৎ হরিণ।

তাহাকে দেখিয়াই সরকার চিনিল,—সেই বিধাতাপুরুষ। নমস্কার করিয়া সরকার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর! আজ তোমার এ মূর্ত্তি কেন?"

বিধাতাপুরুষ বলিলেন, "তুমিই ত আমার এ দশা করিয়াছ! রাজরাণীর সূতিকাগারের দ্বার আটকাইয়া ছিলে, রাণীর পুত্রকন্যার কপালে যাহা লিখিয়া-ছিলাম, তাহা জানিয়া লইয়াছিলে, এখন আমাকে মুটেগিরী করিতে হইতেছে। রাজপুত্র এখন আর মৃগয়ায় যায় না, তাহার গৃহে নিত্য নিত্য আমায় হরিণ পৌছাইয়া দিতে হয়; রাজকন্যা এখন আর সামান্যা দৈবজ্ঞা নহে, যাঁহারা তাঁহার জীবনের ভূত-ভবিষ্যৎ গণনা করিতে যান, তাহাদের হস্তে আমাকে টাকা জমা দিয়া দিতে হয়; সেই দুই কার্য্যেই আমি ছুটিয়াছি।"

হাস্য করিয়া সরকার বলিল, "হাঁ ঠিক। ঠাকুর! ছয়দিনের দিন রাত্রে যার কপালে যা তুমি লেখ, আমার মত লোকে অগ্রে যদি তাহা জানিতে পারে, তাহা হইলে পদে পদে তোমার এই রকমে নাকাল করিতে পারা যায়।" ইহার নাম বিধাতার নাকাল।



আত্মোৎকর্ষ
ও
আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি
(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
লেখক, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস,

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কাউণ্ট টলষ্টয়ের মতে ধর্ম্ম, সত্য এবং তাহার সহিত ঐকান্তিকতা যখন কোন দেহাধারে সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয়, তখন তাহার সান্নিধ্যে যে কেহ আইসে, সেই-ই মনে করে, তাহারও জীবন এই নবীন আলোকে উদ্ভাসিত। তখন স্বার্থ পরার্থে অঙ্গ ঢালিয়া দেয় এবং প্রাণের ভিতর হইতে এক অস্ফুট ধ্বনি অহরহ শ্রুতিগোচর হয়, যে ধ্বনি প্রাচ্যজগতে "তবাস্মি" নামে সমাদৃত; আর প্রতীচ্য জগত ইহার নাম দিয়াছেন "Altruism" বা পরার্থস্পৃহা। এই নবভাবে অনুপ্রাণিত নবজীবনে সুসজ্জিত মানবের মধ্যে তখন দেখা যায়,—একটি জয়পতকা ধীরে ধীরে সমুদিত হইতেছে, যাহার উভয় পৃষ্ঠে স্বর্ণাক্ষরে লেখা, "Live for others.."

এই জয়পতাকাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া তাহার নিম্নে যে সকল লোক একত্র দলবদ্ধ হয়, তাহারাই প্রকৃত মনুষ্য নামের যোগ্য,—অমৃতলোক তাহাদিগের জন্য। আর যাহারা ইহা হইতে দূরে অবস্থিত, তাহারা মনুষ্যাকারে পরিদৃষ্ট হইলেও বুঝিতে হইবে, তাহারা অমৃত-পুত্র নহে। ভারতের বেদবেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস এই অমৃত-পুত্র পরিগঠনের জন্য চিরদিন যত্ন ও চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। "তবাস্মি" ভারতবাসীর দর্শনবিজ্ঞান পূর্ণ করিয়া আবহকাল উজ্জ্বল শ্রীতে দণ্ডায়মান। ইহাই ভারতের সিদ্ধমন্ত্র। এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভারত ঠিক অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন :—

1. The idea of right is as false, as it is immoral, because it presupposes an absolute individuality. 2. That every one has duties towards all." 3. That the industrial regime of to-day which shows us little else than the conflict of rival egoisms, is an anarchical regime, or to put it better, an absence of regime.

ফলতঃ ব্যষ্টিবোধ, ভারত চিরদিন উপেক্ষা করিয়া, সমষ্টিবোধের জন্য লালায়িত

হইয়া আসিতেছেন। তুমি, আমি ইত্যাকার জ্ঞান ভারতীয় ধর্ম্মের ভিত্তি হইতে বহুদিন হইল, বিদূরিত হইয়াছে।

যাহা বর্ত্তমান প্রতীচ্য বিজ্ঞানে, humanity নামে অভিহিত সেই সমষ্টি-বোধ, আর তাহার সঙ্গে "তবাস্মি" ইহাই ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক প্রকৃত সত্য ধর্ম্ম। সমাজে জাতীয়তার অনুরূপ Industrial regime সংগঠন করিবার জন্য যখনই এ দেশে যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহাই দেবাসুরের যুদ্ধে পরিণত হইয়া অজস্র শোণিতধারায় এই ধর্ম্মক্ষেত্রকে পরিপ্লাবিত করিয়াছে। লোক বোঝে না তাই মনে করে, দেবাসুরের যুদ্ধ দেবদৈত্যের রণকোলাহল —পরস্পরের উপর পরস্পরে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা। বৈদিক বৃত্রাসুর বধের চেষ্টা হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক শুম্ভনিশুম্ভ নিধন পর্য্যন্ত, কি প্রাচীন কি আধুনিক এ দেশের যে কোন সময় এক কথায় বলিতে গেলে, তাহার উদ্দেশ্য Altruism Vs. selfishness বৃত্র আপন দেহ বিস্তারিত করিয়া সমস্ত নদীপ্রবাহ বন্ধ করিয়াছে, সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ভারত জলগণ্ডুষবিহীন! এই দুরন্ত দুর্গতি দূর করিবার জন্য বৃত্রঘ্নের অবতার। এই দুর্গতি দূর করিয়া বৃত্রঘ্ন ভারতের প্রাচীন ইতিহাস বেদের অর্দ্ধেক সূক্ত পূর্ণ করিয়া প্রধান দেবতার স্থানে উন্নমিত ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর যে এত সমাদর তাহারও মূলে এই স্বার্থের স্থানে পরার্থের সংস্থাপন। রাবণবধ, কংসবধ, শুম্ভ নিশুম্ভ বধ, সর্ব্বত্রই এক ধর্ম্ম সংস্থাপনই প্রত্যেকের ভিত্তিরূপে দণ্ডায়মান। শাস্ত্রের পর রাশি রাশি শাস্ত্রগ্রন্থ উদ্ভূত হইয়াছে, কাটাকাটি মারামারি তর্ক বিতর্ক, প্রত্যে-কেরই ভিতর পাষণ্ডদলন, আর তাহার সঙ্গে "মুই সেই, মুই সেই" এই অণ্ডকটাহ ভিত্তি ভেদকারী সমুন্নত ধ্বনি! তাই ভারতের চক্ষে Individual right, an-archical regime. national right, absence of regime ভারতের Sociology তবাস্মিকে মধ্যকেন্দ্র করিয়া পরার্থের জন্য আত্মবিসর্জ্জন। ইহাতে তুমি আমি, ইতর ভদ্র, অন্যান্য জাতিভেদ ও বর্ণভেদ অপগত—উন্মূলিত ইহাতে ব্যষ্টিবোধ, সমষ্টিবোধে, সমুদ্রমিলিত নদীতটাকার মত সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্ববিহীন না হইয়াও আত্মহারা।

ভারতের Theology ভারতের Metaphysics, এমন কি ভারতের গণিত, জ্যোতিষ, সঙ্গীতশাস্ত্র উন্নত হইতে সমুন্নত স্তরে আরোহণ করিয়াও শেষ স্বীকার করিয়াছেন, পরাবিদ্যা যাহা, তাহা anthropocentric. এই আত্মজ্ঞান হইলেও

এই ব্যাষ্টিবোধ সমষ্টিবোধে বিশ্রান্ত! "সোহং" "তবাস্মি"তে আত্মহারা।

কাউণ্ট টলষ্টয় ধর্ম্ম, সত্য, ঐকান্তিকতার সমন্বয়কে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির কারণ বলিয়া স্থির করিলেও, তিনি ধর্ম্ম ও সত্যের পূর্ণরূপ কিরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ঠিক জানিতে পারা যায় না।

ক্রমশঃ

এ বাণিজ্য কবে থামিবে?

বর্ত্তমান শিক্ষা ও বর্ত্তমান সভ্যতার প্রভাবে, বড় বড় বাগ্মী মহাশয়গণের বক্তৃতার প্রসাদে আমাদের সামাজিক সংসারে যে সকল নূতন নূতন সামাজিক-তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ ফল আমরা কিছু দেখিতে পাইতেছি না, অসঙ্কোচে ইহা বলা যাইতে পারে; কিন্তু নিতান্ত মর্ম্মবেদনায় আমরা একটি অভাবনীয় বিপর্য্যয় দর্শন করিতেছি। প্রাচীন শিক্ষার ফলে যাহা হয় নাই, সভ্যতার বেগে যাহা উদ্ভূত হয় নাই, বক্তা মহাশয়গণের বক্তৃতার স্রোতে যাহা ভাসিয়া আসে নাই, যেন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া সেইরূপ এক অঘট সংঘটন সমুদিত হইয়াছে। কি সেই বিপর্য্যয়? বঙ্গবাসীর পুত্রকন্যার বিবাহ। দেশ যখন অজ্ঞান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, নানা দিক হইতে নূতন সভ্যতার প্রভাময়ী দীপ্তি যখন এ দেশে বিকাশ পায় নাই, সভামণ্ডপের বক্তৃতা যখন আমাদের শ্রবণপথের অগোচর ছিল, তখন এই মহাবিপর্য্যয় ঘটে নাই, সে অন্ধকার বরং ভাল ছিল; এখন এই সমুজ্জ্বল আলোকপ্রভায় একি সৃষ্টি?

যাঁহারা অধিক শিক্ষা পাইতেছেন, যাঁহারা অধিক সভ্য হইতেছেন, তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রে আপনা হইতে আমাদের সংসার-বাজারে বৈবাহিক বাণিজ্যের হাট বসাইতেছেন, ভদ্রশ্রেণীর গৃহস্থ লোকেরা কন্যার বিবাহের দায়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

কেবল অর্থবিরহে নহে, কন্যাদায়ে তাঁহাদের মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিকৃতপ্রাপ্ত হইয়া যাইতেছে। আমরা শুনিতেছি, কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র গৃহস্থগণের মধ্যে কেহ কেহ সর্ব্বশান্ত হইয়া পাগল হইয়া যাইতেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদেরা বলেন, অস্থায়ী বাতুলতার উন্মেষ না হইলে, কেহ খুন করিতে পারে না, আত্মহত্যা

করিতে পারে না. লোকের ঘরে আগুন দিয়া স্বপরিবার পোড়াইয়া মারিতে পারে না। একথা খণ্ডন করিবার কোন যুক্তি যদি না থাকে, তবে কন্যাদায়ে পাগল বিচিত্র বলিয়া বোধ হইবে না ; সভ্যতার দিকে যাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন, কেমন করিয়া তাঁহারা বলেন, দেশে এখন সামাজিক উন্নতির যুগ আসিয়াছে, ব্যথিত হইয়া আমরা বলি, দুর্য্যোগ আসিয়াছে। সুশিক্ষাপ্রাপ্ত, সভ্যতাভূষিত, সৎকুলোদ্ভব হিন্দু সন্তানেরা আত্মগৌরবে দলপতি সাজিয়া অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইতেছেন। সমাজের অপর গৃহস্থেরা অগত্যা বাধ্য হইয়া সেই পথে গড়াইতেছে। ইহার নাম গড্ডালিকা প্রবাহ। মেষপালের অগ্রগামী মেষ যে দিকে ধাবিত হয়, পালের পশ্চাৎ গামী মেষেরা ধূলি উড়াইয়া সেই দিকে ছুটিয়া যায়। বৈবাহিক বিপ্লবে আমাদের সামাজিক মেষপালের এখন সেই অবস্থা। যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে দলের গতিরোধ করা বড়ই কঠিন দেখা যাইতেছে।

শিক্ষাগৌরবে, সভ্যতা গৌরবে, পদ গৌরবে ও ধর্ম্ম গৌরবে যাঁহারা অগ্রগণ্য, সুপথ না দেখাইয়া কুপথ দেখাইতেছেন। গতিক দেখিয়া দেখিয়া আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, সমাজের বড় বড় লোকেরাই আমাদের সমাজের বাজারে আগুন লাগাইয়াছেন, সামান্য লোকে যদি দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া বিপথে অগ্রসর হইত, তাহা হইলে তাহাদিগকে দমন করিবার উপায় থাকিত, করতালি দিয়া শশকের গতি রোধ করা যায়, কিন্তু বন্যবরাহের গোঁ ফিরাইয়া দেওয়া দুঃসাধ্য। সমাজের বড় বড় বরকর্ত্তারা উচ্চডাকে পুত্র বিক্রয় করিতেছেন! নিম্নশ্রেণীর পাঁঠিবেচা বেপারিরা প্রায় গাঁ-ঢাকা দিয়াছে, বড় বড় পাঁঠা বেচা বেপারির দল পুষ্ট হইতেছে ; ইহা যে কত বড় কুলক্ষণ, লেখনীতে লিখিয়া তাহা ব্যক্ত করা যায় না। শাস্ত্রে আছে,—যে দেশে শুক্র বিক্রয় হয়, সে দেশ পতিত। পূর্ব্বে কন্যাবিক্রয়কারীগণকে ঐ শাস্ত্রীয় প্রমাণ শুনাইয়া ভয় দেখান হইত, এখন কি হয়,—যাঁহারা পুত্র বিক্রয় করিতেছেন, তাঁহারা কি শুক্র বিক্রয় পাপে লিপ্ত হইতেছেন না, তাঁহারা কি ধনলোভে ইচ্ছা করিয়া জননী জন্মভূমিকে পতিত করিতেছেন না ?

হায়, হায়! কাহাকেই বা এ কথা বলা যায়, কেই বা কান পতিয়া শ্রবণ করেন। ধনলোভে যাহাদিগকে বধির করিয়াছে, মায়ামমতা যাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে, দয়ামায়াকে যাঁহারা বিসর্জ্জন দিয়াছেন, সহানুভূতিকে যাঁহারা বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করা অরণ্যে রোদন। হয় হউক অরণ্যে রোদন, আমরা কিন্তু আরও উচ্চনাদে রোদন করিতে ছাড়িব না।

কয়েকবার আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছি বিবাহ না বাণিজ্য ? দুর্ভাগ্যক্রমে কেহই সে প্রশ্নের উত্তর দেন নাই। এখন আবার জিজ্ঞাসা করি, "এ বাণিজ্য কবে থামিবে ?" চাউল ডাউলের বাণিজ্য থামিতে পারিবে না, সোণারূপার বাণিজ্য থামিতে পারিবে না, ঘৃতময়দার বাণিজ্য থামিতে পারিবে না, অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাণিজ্য থামিতে পারে, দধিদুগ্ধের বাণিজ্য থামিতে পারে না, থামিলে সংসার চলিবে না, কিন্তু বিবাহের বাণিজ্য থামিতে পারিবে না কেন ? এ বাণিজ্য থামিলে কি সংসার অচল হইবে, থামাইলে কি অর্থলুব্ধ বরকর্ত্তাগণের পরকাল নষ্ট হইয়া যাইবে ? এই কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর চাই।

এই বাণিজ্যের দরুণ দেশের যে কি দুর্গতি হইতেছে, পুত্র-বিক্রয়ী ব্যাপারিরা হয় ত তাহা দেখিতেছেন না, দেখিয়াও হয় ত গ্রাহ্য করিতেছেন না, টাকায় টাকা আকর্ষণ করে, এই যে একটা কথা আছে, স্বার্থপর ভাব দাসানুদাসেরা সেই কথা সার্থক করিবার পথ আবিষ্কার করিতেছেন, যাঁহাদের অধিক টাকা আছে, তাঁহারাই টাকা আকর্ষণের নিমিত্ত অত্যধিক পরিমাণে পুত্রের মূল্য বাড়াইয়া তুলিতেছেন, গৃহস্থ সংসারের গরীব খরিদ্দারেরা যে কোথা হইতে তাঁহাদের আশা পূর্ণ করিবে, ভ্রমেও তাহা তাঁহারা ভাবেন না ; গরীব খরিদ্দারেরা আরও গরীব হইয়া পড়ুক ; নারিকেল মালা হাতে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করুক, ধনবান ব্যাপারিদের তাহাতে কি ? তাঁহাদের কাছে স্বার্থের জয় ! অর্থের জয় ! দেশে গরীবের সংখ্যা অধিক, ধনীর সংখ্যা অল্প, ধনদাসেরা লোক সংখ্যার তালিকায় তাহা দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন না ! পাঁচ সাতটি কন্যার দরিদ্র পিতা তাঁহাদের দোবাত্ম্যে কত শীঘ্র ফকির হইয়া পথে দাঁড়াইবে, বরবিক্রেতা ব্যাপারি মহাশয়েরা এখন তাহা ভাবিতেছেন না। সমস্ত গরীব যখন কন্যাদায়ে ফকির হইয়া পড়িবে, বরকর্ত্তারা তখন খরিদ্দার পাইবেন কোথা ? লক্ষণ যেরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, দিন কতক পরে এ দেশের গরীব কায়স্থ ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহ একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। কিম্বা হয় ত গরীবেরা অঘরে কন্যাদান করিয়া জাতিকুল হারাইবে। তখন আর নিলামের উচ্চ ডাকে বড় মানুষের ঘরে বর কিনিতে আসিবে কে ? এক একজন সমাজ সংস্কারক বক্তা আমাদের জাতিভেদ উঠাইবার জন্য বাসুকীর ন্যায় সহস্র মুখ ধারণ করেন, ধনবান বরকর্ত্তাদের সহায়তায় তাঁহাদিগকে আর ততটা কষ্টস্বীকার করিতে হইবে না। বৈবাহিক উপদ্রবেই একাকার হইয়া যাইবে, বঙ্গে আর বর্ণ-শঙ্করের স্থান হইবে না।

পুত্র বিক্রয়রূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত যে কোন পুস্তকে লেখা আছে, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। প্রায়শ্চিত্তের বিধি লইয়াই বা কি হইবে, যাঁহারা বাণিজ্য বাজারে নামিয়াছেন, এ বাণিজ্যকে তাঁহারা পাপ বলিয়া গণনাই করেন না, গণনা করেন কি তবে? স্বর্ণ মুদ্রা, রজতমুদ্রা, স্বর্ণ-চেন, স্বর্ণ-খট্টা, স্বর্ণ-চশমা, স্বর্ণ জান। হায় হায়! দেশের কল্যাণকামনা যাঁহারা করেন, নিরবচ্ছিন্ন স্বর্ণ-রৌপ্যকে মহামুল্য জ্ঞান করিতে তাঁহারা শঙ্কুচিত হন, সমাজের গরীব গৃহস্থেরা উৎসন্নে যাউক, স্বর্ণরজতে আমাদের ধনভাণ্ডার পরিপূর্ণ হউক, জন কতক ধনকুবের আপনাদের পুত্রের বিবাহ-বাণিজ্যে কুবেরের পিতৃ পিতামহের পদ অধিকার করুক, ইহাই যাঁহাদের বাসনা, তাঁহারা দেশের কল্যাণকামী নহেন; এ কথা আমরা চীৎকার করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিব, নামে সমাজহিতৈষী হইয়াও তাঁহারা সমাজের মানব বলিয়া পরিচয় দিতে পুত্রব্যাপারিগণের লজ্জা হয় না, ইহাই আশ্চর্য্য। যাঁহারা সমাজ-সংস্কারের বক্তৃতা করেন, তাঁহারা কি এই বিবাহ-বাণিজ্যকে সমাজ-সংস্কারের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন?

বাজার খুব গুল্‌জার প্রতিকূলে যতই আন্দোলন চলিতেছে বাণিজ্য-বাজারও ততই জাঁকিয়া উঠিতেছে। অতএব আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, এ বাণিজ্য কবে থামিবে?

বাবু ও ভট্টাচার্য্য।

সাধারণ ভট্টাচার্য্যগণের আজকাল কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, এই ক্ষুদ্র গল্পটি পাঠ করিলে পাঠক মহাশয়েরা তাহার অনেকটা আভাস পাইবেন।

একদা একজন ভট্টাচার্য্য একজন বাবুর বাটিতে একটি চাকরির উমেদারিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের উভয়ে যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, নাটকের পদ্ধতিতে তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

বাবু।—তোমার নাম কি?

ভট্টা।—বলহরি রামচাঁদ তর্কবাগীশ।

বাবু।—ওবাবা! অত বড় নাম?—অত বড় নামে তোমাকে আমি ডাকিতে পারিব না। যদি ছোট করিয়া লই, তাহাতেও গোল বাঁধিবে। কেননা বলি যদি বলহরি, শ্মশান-যাত্রা মনে করিয়া লোকে ভয় পাইবে; বলি যদি রামচাঁদ, তাহা হইলে আমার ঠাকুরদাদার সর্দ্দার খান্‌সামা রামচাঁদ পরামাণিককে মনে পড়িবে। তোমার উপর আমার অশ্রদ্ধা আসিবে; দুটোর একটাও ভাল লাগিবে না। আমি তোমাকে একটা ছোট রকম নাম দিতে চাই।

ভট্টা।—আজ্ঞা করুন।

বাবু।—প্যালারাম।

ভট্টা।—যে আজ্ঞে।

বাবু।—ও নামে তোমার কাজের হানি হইবে না। আমার অপেক্ষা তুমি বয়সে ছোট, আমি তোমাকে প্যালারাম বলিয়া ডাকিব। অপরে তোমাকে তর্কবাগীশ বলিবে। নিমন্ত্রণপত্র আসিলে, তুমি স্বচ্ছন্দে গরদের জোড় ফোঁটা কাটিয়া, তর্কবাগীশ সাজিয়া শ্রাদ্ধবাড়ী বিদায় আনিতে যাইতে পারিবে। হাঁ কি চাকরী তুমি চাও?

ভট্টা।—আজ্ঞে, সভাপণ্ডিত।

বাবু।—ও বাবা! সভাপণ্ডিত? সভাপণ্ডিত লইয়া আমি কি করিব? আমি রাজা নই, সভাপণ্ডিতে আমার দরকার নাই।

ভট্টা।—(কাচুমাচু মুখে) কি হইব তবে?

বাবু।—থাকো; তোমাকে আমি বিশেষ বিশেষ কাজ দিব।

ভট্টা।—কি কি বিশেষ কাজ?

বাবু।—আমার সঙ্গে থাকিবে, যেখানে আমি যাইব, আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে শ্লোক করিয়া লোকের কাছে আমার পরিচয় দিবে। পার্‌বে ত?

ভট্টা।—আজ্ঞে, বেশ পারিব। দশক্রোশ পথ একলম্ফে আমি যাইতে পারি, আর আপনার পরিচয়ের কথা,—সেটাও বেশ পারিব। "পুত্রে যশোশি তয়েন, সর্ব্বষশেশ্বরো বাবু। দধিশঙ্কতুষারাভঃ শুভ্রদীপ্তি যথা শশীঃ।" এই শ্লোকে সকল লোকের তাক লাগাইয়া দিব।

বাবু।—(হাস্য করিয়া) লম্ফে লম্ফে তুমি যাইতে পার, আকার দেখিয়া তাহা

বুঝিতেছি। অতি কম ছয়ফুট লম্বা, হস্তপদ তাহার অনুরূপ, মস্তকে দীর্ঘ টিকি ; লম্ফ দিলে মানাইবে ভাল। মাপে ওসার কিছু কম, তাহা হউক আমার এখানে থাকিতে থাকিতে কালিয়া পোলোয়াও সেবা করিতে করিতে সেগুনের তক্তার মত চওড়া হইতে পারিবে।

ভট্টা।—আজ্ঞে, হাঁ।

বাবু।—আর একটী কাজ তোমার কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হইবে। যখন যে যে, কথা আমি বলিব, তাহাতে ঠিক ঠিক সায় দেওয়া চাই। কেমন, পারিবে ত।

ভট্টা।—(দন্ত করিয়া) আজ্ঞে, প্রতিধ্বনি ! সে ত আমি খুব জানি। আপনি যদি নীলবর্ণ আকাশকে হলুদবর্ণ বলেন, আমি তৎক্ষণাৎ বলিব, মা দুর্গার চেয়েও দশগুণ হলুদ বেশী।

বাবু।—(হাস্য করিয়া) তবে তুমি থাকো। আর দেখ, বাড়ীর চাকরের অসুখ হইলে তোমাকে বাজার করিয়া আনিয়া দিতে হইবে, ছেলেগুলিকে স্কুলে দিয়া আসিতে ও লইয়া আসিতে হইবে, রশুই ব্রাহ্মণের পীড়া হইলে, এক এক দিন রন্ধন করিতে হইবে।

ভট্টা।—আজ্ঞে, গরীবের ছেলে আমি, বাজার করা, রন্ধন করা, আমার বেশ অভ্যাস আছে। স্কুলে যাওয়া আসাও অভদ্রের কাজ নয়, তাহাও আমি পারিব। শিষ্য যজমানে এখন আর প্রায় পয়সা দিতে চায় না, ডাকতেও চায় না ; কাজেকাজে পেটের দায়ে নূতন কাজে ভর্ত্তি হওয়া চাই।

বাবু।—তবে থাকো মাসিক বেতন ৬৲ টাকা, বেশীর ভাগে খোরাক পোষাক।

তর্কবাগীশ মহাশয় ৬৲ টাকা বেতনে বাবুর মোসাহেব, বাজার সরকার, পাচক ও বেহারা হইয়া রহিলেন। আত্মমর্য্যাদাহীন ব্রাহ্মণের এইরূপই পরিণাম হইয়া থাকে।

সমালোচনা।

রন্ধন-শিক্ষা। ষষ্ঠ সংস্করণ। পাক-প্রণালী প্রণেতা শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ছয় আনা।

অন্ন, বিবিধ নিরামিশ ব্যঞ্জন, মৎস্য, মাংস, খিচুড়ী, পলান্ন, চাট্‌নী, পায়স পিষ্টক, লুচি, কচুরি, গজা, হালুয়া কি, কি প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হয়, বিপ্রদাস

বাবু এই পুস্তকে পরিপাটীরূপে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। রোগীর পথ্যে কিরূপ খাদ্য প্রয়োজন, তাহাও ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে।

পাকপ্রণালীতে বিপ্রদাস বাবু সিদ্ধহস্ত; প্রণালীগুলি তিনি যেরূপ দেখাইয়াছেন, তদনুসারে আমাদের বালিকাগণকে রন্ধনকার্য্য শিক্ষা দেওয়া অতি আবশ্যক। আমাদের বালিকাবিদ্যালয় সমূহে রন্ধনকার্য্য শিক্ষা দিবার উপযুক্ত একখানিও পুস্তক নির্দ্দিষ্ট নাই, বালিকা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা আমাদের সমস্ত বালিকা-বিদ্যালয়ে গৃহস্থ সংসারের নিত্য আবশ্যকীয় এই উপাদেয় পুস্তকখানি পাঠ্যপুস্তক মধ্যে নির্ব্বাচন করিয়া দেন, ইহাই আমাদের আন্তরিক অভিলাষ এবং সনির্ব্বন্ধ একান্ত অনুরোধ।

যখন ছাপা হইয়াছে, তখন অবশ্য পাঠ্যপুস্তক; কিন্তু বেতাল পঁচিশ বা শিশুশিক্ষা প্রভৃতির ন্যায় পাঠ্য নহে; বিষয় উপযোগী সচিত্র পাঠ্যপুস্তক। কি কি উপকরণ লইয়া গৃহিণীরা কিরূপে রন্ধনকার্য্য সম্পাদন করেন, প্রণালী নির্ব্বাচনের শিরোভাগে তৎবিষয়ের একখানি সুরঙ্গিন চিত্র ইহাতে সংলগ্ন আছে। নানাবর্ণের বস্ত্রালঙ্কার ভূষিতা নারীমূর্ত্তি ও রন্ধন-যন্ত্রাদির সুন্দর সুন্দর নয়নরঞ্জন অনুকৃতি। মূল্য ছয় আনা মাত্র। গুণানুসারে একটাকা মূল্য হইলেও অধিক বোধ হইত না। পুস্তকখানি হিন্দুসংসারে প্রত্যেক কুমারী ও গৃহিণীগণের অবশ্যপাঠ্য, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

ভীষ্মবিজয় গীতাভিনয়। আদি আর্য্যসারস্বত নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক উক্ত নাটকের অভিনয় হইতেছে। সমাজের অধ্যক্ষের নাম শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় ভাণ্ডারী ও যামিনীকান্ত ভাণ্ডারী। অভিনয়ের উৎকর্ষ সাধনার্থ অকাতরে অর্থব্যয় করিতে তাঁহারা কৃতসংকল্প। ভীষ্মবিজয় প্রণেতা শ্রীযুক্ত রামদুর্লভ কাব্যবিশারদ। নাটক রচনায় তাঁহার নৈপুণ্য আছে, ভীষ্মবিজয় তাহার পরিচয় দেয়। আমরা একদিন ভীষ্ম বিজয়ের অভিনয় দেখিয়া বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছি। অভিনয়, সঙ্গীত, নৃত্য, সমস্তই উত্তম। যাঁহারা যে বিষয়ের অভিনয় করিয়াছেন, সেই সেই বিষয়ে তাঁহাদের যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বনামখ্যাত নৃত্যশিক্ষক শ্রীযুক্ত তারকনাথ বাগ্‌চী এই দলে নৃত্য শিক্ষা দেন। বাবু তারকনাথের নৃত্যকৌশল সর্ব্বাংশে সুন্দর ও প্রশংসনীয়। এই সম্প্রদায়ের ক্রমশঃ সুখ্যাতির সহিত সাধারণের মনোরঞ্জন করিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৯শ বর্ষ। } ১৩১৮ সাল, আষাঢ়। { ৩য় সংখ্যা।

রথযাত্রা।

জগন্নাথের রথ, ইহাই প্রসিদ্ধ কথা; কিন্তু আজকাল যাঁহারা রথের সময় সংকীর্ত্তন করেন, তাঁহারা বলেন, অক্রূরের রথে শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-যাত্রা। কৃষ্ণ-বলরাম রথে উঠিলেন, বৃন্দাবনবাসিনী কৃষ্ণপ্রেমাধিনী গোপিনীকুল রথের পথ আগ্‌লাইয়া, আকুলকুন্তলে ক্রন্দন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন :—

অবলার প্রাণ হরি, কোথা যাও প্রাণহরি,
রাখ রথ, থাকো থাকো, করি দরশন।
জনমের মত হেরি ও বিধুবদন॥

তব প্রেমে ব্রজাঙ্গনা, চিরদাসী সর্ব্বজনা,
দাসী পরিহার করি কোথা যাও হরি ?
বারেক ফিরিয়া চাও, দেখি মুখ, দেখা দাও,
জোড়করে তব পদে এ মিনতি করি।
দেখ দেখ, মোরা সবে রথচক্র ধরি॥
চলি যাবে কৃষ্ণধন, কিবা ছার এ জীবন,
তব আগে মোরা সবে প্রাণ্ পরিহরি,
প্রাণসাধে মৃত্যুকালে বলি হরি হরি।
রথচক্রে এ জীবন বিসর্জ্জন করি!
কহিলেন কৃষ্ণচন্দ্র করুণ-বচনে,
যাইতেছি কংশালয়ে যজ্ঞনিমন্ত্রণে।
শুন শুন মম বাণী শুন প্রাণসই,
তিলতরে বৃন্দাবন ছাড়া আমি নই॥
চিরদিন আজ্ঞাকারী আমি শ্রীরাধার,
বোলো বোলো শ্রীমতিরে আসিব আবার।
এইরূপে প্রবোধিয়া ব্রজগোপীকায়,
অক্রুরের রথে কৃষ্ণ গেলা মথুরায়॥
এইত পুরাণ কথা শ্রীকৃষ্ণ, তোমার,
জগন্নাথরূপে এবে তব অবতার,
নীলাচলে রথযাত্রা এখন তোমার,
নেহারিলে পুনর্জন্ম নাহি হয় আর।
জয় জয় মহাপ্রভু, জয় জগন্নাথ!
জোড়করে শ্রীচরণে করি প্রণিপাত॥

মন তোতাপাখী।

পল্লীগ্রামে একজন গোস্বামী ছিলেন, নামে কৃষ্ণভক্ত, কিন্তু কৃষ্ণভক্তি অপেক্ষা মামলা-মোকর্দ্দমায় তাঁর অধিক ভক্তি ছিল। দিবাভাগে তিনি উকীলবাড়ী ঘুরিতেন, আদালতের বৃক্ষতলে পাঁজী-পুঁথি খুলিয়া উকীল-মোক্তারের সহিত কূট মামলার পরামর্শ করিতেন, সন্ধ্যার পর জরির জুতা পায়ে দিয়া আপন বাটীর চৌকাঠে দাঁড়াইয়া কুঁড়াজালির ভিতর হাত লুকাইয়া মালা জপ করিতেন। একদিন রাত্রি একপ্রহরের সময় নিজ কক্ষে কোমল-শয্যায় শয়ন করিয়া তিনি হরিচিন্তা অথবা বিষয়চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একটি সুমধুর সঙ্গীতের সুর তাঁহার শ্রবণ-কুহরে প্রবেশ করিল। বাটীর সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র বর্ত্ম হইতে সেই সুর আসিতেছিল।

শুক্লপক্ষ রজনী, গবাক্ষপথে মুখ বাড়াইয়া জ্যোৎস্নালোকে গোঁসাইজী দেখিলেন, একটি পথভিখারিণী রমণী। ভিখারিণী গাহিতেছে :—

খেমটা।

মন তোতাপাখী!
(মুখে) রাধাকৃষ্ণ বল দেখি!
মন তোতাপাখী!
(ও তোর) কলুষ বিনাশ হয়ে যাবে,
স্বর্গে যাবি ভাবনা কি?
মন তোতাপাখী।
বল্ পাখী তুই কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম, ওতোর পূর্‌বে মনস্কাম,
(ওতোর) পাখীজন্ম ঘুচে যাবে, পাবি আত্মারাম :—
(ও তুই) যাবার সময় জেনে যাবি, ভবের বাজী সব ফাঁকি!
সব ফাঁকি রে সব ফাঁকি—
মন তোতাপাখী!

গোস্বামী উপর হইতে নামিয়া আসিলেন, অল্পক্ষণ ভিখারিণীর সহিত কি কি কথা কহিলেন, গৃহে আর পুনঃ প্রবেশ করিলেন না।

কথিত আছে, সেই দিন অবধি সেই গোঁসাইজীটি হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন।

আয়ুশ্চর্য্যা।

কবিরাজ—শ্রীযুক্ত বারাণসীনাথ গুপ্ত বৈদ্যরত্ন।

অনাদিকাল হইতে আত্মা যাহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা একাধারে যাহাতে সম্মিলিত হইয়া জগতে জীব নামে আখ্যাত হইতেছে, যাহার অস্তিত্বে দেহের অস্তিত্ব, মনের অস্তিত্ব, আমার আমিত্ব ও ও ইন্দ্রিয়গণের স্ফূর্ত্তি, আব্রহ্ম কীটাণু পর্য্যন্ত যাহার জন্য লালায়িত, নিস্কাম ব্রতাবলম্বী সিদ্ধ ঋষি, তপস্বিগণও যাহার কামনায় যম-নিয়ম ও ধ্যানধারণা-পরায়ণ, যাহার অভাবে জীবের সুখ-দুঃখ, ভাবাভাব, সম্পদবিপদ ও মানাপমান সকলই সমান। পরন্তু যাহা আমাদের শুভানুধ্যায়ী গুরু-পরম্পরা প্রোক্ত প্রধান আশীর্ব্বাদ "দীর্ঘায়ূরস্তু" সেই আয়ুঃ শব্দের স্বরূপ কি? কাহাকে আয়ুঃবলে? এ প্রশ্নের মীমাংসা অগ্রে না হইলে, আয়ুশ্চর্য্যার পর্য্যালোচনা আকাশ-কুসুমবৎ অলীক বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে; সুতরাং বক্তব্য প্রবন্ধাবতরণার প্রারম্ভেই আয়ুঃ কাহাকে বলে, তাহাই উক্ত হইতেছে। আয়ুর স্বরূপ নিরূপণ সম্বন্ধে মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন:—

"শরীরেন্দ্রিয় সত্ত্বাত্ম সংযোগঃ
* * * আয়ুরুচ্যতে॥"

শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার যে সংযোগ, তাহাই আয়ুঃ নামে উক্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ শরীরের সহিত ইন্দ্রিয়, মন আত্মার যে সম্বন্ধ, সেই সব সম্বন্ধনিষ্ঠ কালকেই আয়ুঃ বলা যায়; সুতরাং জীবনের আরম্ভ হইতে পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত যে কাল তাহারই নাম আয়ুঃ। এই আয়ুঃ বা জীবনবাহী কালকে সুখময় করিবার জন্য যে সকল আহার, বিহার ও আচার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, সংক্ষেপতঃ তাহারই নাম আয়ুশ্চর্য্যা।

এই আয়ুশ্চর্য্যা সম্যক প্রতিপালন করিতে হইলে, মানবকে ঐহিক-পারত্রিক অনেক বিষয় লক্ষ্য করিয়া সংসারে পদক্ষেপ করিতে হয়। আয়ুশ্চর্য্যার প্রতিপালন বিষয়ে হিতকর আহার বিহারাদির অনুগত হওয়া যেরূপ আবশ্যক, ঈশ্বরে ও ধর্ম্মে বিশ্বাসস্থাপন, আস্তিক্য বুদ্ধির অনুসরণ, পাপানুষ্ঠানে বিরতি ইত্যাদি বিষয়গুলিও তদ্রূপ প্রয়োজনীয়। দেহ আত্মা ও মন এই ভাবত্রয়ের সংযোগ সম্বন্ধে নির্ভর করিয়া জীবের জীবনীশক্তি যখন অবস্থান করিতেছে, তখন যে প্রকার আহার-বিহারাদি দ্বারা তিনেরই আনুকুল্য সাধন হইতে পারে, তিনেরই সংযোগ

সামঞ্জস্যে আসিতে পারে, সেইরূপ আহার-বিহারাদিই প্রকৃত স্বাস্থ্যপ্রদ ও অনাগত ব্যাধি প্রতিষেধক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

অন্যথা যাহা দেহের অনুকূল, পরন্তু মনস্তুষ্টি বা আত্মপ্রসাদ আনয়নে অসমর্থ, সেরূপ আহার-বিহার প্রকৃত আয়ুশ্চর্য্যার অন্তর্গত বা স্বাস্থ্যপ্রদ নহে। যদ্যপি তাহা হইত, তবে আত্মা ও মনের প্রসন্নতার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বিবেক বুদ্ধি-বিহীন পশ্বাদির ন্যায় আচার-অনাচার, পাপপুণ্যের বিচার না করিয়া, উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছভাবে আহারাদি অনুষ্ঠিত হইলেই নিরাপদে দেহ রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইতে পারিত। কিন্তু সেরূপ স্থলে তাহা না হইয়া অধিকতর আত্মগ্লানি ও পাপভয়ে আত্মা প্রপীড়িত ও বিবিধ উদ্বেগে মন বিলোড়িত হইয়া অতি শীঘ্র শারীরিক, মানসিক নানাপ্রকার আত্যয়িক ব্যাধি সমূহের হেতু হইয়া থাকে।

সুতরাং যদ্দ্বারা দেহের পুষ্টি সাধিত হইবে, তদ্দ্বারা আত্মপ্রসাদ ও মনস্তুষ্টি সাধিত হওয়াও আবশ্যক। কেননা আত্মা, মন ব্যতীত যখন দেহ থাকিতে পারে না, এবং দেহমন ব্যতিরেকেও যখন আত্মানুভূতি হইতে পারে না, তখন তিনেই এক, একই তিন বুঝিতে হইবে। এককে লক্ষ্য করিয়া যখন তিনের অবস্থান, একের হিতাহিতে যখন তিনের হিতাহিত, তখন দেহের পুষ্টি এক, মনের তুষ্টি অপর, এইরূপ সিদ্ধান্ত সমীচিন বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না, এবং তাহা সমীচিন নয় বলিয়াই শাস্ত্রকারেরা আয়ুস্তত্ত্বের পর্য্যালোচনায় অতীব সূক্ষ্মতম তত্ত্বে উপনীত হইয়া কি আহার বিধি, কি বিহার বিধি, কি সদাচার বিধি, সকল বিধি-ব্যবস্থার মূলেই আত্মা, দেহ, মন এই তিনকে জড়িত রাখিয়া উপদেশ সকল প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এবং তজ্জন্যই তাঁহাদিগকে তিথিনক্ষত্র বিশেষে তত্তৎ আহার বিহারাদির বিধিনিষেধেরও আবশ্যকতা দেখাইতে হইয়াছে। আয়ুস্কামী ব্যক্তিমাত্রেরই আয়ুশ্চর্য্যার একান্ত অন্তর্নিহিত সেই সকল বিধিনিষেধ অবশ্য প্রতি-পালনীয়। এতদ্ব্যতীত মহামনস্বী মহর্ষি আত্রেয় মনুষ্যোচিত দয়া, দাক্ষিণ্য-পরোপকারিতা, সত্যনিষ্ঠা, সমদর্শিতা, বিনয়, বিরতি প্রভৃতি কতকগুলি সদ্বৃত্তির অনুশীলনকেও আয়ুশ্চর্য্যার অন্তর্গত ও স্বাস্থ্যসাধনের হেতু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"নরো হিতাহার বিহার সেবী
সমীক্ষকারী বিষয়েষ্বসক্তঃ।
দাতা সমঃ সত্যপর ক্ষমাবান

আপ্তোপসেবীচ ভবত্য রোগঃ।"

অর্থ এই যে—যে মানব হিতকর আহারবিহারের সেবা করে, পূর্ব্বাপরদর্শী কার্য্য করে, স্ত্রীপুত্র, ধনাদিতে অনাসক্ত, যিনি দানশীল, সমদর্শী, সত্যনিষ্ঠ, যিনি অপরাধীকে ক্ষমা করেন এবং যিনি আপ্তজনের বাক্যপ্রতিপালন করেন, শারীরিক ও মানসিক কোন প্রকার রোগই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। মহর্ষি প্রোক্ত এই আয়ুশ্চর্য্যার মূল সূত্রে কি যে অমূল্য রত্নরাজী নিহিত রহিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় অভুতপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া উঠে। সংসারি মানব! তুমি যদ্যপি আত্মা, দেহ ও মন এই তিনেরই উন্নতিকামনায়, তিনেরই মঙ্গল কামনায়, ঐহিক পারত্রিক সকল সুখে সুখী হইতে ইচ্ছা কর, তবে উক্ত মহর্ষি প্রোক্ত স্বাস্থ্যোপদেশ স্বরূপ কল্পপাদপের শরণাপন্ন হও, অচিরাৎ সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। তোমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা মুল্যবান উপদেশ আর কি হইতে পারে।

ক্রমশঃ

তৃতীয় পক্ষ।

(গল্প)

লেখক,—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্চী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গোপীনাথ ঘোষালের বয়ঃক্রম পঞ্চষষ্টি বৎসর। দেহ খর্ব্বাকৃতি, অসামান্য স্থূল। মস্তকে বিরল শুভ্র কেশ। চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ। দেহের বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ গোপীনাথ ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইলে বোধ হইত' কে যেন তাহার গায়ে কালি ঢালিয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ গোপীনাথ তাহার বৃহদাকার দেহে তৈল মর্দ্দন করিলে, সমস্ত শরীরটা বার্ণিশ করা বলিয়া ভ্রম জন্মাইত। এরূপ অবস্থায় গোপীনাথ কখন কোন চর্ম্মকারের লোলুপ দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিল কিনা, বলা দুঃসাধ্য। গোপীনাথের বদন-দুর্গরক্ষক দশন-সৈন্যগণ ক্রমাগত পঞ্চাশৎ বর্ষব্যাপী চর্ব্বণযুদ্ধে নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া ক্রমে পরাভূত ও নিহত হইয়া দুর্গভূমি পরিশূন্য করিয়াছে,—সে দুর্গ এখন নিতান্ত অরক্ষিত অবস্থাপন্ন। জবাকুসুম-সঙ্কাশ-নেত্রদ্বয়-শোভিত

বদনমণ্ডল সর্ব্বদাই শ্মশ্রুগুম্ফমুণ্ডিত থাকায় জৃম্ভণাকৃষ্ট বা ক্রোধোদ্দীপ্ত গোপীনাথ যখন মুখব্যাদান করিত, তখন দন্তহীন ভল্লুকের মুখব্যাদানবোধে বালকেরা ভীত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিত। গোপীনাথের তেজারতি কারবার ছিল, গোপীনাথ অবস্থাসম্পন্ন, বাটীর প্রাঙ্গণে অবস্থিত মুগ, কলাই, ধান, চাউল, সরিষা প্রভৃতির চার পাঁচটী বড় বড় গোলা তাহার সচ্ছল অবস্থার নীরব সাক্ষী। কৃষকেরা অতিরিক্ত হারে সুদ দিয়া তাহার কাছে টাকা কর্জ্জ করিত। যে বৎসর বেশ শস্য জন্মিত, শস্যবিক্রয়লব্ধ অর্থে অথবা শস্যদানে কৃষককুল ঋণ পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিত; কিন্তু পরিশোধ হওয়া দূরে থাক্, শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় ঋণ দিন দিন বর্দ্ধিতাঙ্গ হইত। লোকে বলিত ঘোষালের ঋণ সাল সাল বিশালরূপ ধারণ করে।

ফলতঃ গোপীনাথের টাকা যে একবার কর্জ্জ করিত সে টাকা কিছুতেই পরিশোধ করিতে পারিত না। চক্রবৃদ্ধি হারে তাহার সুদ গ্রহণ করা নিয়ম ছিল। সুবিধা বুঝিলে সে খাতকের নিকট ১৩ মাসে বৎসর গণনায় সুদের হিসাব করিয়া কড়ায় গণ্ডায় তাহার প্রাপ্য টাকা বুঝিয়া লইত। চক্ষে তাহার মানবদেহোপযোগী যথেষ্ট চর্ম্ম থাকা সত্ত্বেও যাহারা তাহার নিকট টাকা কর্জ্জ করিত, তাহারা বলিত, ঘোষাল মহাশয়ের চক্ষে চামড়া নাই। যাহারা একথা বলিত, তাহারাই আবার প্রয়োজনে তাঁহার নিকট হাত পাতিত! যেরূপ ব্যয়সঙ্কোচে লোক লোককে কৃপণ আখ্যা দেয়, সেরূপ ব্যয়সঙ্কোচ গোপীনাথের ছিল কি না, তাহা বলিতে পারি না,—তবে সে দিয়াশালায়ের কাঠিগুলি গণিয়া রাখিত, তামাক কিনিয়া ছোট ছোট গুলি পাকাইয়া বাক্সের ভিতর চাবি দিয়া রাখিত, শত ছিন্ন পুরাতন পাদুকাগুলি চর্ম্মকারকে বিক্রয় করিতে দর কষাকষি করিত। আহারের পূর্ব্বে কেহ তাহার নাম মুখে আনিত না। লোকে বলিত, তাহার নামগ্রহণে হাঁড়ী ফাটে; তাহা ফাটুক, কিন্তু বিপদে আপদে অনেককেই গোপীনাথের দ্বারস্থ হইতে হইত বলিয়া, গ্রামে তাহার মান মর্য্যাদা সম্ভ্রম ছিল। তাহার সে অপবাদ সে যে জানিত না এমন নহে,—তবে অর্থমাহাত্ম্যে সেই বৃহৎ অপবাদ তাহার ক্ষুদ্র মনে স্থান পাইত না।

সংসারে এখন গোপীনাথের ৩৮ বৎসরের এক বালবিধবা কন্যা এবং ২৪ বৎসরের এক অবিবাহিত পুত্র মাত্র। এই দুই পুত্রকন্যা ছোট রাখিয়া গোপীনাথের প্রথমা পত্নী সংসার অনিত্য জ্ঞানে, স্বামীর অর্থের প্রতি নিতান্ত উপেক্ষা প্রদর্শনে

ইহলোকে মানবলীলা সংবরণ করতঃ পরলোকে অন্য কোন নবলীলা করিতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সে আজ বিশ বৎসরের কথা। পত্নীবিয়োগবিধুর গোপীনাথ ঘটকের সহায়তায় পুনরায় অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী লাভের চেষ্টা করেন। গোপী নাথ বংশজ—তাহার দুরদৃষ্টে নানা উপঢৌকন এবং পণ সহ সুরূপা পাত্রী কি করিয়া মিলিবে? পত্নীর মৃত্যুতে অল্পবয়স্ক পুত্র ও কন্যার অভিভাবিকার অভাবে বংশজ গোপীনাথ বহু অর্থব্যয়ে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু করাল-কাল সেই দ্বিতীয়া পত্নীকেও গোপীনাথের লৌহসিন্দুক বিরাজিত রজতকাঞ্চনের প্রাণোন্মাদকারিণী অত্যুজ্জ্বলা মূর্ত্তিকে অধিক দিন দেখিবার সুযোগ দিলেন না। দুই মাস হইল গোপীনাথের সে পত্নীও প্রথম পক্ষের পত্নীর পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছে। দ্বিতীয়া পত্নীর অকাল মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হইয়া গোপীনাথ সংসার শূন্য-ময় দেখিতে লাগিল। পত্নীর মৃত্যুতে ত মানুষ মাত্রেরই শোক হওয়া সম্ভব। গোপীনাথের পত্নীশোক অপেক্ষা বিবাহব্যয়িত অর্থশোক দিন দিন অধিকতর ঘনী-ভূত হইতে লাগিল।

গোপীনাথের সহিত যাহাদের স্বার্থের সংস্রব, তাহারা আসিয়া যথাশক্তি সান্ত্বনাবাক্যে তাহার শোকাপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। পরিবারের কথা উঠিলেই গোপীনাথ ভেউ ভেউ করিয়া চীৎকার করতঃ ক্রন্দন করিত; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে ক্রন্দনে অশ্রুর নাম গন্ধও থাকিত না। পাড়ার মাতব্বর ব্যক্তিবর্গ আসিয়া গোপীনাথের নিকট তাহার যুবক পুত্র রমানাথের বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলে, সে প্রস্তাবে গোপীনাথ ঘাড় নাড়িত। মুখে কোন উচ্চ বাচ্য করিত না। রমানাথের পূর্ব্বে মূর্চ্ছারোগ ছিল; জানিয়া শুনিয়া কোন্ ব্যক্তি তাহাকে কন্যা সম্প্রদান পূর্ব্বক কন্যার হস্তপদ বন্ধন করিয়া অতল জলে নিক্ষেপ করিতে সাহসী হইবে? সুতরাং রমানাথের এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। এক বৎসর পূর্ব্বে দৈবাৎ একদিন এক সন্ন্যাসী আসিয়া রমানাথকে মূর্চ্ছাগ্রস্ত দেখিয়া ঔষধ দিয়া যায়, সেই ঔষধ সেবনাবধি তাঁহার পীড়ার লক্ষণ অন্তর্হিত হইয়াছে। পীড়া আরোগ্য হইয়াছে স্থিরীকৃত হওয়ায় ঘটকনিয়োগে রমানাথের বিবাহের চেষ্টা হইতেছিল, এই সময়ে হতভাগ্য গোপীনাথের স্ত্রীবিয়োগ ঘটিল।

কন্যা বিজয়া একদিন পিতার নিকট রমানাথের বিবাহ দিবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে স্ত্রীবিয়োগবিধুর গোপীনাথ দলিত ফণীর ন্যায় ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল,

"হতভাগী বেটী তোর কোন আক্কেল নাই,—এমন একটা ঘটনা ঘটিল, তাহাতে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলা নেই,—কেবল ভায়ের বিয়ে—ভায়ের বিয়ে! যা বেটি তুই ভায়ের বিয়ে দিগে যা,—আমি পার্‌বো না। বিয়ের ত সুখ ভারি, বিয়ে কর্‌ছি, আর মর্‌ছে। শুধু কি মর্‌ছে,—আমার পাঁজরার হাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে বা'র করে নিয়ে আমার রক্তমাংস শোষণ করে তবে মর্‌ছে। আর তুই বেটি মার্কণ্ডের পরমায়ু নিয়ে চার যুগ বেঁচে থাক্‌বি; যদি ফের বিয়ের নাম কর্‌বি ত টের্‌টা পাবি।"

পিতার এইরূপ নিদারুণ অনুযোগ রক্তমাংসে গঠিতা কোন দুহিতাই নীরবে সহ্য করিতে পারে না। চিরকাল পিতৃঅন্নে পুষ্টা বালবিধবা তেজস্বিনী বিজয়া কিন্তু সহিল,—সে সে কথায় দুঃখিত হওয়া দূরে থাক্‌, মনে মনে খুসী হইল; ভাবিল এত দিনের পর পিতার বিবাহের উপর ঘৃণা জন্মিয়াছে, ভালই হইয়াছে। সেই জন্য সে আর কোন উত্তর করিল না।

সেই দিন হইতে বিজয়া ভ্রাতার বিবাহের কথা পিতার নিকট পুনর্ব্বার উত্থাপন করিতে বিরত রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একদিন প্রাতঃকালে গোপীনাথ বৈঠকখানায় বসিয়া তাহার নূতন খাতক হলধর মণ্ডলকে সুদের হিসাব উপলক্ষে তেরো মাসে বৎসর পূর্ণ হয়, এই কথা নানা প্রসঙ্গ তুলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিল এবং আহাম্মক হলধর বারো মাসে বৎসর হয় বলিয়া মাঝে মাঝে গোপীনাথের কথায় বাধা দিয়া রসভঙ্গ করতঃ তাহার কথার সত্যতার প্রমাণে ব্যতিব্যস্ত ছিল, সেই সময় তথায় এক জন প্রৌঢ় বয়স্ক ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণের মস্তকে বোধ হয়, অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বের আমদানীর জীর্ণ ছিন্ন ছত্র। বামস্কন্ধে পরিচ্ছন্ন উত্তরীয়। পরিধানে মলিন বস্ত্র। পদযুগলে শততালি একজোড়া প্রাচীন চটিজুতা এবং ধুলার একজোড়া হাফ মোজা।

গোপীনাথ ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই মলিন মুখে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া বাটীর কৃষাণ তথা চাকর নকরচন্দ্রকে পদপ্রক্ষালনের জল ও তামাক আনিতে বলিল। মূর্খ হলধরকে অল্প সময়ের মধ্যে "তেরো মাসে বৎসর" এই জটিল বিষয় বুঝান শক্ত বিবেচনায় গোপীনাথ হলধরের প্রথম ট্যাঁকে, দ্বিতীয় কোঁচায়, তৃতীয় কাছায়, চতুর্থ সঙ্গীর নিকট যে টাকা ছিল, তাহা ব্যাকরণ ও অভিধানত্যক্ত নানা শব্দনিচয়ের প্রয়োগের অসাধারণ শক্তি প্রভাবে বাহির করিয়া লইয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিল।

গৃহ নির্জ্জন হইল। গোপীনাথ তখন ছলছলনেত্রে তাহার গৃহিণী যে তাহাকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিয়া অতি নিষ্ঠুরের ন্যায় আজ দুই মাসাবধি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই সম্বাদ নানা ছন্দালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া ঘটকের নিকট জ্ঞাপন করিল। নিজগ্রামে বসিয়াই অনুসন্ধিৎসু ঘটকঠাকুর গোপীনাথের পত্নীর মৃত্যুসম্বাদ পাইয়াছিলেন, সে কথা ব্যক্ত না করিয়া তিনি যেন এইমাত্র প্রথম শ্রুত হইলেন, এইরূপ ভাব প্রদর্শন করিয়া যেন সহসা আকাশ হইতে পতিত হইলেন। বলিলেন, "অঁ্যা বল কি? হায় হায়! সকলি বরাত, বরাত,—"সজোরে শ্বাস গ্রহণ করিয়া তাহাই দীর্ঘ নিশ্বাসাকারে ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "সকলি সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। ভাবিয়া কি কাঁদিয়া ত ফিরে পাওয়া যাইবে না। তার জন্য শোক করা বৃথা।"

ঘটকঠাকুর ক্রমে এ কথায় সে কথায় বলিলেন, "আপনার পুত্রের জন্য কন্যা স্থির করিয়াছিলাম,—পরমা সুন্দরী, পরমা সুন্দরী,—একেবারে ডানাকাটা পরী। বয়স একটু বেশী" কহিতে কহিতে এ সংবাদে গোপীনাথের মনে কি প্রকার ভাবোদয় হয়, তাহা জানিবার জন্য ঘটকঠাকুর কুটদৃষ্টিতে তাহার মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক এ সংবাদে গোপীনাথের মনে যেন বর্ষণান্তে ক্ষীণবিদ্যুতের ন্যায় একটু আশা, একটু আনন্দের রেখা বহিয়া গেল। স্মিতবদনে গোপীনাথ আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েটি বয়স্থা বলিতেছিলেন, কত বয়স?"

বাস্তবিকই ঘটকঠাকুর বঙ্গদেশের নিভৃত কোণে অবস্থিত অশ্রুতনামা এক গ্রামের ক্ষুদ্র কুটিরনিবাসী নিঃস্ব ব্রাহ্মণের একটি সুন্দরী কন্যাকে রমানাথের ভাবী পত্নীরূপে স্থির করিয়াছিলেন। সে কন্যা বয়স্থা—বয়ঃক্রম অনুমান চোদ্দ বৎসর হইবে। সেই অরক্ষণীয়া কন্যা রমানাথের নিমিত্ত হইলে তিনি তাহার বয়স

হয়ত সৌষ্ঠবানুসারে কমাইয়া বলিতেন, কিন্তু কন্যার কথা গোপীনাথের দুর্ব্বল চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া তাহার উক্ত প্রশ্নের উত্তরে ঘটকঠাকুর বলিলেন, "মেয়ে দিব্য—পরমা সুন্দরী, বয়স—বয়স তা পনর কি ষোল হইবে। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপিনী।" এই কথা বলিতে বলিতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, গোপীনাথের বামকর্ণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া, ঘটকঠাকুর তাহার কাণে কাণে বলিলেন "তোমার এমন চেহারা—তুমিই সেই কন্যার যথার্থ উপযুক্ত পাত্র।" তোমার আর এমন কি বয়স? আমাদের গ্রামের গোবর্দ্ধন চাটুর্য্যে যমালয় যাত্রার বয়সে অর্থাৎ বাহাত্তর বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়া তিন কন্যা ও দুই পুত্র রাখিয়া বাদ্যোদ্দম সহকারে স্বর্গে গমন করিয়াছে। তোমার কি বয়স? তুমি কারো কথা শুনো না। তোমার যখন অসময় হবে, তখন কেউ দেখ্‌বে না। ও ছেলেই বল আর ও মেয়েই বল, সে অসময়ে কেউ কাহারো নয়। এক পরিবার ভিন্ন কেহই সেবা করিতে পারে না। ওটা যে ভগবানের লীলাখেলা; ঐ মেয়েই বিয়ে কর—দিব্যি মেয়ে,—তাকে আন্‌লে দুদিনের ভেতর তোমার ঘর-দুয়ার হাস্‌তে থাক্‌বে। এমন সৎলোকের মেয়ে, রূপ কি—যেন সাক্ষাৎ এই—এই—সাক্ষাৎ" কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া—"এই প্যাঁচা ছাড়া লক্ষ্মী।"

যখন ঘটকঠাকুর নিয়ত শিরশ্চালনে গোপীনাথের কর্ণের নিকট উপরোক্ত মিষ্ট কথাগুলি বলিতেছিলেন, তখন গোপীনাথ সেই বাক্যসুধাধারা কর্ণ দিয়া পান করিতে করিতে আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিতেছিল। কোন তৃতীয় ব্যক্তি অন্তরাল হইতে তাহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল কি না, তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিবার অবকাশ গোপীনাথের ছিল না।

নিকটে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল সত্য, সে তৃতীয় ব্যক্তি আর কেহ নয়,—বিজয়া। ঘটকঠাকুর যখন বৈঠকখানায় প্রবেশ করেন, তখন বিজয়া তাহা দেখিতে পায়। ঘটকের সহিত পিতার কি কথোপকথন হয়, তাহা শুনিবার জন্য তাহার কৌতূহল জন্মে। কৌতূহল জন্মিবার একটি কারণ ছিল, সেই কারণ এই বিজয়া পিতৃচরিত্র অবগত ছিল, পুনরায় দারপরিগ্রহ করা তাঁহার সঙ্গতিসম্পন্ন পিতার পক্ষে বিচিত্র নয়। সেইজন্য সে তাহাদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গৃহকার্য্য করিতেছিল। যখন গোপীনাথ স্ত্রবিয়োগের শোকসম্বাদ ঘটকের কর্ণগোচরা, মর্ম্ম-স্তুদ ভাষায় বিবৃত করিতে আরম্ভ করিল, বিজয়াও সময় বুঝিয়া বৈঠকখানা হইতে বাটির ভিতর প্রবেশের দ্বারের কপাট আড়াল দিয়া দাড়াইয়া ঘটকের

সকল কথাই শুনিল। কিন্তু ঘটক অগ্রসর হইয়া গোপীনাথের কাণে কাণে যে সকল কথা সমান উত্তেজনায় বলিতে লাগিল ও সেই সকল কথা শ্রবণে গোপীনাথের মনে আনন্দসঞ্চার হইতেছে দেখিতে পাইল, তখন বিজয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া, সেই সকল কথা কোনপ্রকারে শুনিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইল। এই সময়ে তাহার অসাবধানতা বশতঃ দ্বারের কপাটে হাত লাগিয়া অল্প শব্দে শিকল নড়িল। গোপীনাথ দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল বিজয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। গোপীনাথ মনে মনে বলিল, "হতভাগী মেয়ের সব দিকে নজর।" ঘটককে বলিল, "আসুন, বাহিরের দিকে যাই।"

উভয়ে বৈঠকখানা হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া বাহিরে গেল। গোপীনাথ ঘটককে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যই মেয়েটি বয়স্থা ও সুন্দরী?"

ঘটকঠাকুর কৃত্রিম বিরক্তি সহকারে বলিলেন, "মেয়েটি পরমা সুন্দরী,, বয়স ষোল বৎসর, তামা, তুলসী,গঙ্গাজল নিয়ে এসো আমি হলপ করে বল্‌চি।"

গোপীনাথ যেন একটু লজ্জিত হইয়া অরুণ নয়ন বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "মহাভারত! মহাভারত! ও কথা বোল্‌বেন না। তা কি প্রকার দেনা পাওনা?"

ঘটক মৃদু হাস্যে গোপীনাথকে বলিলেন, "সে বেশী নয়! কন্যার পিতাকে হাজার টাকা, আর কন্যাকে দিতে হবে দু'হাজার টাকার আভরণ। আর জামার একশো, আর গরদের জোড়। এ আর বেশী কি?" এই কথা বলিয়া ঘটকঠাকুর উত্তরের প্রতীক্ষায় গোপীনাথের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

কূটবুদ্ধি গোপীনাথের তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিবার বাসনা হৃদয়ে প্রবল থাকিলেও, দর কমাইবার জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আবার বিবাহ? আপনি কি পাগল হইয়াছেন! লোকে তাহা হইলে বোল্‌বে কি? রাধে—রাধে! এখন ছেলের বিবাহ দিয়ে বৌমাটিকে ঘরে আনি,—আর আমার বিবাহে কাজ নাই।" এই কথায় ঘটকঠাকুরের ধূর্ত্ততা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল; বলিলেন, "গোপীনাথ! তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর। সেই দিনটাকে কেন ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়া আনিতেছ? তোমার অর্থ আছে, সুখভোগ কর—কেউ কারো নয়,—কেউ কারো নয়। "মনুতে লিখেছে, " * * ক্ষীরভোজনং।" আমার কথা শোন",—

গোপীনাথ ঘটকের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "ঘটক মশাই! টিক্‌চে কই? কেবল টাকাগুলো জলে যাচ্চে।"

ইহা শ্রবণ করিয়া ঘটকঠাকুর কহিলেন, "তন্ত্রে লিখ্‌চে আপোনারায়ণ স্বয়ং।" সে জল নয়, জল নয়,—তা হোক আমি তোমাকে ঐ সূর্য্যসাক্ষী করিয়া বলিতেছি এবার যদি তোমার পত্নী না টেকে ত আমি ব্রাহ্মণ হ'তে খারিজ।"

গোপীনাথ কিছু লজ্জিতভাবে বলিল, "না—না,—তা ঠিক, তবে আমি অত টাকা দিতে পারিব না। পণ হিসাবে পাঁচশো, আর গহনা সে আমার ঘরেই রহিয়াছে; আপনি ত জানেন প্রায় তিন হাজার টাকার গহনা আমার গত পরিবারের ছিল।"

ঘটক বলিলেন, "তা আবার আমি জানি নি—বিলক্ষণ জানি, ও পাত্রী তোমারই জন্যে বিধাতা গড়িয়াছিলেন, তা হাজার টাকার এক পয়সা কমে কন্যার পিতা রাজী হবে না। কশাই কশাই—সেই আঁতুড় খরচ হতে হাত নাগাইদ মেয়ের প্রতি খরচা ধরে নেবে। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি কিছুতেই কমাইতে পারি নাই। তুমি রাজী হও, এতেও তোমার জিত জানিবে।

বিবাহোন্মত্ত গোপীনাথ খানিকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "আপনি যখন অনুরোধ করিতেছেন, তখন আপনি যাহা হয় করুন। কিন্তু যাহাতে কমে করিতে পারেন, তৎপক্ষে চেষ্টা করিবেন, দেখিবেন,—গ্রামে বা আমার পুত্রকন্যার নিকটে ঘুণাক্ষরেও বিবাহের কথা প্রকাশ করিবেন না।"

ঘটক কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করতঃ কহিলেন, "রামচন্দ্র! বল কি, আমি কি দুগ্ধপোষ্য বালক—আমরা সাত পুরুষ ঘটক। এ সব কাজে খুব পাকা, তোমার সে চিন্তা নাই, এমন গোপনে বিবাহ দিব যে, ক'নের চৌদ্দপুরুষ টের পায় কি না পায়।"

গোপীনাথের ব্যয়কুণ্ঠা তাহার উদ্বাহোন্মত্ততার সহিত সংগ্রামে পরাস্ত হইল। সে কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া ঘটকের বাক্যকৌশলে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে সম্মত হইল। তাহার দাবদগ্ধ হৃদয়তরুতে আবার সঞ্জীবনী সুধা সিঞ্চিত হইল। তখন ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভ, বিবাহের দিন পঁচিশে তারিখে ধার্য্য করিয়া ঘটক প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে অদূরে আম্রবৃক্ষে একটা কোকিল দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া কুহু-কুহু রবে ডাকিয়া উঠিল।

ইহা বৃদ্ধ গোপীনাথের তৃতীয়পক্ষীয় উদ্বাহসূচনায় প্রকৃতির হুলুধ্বনি!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যখন ঘটকঠাকুরের সহিত গোপীনাথের গোপনে কথাবার্ত্তা হয়, তখন রমানাথ বাটিতে ছিল না। রমানাথ আসিলেই বিজয়া পিতার পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিবার আশঙ্কায় ভীতিবিহ্বলা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া পিতার সহিত ঘটকের গোপনে পরামর্শের কথা বলিল।

রমানাথ ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল, "পুনরায় যদি বাবা বিবাহ করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যার পাতককে আমি ভীত হইব না। দিদি তুমি আমার এটা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা বলিয়া জানিও।"

বিজয়া ভ্রাতার এই দৃঢ়সংকল্পে ত্রস্তা হইয়া বলিল, "তাহাতে আর কাজ নাই,—এ বিবাহ যাহাতে না হয় তাহারই চেষ্টা কর।"

রমানাথ বলিল, "ঘটকটা গেল কোথা, তাহাকে পাইলে আমি বুঝিয়া লইতাম। তাহার ঘটকালি আমি ঘুরাইয়া দিতাম।"

বিজয়া বলিল, 'ঘটক ভয়ে বেশীক্ষণ থাকেনি—তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়াছে।'

এমন সময়ে গোপীনাথ তস্করের ন্যায় বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল, তাহাকে দেখিয়াই বিজয়া ও রমানাথ চুপ করিল। বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! ঘটকঠাকুর কি জন্য আসিয়াছিল?"

গোপীনাথ অতিশয় বিরক্তিসহকারে বলিল, "আর কি জন্য! রমানাথের বিবাহের জন্য পাত্রী স্থির হইয়াছে তাহাই বলিতে আসিয়াছিল; ঘটক ত জানিত না, যে তোমার বিমাতার কাল হইয়াছে। এক বৎসর কালাশৌচ এখন আর কি করিয়া বিবাহ হয়! হায় হায়!" গোপীনাথের এই শেষোক্ত 'হায়, হায়!' রমানাথের বিবাহে ব্যাঘাত হইল বলিয়া নহে। পত্নীবিয়োগের মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি।

বিজয়া বলিল, "তাহার আর কি, এক বৎসর পরেই হইবে। পাত্রী কোথাকার? গোপীনাথ গ্রামের নাম গোপন করিয়া বলিল, "কি গ্রামটা বলিল, নাম ভুলিয়া গিয়াছি। বেশ নাম, সময়ে মনে হবে। এখন ত বিয়ে হবে না।"

রমানাথ নিরুত্তর।

গোপীনাথের স্ত্রীবিয়োগের পর বিজয়া পিতার সেবাশুশ্রূষায় অতিশয় মনোযোগ দিয়াছিল, পাছে কোন বিষয়ে কোন ক্রটি হয়—পিতার মন বিষণ্ণ হয়; এই ভয়ে বিজয়া প্রাণপণে তাহার পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। কি রন্ধনে কি শয্যা-

রচনায়, কি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়কার্য্য সমাধানে ক্ষিপ্রতা ও পারিপাট্য দেখাইতে বিজয়ার কোন প্রকার ত্রুটি ছিল না। পত্নী থাকিতে বরঞ্চ গোপীনাথকে সময়ে সময়ে অসুবিধা ভোগ করিতে হইত; এখন বিজয়ার সুব্যবস্থায় গোপীনাথের কোন অসুবিধাই ছিল না। কৃপণ পিতার সন্তোষসাধনার্থ বিজয়া গোপনে নিজ অর্থব্যয়ে অনেক খাদ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করতঃ পিতাকে আহার করাইত। বিজয়া সম্বলহীনা নহে। যখন বিজয়ার বিবাহ হয়, তখন তাহার শ্বশুর পরলোকগত; সুতরাং স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া বিজয়া তাহা বিক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নিরপেক্ষ বিবেচনায় মূল্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাহার ভাশুর সেই সম্পত্তি পাঁচ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়া লয়। সেই পাঁচ হাজার টাকা লইয়া বালিকা বিজয়া পিতৃগৃহে আসিয়া বাস করিতে থাকে। গোপীনাথ ঐ টাকা তাহার ব্যবসায়ে খাটাইত। মাসে মাসে বিজয়াকে নির্দ্দিষ্টপরিমাণে সুদ দিত; সুতরাং বিজয়া পিতার গলগ্রহ ছিল না। সে আপনার তেজে পিতৃগৃহে বাস করিতেছিল, গোপীনাথও সেই কারণে বিজয়াকে একটু ভয় করিত। যে দিন গোপীনাথ পুনর্ব্বিবাহে কৃতসংকল্প হইল, তাহার পরদিন হইতেই সে তাহার মুখমণ্ডল স্বেচ্ছায় বিকৃতভাবে বিষণ্ণ করিয়া তুলিল, বিজয়ার কার্য্যকলাপে ছল ধরিয়া নানা ত্রুটি প্রদর্শন করিতে লাগিল। নিজের মাথার কেশ ছিঁড়িয়া ভাতে মিশাইয়া দিয়া বলিল, "ভাতে চুল," দুগ্ধ চৌদ্দ আনা পরিমাণ পান করিয়া তাহাতে মাটি মিশাইয়া দিয়া বলিল, "দুধে মাটি" এইরূপ "শাকে বালি", "এ ব্যঞ্জনটা লবণহীন" "ও ব্যঞ্জনটা অতিরিক্তলবণ"। চুপি চুপি একদিন বিছানায় দুটি ধূলা ছড়াইয়া দিয়া বিজয়াকে বলিল, 'বিছানা পরিস্কার করিয়া দিস্ না, দেখ্ দিকি কত ধূলো, ইহাতে কি শোয়া যায়,' বিজয়াও তাহা দেখিয়া নিতান্ত অপ্রতিভ হইল, ঐরূপ কেন হয়, সে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না; অপ্রতিভ হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

গোপীনাথ একদিন ভাতে চুল দেখাইলে বিজয়া বলিল, "এযে তোমার পাকা চুল, তোমার মাথা থেকে কিরূপ পড়িয়াছে।" সে কথায় গোপীনাথ কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করতঃ বলিয়াছিল, "আ মর—বেটী! আমার পাকা চুল! তোদেরই চুল, গরম ভাতে পড়িয়া সিদ্ধ হইয়া সাদা হইয়া গিয়াছে।"

যে জাগিয়া নিদ্রার ভাণ করে, তাহার নিদ্রাভঙ্গ করা যেমন দুঃসাধ্য, গোপী-

নাথের স্বেচ্ছাকৃত ত্রুটি নিবারণ করাও বিজয়ার সেইরূপ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ গোপীনাথ সুর ধরিল, "যাহার পরিবার নাই, তাহার জগতে কেহই নাই! আমাদের কেনারাম তর্করত্ন বলিতেন যে, "জায়াহি জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" তাহা ঠিক কথা। আহা কি কথাই তিনি বলিয়াছেন! এমন মধুর কথা আর কাহারও মুখে শুনি নাই!"

পিতার এইরূপ ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুদ্ধিমতী বিজয়া বুঝিল, পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার ইচ্ছায় এইগুলি পিতার ছলমাত্র। সে একদিন ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল, "ওরূপ করিয়া ছল করা কেন? বলিলেই হয়, বিবাহ করিব। বুড়ো বয়সে, বুদ্ধিভ্রম অধঃপাতে গিয়েছে! এবার বিয়ে কর্‌লে, গ্রামের লোক গায়ে ধুলা দিবে। পাগল বলিয়া ছেলেগুলো হাততালি দিবে।"

সে কথায় গোপীনাথ ক্রোধে সে দিন আহার ত্যাগ করিল। ইহাতে বিজয়া তাহার জননীর নাম উল্লেখ করিয়া তারস্বরে ক্রন্দন করিয়া পাড়া তোলপাড় করিয়া তুলিল। বিমাতার জীবিতাবস্থায় তাহার সহিত বিজয়া ও রমানাথের প্রায়ই কোন্দল হইত। কিন্তু সে কোন্দল মনুষ্যজীবনের সাংসারিক শত কোলাহল-কলরবের সহিত সর্ব্বদা মিশাইয়া যাইয়া তাহার অভিনবত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সে সকল ঝগড়ায় আর পাড়ার কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ নিজ কার্য্য ধ্বংস করিয়া কেহই তাহাতে মন দিতে বাসনা করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া নিজ মূর্খত্বের পরিচয় প্রদানে ব্যগ্র হইত না; সুতরাং সেদিন বিজয়ার ক্রন্দনে পাড়ার কেহই কর্ণপাত করিল না।

দুই চারিদিন যায়, আহারের কালে একদিন কথায় কথায় গোপীনাথ বিজয়া ও রমানাথকে বলিল, "হলধরপুরে সরিষা খুব সস্তাদরে বিক্রয় হইতেছে, একশো মন সরিষা কিনিবার জন্য আমাকে সেখানে যাইতে হইবে। চারপাঁচ দিন বিলম্ব হইবে; দর সস্তা, এই সময় কিনিয়া রাখিতে পারিলে অনেক টাকা লাভ হইবে।"

সে কথায় রমানাথ নিরুত্তর রহিল। বিজয়া গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল, গোপীনাথ তাহা দেখিতে পাইল না।

ঘটকের সহিত গোপীনাথের বন্দবস্ত ছিল, ঘটক বিশে ফাল্গুন বিকালে গ্রামের প্রান্তস্থিত নদীতে নৌকা লইয়া আসিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিবে। ঘটকের কথার ঠিক ছিল, তিনি উক্ত দিবসে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘাটে নৌকা লাগাইয়া গোপীনাথকে চুপি চুপি লইয়া যাইতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। গোপী-

নাথ একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগে গোপনে বহু টাকার নোট ও তাহার মৃতপত্নীর অলঙ্কারের বাক্স লইয়া "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া নৌকারোহণ পূর্ব্বক সেই লোকের সহিত যাত্রা করিল। লোকে জানিল, গোপীনাথ সর্ষপ ক্রয় করিতে হলধরপুরে গেল।

হায়! গোপীনাথ, তুমি যে সর্ষপ ক্রয় করিতে হলধরপুরে চলিলে, অলক্ষ্যে অবস্থিত মহাশক্তিশালী হলধরের হলচালনার গুণে সে সর্ষপ-বীজ তোমার সংসার ক্ষেত্রে উপ্তহইয়া একদিন বৃক্ষে পরিণত হওত যে কুসুম উৎপাদন করিবে সে কুসুম দর্শনে তোমার মনস্তাপের আর সীমা থাকিবে না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

আর্ত্তের আবাহন।

লেখক,—রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত।

গীত।

কীর্ত্তনের সুর।

জয় জয় জয় জগদ্‌গুরু, কাঙ্গালের ঠাকুর!
কল্পতরু, কৃপাসিন্ধু, ভাবনা কর দূর॥
ভক্তি দাও ও অভয় পায়ে, রাখ দীনে ও চরণ ছায়ে,
অলক্ষ্যে হে আমায় ছুঁয়ে, কর শুদ্ধ অন্তঃপুর॥
শক্তি দাও সত্য পালিতে, শান্তি দাও চঞ্চল-চিতে,
হেরে তোমায় সর্ব্বভূতে, যেন মরে কামাসুর॥
(সে দৈত্য যে বড়ই ভীষণ, আমার বুকের ভিতর জ্বালে আগুন,—
অন্তর্য্যামি, হে হৃদয়-স্বামি তার দর্প কর চূর।
আমি শরণাগত, অতি হে ভীত, পীড়িত আতুর॥)



স্বর্গীয় রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর।

লেখক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ রায়।

বঙ্গীয় গৌরব-মন্দিরের এক একটি উজ্জ্বলরত্ন একে একে খসিয়া পড়িতেছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ-বৈদ্যকুল-প্রদীপ, হাইকোর্টের এটর্ণী, নোটারি পাব্লিক, ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রের উপযুক্ত সম্পাদক, এবং বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নব-প্রচারিত "সুলভ সমাচার" নামক সাপ্তাহিক বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর বর্ত্তমান মাসের ষোড়শদিবসে ইহলোকপরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর আর এ জগতে নাই! বঙ্গভূমি আঁধার করিয়া আর্ত্ত বঙ্গবাসীকে কাঁদাইয়া ১লা জুলাই শনিবার অপরাহ্ণ ৫।৪৫ মিনিটের সময় নরেন্দ্রনাথের পুণ্যপূত আত্মা ভগবৎ সমীপে গিয়াছেন, অনেক দিনের পরিশ্রমের পর জগৎপাতার ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়াছেন। গৌরিভা গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ সেন বংশে নরেন্দ্র বাবু ১৮৪৩ সালের ২৩এ ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ৺রামকমল সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বনাম প্রসিদ্ধ হরিমোহন সেন মহাশয়ের ৪র্থ পুত্র। ৺রামকমল সেন হইতেই এ বংশের খ্যাতি প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়।

রামকমলের জ্যেষ্ঠপুত্র (নরেন্দ্র বাবুর পিতা) ৺হরিমোহনবাবু এক সময়ে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন এবং নানা সরকারি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন ; তৎপরে জয়পুরাধিপতি মহারাজা রামসিংহের সময়ে তিনি বহুদিন যাবৎ জয়পুর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ও ভাগ্য বিধাতারূপে বিরাজ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সেই পুণ্যাত্মার বংশধর। রামকমলের বংশে অনেকগুলি কমল ফুটিয়াছিল, তন্মধ্যে নরেন্দ্রনাথ একতম। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন অন্যতম। ইংরাজীশিক্ষার বিস্তৃতি এ বংশে এত অধিক হইয়া পড়িল যে, এ বংশে সকলেই স্বনামপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন। নরেন্দ্রনাথের পিতা শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত, অগ্রজ সহোদর যদুনাথ, পিতৃব্যপুত্র কেশবচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সকলেই সুশিক্ষিত ; কাজেই নরেন্দ্রনাথও তাঁহাদের পদানুসরণে সরস্বতী সেবায় আত্মোৎসর্গ করিলেন। অতি শৈশব কালেই তিনি বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতার হিন্দু কলেজে প্রেরিত হইলেন। ঐ স্থানে পাঠকালে অশেষ বুদ্ধিমত্তা, অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু অবস্থা ও ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য মানবের ভাগ্যে সকল সময়ে ঘটে না। বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, সে স্বাস্থ্য কৈশোরে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ষোড়শ বৎসর বয়সেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কলেজ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। স্বাস্থ্যভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু নরেন্দ্রনাথের উদ্যম ভঙ্গ হয় নাই, বাল্যাবধি তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও জ্ঞানপিপাসু। কলেজ ছাড়িলেন বটে, কিন্তু তিনি বিদ্যাচর্চ্চা ত্যাগ করিলেন না, বরং কলেজে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকই পড়িতে পাইতেন। কলেজ ত্যাগ করিয়া আপন ইচ্ছামত অন্যান্য বহু পুস্তক পাঠের অবসর পাইলেন। জ্ঞানপিপাসা ক্রমশঃ যতই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, নরেন্দ্রনাথের পুস্তক পাঠের ততই একাগ্রতা প্রগাঢ়তর হইয়া উঠিল। হরিমোহনবাবু পুত্রের শিক্ষার্থে কাপ্তেন পামর সাহেবকে নরেন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তৎকালে পামর সাহেব অপেক্ষা যোগ্যতর শিক্ষিত ব্যক্তি বঙ্গদেশে অতি বিরল ছিল। কাপ্তেন রিচার্ডসনের নিম্নেই তাঁহার আসন গণিত হইতে পারে। তাদৃশ সুশিক্ষকের সুশিক্ষার ফলে নরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ জ্ঞান ও কীর্ত্তির ভিত্তি গঠিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথের পিতৃব্য ৺মুরলীধর সেন হাইকোর্টের এটর্ণি ছিলেন ; তাঁহার পরামর্শ মতে ২০ বৎসর বয়সে নরেন্দ্রনাথ হাইকোর্টের অন্যতম এটর্ণি উইলিয়ম এন্‌লি সাহেবের নিকট তিনি আর্টিকেল্‌ড ক্লার্ক অর্থাৎ এটর্ণি কার্য্যের শিক্ষানবীশ হইলেন ; যথাসময়ে তিনি এটর্ণি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, স্বয়ং আপিস স্থাপন করেন।

নরেন্দ্রনাথ বাবু ব্যবহারাজীবের ব্যবসা করিতেন বটে—কিন্তু, তাঁহার লক্ষ ছিল অন্য দিকে। কাপ্তেন পামরের উপদেশক্রমে সংবাদপত্র পরিচালনা একটা আদর্শ কর্ম্ম বলিয়া নরেন্দ্রনাথের ধারণা হইয়াছিল। তৎকালিক কয়েকখানি ইংরাজের ইংরাজী সংবাদপত্রে নরেন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখিতেন। এমন সময়ে তাঁহার এক সুযোগ উপস্থিত হইল। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে মহাত্মা মনোমোহন ঘোষ মহোদয় মিরার পত্র পাক্ষিক নিয়মে বাহির করেন। নরেন্দ্রনাথের পিতৃব্যপুত্র কেশবচন্দ্র মনোমোহনের দক্ষিণ হস্ত। কেশবচন্দ্র নরেন্দ্রনাথের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জানিতেন। তিনি কনিষ্ঠ নরেন্দ্রনাথকেও মিরারপত্রের সম্পাদন ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট করিয়া লই-লেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থসাহায্যে মিরার চলিতে লাগিল; এবং মনো-মোহন, কেশবচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথের ওজস্বিনী ভাষায় দেশের অভাব অনুযোগ, আবেদন, নিবেদন মিরারের স্তম্ভ পূর্ণ হইয়া বাঙ্গালীর গৌরবঘোষণা করিতে লাগিল। দেশীয় লোকে বিদেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র চালাইতেছে, দেখিয়া সকলেই-আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। মিরারই বাঙ্গালী চালিত প্রথম ইংরাজী সংবাদপত্র। তখন ঈশ্বর গুপ্তের "সংবাদ প্রভাকর" তদীয় ভাগিনেয় শশীভূষণ রায় চালিত 'কাঁচড়া পাড়া পত্রিকা', দারকানাথ বিদ্যাভূষণ চালিত 'সোম-প্রকাশ' এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রভৃতি কয়েকখানি পত্র প্রচারিত ছিল। কিন্তু রাজকর্ম্মচারিগণ বাঙ্গালা কাগজের মর্ম্ম সকল সময় বুঝিতেন না; কাজেই মিরার অল্প দিনে সকলেরই দৃষ্টি ও চিত্তা-কর্ষণ করিল। অল্প দিন মধ্যেই মিরার সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হইল। ঐ সময়ে মিরারের কার্য্য বাড়িল, কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই মনোমোহন ঘোষ বিদ্যাশিক্ষার্থ ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। মিরারের দায়িত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় কার্য্য কেশব ও নরেন্দ্র দুই ভ্রাতার উপর ন্যস্ত হইল। কিছুদিন পরেই মিরার দৈনিক হইল। কার্য্য-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কেশবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সহকারী সম্পাদকরূপে গৃহীত হইলেন। ধর্ম্মপ্রচার, নানা দেশ ভ্রমণাদি ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় কেশবচন্দ্রের অবকাশ না থাকায় নরেন্দ্রনাথের উপরেই মিরারের সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত হইল। তদবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নরেন্দ্রনাথ মিরারের কাণ্ডারী ছিলেন। বলাই বাহুল্য, ব্রাহ্মদিগের প্রবর্ত্তিত মিরারপত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা বিশেষ ভাবে লিখিত থাকায়, তাহা সর্ব্বসাধারণের মনোমত হয় নাই। সেই অভাব দূরীকরণার্থ দৈনিক-মিরার হইলে, রবিবারের মিরারপত্রখানি "Sunday Mirror" নামে কৃষ্ণবিহারী সেন কর্ত্তৃক চালিত হইতে লাগিল, এবং অন্য ছয় দিবস দৈনিক-

মিরার নরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া নিরপেক্ষভাবে সকল ধর্ম্মেরই সারবত্তা এবং উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝাইয়া দিতে লাগিল। সর্ব্বজীবে দয়া, সকল ধর্ম্মে অদ্বেষভাব, সকল জাতির প্রতি ভ্রাতৃভাব এক মিরারের মনস্বী নরেন্দ্রনাথই দেখাইয়াছেন। মিরার এইভাবে আরও কিছুদিন চলে, তৎপরে Unity Minister নামক ব্রাহ্ম পত্র বাহির হওয়ায় Sunday Mirror ও নরেন্দ্রবাবুর সত্ব হইয়া পড়িল। নির্ভীক নরেন্দ্রনাথ দুর্ব্বলের সহায়, নির্ধনের বন্ধু ও সত্যের দাস ছিলেন। যাহা সত্য ও গ্রাহ্য বলিয়া বুঝিতেন সে কর্ম্মের বিরুদ্ধে শত জন বিরুদ্ধ থাকিলেও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে, দুঃখীর দুঃখমোচন করিতে তাঁহার লেখনী ও ভাণ্ডার সর্ব্বদা উন্মুক্ত ছিল। সায়ত্ব-শাসন (Local self Govt,) নরেন্দ্রবাবুরই তীব্র লেখনীর ফল। ভ্রমপ্রমাদ মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ হইতে পারে, নরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনে কোন না কোন ভ্রম হইয়াছে। দুই মানবের মধ্যেই যখন মতদ্বৈধ ঘটে, তখন নরেন্দ্রনাথের অন্যান্য পত্রিকা-সম্পাদকের সহিত যে মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে, তাহা বিচিত্র নহে, কিন্তু সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, নরেন্দ্রনাথ যাহা সত্য ও ন্যায্য মনে করিতেন, সেই কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতেন। অসত্য বা অন্যায় কর্ম্মে স্বার্থান্ধ হইয়া কখন লেখনীচালন করেন নাই। উদার বৃটিশ গভর্ণমেন্টের রাজত্বে নানা ধর্ম্মী নানা জাতির বাস। উদার নৈতিক নরেন্দ্রনাথ বিনা পক্ষপাতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম সকল সম্প্রদায়েরই স্বার্থ যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে, সেইরূপ চেষ্টাই করিয়াছেন। বসুধা শুদ্ধ লোকেই তাঁর কুটুম্ব। তিনি আত্মপর ভেদ করিয়া ভেদনীতির পন্থায় চলেন নাই। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের, সকল ধর্ম্মীর মঙ্গলকামনা করিয়াছেন। তাই আজ আকুমারিকা হিমাচলান্ত ও আব্রহ্ম পঞ্চনদান্ত ভারতবাসী মাত্রেই তাঁহার শোকে সন্তপ্ত। অনেক লোকে সংবাদপত্র চালান, লাভের খাতিরে, ব্যবসার খাতিরে; কিন্তু নরেন্দ্রনাথ মিরারের জন্য লাভজনক এটর্ণি ব্যবসা বহুদিন পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়া সম্পাদকের ব্রতে একান্ত নিযুক্ত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ-কাল দেশের কল্যাণসাধনে নরেন্দ্রবাবু যেরূপ অমিত পরিশ্রম করিয়াছেন। গত বৎসর মিরারের ৫০ বর্ষীয় জন্মোৎসবে ভারতের গুণগ্রাহী মানব মাত্রেরই প্রশংসা-বাদে তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে।

নরেন্দ্রবাবু যে কেবল লেখনী চালনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, এমত নহে; দেশ-হিতকর অনুষ্ঠানে সভাসমিতিতে নরেন্দ্রনাথ সদাই অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। সমাজ-

সংস্কার, ধর্ম্মসভা, রাজনৈতিক ও স্বায়ত্ত শাসন ব্যাপারেও সতত যোগদান করিতেন। বহু বৎসর যাবত তিনি ৯নং ওয়ার্ডের কমিশনার ছিলেন এবং কলিকাতা মিউনিসিপালিটি হইতে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। নরেন্দ্রনাথ যথার্থ একজন কর্ম্মবীর, দেশের সেবায়, দশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া খাটিয়া গিয়াছেন, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত খাটুনির বিরাম ছিল না। তিনি দেশের কি উন্নতি, কি উপকার করিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গের বিবেচ্য, তবে ইহা ধ্রুবসত্য যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের দুর্দ্দিনে নরেন্দ্রনাথ যে দেশের ইষ্টসাধনকল্পে লেখনীধারণ করিয়াছিলেন, আজ সে দেশ তাৎকালাপেক্ষা অনেক শিক্ষিত ও ও উন্নত হইয়াছে। নরেন্দ্রনাথ এক সময়ে কংগ্রেস দলের একজন প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন; কিন্তু শেষজীবনে কংগ্রেসের দলাদলি ও মতভেদ হওয়ায় নরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের সংশ্রব একেবারে ত্যাগ না করিলেও, একটু যেন তফাতে তফাতে থাকিতেন। নরেন্দ্রনাথ ধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ, দেশহিতৈষী এবং প্রগাঢ় রাজভক্ত ছিলেন। দেশের উন্নতিকল্পে, নরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় ধনী জমীদারগণের সাহায্যে যে এসোসিয়েসন স্থাপিত হইয়াছে, তাহার ফলে বহু শিক্ষিত, দরিদ্র বালক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বহুদেশে প্রেরিত হইয়া তথাকার প্রধান প্রধান বিদ্যালয় ও কারখানা হইতে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও শিল্পী হইয়া দেশে ফিরিয়া বহু প্রকারের ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত আছেন। দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য নরেন্দ্রনাথের চেষ্টা। স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্ব্বে ইহা তাঁহার দেশ-হিতৈষণা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পরিচায়ক, অথচ নরেন্দ্রনাথ দেশের হিতের জন্য রাজভক্তের আদর্শ হইয়াছিলেন। সেই গুণের পুরস্কার তাঁহার "রায় বাহাদুর" উপাধি। রাজা প্রজায় সৌহৃদ্য অধিকতর দৃঢ়করণ মানসে দেশে শান্তি অক্ষুন্ন রাখিতে তিনি অদম্য উৎসাহে, অমিত পরিশ্রমে লেখনী চালাইয়াছেন; লোকের শ্লেষ গ্রাহ্য করেন নাই; তিনি যাহা মনে ভাল বুঝিছিলেন, তাহাই করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মানুগতপ্রাণ শান্তিপ্রিয়, তিনি সেই শান্তি স্থাপনেরই উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। শান্তিপ্রিয় রাজভক্ত ভারতবাসীর নিকট তিনি ধন্যবাদার্হ। ধর্ম্মের মহিমা বর্দ্ধনার্থ তিনি যোগধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মে আনুরক্তি থাকিলেও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি নরেন্দ্রনাথের সবিশেষ আস্থা ছিল। একটি প্রমাণ আমরা এই স্থলে উল্লেখ করিব। হিন্দুর শ্মশান অতি পবিত্র স্থান; রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, ইতর, ভদ্র, সমস্ত লোকের

অন্তিম শয্যা সুপবিত্র শ্মশানভূমি। কলিকাতা নগরে দুটি শ্মশানঘাট আছে,—নিমতলার ঘাট ও কাশীমিত্রের ঘাট। নগরবাসীর সমস্ত হিন্দুর শব এই দুই শ্মশানে ভস্মীভূত হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার অনুরোধে শ্রীবৃদ্ধিকারী মিউনিসিপালিটির কর্ত্তারা এই দুই শ্মশানের চিতাভস্ম ও অঙ্গারাদি স্থানান্তরিত করিবার নিয়ম করিয়াছেন। উত্তম নিয়ম; কিন্তু স্থানান্তরিত হয় কোথায়? ধাপার মাঠে! মেথর মুদ্দফরাসেরা ময়লা ফেলা গাড়ীতে তুলিয়া, ধাপার মাঠে লইয়া গিয়া গলিত মৃত পশু ও বিষ্ঠামুত্রের মধ্যে নিক্ষেপ করে। রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর যখন কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কমিশনার ছিলেন, সেই সময় ঐ বীর্ভৎস ব্যাপার স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রাণে নিদারুণ বেদনা অনুভূত হইয়াছিল। হিন্দুর পরমারাধ্য জনকজননী ও স্নেহাস্পদ পুত্রকন্যা প্রভৃতির অন্তিম চিতাভস্ম (যাহা স্বসম্পর্কীয় আত্মীয় কুটুম্বব্যতীত অপর কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না, তাহা) ঐরূপে মেথর মুদ্দফরাসের দ্বারায় নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়, ইহা যারপরনাই শোচনীয় ব্যাপার। আরও শোচনীয় ব্যাপার এই যে নগরের হিন্দুমণ্ডলী ও মিউনিসিপালিটির হিন্দু কমিশনারমণ্ডলী তদ্বিষয়ের প্রতিবিধানে কিছুমাত্র যত্ন করেন নাই, প্রকারান্তরে আলস্য ঔদাস্যের অভিনয় করিয়াছিলেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন আন্তরিক যত্নে উদ্যমশীল হইয়া সেই সকল চিতাভস্ম যাহাতে গঙ্গাসাগরে নিক্ষেপ্ত হইবার উপায় হয়, তাহার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দুইখানি বড় বড় নৌকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই নৌকাযোগে যাবতীয় চিতাভস্ম গঙ্গাসাগরে প্রেরিত হইত; এক্ষণে সেই দুইখানি নৌকা কোথায়? আবার সেই ধাপার মাঠে, সেই স্যাভেঞ্জার! মিউনিসিপালিটির হিন্দু কমিশনার মহোদয়েরা বাবু নরেন্দ্রনাথের সমাদৃত কীর্ত্তিটি পুনঃ জাগরিত করেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়!

নরেন্দ্রনাথের শেষকার্য্য "সুলভ-সমাচার" প্রচার। গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালাভাষার একখানি পত্রিকা প্রচারে মনন করেন। উদ্দেশ্য গভর্ণমেণ্টের কার্য্যাবলী অবিকৃতভাবে প্রকাশ ও নীতিশিক্ষা দান। গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল, "সুলভ সমাচার" প্রচারিত হইল। নরেন্দ্রনাথের রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ সুলভ সমাচারের ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত হইল।

শ্মশানঘাটে নরেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি শেষ দর্শনাভিলাষে বহু সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন, তাঁহার স্মৃতি রহিল। কর্ম্মবীরের কর্ম্ম শেষ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া রহিল। ইহাই তাঁহার শোকার্ত্ত

সন্তানসন্ততি ও সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর সান্ত্বনা। মহাকবি মধুসূদন বলিয়াছেন :—

"সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

নরেন্দ্রনাথ তুমি এক্ষণে ভগবানের পদছায়ায় আশ্রয় পাইয়াছ। অনন্তশান্তি উপভোগ কর।

স্বর্গীয় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী রায়বাহাদুর।

রায় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর। এই রত্নটি বর্ত্তমান মাসের চতুর্ব্বিংশ দিবসে ৺কাশীধামে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বহু সম্পন্ন সম্মানিত প্রাচীন কুলীন কায়স্থ বংশসম্ভূত ছিলেন। বৈষয়িক জগতে তাঁহার প্রথম পরিচয় লক্ষ্ণৌ নগরে। লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও ব্যবহার শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। অযোধ্যার তালুকদারি সভার সহিত তাঁহার সবিশেষ সহানুভূতি ছিল। রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় যৎকালে অযোধ্যার তালুকদারগণের বিরোধ-ভঞ্জনার্থ প্রকৃত সত্য নিরূপণের সুবন্দোবস্ত করেন, বাবু রাজকুমার তৎকালে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া, প্রত্যেক কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন; তৎপ্রণীত "তালুকদারি বন্দোবস্ত" নামক পুস্তক তাঁহার একটি কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এতৎদেশ-প্রচলিত ব্যবহার শাস্ত্রে তাঁহার সবিশেষ বুৎপত্তি ছিল; "হিন্দুর উত্তরাধিকার" সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি এতদ্দেশের বিচারপতি ও ব্যবহারাজীবগণের বিস্তর উপকার সাধন করিয়াছেন।

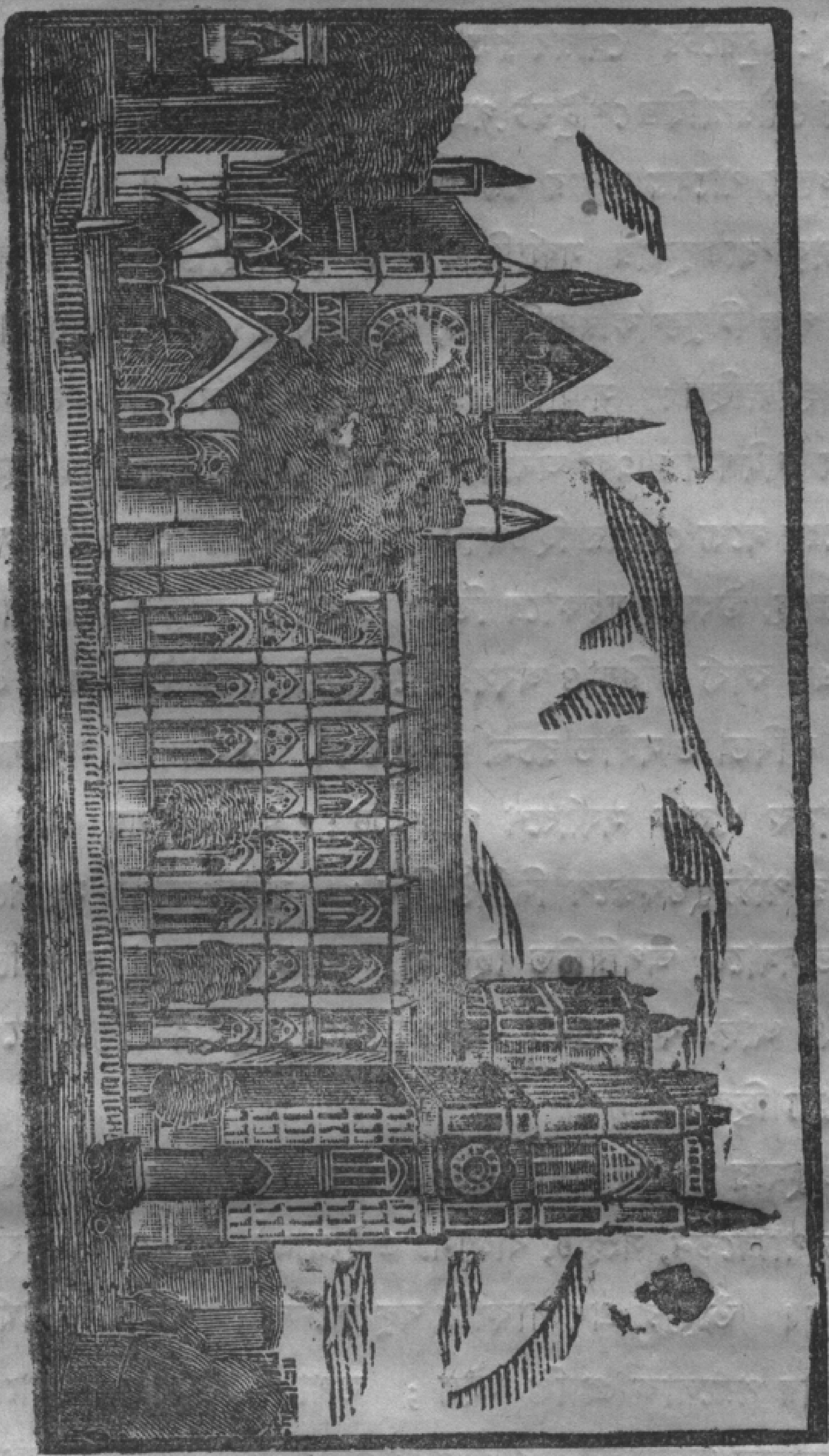
লক্ষ্ণৌ হইতে তাঁহার কলিকাতায় আগমন। রায় বাহাদুর কৃষ্ণদাস পাল যে সময় অন্তিম পীড়ায় শয্যাগত, সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের দক্ষতা ও যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ সেই সময় তিনি হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রের সম্পাদন ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন, তদবধি প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বিশেষ যোগ্যতার

সহিত "হিন্দু পেট্রিয়টের" গৌরব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; তাঁহারই উদ্যমে, তাঁহারই যত্নে গৌরবান্বিত পেট্রিয়ট পত্রখানি দৈনিক নিয়মে প্রচারিত হইতেছে।

বাবু কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুর পর গুণপক্ষপাতি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, বাবু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীকে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন সভার সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তৎকার্য্যেও তাঁহার প্রশংসনীয় পারদর্শিতার পরিচয় হইয়াছিল। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, মিউনিসিপাল কমিশনার এবং অনারারি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে দেশের হিতকামনায় কলিকাতায় যে সকল সভা-সমিতির অনুষ্ঠান হইয়াছে, উৎসাহ সহকারে তিনি তৎসমস্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। এত কার্য্য করিয়াও অবসরকালে তিনি উত্তম উত্তম গ্রন্থ প্রণয়ন এবং সুন্দর সুন্দর কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিতেন। তৎপ্রণীত "ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী" নামক পুস্তক সর্ব্বাংশে পরিপাটি; কয়েকবৎসর সেই পুস্তক খানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের কবিত্ব-শক্তি সাহিত্যসমাজে অপরিচিত ছিল না, গুণজ্ঞ লোকেরা তদ্বিরচিত কাব্য ও সঙ্গীতের যথেষ্ট আদর করিতেন। শুনা গিয়াছে, সু-স্বর সঙ্গীতালাপেও তাঁহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য ছিল।

রায় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর স্বীয় শিষ্টাচার গুণে সর্ব্বজনের মনো-রঞ্জন করিতে পারিতেন, সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার সবিশেষ অধিকার ছিল। তাঁহার প্রশংসাকারি বন্ধু অনেক; যদিও সুদীর্ঘ ৭২ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইল; তথাপি তাঁহার বিয়োগে বন্ধুমণ্ডলী অতিশয় শোকাকুল হইয়াছেন। বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী তাঁহার সহোদর ছিলেন। শোকাকুল পরিবারবর্গকে শান্তনা দান করিয়া আমরা উপরত সৎগুণশালী মহানুভবের আত্মার পরলোকে নিত্যশান্তি কামনা করিতেছি।

ভারত সম্রাটের অভিষেক-মন্দির।



ওয়েষ্ট মিনষ্টার অবি।

বিলাতের এই "ওয়েষ্টমিনষ্টার আবি" নামক গির্জ্জায় পূর্ব্বপ্রথানুসারে আমাদের সম্রাট ও সম্রাট মহিষীর রাজ্যাভিষেক কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

অভিষেক।

বিপুল শোকোচ্ছ্বাসের অব্যবহিত পরে বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস, সংসারে মধ্যে মধ্যে এমন ঘটনা হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের রাজবংশে তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গেল। দশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে রাজরাজেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বর্গধামে প্রয়াণ করেন, পরিচিত জগতের সমস্ত লোক মহাশোকে

সমাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। এক বৎসর পরে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট তারিখে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আলবার্ট এডওয়ার্ড,—সপ্তম এডওয়ার্ড উপাধি ধারণ করিয়া ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন; তদুপলক্ষে জগতের চারিখণ্ডের দেশপ্রদেশ ব্যাপী মহানন্দধ্বনিতে জয়যুক্ত ইংলণ্ড রাজ্য প্রতিনিধ্বত হইয়াছিল। সে আনন্দপ্রবাহের স্রোত মন্দীভূত হইবার অল্পদিন পরেই গত বৎসর সেই গৌরবান্বিত শান্তিসুহৃৎ নরপতি সপ্তম এডওয়ার্ড অকস্মাৎ লোকলীলা সম্বরণ করিলেন, সমগ্র বৃটিশ-সাম্রাজ্য ও বৈদেশিক রাজ্যসমূহ নিদারুণ শোক-বজ্রাঘাতে মুহ্যমান হইয়াছিল, সম্প্রতি এই বৎসরের জুন মাসের দ্বাবিংশ দিবসে (বঙ্গাব্দের বর্ত্তমান আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে) বৃহস্পতিবাসরে তাঁহার সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্‌স পঞ্চমজর্জ্জ উপাধি ধারণপূর্ব্বক অতুল সমারোহে রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। এই অভিষেক উপলক্ষে লণ্ডন নগরে যেরূপ সমারোহ হইয়াছিল, গত দুই শত বৎসরের মধ্যে তাদৃশ সমারোহ কেহ কখন দেখেন নাই। রাজা প্রথম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেকে কুলপদ্ধতিমতে সমারোহ হইয়াছিল, রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জের অভিষেকেও সমারোহের অঙ্গ হীন হয় নাই, রাজা তৃতীয় জর্জ্জ (মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পিতামহ) যখন রাজ্যাভিষিক্ত হন, তখনও মহানগর লণ্ডন মহাশোভায় পূর্ণ ও মহানন্দে পরিপ্লুত হইয়াছিল। বহুদিনের পর রাজা তৃতীয় জর্জ্জের সুদীর্ঘকালব্যাপী রাজত্ব গৌরবে একটি জুবিলী হইয়াছিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে রাজা চতুর্থ জর্জ্জের অভিষেক সময়েও শোভা-সমৃদ্ধির ত্রুটি হয় নাই, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বালিকা রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া যখন রাজ পিতৃব্যের উত্তরাধিকারিণী হইয়া ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করেন, তখনও সমধিক সমারোহে সমস্ত লোক পরমানন্দে বিমোহিত হইয়াছিলেন, মহিমান্বিতা ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতবর্ষের মহারাণী (Empress of India) উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক অক্ষুণ্ণ প্রতাপে বহু বিস্তৃত রাজ্য নিরপেক্ষভাবে পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বকাল ৬২ বৎসর। রাজারাণীর পঞ্চাশ বৎসর রাজ্যভোগে এক একটী জুবিলী হয়, পঞ্চাশৎ বৎসরে ভারতেশ্বরীর প্রথম জুবিলী, দশ বৎসর পরে ষষ্টি বৎসর রাজত্বগৌরবে হীরকজুবিলী নামে দ্বিতীয় জুবিলী হইয়াছিল। তৎপরে সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক। সে অভিষেকে যেরূপ মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, বহুলোক তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত অভিষেকের উৎসবের সহিত বর্ত্তমান নরপতি পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক উৎসবের তুলনা করিলে

এই উৎসবটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। এই উৎসবে কিরূপ মহাব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করা হইল।

অভিষেকের দিন ছিল ২২শে জুন বৃহস্পতিবার। ৬ মাস পূর্ব্ব হইতেই মহা-মহোৎসবের আয়োজন হইতেছিল। রজনী প্রভাত হইলেই নগরে মহানন্দ বিঘোষিত হইবে, কতই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিব, এই উল্লাসে লণ্ডন নগরের অধিবাসীবর্গ ২১শে জুন বুধবার রাত্রিকালে নিদ্রা পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন, সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়া প্রভাতে সমারোহ দর্শন পিপাসায় আনন্দ উৎসাহে তাঁহারা উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। অভিষেকের রজনীতে সুবিস্তৃত মহা নগর বিচিত্র আলোক-মালায় বিভূষিত হইবে, নমুনাপ্রদর্শনার্থ বুধবার রজনীতে সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রে সহস্র সহস্র দীপমালা প্রজ্জ্বলিত করা হইয়াছিল, সেই রজনীতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অল্পাধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে কিন্তু আলোকমালার নমুনা প্রদর্শনের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

বুধবারের রজনী প্রভাত হইবামাত্র সেণ্ট জেম্‌স দুর্গ হইতে ভীমগর্জ্জনে এক-বিংশতি তোপধ্বনি হইল, পরক্ষণেই একচত্বরিংশ কামান গর্জ্জন; ওয়েষ্ট-মিনষ্টার আবিমন্দিরের তোরনদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল; নগরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে মিলিত হইয়া মন্দিরাভিমুখে ধাবিত হইল; এমন কি, যাহাদের দেহ রুগ্ন, বয়সে যাহারা অথর্ব্ব, তাহারাও এক একটি যষ্টির উপর ভর দিয়া শোভা-দর্শনার্থ আনন্দে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। রাজপথের জন-স্রোত যেন জলধিস্রোত বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল।

রাজবর্ত্ম সমূহের অপরূপ শোভা। উভয়পার্শ্বে স্বর্ণমণ্ডিত স্তম্ভ, স্বর্ণমণ্ডিত দণ্ডশ্রেণী বদ্ধ; স্তম্ভদণ্ড-গাত্রে মনোহর পুষ্পমাল্য দোদুল্যমান, বিচিত্র পত্র পুষ্পে পরিশোভিত প্রত্যেক দণ্ডের মস্তকোপরি কাঞ্চনমণ্ডিত মুকুট, সর্ব্বোপরি বিচিত্র বর্ণের ধ্বজপতাকা উড্ডীয়মান।

নানাদিকে দেশীয় রাজা, রাজমাতা, প্রধান প্রধান বিচারক, ধর্ম্মযাজক, সেনানায়ক নৌবাহিনীপতি এবং ভিন্ন ভিন্ন উপাধিধারী অসংখ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন। লণ্ডনের সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইয়াছে, আবিমন্দিরের ভিতর ও বাহিরে অন্যূন ৭০ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল।

কিংবদন্তী-প্রমাণে আবি মন্দিরের উৎপত্তির একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।

প্রভু যীশুখৃষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পরে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়; প্রতিষ্ঠার দিন প্রাতঃকালে একজন মৎস্যজীবী তরণীযোগে নদী পার হইয়া একটি ভদ্রলোক সেই স্থানে উপস্থিত হন; সমবেত ভদ্রলোকগণকে তিনি বলিলেন, "আমি স্বর্গধাম হইতে আসিতেছি, আমার নাম সেণ্টপিটার; আমিই জগতপিতার মহিমা প্রচারার্থ এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইলাম; অদ্যাবধি ইহা ঈশ্বরের কার্য্যে ও রাজকার্য্যে পরমপবিত্র স্থান বলিয়া গণ্য হইবে।" কিংবদন্তী যাহা বলে, প্রকৃতপক্ষে তাহাই প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে।

বেলা ৬॥ টা সময় সম্ভ্রান্ত সম্ভ্রান্ত মাননীয় ব্যক্তিগণ আবিমন্দিরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন; রাজপথে অসংখ্য সুসজ্জিত শকট, বিচিত্র বর্ণের পরিচ্ছদধারী শ্রেণীবদ্ধ অস্ত্রপাণি অশ্বারোহী; তৎভিন্ন অগণিত পন্থাবাহিলোক। বেলা ৭॥ টার সময় ওয়েষ্ট মিনষ্টার আবিমন্দির জনপূর্ণ হইয়া আসিল; হাইড পার্ক, সেণ্ট-জেম্‌স স্কোয়ার এবং ট্রাফলগার স্কোয়ার জনস্রোতে পরিপূর্ণ হইল। জনতাপ্রবাহ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাদৃশ মহা জনতাস্থলে আশানুরূপ শান্তির ব্যবস্থা করা অতি দুরূহ ব্যাপার। মহা প্রশংসার বিষয়, ভারতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনার এবং বীরবর লর্ড রবার্ট ৫৫ হাজার সৈন্য নির্ব্বাচন করিয়া সাধারণ শান্তিরক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হাইড পার্ক এবং ট্রাফলগার স্কোয়ারের নিরাপদ বিধানার্থ দুই দল অতিরিক্ত অস্ত্রধারী পুলিশ সৈন্য নিযুক্ত রাখা হইয়াছিল।

বেলা ৮॥ টার কিঞ্চিত পূর্ব্বে দুর্গপ্রাসাদ হইতে বজ্রনিনাদে তোপধ্বনি আরম্ভ হইল, গগনভেদী উচ্চশব্দে জয়বাদ্য বাজিতে লাগিল; দর্শকলোকেরা জয় জয় রবে কোলাহল করিয়া উঠিল; সকলেই বলা বলি করিল, এইবার রাজা আসিতেছেন।

রাজা আসিবার পূর্ব্বক্ষণে অশ্বারোহী পতাকাধারী শ্রেণীবদ্ধ সুসজ্জিত প্রহরীদল শ্রেণীবদ্ধ। বিবিধ যন্ত্রসহ বিবিধ বাদ্যকরদল দুই ধারে দণ্ডায়মান। যাঁহারা সিংহাসন গৃহে প্রবেশ করিবার অধিকারী, রাজমন্ত্রী, লর্ড, ডিউক, ধর্ম্মযাজক দেশ বিদেশীয় সেনাপতি এবং প্রিভি কাউন্সেলের বিচারপতি প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন; পুনরায় ঘন ঘন কামান গর্জ্জিল, তালে তালে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া উঠিল। সুমধুর স্বরে জাতীয় সঙ্গীত গীত হইতে আরম্ভ হইল, চতুরঙ্গদল সমভিব্যাহারে অষ্টাশ্বযোজিত স্বর্ণমণ্ডিত সুসজ্জিত শকটে রাজা

ও রাজ্ঞী আবিমন্দিরের তোরণদ্বারে উপনীত হইলেন; প্রধান প্রধান যাজকগণ ও মন্ত্রীগণ দ্বারে উপস্থিত হইয়া মহাসম্মানে রাজদম্পতির অভ্যর্থনা করিলেন। রাজদম্পতি সভামণ্ডপে মণিমুক্তাখচিত চন্দ্রাতপতলে সুবিচিত্র গালিচার উপর দণ্ডায়মান হইলেন। যাজকসম্প্রদায়ের দ্বিতীয় আচার্য্য এবং ক্যাণ্টারবরীর আর্চ্চ-বিশপ কিয়ৎক্ষণ ভক্তিভাবে প্রার্থনা-স্তোত্র পাঠ করিলেন; রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও রাজ্ঞী মেরী সেই স্থানে জানু পাতিয়া বসিয়া নিমিলিত নেত্রে ক্ষণকাল জগদী-শ্বরের ধ্যান করিলেন; আর্চ্চবিশপ অতঃপর রাজার হস্তে ধর্ম্মপুস্তক (বাইবেল) অর্পণ করিয়া পদ্ধতিমত শপথ করাইলেন; অনন্তর তাঁহার শিরোদেশে রাজ-মুকুট * পরাইয়া দিলেন, গভীর নিঃস্বনে জলদ গর্জ্জন সদৃশ শতাধিক তোপধ্বনি হইল, পুনরায় জাতীয় সঙ্গীত গীত হইল; গীতের মর্ম্ম "পরমেশ্বর আমাদের রাজাকে ও রাজমহিষীকে নিরাপদে রক্ষা করুন।" মধুরতানে জয়বাদ্য বাজিতে লাগিল, ক্যাণ্টরবরীর আর্চ্চবিশপ মুকুটালঙ্কৃত নরপতির হস্তধরাণপূর্ব্বক রাজসিংহা-সনে স্থাপন করিলেন, রত্নমণ্ডিত রাজদণ্ড, রত্নকোষ যুক্ত তরবারি এবং স্বর্ণমণ্ডিত বাইবেল পার্শ্বদেশে সুরক্ষিত হইল। সুমধুরস্বরে অর্গেন বাজিল, সহস্র সহস্র বদনে

* ইংলণ্ডের রাজমুকুটে দ্বাদশটি মহারত্ন আছে।—কোন্ কোন্ মণির কি কি গুণ, তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রাজ্ঞী (Elizabeth) এলিজাবেথের রাজত্বকালে একজন মহানুভব বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত তাহা এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,—(Sardius) সারডিয়স্ রাঙ্গামাটির রং, রাজৈশ্বর্য্যপ্রদ, (Topaz) গোমেদক মণি সর্ব্ব রত্নবর্ণ, সর্ব্বসৎগুণপ্রদ; (Emerald) মরকত মণি, সবুজ বর্ণ, সুবিচারপ্রদ; (Chrysolite) পদ্মরাগমণি, স্বর্ণবর্ণ, ন্যায়-নীতিপ্রদ; (Chalcedony) ক্যাল্‌সিডানি মণি কঠিন, সম্পদেবিপদে ধৈর্য্যপ্রদ; (Jacynth) জাসিন্থ মণি, সৌরকরসংযুক্ত সলিলবর্ণ, মিতাচার ও দেবগুণপ্রদ; (Chrysoprase) ক্রাইসোপ্রেসমণি পীতহরিত মিশ্রবর্ণ, প্রজ্ঞা ও ধর্ম্মবিশ্বাসপ্রদ; (Beryl) বেরিল মণি হরিতপাণ্ডু মিশ্রবর্ণ, পরমেশ শক্তিপ্রদ; (Sapphire) নীলকান্ত মণি ঈষৎ নীলবর্ণ, জিতেন্দ্রিয়তা প্রদ; (Amethyst) এমিথিষ্ট মণি লাল, বেগুণি ও গোলাপীবর্ণ, রাজকর্ত্তব্যতা সৎগুণ-সৌর ও প্রজা প্রীতিপ্রদ; (Sardony) শ্বেত, লোহিত, কৃষ্ণ মিশ্রবর্ণ, নম্রতা, দানশীলতা ও সরলতাপ্রদ। মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার মহার্ঘ মুকুটে ভারতের কোহিনুর মণি শোভা পাইত; এখনও সেই সর্ব্বশুভগুণপ্রদ দুর্লভরত্ন ইংলণ্ডের রাজমুকুট অলঙ্কৃত করিতেছে।

জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। ওয়েষ্টমিনষ্টার আবি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সেই সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে রাজাকে অভিবাদনপূর্ব্বক ঈশ্বরের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিল। যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স সিংহাসন সমীপে উপস্থিত হইয়া পিতার মস্তকের রাজমুকুট স্পর্শ করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে চুম্বন করিলেন, রাজাও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন করিলেন। অতঃপর রাজপরিবারস্থ কুমার কুমারীগণ ঐরূপে রাজাকে অর্চ্চনা করিয়া স্নেহালিঙ্গন প্রাপ্ত হইলেন।

দশ মিনিট পরে সুবেশধারিণী সহচরীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া, দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত বিচিত্র দণ্ডহস্তে গৌরবিণী রাজ্ঞীমেরী সভামণ্ডপে পুনঃ প্রবেশ করিলেন; দুইখানি স্বর্ণ-সিংহাসন সংস্থাপিত ছিল, একখানিতে রাজা বসিয়াছেন, ক্যাণ্টার বরীর আর্চ্চবিশপ রাজ্ঞীর মস্তকে মুকুট পরাইয়া, সেই রাজসিংহাসনের বাম ভাগস্থ দ্বিতীয় সিংহাসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন। পুনর্ব্বার সমবেত জনগণের বহুকণ্ঠে উচ্চ জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইল, সেই জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মলা রাজভক্তি বিভাসিত হইল; পুনর্ব্বার বাদ্যোদ্যম, পুনর্ব্বার তোপধ্বনি, পুনর্ব্বার জাতীয় সঙ্গীতের আলাপ। সভাভূমি সে সময়ে যেন দেবসভার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল।

ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ওয়েল্‌স এবং আয়রলণ্ডের প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা, সামরিক পুরুষেরা, নাবিক পুরুষেরা, ধর্ম্মযাজকেরা, এবং আইনজ্ঞ বিচারক পুরুষেরা এই অভিষেক সভায় একত্র হইয়াছিলেন। জর্ম্মনির যুবরাজ, ফ্রান্স, প্রুসিয়া, অষ্ট্রেলিয়া রুষিয়া, আমেরিকা এবং জাপানপ্রভৃতি বৈদেশিক রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিয়াছিলেন; ভারতবর্ষের বরদারাজ্যের মহারাজ গুঁইকুমার, ইন্দোরের মহারাজ হোলকার, পাতিয়ালার মহারাজ, পদ্মকোটের রাজা, গণ্ডালের রাজাঠাকুর এবং ভূপালের বেগম প্রভৃতি সভায় সমাগত হইয়া ভারতের ভারত-সম্রাটের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

অভিষেক ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে রাজা ও রাজমহিষী পূর্ব্ববৎ অষ্টাশ্বযোজিত-রথে আরোহনপূর্ব্বক অনুযাত্রীবর্গ সমভিব্যাহারে আবিমন্দির হইতে বহির্গত হইলেন, সৈন্যাধ্যক্ষ, পোতাধ্যক্ষ, এবং সুশিক্ষিত সেনাদল অগ্রে অগ্রে চলিল। সাধারণ দর্শকবৃন্দ রাজভক্তি সূচক জয়ধ্বনি করিতে করিতে রাজদম্পতিকে ভূয়ো ভূয়ো অভিবাদন করিতে লাগিলেন, রাজদম্পতিও প্রসন্নবদনে মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক সকলকে প্রত্যাভিবাদন করিলেন। বাদ্যকরেরা রাজদম্পতির মঙ্গলসূচক

তালে তালে বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল; দুর্গ হইতে সম্মানসূচক তোপধ্বনি হইল, সমবেত সুমধুর মঙ্গলধ্বনিশ্রবণে সমস্ত লোকের অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়াছিল। তাদৃশী শোভাযাত্রার স্বরূপচিত্র প্রদর্শন করা ক্ষুদ্রলেখনীর অসাধ্য। আবিমন্দিরের মহাজনতা মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক হইয়াছিল। শান্তি-রক্ষকগণের সুবন্দোবস্তে যদিও দুর্ঘটনা অধিক হয় নাই, তথাপি সর্দ্দিগর্ম্মিতে অবসাঙ্গ ৮৮ জনকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করিতে হইয়াছিল, একটি বিবি অশ্ব হইতে পতিত হইয়া ভগ্নপদ হইয়াছিলেন, আর তিনটি মহিলা মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন। মহাজনতা ক্ষেত্রে তাদৃশ সামান্য দুর্ঘটনা বাস্তবিক ধর্ত্তব্যই হয় না।

শোভাযাত্রীগণের সহিত রাজা ও রাজমহিষী বকিংহাম প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, তথায় মুকুট উন্মোচন করিয়া প্রজারঞ্জন রাজা সাধারণ প্রজাবৃন্দকে দর্শন দিবার জন্য প্রাসাদস্থ একটি সুরম্য কক্ষের বাতায়ন পথে দণ্ডায়মান হইলেন; রাজবর্ত্ম হইতে প্রজাগণ ঊর্দ্ধমুখে প্রফুল্লনেত্রে রাজদর্শন লাভ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করিল, রাজাও সহাস্যবদনে প্রত্যাভিবাদন করিলেন। অপরাহ্ণে অলিম্পিয়ান অশ্ব প্রদর্শনী দর্শনার্থ রাজা সুসজ্জিত শকটারোহনে গমন করিয়াছিলেন; সে স্থানেও সহস্র সহস্র নরনারী নতমস্তকে অভিবাদন করিয়া রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। রাত্রিকালে সুবিস্তৃত লণ্ডননগরী বিচিত্র আলোক মালায় সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। অধিবাসী লোকের সমস্তগৃহ বিবিধ বর্ণের দীপ-মালায় সুশোভিত হইয়া যেন এক একখানি সুরঞ্জিত ছবির ন্যায় দেখাইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি সমভাবে নগরব্যাপী আলো জ্বলিয়াছিল। ওয়েষ্টএণ্ড পল্লীর সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রে নয়নমোহিনী বিস্ময় উৎপাদিনী আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অগ্নিক্রীড়া হইয়াছিল। বিলাতী টেলিগ্রামে দৃষ্ট হয়, লণ্ডনের ঐ দীপাবলীতে ও আতোসবাজীতে একাদশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রাজা পঞ্চমজর্জ্জ আমাদের ভারতেশ্বর ভারতসম্রাট, শ্রীমতী রাজ্ঞী মেরী আমাদের ভারতেশ্বরী সম্রাজ্ঞী। লণ্ডনে অভিষেক হইল; সেই অভিষেকের দিন ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থলে, সর্ব্ব নগরে, সর্ব্ব মহকুমায়, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সর্ব্বগ্রামে বিশেষ স্মরণীয় উৎসব হইয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী, ইহুদী, বৌদ্ধ, এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা সম্রাট সম্রাজ্ঞীর দীর্ঘ জীবন ও চির সুখশান্তি কামনায় স্ব স্ব ধর্ম্মমন্দিরে জগদীশ্বর সমীপে ভক্তিভাবে প্রার্থনা করিয়া ছিলেন। কালীঘাটের হালদার মহাশয়েরা সেই দিন সেই শুভ কামনায় মা কালীর পূজা

দিয়া, ভোগ দিয়া, দরিদ্রগণকে অন্ন দিয়া হৃদয়ের রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। স্থির হইয়াছে, আগামী শীতঋতুতে আমাদের নবীন সম্রাটদম্পতি ভারতবর্ষে শুভাগমন করিবেন; প্রাচীন দিল্লীনগরীতে মহা সমারোহে রাজদরবার হইবে; কলিকাতা নগরীতেও তাঁহারা পদার্পণ করিবেন; রাজভক্ত ভারতবাসী সেই সময় মুক্তনেত্রে রাজদর্শন লাভ করিয়া চরিতার্থ হইবেন। বৃটিশ অধিকারে এই দেড় শত বৎসরের মধ্যে ভারতবাসীর ভাগ্যে এমন শুভ-সংযোগ আর কখন হয় নাই; সকলেই সাগ্রহ উল্লাসে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

রঙ্গমঞ্চে অভিষেক-সঙ্গীত।

রচয়িতা,— নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

রবি শশী তারা মিলিয়া গগনে
তব অভিষেক নেহারে।
নিজ নিজ সাজে ষড়ঋতু রাজে,
সুবিশাল অধিকারে।
সাগরে ভূধরে পবনে অম্বরে,
জয়নাদ উঠে লহরে লহরে,
কামান হুঙ্কারে দশদিশি ভরে—
শুভদিন আজি প্রচারে।
পুলকিত চিত আশা বিকশিত,
পরম শান্তি ভুবনে রাজিত,
রাজ-রাজেশ্বর জগত পূজিত,
করুণা, ন্যায়, প্রেমে বিজড়িত,
জন বিমোহন আধারে।

বিধি চিরন্তন নট নটীগণ,
চির-অধিকারী করিতে বন্দন,
দীন হীন মনে সদা আকিঞ্চন,
বিরাট সম্রাট চরণ পূজন,
মিলি অকিঞ্চন করিছে অর্পণ
হৃদি ফুল-মধু ভকতি-ধারে।
জয় জয় জয় জর্জ্জ পঞ্চম,
শুদ্ধ আত্মা নরেশ উত্তম,
তোলো একতানে, তোলো একপ্রাণে
জয় রব বারে বারে॥

রাজমঙ্গল-গীতি।

রচয়িতা,—শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস রায় রায়গুণাকর।

রাগিণী সুরট মোল্লার, তাল একতালা

আজ হাটে বাটে গোঠে কিম্বা মাঠে, সর্ব্বস্থানে রটে সম্রাটের জয়।
সে ধ্বনি শ্রবণে প্রজার জীবনে, স্বর্গীয় অপূর্ব্ব সুখ উপজয়॥

১। ভারতবাসী রাজভক্ত প্রজা সব, সম্রাট অভিষেকে করিছে উৎসব;
স্বরগে বাসব, বৈকুণ্ঠে কেশব, এই আনন্দে মত্ত তাঁদের হৃদয়॥

২। আজি সুপ্রভাতে যাই যার কাছে, রাজভক্তি ভরে সবার প্রাণ নাচে,
আগে কিম্বা পাছে, যত পথিক আছে, মহারাজের জয় উচ্চৈস্বরে গায়।
সিংহাসনে মহারাজা মহারাণী, যে জন দেখিছে, তার পবিত্র পরাণী,
আমরা দেখি চিত্রপটে, আর চিন্তায় বটে, ধ্যান ও ধারণা যোগবলে হয়॥

৩। প্রজার প্রার্থনা পরমেশ পদে, অক্ষয় হউন সম্রাট, এ রাজ্য সম্পদে,
আমরা সম্পদে বিপদে, থাকি রাজপদে, রাজার কৃপা বই নাহিত আশ্রয়

রাজ মঙ্গল তরে করি প্রাণপণ, আছে ভারতবাসী ধরি এ জীবন,
জীবনে মরণে সম্রাটে স্মরণ, শরণাগত প্রজা রাজভক্তি ময়॥

৪। ২২শে জুন ১৯১১ খৃষ্টাব্দ, ভারত-সম্রাটের জয় হচ্ছে এই শব্দ,
কেহ নয় ক্ষুব্ধ, সকলেই মুগ্ধ, জয় পঞ্চম জর্জ্জ, সম্রাটের জয়॥
তুরী ভেরি বাজে লণ্ডন নগরে, সেই মহাধ্বনি মিশিয়া সাগরে,
সোণার ভারতে, প্রতি ঘরে ঘরে, জয় সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ আর কিবা ভয়॥

৫। আজ হতে দিন গণি দিন দিন, দীন প্রজায় পাবে ভারতে এ দিন,
দেখতে রাজ্যপাট আসিবেন সম্রাট, দিল্লীতে দরবার হইবে নিশ্চয়।
সেই দরবার শেষে কলিকাতায় আসি, দেখা দেবেন সম্রাট দেখবে বঙ্গ-
বাসী, ধর্ম্মদাস বলে প্রেমানন্দে ভাসি, কতদিনে হবে সে দিনের উদয়।

গায়ক,—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

কান্তা।

স্ত্রীশিক্ষা।

অনুবাদক,—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ,

এবং আমরাও দুঃখ শূন্য হইয়া অন্তে মোক্ষলাভের অধিকারী হইয়া উঠিব।" চক্ষের সম্মুখে স্ত্রীর এবম্বিধ দৃষ্টান্ত দেখিয়া স্বামীর হৃদয়ে স্বতঃই পাপের দিকে উপেক্ষা হইয়া যায় ও তাঁহাকে ক্রমশঃ কল্যাণমার্গে লইয়া যাইতে থাকে। এই জন্য পত্নীর উপরোক্ত গুণ যুক্তা হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সরলা। আপনি পূর্ব্বে স্ত্রীজাতির পক্ষে সকল বিদ্যাশিক্ষার বিষয় বলিয়াছেন; তাহার মধ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ডাক্তারী করা উদ্দেশ্য কি না?

কান্তা। না তাহা নহে। ভৈষজ্য শিক্ষা করিয়া স্ত্রী নিজের, আপনার স্বামীর ও সন্তানসন্ততির শরীর নিরাময় রাখিতে পারে এবং সুস্থ ও সবল প্রজোৎপাদন করিতে সক্ষম হইতে পারে, তাহাই উদ্দেশ্য। ডাক্তারী করিবার প্রয়োজন

নাই। ইহার উপকারিতা আমি তোমাকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি, শোন।
"অশুচি"।—বর্ত্তমান সময়ের কুসংস্কার বশতঃ অশুচি অবস্থায় স্ত্রী-জাতিকে অন্ন, জল ও বস্ত্রের কষ্টসহ্য করিতে হয় এবং তজ্জন্য তাহাদের শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ পাইতে হয়। অশুচিদোষ ঘটিলে তাহার কারণ না জানা বশতঃ প্রতিকার করিতে পারে না। উক্ত দোষ শরীরে একবার প্রবিষ্ট হইলে প্রদর, মাথাধরা, পদ, কটিদেশ ও মস্তকে বেদনা, অজীর্ণ, দুর্ব্বলতা ক্ষয়রোগ ও হিষ্টিরিয়া, গর্ভস্রাব, গর্ভাশয় দোষ, বন্ধ্যারোগ, মৃত-বৎসা, যুগ্মসন্তান প্রসব প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া দুঃখভোগ করিতে হয়; যদি স্ত্রীদিগের চিকিৎসা শাস্ত্রে অল্পও বোধ থাকে, তবে উপযুক্ত সময় ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা হইতে পারে ও শারীরিক সুস্থ থাকিয়া, নীরোগী প্রজোৎপাদন করিতে সমর্থ হয়।

"গর্ভধারণ"।—স্ত্রী পুরুষ উভয়েই যদি নিরোগী, চিন্তাশূন্য ও উৎসাহী থাকেন, তবেই সন্তান নীরোগী ও উৎসাহী হইয়া থাকে। তৎ-কালে যদি উভয়েরই বীরতার সংস্কার স্ফুরণা হয়, তবে সন্তানও সুরবীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত সময়ে যদি উভয়ের মনোবৃত্তি, চিন্তাতুর, ক্লেশিত ও অনুৎসাহী হয়, তবে নবজাত সন্তানও ঐরূপ প্রকৃতির হইবে। এইরূপ বিদ্যা, নীতি, ধর্ম্ম, ভক্তি, দানশীলতা, সৌর্য্য প্রভৃতি যেমন গুণ, স্বভাব স্ত্রী পুরুষের উৎপন্ন হইবে, নবজাত শিশুরও তদ্রূপ গুণস্বভাব হইবে। এমন কি যদি তদবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের নীচ বা অধর্ম্মী লোকের বৃত্তির স্ফুরণা হয়, তাহা হইলে সন্তানও সেই বৃত্তি সম্পন্ন হইবে।

অশুচিকালান্তে স্নান করিয়া স্ত্রীলোকদিগের পতির মুখ বা তাঁহার চিত্র দর্শন করা উচিত। পতি যদি গৃহে না থাকেন, তাহা হইলে পত্নী দর্পণে নিজের মুখ দেখিবেন। যদি ইহা না করেন, তবে ঐ সময়ে যাহার মুখ দেখিবেন, তাহার আকৃতি বিশিষ্ট বা তাহার গুণস্বভাবযুক্ত সন্তান প্রসব করিবেন। এইরূপ প্রয়োজনীয় কথা চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা ব্যতিরেকে স্ত্রীদিগের পক্ষে জানিতে পারা সুকঠিন।

"গর্ভরক্ষা"—গর্ভধারণের পর যদি স্ত্রীলোক কুখাদ্য খায়, নীচকর্ম্ম করে, কুচিন্তা মনে স্থান দেয়, কুবাক্য বলে, বা শ্রবণ করে, কুসংসর্গে দিনযাপন করে, চিন্তাযুক্ত থাকে, কিম্বা রুগ্ন হয়, তবে প্রসূত সন্তানও তদনুরূপ কুস্বভাব-

যুক্ত ও রুগ্ন হইবে। এই সকল বিষয় অর্থাৎ গর্ভরক্ষা প্রকরণ ভৈষজ্যবিদ্যা শিক্ষা ব্যতীত সম্যকরূপে বুঝিতে পারা সম্ভবপর নয়।

"সন্তানপালন"—সন্তান প্রসবান্তে প্রসূতির কি কি নিয়ম পালন করা উচিত, চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ করিলে তাহা সম্যক জানা যায়। সন্তান জন্মাইবার পর হইতেই যদি বালকের শরীরের তন্তু সকল ও অবয়বের গঠনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখা যায়, তাহা হইলে সন্তানের গঠন ও আকৃতি সৌষ্ঠব বিহীন ও বদ-চেহারা হইয়া থাকে। যদি শাস্ত্রোল্লিখিত নিয়মানুসারে জাতকের রক্ষা না করা যায়, তবে তাহার নানাবিধ রোগাধিকার হওয়া সম্ভব।

সন্তানকে কখন কিরূপ দুধ খাওয়াইতে হইবে, কোন্ সময়ে রেচক দিতে হইবে, কখন কেশমুণ্ডন করা উচিত, দন্তোৎগমের সময় কি নিয়মে বালককে রাখা উচিত, কি উপায় অবলম্বন করিলে বসন্তাদি রোগ হইতে রক্ষা পাইতে পারে, মোটের উপর সন্তানকে কি প্রকারে "মানুষ" করিতে হয়, কেমন করিয়া সুস্থকায় রাখিতে পারা যায়, কি প্রকার শিক্ষাদ্বারা উহাকে যথার্থ সুস্থকায় ও গুণবান করিতে পারা যায়, এইরূপ প্রয়োজনীয় অনেক কথা চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী মাতা জানিয়া থাকেন ও তদনুরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম হন। উপরন্ত সন্তানের হৃদয়ে বাল্যাবস্থা হইতেই এই সব কথার বীজ রোপিত হইতে থাকে, যাহার পরিণামে ভবিষ্যতে অতি উত্তম ফললাভ হইতে পারে।

যে প্রসূতী উপযুক্ত চিকিৎসা ও সন্তান পালনপ্রণালী একেবারেই অবগত নহেন, তিনি তদনুকুল নিয়মাদি পালন করিতে সক্ষম হন না, এবং তাহার ফলে সন্তানের শরীরে আয়ের ও বুদ্ধিহানী ঘটিয়া থাকে। ৬ বৎসর বয়ঃক্রম অবধি সন্তানের লালনপালন মাতার কর্ত্তব্য; সেই জন্য প্রত্যেক মাতারই অল্পবিস্তর ভৈষজ্য বিদ্যা শিক্ষা করা উচিত। নতুবা তিনি সন্তানের শরীর, বীর্য্য ও মনের হানী সম্পাদন করেন ও নিজের, নিজ পতির ও বংশের অনিষ্ট সম্পাদন করিয়া পাপিনী হইয়া থাকেন।

"গৃহস্থ ব্রহ্মচর্য্য"—যে স্ত্রী ও পুরুষ গৃহস্থব্রহ্মচর্য্য পালন করেন না, তাঁহাদের শরীর শীঘ্রই অশক্ত রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং তাঁহাদের সন্তানসন্ততিও দুর্ব্বল, ভীরু, অকর্ম্মণ্য বুদ্ধিহীন ও রুগ্ন হইয়া থাকে। চিকিৎসাশাস্ত্র অধীত স্ত্রীপুরুষই এই গৃহস্থ ব্রহ্মচর্য্যের উপকারীতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন।

এইরূপ বহুবিধ ব্যবহার্য্য বিষয় জানিবার আছে। উপরোক্ত কথাগুলি বলিবার

তাৎপর্য্য এই যে স্ত্রীপুরুষ যদি ভৈষজ্যবিদ্যায় অল্প স্বল্পও জ্ঞানলাভ করেন, তবেই উক্ত নিয়মানুযায়ী চলিতে সক্ষম হয়েন। কারণ তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ ব্যতীত ভৈষজ্য-শাস্ত্রের নিয়মানুবর্ত্তি হইয়া চলা ও অপরকে তদনুবর্ত্তী করিতে পারা কঠিন ব্যাপার।

বিদ্যাহীন পুরুষ ও স্ত্রী গর্ভরক্ষার জন্য ও শিশুদিগের রোগাধিকারে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সময় ও বহু অর্থনষ্ট ও শিশুর অনিষ্ট করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা নানারূপ মন্ত্র, ঝাড় ফুক করেন, তাগা ও মাদুলী বাঁধেন, মানত, 'হত্যা' ও বলিদানাদি দিয়া থাকেন। হনুমান, ভৈরব, দেবী, পীর, পৈগম্বর এমন কি ভূত ও প্রেত প্রভৃতিরও মানত করিয়া থাকেন। এইরূপ কুসংস্কার ও ভেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত কার্য্যাদির ফললাভ হইল না দেখিয়া আর্থিক ও শারীরিক হানীর জন্য কষ্টভোগ করেন। যদি পিতামাতা কিছু বিদ্যালাভ করিয়া থাকেন ও অল্প চিকিৎসা-শাস্ত্র তাঁহাদের জানা থাকে, তবে ঠগ ও ধূর্ত্তদের উপরোক্ত মিথ্যা চাতুরীতে ভুলিয়া প্রতারিত হন না ও সন্তানাদিকে নিরর্থক ক্লেশ ও দুঃখাদি হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়েন।

ঋতু, গর্ভধারণ প্রভৃতি প্রসঙ্গ বিষয়ক কয়েকখানি ছোট ছোট প্রসিদ্ধ পুস্তক আছে, তাহা অবশ্য পাঠ করিয়া শিক্ষালাভ করা উচিত। এখানে সবিস্তার বলা নিষ্প্রয়োজন।

যেমন চিকিৎসা শাস্ত্রের উপযোগীতা ও আবশ্যকতা এইমাত্র বুঝাইলাম। তদ্রূপ স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধীয় অপরাপর কতকগুলি বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছি, যাহার উপযোগীতা উপলব্ধ হওয়া উচিত। এই গুলি সম্বন্ধেও ভাল ভাল পুস্তকাদি আছে, তাহাও পাঠ করা কর্ত্তব্য। এখানে সে বিষয় আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

গীত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্রনাথ মিত্র।

বাগেশ্রী,—আড়াঠেকা।

এই যে এখন ছিল ঘরে, কোথায় সে লুকাল।
তাই না দেখে তারে, হই বড় ব্যাকুল॥

গভীর শোকে বিষাদে, অবিরত প্রাণ কাঁদে,
কোথায় শান্তি পাব আমি, আঁধারে সকল ঘেরিল :—
ডাকি আমি মা তোমারে, দেখ যদি দয়া করে,
দুঃখ ভয় যাবে চলে, পাইয়ে তব পদ্মকমল ॥
তোমারে দেখিলে পরে, দেখিব আমি তাহারে,
তোমাকে পাইলে আমি পাব যে সকল ॥

—o:*:o—

সমালোচনা।

ম্যাটিতত্ত্ব। এখানি চিকিৎসা পুস্তক। কলেজ ষ্ট্রীটের বটব্যাল কোম্পানী এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার নির্ঘণ্ট হইতেছে, ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা।

ডাক্তার হ্যানিম্যান যেমন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আবিষ্কারক, কাউন্ট ম্যাটি তদ্রূপ ইলেক্টোহোমিওপ্যাথি প্রবর্ত্তক। বটব্যাল কোম্পানী এই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান শাখার অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন; সাধারণ লোকে যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, বিশেষ যত্নপূর্ব্বক সেইরূপে ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব রক্ষা করা হইয়াছে। পুস্তকের এক স্থানে আমরা দেখিলাম, ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথি মতে মোটে আটত্রিশপ্রকার ঔষধ, বত্রিশপ্রকার বটিকা ঔষধ এবং ছয়প্রকার তরলআরক এলোপ্যাথি ডাক্তারী মতে যেমন পাঁচপ্রকার পদার্থ মিশাইয়া একটি ঔষধ প্রস্তুত করা হয়, ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথিতে সেরূপ নিয়ম নাই; অমিশ্র এক প্রকার ঔষধেই আশানুরূপ কার্য্য হয়। তদ্ব্যতীতনীল, পীত, লোহিত, হরিদ্রাদি বর্ণের তাড়িৎ আছে, রোগবিশেষে এক এক বর্ণের ইলেক্ট্রোসিটিতে ঠিক যেন ইন্দ্রজালের ন্যায় কার্য্য হইয়া থাকে।

"ম্যাটির রেমিডি" নামে একখানি সাময়িক পত্রিকা আমেরিকা হইতে প্রকাশিত হয়, সেই পত্রিকা পাঠ করিয়া আমরা দেখিয়াছি, রোগ নির্ণয় ঠিক হইলে, ইলেক্ট্রোহোমিওপ্যাথি ঔষধে আশু ফল সিদ্ধ হয়। অন্যান্য চিকিৎসকেরা বহুমূত্র, ক্যানসার, যক্ষা প্রভৃতি দুরন্ত ব্যাধিগুলিকে যেমন দুরারোগ্য অথবা অসাধ্য বিবেচনা করেন, কাউন্ট ম্যাটি সেরূপ মনে করেন না; তাঁহার ঔষধে অনেক দুঃসাধ্যরোগসুসাধ্য হইতেছে।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট সুদৃঢ় সংকল্পে এলোপ্যাথি চিকিৎসার পক্ষপাতি; হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি তাঁহাদের দ্বারা উৎসাহ প্রাপ্ত হয় নাই অথচ শনৈঃ শনৈঃ হোমিওপ্যাথির প্রচার হওয়াতে এতদ্দেশের অনেক রোগী শাঘ্র শীঘ্র সন্তোষকর ফললাভ করিতেছে; দেশীয় বিজ্ঞ বিজ্ঞ লোকের যত্নে হোমিওপ্যাথি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আমরা আশা করি, ইলেক্টোহোমিওপ্যাথিও সেইরূপে ভারতবর্ষে লব্ধ প্রবেশ করিয়া ভারতবাসীর উপকার সাধন করিবে।

বটব্যাল কোম্পানী বঙ্গবাসীগণের উপকারার্থ বঙ্গভাষায় ম্যাটিতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। এই উপকারের জন্য তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করি। আমাদের অভিলাষ বঙ্গবাসীগণ মনোযোগপূর্ব্বক ম্যাটিতত্ত্ব পাঠ করিয়া বিশেষ বিশেষ উপকার লাভে কৃতার্থ হইবেন।

রামের অধিবাস। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত; মূল্য একটাকা।

প্রস্তাবিত বিষয়টি রামায়ণের অংশ, বাঙ্গালী পাঠক মহাশয়কে সে পরিচয় দিতে হইবে না। স্বর্গীয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের কিয়দংশ মাত্র রচনা করিয়া, কোন বিশেষ কারণে তাহা সমাপ্ত করিতে বিরত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় সেই অসম্পূর্ণ পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ইহাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত রামলক্ষ্মণের সিদ্ধাশ্রমে গমন, ঋষিগণের যজ্ঞদর্শন, জনকপুরী যাত্রা, রামসীতার বিবাহ, রামের অভিষেক এবং বনপ্রস্থান পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুরস প্রসবিনী লেখনীপ্রসূত সুমধুর ভাষার সহিত গ্রন্থকার বিদ্যরত্ন মহাশয়ের ভাষায় কতদুর সাদৃশ, বিশেষ শিষ্টাচারে এই পুস্তকের ভূমিকায় তিনি তাহা অকপটে ব্যক্ত করিয়াছেন। সাদৃশের বিচার দূরে রাখিয়া আমরা বলিতেছি, বিদ্যরত্ন মহাশয়ের অবলম্বিত ভাষা যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ও সুমিষ্ট হইয়াছে। সুযোগ্য পিতার উপযুক্ত পুত্র আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত হইলেন, ইহা অবশ্য আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি বিদারত্ন মহাশয় অতঃপর তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেবের আদর্শে পুরাণান্তর্গত নূতন নূতন গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সম্মান রক্ষা করিবেন। তৎপ্রণীত এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সাহিত্যবিশারদ পাঠকবৃন্দ পরিতুষ্ট হইবেন। আমাদের এরূপ আশা বোধ হয় বিফল হইবে না।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৯শ বর্ষ। | ১৩১৮ সাল, শ্রাবণ। | ৪র্থ সংখ্যা।

তান্ত্রিকী সাধনা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ইত্যগ্রে **"কলিকাল"** নামক প্রবন্ধে আমরা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, কালশক্তির অপ্রতিহত ক্রিয়াদ্বারা প্রত্যেক যুগপরিবর্ত্তনের সময় জীবগণের শরীরাবয়ব, প্রকৃতি, রুচি, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি সমস্তই বিভিন্ন ভাব ধারণ করে এবং ত্রিকালদর্শী সর্ব্বজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ মানবগণের মঙ্গলের নিমিত্তই প্রত্যেক যুগের অবস্থার উপযোগী শাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। এই কারণেই সত্যাদি যুগ চতুষ্টয়ের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র ও উপাসনাপদ্ধতির বিধান হইয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

'কৃতে তু বৈদিকো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ।
দ্বাপরে চ পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ॥" তন্ত্র।

অর্থাৎ সত্যযুগে বেদবিহিত ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে স্মৃতিসম্ভব ধর্ম্ম, দ্বাপরে পুরাণোক্ত ধর্ম্ম ও কলিযুগের নিমিত্ত আগমসম্মত (তন্ত্রোক্ত) ধর্ম্মই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,

"বিনা হ্যাগম-মার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে।
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে।
আগমোক্তেন বিধিনা কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ॥"

তন্ত্রশাস্ত্রবক্তা ভগবান্ সদাশিব স্বয়ং বলিতেছেন, "একমাত্র আগমোক্ত পন্থা ব্যতীত কলিতে মানবগণের গত্যন্তর নাই, শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণাদিতে আমি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, আগমোক্ত বিধানমতেই কলিতে দেবোপাসনা করিতে হইবে।" শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে লিখিত আছে,

"বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্।"
উদ্ধবং প্রতি ভগবদ্ বাক্যম্।

অর্থাৎ কলিকালে বৈদিকী দীক্ষা, তান্ত্রিকী দীক্ষা ও ভগবান্ বিষ্ণুর ব্রতধারণ করিতে হইবে।

কোন কোন তন্ত্রাচার্য্যের মতে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদির বিধানানুসারে কলিতে কোন কার্য্যই করা কর্ত্তব্য নহে। জাতকর্ম্ম, পুংসবন ও চূড়াকরণ প্রভৃতি দশবিধ সংস্কার ও অপরাপর যাবতীয় কার্য্য তন্ত্রোক্ত পদ্ধতিক্রমে সম্পন্ন করিতে হইবে। তাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে দুইটি মাত্র প্রমাণবচন এই স্থানে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা—

"কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণ ফলপ্রদা।
শস্তাঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু॥
নির্ব্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনা ইবোরগাঃ।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব॥" তন্ত্র।

কলিকালে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র সকলই সিদ্ধ ও আশু ফলপ্রদ হইয়া থাকে, সুতরাং জপ, যজ্ঞক্রিয়া প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে ঐ সকল মন্ত্রই প্রশস্ত। শ্রুতি, স্মৃতি, প্রভৃতি অপরাপর শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র সকল সত্যাদি যুগত্রয়ে সফল হইত; পরন্ত সে সমস্ত মন্ত্র কলিতে বিষহীন সর্পের ন্যায় একেবারে নির্ব্বীর্য্য ও মৃতবৎ হইয়াছে।

কিন্তু এতদ্দেশীয় স্মার্ত্তসম্প্রদায় ও অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ তন্ত্রাচার্য্যগণের উল্লিখিত মতের সর্ব্বথা অনুমোদন করেন না; তাঁহারা বলেন, কলিতে কেবল দীক্ষা ও দেবপূজাদি কার্য্যই আগমোক্ত বিধানমতে করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন সমস্ত কার্য্যেই শ্রুতি, স্মৃতির বিধানই অবলম্বনীয়। শ্রুতি, স্মৃতি-বিরুদ্ধ তন্ত্র আদৌ গ্রাহ্য নহে। ইঁহারাও কূর্ম্মপুরাণের পশ্চাল্লিখিত বচন কয়েকটিকে আপনাদের মতের পোষক প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়া থাকেন। যথা,—

"যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকঽস্মিন্ বিবিধানি চ।
শ্রুতিস্মৃতি-বিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী॥
করালভৈরবঞ্চাপি যামলং নাম যৎকৃতম্।
এবম্বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু।
ময়া সৃষ্টানি চান্যানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে॥"

মর্ম্মার্থ এই যে, ইহলোকে যে সকল তন্ত্রশাস্ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ তন্ত্র আদৌ গ্রাহ্য নহে। করালভৈরব নামক যামলও এই প্রকারের অন্য যে সকল তন্ত্র ভগবান্ সদাশিব কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল কলিকালের জন্য লোকদিগের মহোৎপাদনার্থই বুঝিতে হইবে, নিম্নলিখিত মনু-বচনে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যথা,—

"বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদি দ্বিজন্মনাম্।
কার্য্যঃ শরীর সংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ॥
গার্ভৈর্হোমৈর্জ্জাতকর্ম্ম চৌড়মৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে॥
স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যে নেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥"

মর্ম্মার্থ এই যে, বেদোক্ত পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণরূপ কার্য্যদ্বারা গর্ভাধানাদি শারীরিক সংস্কার করিতে হইবে। যাহাতে দ্বিজগণ বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা ইহলোকে ও যাগাদির ফললাভ দ্বারা পরলোকে পবিত্র হইবেন। গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম, অন্নাশন, চূড়াকরণ ও উপনয়নাদি সংস্কারদ্বারা দ্বিজাতির বীজদোষ ও গর্ভবাস জন্য পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। বেদাধ্যয়ন, মধুমাংস বর্জ্জনাদি ব্রত, সায়ং ও প্রাতর্হোম, ত্রৈবিদ্য নামক ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য সময়ে দেব-ঋষি-পিতৃ-তর্পণ, গৃহস্থাবস্থায় দারপরিগ্রহ ও

সন্তানোৎপাদন, পঞ্চ মহাযজ্ঞ * ও জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ দ্বারা মানব এই দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য করে।

বলা বাহুল্য যে, পরস্পর-বিরুদ্ধ উক্ত-উভয় মতের মধ্যে কোন্ মত সমীচীন ও গ্রাহ্য সে বিষয়ের বিচার করিতে আমরা সম্পূর্ণরূপেই অনধিকারী। কেননা,—আমরা যখন শাস্ত্র-জ্ঞানহীন ক্ষুদ্রাৎ-ক্ষুদ্রতর ব্যক্তি, তখন ঐ বিষয়ে কোন কথা বলা আমাদের পক্ষে নিশ্চিতই ধৃষ্টতা মাত্র। শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণই সে বিষয়ের মীমাংসা করিবেন। ফল কথা,—কলিকালে দীক্ষা ও দেবপূজাদি কার্য্য মাত্রেই যে, আগমোক্ত বিধান অবলম্বনীয়, সে পক্ষে বড় মত-বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব আমরা এক্ষণে প্রচলিত মতেরই অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম।

"গুরু ও শিষ্য" নামক প্রবন্ধে আমরা ইত্যগ্রে কেবল দীক্ষা এবং গুরু ও শিষ্যের কর্ত্তব্য মাত্রের আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু সাধকগণ কি প্রণালীতে সাধনা কার্য্যে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইবেন, তৎসম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয় নাই। অতএব অদ্য আমরা এই প্রবন্ধে সেই কথাটিই সংক্ষেপে বুঝাইবার যত্ন করিব।

তান্ত্রিক সাধকগণ অধিকারীভেদে যে যে ভাব ও যে যে আচার অবলম্বনে ক্রমে ক্রমে সাধনকার্য্যে অগ্রসর হইবেন, ঐ ভাব তিনপ্রকারে ও আচার সপ্ত-প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। তিন প্রকার ভাব; যথা,—পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব। সপ্ত প্রকার আচার; যথা,—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার।

পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব কাহাকে বলে, অগ্রে সেই কথাটিই বলিতেছি। আচারের কথা পরে বলিব।

"আদৌ পশুস্ততো বীরশ্চরমো দিব্য উচ্যতে।
জ্ঞানেন পশু-কর্ম্মাণি জ্ঞানেন বীরভাবনম্॥"

---

* পঞ্চসূনাজনিত পাপ ক্ষয়ার্থই গৃহস্থ দ্বিজগণকে পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। পঞ্চ মহাযজ্ঞ যথা,—

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি-পূজনম্॥" মনুঃ।

ব্রহ্মযজ্ঞ—(অধ্যয়ন, অধ্যাপন) পিতৃযজ্ঞ—(নিত্যশ্রাদ্ধ ও তর্পণ) দেবযজ্ঞ—(নিত্যহোম) ভূতযজ্ঞ—(পশু, পক্ষ্যাদি সর্ব্বজীবকে নিত্য অন্নাদি দান) ও নৃযজ্ঞ—(অতিথি-পূজন)।

প্রথমে পশুভাব, তাহার পর বীরভাব, সর্ব্বশেষে দিব্যভাব। বস্তুতঃ কেবল জ্ঞানেরই তারতম্যানুসারে এইভাবত্রয়ের বিভাগ হইয়াছে; অর্থাৎ পশু বীর ও দিব্য, এই তিনটি ভাব কেবল জ্ঞানেরই অবস্থাভেদে সংজ্ঞাভেদ মাত্র। কথাটা পরিস্কার করিবার জন্য প্রমাণান্তর প্রদর্শিত হইতেছে। যথা :—

"জ্ঞানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং ভেদাভেদ-বিভেদতঃ।
ভেদঃ পশোরভেদো হি দিব্যভাব উদাহৃতঃ॥
ভেদাভেদবিদো বীরাঃ সর্ব্বত্রৈবং ক্রমঃ প্রিয়ে।
পশুভাবঃ সোপরমো বীরভাবাব বোধকঃ॥
দিব্যাববোধকো বীরভাবঃ সোপরমস্তথা॥
যথা বাল্যং যৌবনঞ্চ বৃদ্ধভাবঃ ক্রমাৎ প্রিয়ে।
তথা ভাবত্রয়ং দেবি উত্তর ারম্ভসাধনম্॥
অতএব মহেশানি বীরাণাং কারণং পশুঃ।
দিব্যানাং বীরভাবশ্চ, ইত্যাদি॥ বিশ্বসার তন্ত্র।

জ্ঞান দুই প্রকার; ভেদজ্ঞান ও অভেদজ্ঞান। যে জ্ঞানে ঘটপটাদি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার নাম ভেদজ্ঞান, আর যে জ্ঞানের উদয় হইলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড একসত্তাময় উপলব্ধ হয়, (তুমি, আমি, জগৎ পৃথক বলিয়া ধারণা হয় না) তাহারই নাম অভেদজ্ঞান। ভেদ জ্ঞানকে পশু-ভাব, ভেদাভেদ জ্ঞানকে বীরভাব এবং একমাত্র অভেদ জ্ঞানকে দিব্যভাব বলে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধকের মনে ভেদজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি পশুভাবাপন্ন; যখন ভেদজ্ঞানের অল্পতা ও অভেদ জ্ঞানের প্রবলতা হয়, সেই অবস্থায় তিনি বীরভাবাপন্ন; আর যখন সাধকের ভেদজ্ঞান একেবারে দূর হইয়া যায়, সেই অবস্থায় তখন তাঁহাকে দিব্যভাবাপন্ন বলা যায়। জীবগণ যেমন বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যাবস্থা ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করে, সেইরূপ সাধক প্রথমে পশুভাব, পরে বীরভাব ও সর্ব্বশেষে দিব্যভাবে আরূঢ় হইয়া থাকেন। উক্ত ভাবত্রয়ের মধ্যে পশু-ভাব, নীচভাবের ও বীরভাব, দিব্যভাবের কারণরূপে পরিগণিত; সুতরাং একটিকে উল্লঙ্ঘণ করিয়া অপরটি ধরা যাইতে পারে না। অর্থাৎ পশুভাবে কার্য্য করিতে করিতে সিদ্ধিলাভ না ঘটিলে, বীরভাবে অধিকার হয় না; আবার বীর-ভাবের কার্য্য সফলতা না হইলে, সাধক দিব্যভাবের অধিকারী হইতে পারেন না।

পশ্বাদি ভাবত্রয়ের কথা একরূপ বর্ণিত হইল। অতঃপর সপ্তআচারের কথা বলা যাইতেছে। যথা,—

"বৈদিকং বৈষ্ণবং শৈবং দক্ষিণং আশবং স্মৃতম্।
সিদ্ধান্ত বামে বীরে তু দ্বিবং সৎকৌলমুচ্যতে।
ভাবত্রয়গতান্ দেবি সপ্তাচারাংশ্চ বেত্তি যঃ॥" বিশ্বসার তন্ত্র।

বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার; এই সাত প্রকার আচার উক্ত ভাবত্রয়েরই অনুগত। সাধক যে পর্য্যন্ত পশুভাবে থাকিবেন, সেই কাল পর্য্যন্ত তিনি ক্রমপরম্পরায় বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচারের নিয়মানুসারে সাধনা করিবেন; পরে বীরভাবে অধিকারলাভ করিলে, বামাচার ও সিদ্ধান্তাচারের কার্য্য করিতে থাকিবেন এবং সর্ব্বশেষে দিব্যভাবে অধিকার হইলে, তখন তিনি কুলাচারী হইবেন। এই সপ্ত আচারের মধ্যে পরম্পরাক্রমে কোন্ আচারের পর কোন্ আচার অনুষ্ঠেয় ও শ্রেষ্ঠ, এক্ষণে তাহাই কথিত হইতেছে।

সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্।
দক্ষিণাদুত্তম্ বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং ন হি॥"

সাধারণ আচার অপেক্ষা বেদাচারই শ্রেষ্ঠ। বেদাচার অপেক্ষা বৈষ্ণবাচার বৈষ্ণবাচার অপেক্ষা শৈবাচার, শৈবাচার অপেক্ষা দক্ষিণাচার, দক্ষিণাচার অপেক্ষা বামাচার, বামাচার অপেক্ষা সিদ্ধান্তাচার এবং সিদ্ধান্তাচার অপেক্ষা কৌলাচারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তদ্ব্যতীত আর শ্রেষ্ঠ আচার নাই। এক্ষণে ঐ সপ্ত আচারের লক্ষণ বলা যাইতেছে। প্রথমতঃ বেদাচার যথা,—

"সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবৎ কুর্য্যাদাবশ্যকং ততঃ।
অপাবৃত শরীরঃ সংস্ত্রিসন্ধ্যং স্নানমাচরেৎ।
রাত্রৌ নৈব যজেদ্দেবান্ সন্ধ্যায়াং বাপরাহ্লাক।
ঋতুকালং বিনা দেবি স্বভার্য্যারমণং ত্যজেৎ॥
মৎস্যং মাংসং মহেশানি ত্যজেৎ পঞ্চসু পর্ব্বসু।
যদ্যদ্ বেদবিহিতং কুর্য্যান্নিয়ম তৎপরঃ॥"

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে * শয্যাত্যাগ করিয়া যথাবিহিতরূপে বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যার উপাসনা ও তদনন্তর সাংসারিক আবশ্যক কার্য্য সমাপন করিবে। এবং রিক্ত-পাত্রে ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিবে। রাত্রিকালে উভয় সন্ধ্যাতে ও অপরাহ্ণ সময়ে দেবতার অর্চ্চনা করিবে না। ঋতুকাল ব্যতীত স্বীয় ভার্য্যাতেও গমন করিবে না। পঞ্চপর্ব্ব দিনে § মৎস্য, মাংস বর্জ্জন করিবে। এতদ্ব্যতীত বেদবিহিত যাবতীয় নিয়মেরই পালন করিতে হইবে। অতঃপর বৈষ্ণবাচার। যথা,—

"অথ বক্ষ্যে মহেশানি বৈষ্ণবাচারমুত্তমম্।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ কালাদ্‌ভীতির্ন বিদ্যতে॥
বেদাচারক্রমেণৈব সদা নিয়মতৎপরঃ।
মৈথুনং তৎকথালাপং কদাচিন্নৈব কারয়েৎ॥
হিংসাং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যং বর্জ্জয়েন্মাংস ভোজনম্।
রাত্রৌ পূজাং তথা মালাং ন কুর্য্যান্নৈব সংস্পৃশেৎ॥
বিষ্ণুং সমর্পয়েদ্দেবি বিষ্ণৌ কর্ম্ম নিবেদয়েৎ।
ভাবয়েৎ সর্ব্বদা দেবি সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥
তপঃ কষ্টাতিসহ্যেন সর্ব্বত্রাচ্যুতচিন্তয়া।
বৈষ্ণবাচার ঈশানি বৈদিকেভ্যো বিশিষ্যতে॥"

পূর্ব্বোক্ত বেদাচারের নিয়মানুসারে সর্ব্বদা সংযতেন্দ্রিয় হইয়া, মৈথুন ও তৎসম্বন্ধীয় সংলাপ বর্জ্জন করিবে। কখনই মৈথুনাদি বিষয়ক চিন্তা করিবে না। হিংসা, পরনিন্দা, কুটিলতা ও মৎস্য, মাংস ভক্ষণ পরিত্যাগ করিবে। রাত্রিকালে দেবপূজা বা মালা জপাদি করিবে না।

এইরূপে হিংসাদি দোষ বিবর্জ্জিত হইয়া বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতে থাকিবে। সংসারে যাহা কিছু ভাল মন্দ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, নিজে তাহার ফলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া তৎসমস্তই বিষ্ণুতে সমর্পণ করিবে। আপনার দেহ, মন, আত্মা অবধি সমস্ত জগতই বিষ্ণুময় ভাবনা করিবে। কেবল মৌখিক ভাষায় তিনি সর্ব্বময় ও সর্ব্বস্বরূপ বলিলে চলিবে না, তাঁহার সর্ব্বতত্ত্ব অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে

* সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দুই মুহূর্ত্তের নাম ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। রাত্রিশেষের এই চারিদণ্ড কাল আগামী দিবসের মধ্যে পরিগণিত হয় বলিয়া, দিবাহ্নিক যাবতীয় কার্য্যই এই সময় হইতে সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

§ অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা সংক্রান্তিকে পঞ্চপর্ব্ব বলে।

হইবে। এই বৈষ্ণবাচার বেদাচার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এইবার শৈবাচারের কথা বলা যাইতেছে। যথা,—

"বেদাচারক্রমো দেবি শৈবাচারে ব্যবস্থিত।
তদ্‌বিশেষো মহেশানি পশুহিংসা বিবর্জ্জনম্‌॥
শিবং মহেশ্বরং শান্তং চিন্তয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মসু॥
তোষয়েৎ বক্তু বাদ্যেন চতুর্ব্বর্গপ্রদং হরম্‌॥
তমেব শরণং গচ্ছেন্মনোবাক্‌ কায়কর্ম্মভিঃ।
সিধ্যত্যাশু মহেশানি শৈবাচারঃ নিষেবনাৎ।
অতস্তাভ্যাং পরোধর্ম্মঃ শৈবাচারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

বেদাচারে যে যে ক্রম বলা হইয়াছে, তৎসমস্তই শৈবাচারে অনুষ্ঠেয়। অর্থাৎ বেদবিহিত সমস্ত কার্য্যই ইহাতে করিতে হইবে। শৈবাচারেও পশুহিংসাদি একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে। এইরূপে হিংসাদি দোষ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, সাধক মহান্ত ও মহেশ্বর সদাশিবের চিন্তা এবং তাহাতেই সমস্ত কার্য্য ও তৎফল বিন্যস্ত করিবেন। বক্তু বাদ্য দ্বারা চতুর্ব্বর্গ প্রদায়ক মহেশ্বরকে পরিতুষ্ট ও সর্ব্বদা তাঁহাকেই শরণরূপে প্রসন্ন হইয়া মন, বাক্য, দেহ ও কর্ম্ম দ্বারা সাধক কেবল তাঁহারই পরিকর্ম্ম করিতে থাকিবেন। অজ্ঞানমূলক নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমানকে একবারে নষ্ট করিতে হইবে। এই প্রকারে শৈবাচারের অনুষ্ঠান করিতে করিতেই সাধক কৃতার্থতা লাভ করিবেন। এই আচারে পশুহিংসাদি দোষের নিবৃত্তি হইয়া, ক্রমশঃ সাধকের চিত্ত নির্ম্মল, প্রশান্ত ও তন্ময়ভাব দৃঢ়বদ্ধ হইতে থাকে অতএব বেদাচার ও বৈষ্ণবাচার অপেক্ষা শৈবাচারই শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে দক্ষিণাচারের লক্ষণ কথিত হইতেছে। যথা;—

ইদানীং শৃণু বক্ষ্যামি দক্ষিণাচারমদ্রিজে।
যস্ত শরণমাত্রেণ সংসারান্মুচ্যতে নরঃ॥
প্রবর্ত্তকোঽয়মাচারঃ প্রথমং দিব্য-বীরয়োঃ
অতস্তেভ্যঃ কুলেশানি শ্রেষ্ঠোঽসৌ দক্ষিণঃ স্মৃতঃ॥
বেদাচারক্রমেনৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্‌।
স্বীকৃত্য বিজয়াং রাত্রৌ জপেন্মন্ত্র মনন্যধীঃ
চতুষ্পথে শ্মশানে বা শূন্যাগারে নদীতটে।

দক্ষিণাচার দিব্য ও বীরভাবের প্রবর্ত্তক। সাধকের দক্ষিণাচারে সিদ্ধিলাভ ঘটিলেই বীর ও দিব্যভাবের স্ফূর্ত্তি আরম্ভ হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত বেদাচার, বৈষ্ণবাচার ও শৈবাচার অপেক্ষাও এই আচার শ্রেষ্ঠ। সাধক রাত্রিকালে বেদাচারোক্ত পদ্ধতিক্রমে ভগবতী জগদম্বার অর্চ্চনা ও বিজয়া (সিদ্ধি) পান করিয়া অনন্যচিত্তে তাঁহার মন্ত্র জপ করিবেন। এই সময়ে সাধকের হৃদয়ক্ষেত্র জগদম্বাময় হইয়া যায় ও ভেদজ্ঞান ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া বহির্দৃষ্টি বিলুপ্তপ্রায় হইতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে বীরভাব ও দিব্যভাব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া আইসে। এই নিমিত্তই শাস্ত্র দক্ষিণাচারকে দিব্য ও বীরভাবের প্রবর্ত্তক বলিয়াছেন। দক্ষিণাচারী সাধক চতুষ্পথে, শ্মশানে, শূন্যগৃহ ও নদীতীরে জগদম্বার উপাসনা করিবেন; আরও কতকগুলি স্থানের নাম আছে, তাহা অপ্রকাশ্য; সুতরাং গুরুমুখেই তাহা জ্ঞাতব্য।

দক্ষিণাচারে সাধক সাধনার উচ্চ সোপানে আরোহণ করেন। এই সময় সাধকের রজস্তমোগুণের ক্ষীণতা, সত্ত্বগুণের বিকাশ ও ভেদজ্ঞানের বিজৃম্ভন সঙ্কুচিত হইয়া চিত্ত ক্রমশঃ একাগ্রতা লাভ করিতে থাকে। এবং এই অবস্থার দৃঢ়তা হইলেই সাধক তখন বামাচারে উপনীত হয়েন। অতঃপর বামাচারের লক্ষণ বলা যাইতেছে। যথা,—

"বামাচারং প্রবক্ষ্যামি সম্মতং দিব্যবীরয়োঃ।
যৎশ্রুত্বৈব মহেশানি সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥
দিবসে পরমেশানি ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
পঞ্চতত্ত্বক্রমেণৈব রাত্রৌ দেবীং প্রপূজয়েৎ।
চক্রানুষ্ঠানবিধিনা মূলমন্ত্রং জপন সুধীঃ।
ধ্যায়ন দেবী-পদাম্ভোজং সাধয়েৎ বীরাসধনম্॥

বামাচার দিব্য ও বীরভাবাবলম্বিদিগেরই সম্মত। ইহার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, সাধকের সমস্ত সাধনাই সফল হয়। যে পর্য্যন্ত পশুভাব তিরোহিত না হয়, তাবৎকাল বামাচারে অধিকার হয় না।

সাধক দিবাভাগে ব্রহ্মচর্য্যে ও সংযতচিত্তে থাকিয়া, রাত্রিযোগে পঞ্চতত্ত্ব* দ্বারা

* মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন, ইহারই নাম পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চ ম কার। মদ্যের সহিত যে উপকরণ গৃহিত হয়, তাহাকে মুদ্রা বলে।

দেবীর পূজা করিবেন। এবং শাস্ত্রবিধি অবলম্বনে চক্রের অনুষ্ঠান করিয়া, জগদম্বার মূলমন্ত্র জপ ও দেবীর পদারবিন্দ ধ্যান করিতে থাকিবেন।

সাধক যখন বামাচারে উপনীত হয়েন, তখন তাহার অতীব উচ্চাবস্থা উপস্থিত হয়। সে সময়ে তিনি নিখিল জগৎ জগদম্বাময় অবলোকন করেন, তাঁহার অন্তরে ও বাহিরে কেবল জগদম্বার সত্তাই উপলব্ধি হয় এবং ভেদজ্ঞান ক্রমেই ক্ষীণ হইতে থাকে। এই অবস্থায় তাঁহার চিত্ত সুনির্ম্মল, ঐন্দ্রিয়িক বিকার বিদূরিত ও বিবেক, বৈরাগ্যাদি সদ্‌গুণগুলি সর্ব্বদাই মূর্ত্তিমান থাকে, তিনি তখন পরমানন্দে ভাসিতে থাকেন। চক্রের অর্থ গুরুমুখেই জ্ঞাতব্য। এইবার সিদ্ধান্তাচারের কথা বলিব। যথা,—

"অপরং শৃণু বক্ষ্যামি সিদ্ধান্তাচার লক্ষণম্।
ব্রহ্মানন্দময়ং জ্ঞানং যস্মাদ্দেবি-প্রপদ্যতে ॥
বেদশাস্ত্রপুরাণেষু গূঢ়ং জ্ঞানমিদং প্রিয়ে।
কাষ্ঠমধ্যে যথা বহ্নিস্তথা তেষু প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
দেব্যাঃ প্রীতিকরং পঞ্চতত্ত্বং মন্ত্রৈর্ব্বিশোধিতম্।
সেবেত সাধকো দেবি পশুশঙ্কাবিবর্জ্জিতঃ ॥
সৌত্রমন্যাং যথা ব্যক্তঃপানদোষো ন বিদ্যতে।
সিদ্ধান্তেঽস্মিন্ তথাচারে সুপ্রকাশং সুরাং পিবেৎ ॥
অশ্বমেধক্রতৌ বাজি-হত্যা দোষো নবিদ্যতে।
অস্মিন্ ধর্ম্মে তথেশানি পশূন্ হিংসন্ ন দুষ্যতি ॥
কপালপাত্রং রুদ্রাক্ষমস্থিমালাঞ্চ ধারয়ন্।
বিহরেদ্‌ভুবি দেবেশি সাক্ষাৎ ভৈরবরূপধৃক্ ॥
শঙ্কাত্যাগাৎ ব্যক্তভাবাৎ তথৈব সত্যসেবনাৎ ॥
বামাদপি কুলেশানি সিদ্ধান্তঃ পরমঃস্মৃত ॥

এক্ষণে সিদ্ধান্তাচারের লক্ষণ বলা যাইতেছে। সিদ্ধান্তাচারানুষ্ঠানের দৃঢ়তা হইলেই সাধকের তখন ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি হয়। কাষ্ঠের অভ্যন্তরে অগ্নি যেমন লুক্কায়িত ভাবে থাকে, তদ্রূপ বেদাদি শাস্ত্রে এই পরমজ্ঞান অন্তর্নিহিত আছে। অনুশীলন করিলে ক্রমেই সাধকের হৃদয়-দর্পণে উহা প্রতিবিম্বিত হইয়া তাঁহাকে চরিতার্থ করিয়া থাকে।

মন্ত্রের দ্বারা সম্যক বিশোধিত পঞ্চতত্ত্ব দেবীর বড়ই প্রীতিকর; অতএব সাধক

মন্ত্র দ্বারা পঞ্চতত্ত্ব শোধিত করিয়া প্রথমে দেবীকে অর্পণ করিবেন। সাধক যতদিন পশুভাবাপন্ন থাকেন, ততদিন পর্য্যন্ত বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, ও দক্ষিণাচারের অনুষ্ঠানেই নিরত থাকিবেন এবং ক্রমে ক্রমে পশুভাব অন্তর্হিত হইলে নিঃশঙ্কচিত্তে জগদম্বার পূজার অনুষ্ঠান করিবেন। সৌত্রামণী যাগের ন্যায় এই সিদ্ধাচারে প্রকাশ্যভাবে সুরাপান দোষাবহ নহে। অশ্বমেধ-যজ্ঞে অশ্ববধে যেমন কোন দোষ নাই, সেইরূপ সিদ্ধান্তাচারেও পশুহিংসা পাপজনক হইবে না। এই অবস্থায় সাধক কপালপাত্র (শবমস্তক) রুদ্রাক্ষ ও অস্থিনির্ম্মিত মালা ধারণ করিয়া সাক্ষাৎ শিবরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন। সিদ্ধাচারী সাধকের পশুভাব তিরোহিত হইয়া বীরভাবের অভিব্যক্তি ও বিপর্য্যাদি মিথ্যা জ্ঞান নষ্ট হইয়া সত্য জ্ঞানের উদয় হয়। সৌভাগ্যক্রমে সাধক যখন সিদ্ধান্তাচারে উপনীত হয়েন, তখন তিনি জগদম্বার সহিত অভিন্নভাব হইয়া যান, তাঁহার ভেদবুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া "সোঽহং" জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এই সময়ে তিনি আর বিধিনিষেধের অধীন নহেন। ইহাকেই ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান বলে। এইবার শেষাচার,—কৌলাচারের কথা বলা যাইতেছে। যথা,—

"কৌলাচারবিধিং বক্ষ্যে সাবধানাবধারয়।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ শিবো ভবতি নান্যথা॥
দিক্‌কাল-নিয়মো নাস্তি তথা বিধিনিষেধয়োঃ।
ন কোঽপি নিয়মো দেবি কুলধর্ম্মস্য সাধনে॥
কৌল এব গুরুঃ সাক্ষাৎ কৌল এব সদাশিবঃ।
কৌলঃ পূজ্যতমো লোকে কৌলাৎ পরতরো ন হি॥
কর্দ্দমে চন্দনে দেবি পুত্রে শত্রৌ প্রিয়াপ্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।
ন ভেদো যস্য দেবেশি স জ্ঞেয়ঃ কৌলিকোত্তমঃ॥
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদাত্মানং বিভুমব্যয়।
ভূতান্যাত্মনি দেবেশি স জ্ঞেয়ঃ কৌলিকোত্তমঃ॥"

এক্ষণে কৌলাচার পদ্ধতি বলিতেছি। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই কৌলজ্ঞান জন্মিলে সাধক শিবত্ব প্রাপ্ত হন, আর তাহার কর্ত্তব্যের অবশেষ থাকে না। কুলাচারী সাধকের সাধনবিষয়ে কোন দিক্‌কালের নিয়ম নাই। কেননা তিনি বিধিনিষেধের অধীন নহেন। কুলাচারী সাধক ব্রহ্মাণ্ডের গুরু সাক্ষাৎ সদাশিব

মূর্ত্তি; তিনি ত্রিলোকের পূজনীয়। তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধক আর নাই। সাধক যখন কুলাচারে উচ্চ সোপানে আরোহন করেন, তৎকালে পঙ্ক-চন্দন, পুত্র ও শত্রু, প্রিয় ও অপ্রিয়, শ্মশান ও অট্টালিকা এবং স্বর্ণে তৃণে ভালমন্দ বস্তু বলিয়া, কিছুমাত্র ভেদবুদ্ধি থাকে না। যিনি সর্ব্বভূতে অব্যয়, সেই বিভু আত্মাকে ও আত্মাতে সকল ভূত দর্শন করেন, তিনিই কৌলিকোত্তম। দেহপাতের পর তিনি নির্ব্বাণ-মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, তাহাকে আর সংসারে আসিতে হয় না।

কৌলাচারের প্রথম ও মধ্যমাবস্থা।

"যস্তু ধ্যানপরো দেবি জ্ঞাননিষ্ঠঃ সমাহিতঃ।
সাধয়েৎ পঞ্চতত্ত্বেন স কৌলো মধ্যম স্মৃতঃ
জপপূজাহোমরতো বীরাচার পরায়ণঃ।
আরুরুক্ষুর্জ্জনভূমি স কৌল প্রাকৃতো মতঃ॥"

কৌলাচারের চরমাবস্থায় সাধকের ধ্যান, জপ, পূজা ও হোমাদি কিছুই থাকে না। তখন আত্মারাম সাধক নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মময়ই দর্শন করেন; কিন্তু যে কাল পর্য্যন্ত সাধকের ঐরূপ উচ্চতম অবস্থা না ঘটে, তাবৎকাল তিনি জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া যুগান্তর ধ্যান ও পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনাদি করিতে থাকিবেন। এই শ্রেণীর সাধককে মধ্যমাবস্থার কৌল বলে। আর যে পর্য্যন্ত সাধকের হৃদয়ে অভেদ-জ্ঞানের প্রবলতা ও ভেদজ্ঞানের অল্পতা বিদ্যমান থাকে, সেই পর্য্যন্ত তিনি বীরভাবেই জপ, পূজা, হোমাদিরূপ সাধনাতে নিরত থাকিবেন। এই অবস্থার সাধককে নিকৃষ্ট কৌল বলে; এবং ইহাই সিদ্ধান্তাচারের শেষ ও কৌলাচারের প্রথমাবস্থা।

তন্ত্রোক্ত শক্তিসাধনকে কিরূপ সংযত ও কঠোরতর নিয়মের অধীন হইয়া ক্রমপরম্পরায় বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচার অতিক্রম করিয়া তবে বামাচারে অধিকারী হইতে হয়; অতঃপর সিদ্ধান্তাচারে ও কৌলাচারে সাধকের কিরূপ উচ্চতম অবস্থা ঘটে, এবং পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব কাহাকে বলে, পাঠক! ইত্যাদি বিষয়গুলি শাস্ত্রবাক্যে শুনিলেন ত? বস্তুতঃ পূর্ব্বসঞ্চিত বহু সুকৃতি না থাকিলে, কেহ একই জীবনে বীর ও দিব্যভাবের অধিকারী হইতে পারে না। সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদই প্রকৃত দিব্যভাবের সাধক ছিলেন এবং মদ্যাদি পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা জগদম্বার অর্চ্চনা করণে তিনিই প্রকৃত অধিকারী। কথিত আছে যে, রামপ্রসাদের বামাচারের সাধনার সময়ে কতকগুলি

কুলোক বিদ্বেষ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, যখন তাঁহাকে "মাতাল" অভিধানে অভিহিত ও লোকসমাজে কুৎসা রটনা করিতে ছিল, তৎকালে তিনি নির্ভীক হৃদয়ে গীতিচ্ছলে সেই অপবাদের যে উত্তর দিয়াছিলেন, পাঠকগণের অবগতি জন্য তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে ঃ—

রাগিণী জংলা,—তাল একতালা।

"মন ভুলো না কথার ছলে।
লোকে বলে বলুক মাতাল, মাতালেরা মাতাল বলে॥
সুরাপান করিনা আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে ঃ—
আমার মন-মাতালে মেতে বেড়ায়, মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
অহর্নিশি, থাক বসি, মন! হরমহিষীর চরণতলে ঃ—
নৈলে ধরবে নিসা, ঘুচ্‌বে দিশা বিষম বিষয়-মদ খাইলে॥
যন্ত্রভরা, মন্ত্র সোঁড়া, অগু ভাসে যেই জলে ঃ—
সে যে অকূলতারণ, কুলের কারণ কূল ছেড়োনা পরের বোলে॥
ত্রিগুণে তিনের জন্ম, সাধক বলে মোহের ছলে ঃ—
সত্ত্বে ধর্ম্ম, তমে মর্ম্ম, কর্ম্মে হয় মন! রজঃ মিশালে॥
মাতাল হ'লে বেতাল পাবে, বৈতালী করিবে কোলে।
রামপ্রসাদ বলে, নিদানকালে, পতিত হবে কূল ছাড়িলে॥"

বলা বাহুল্য যে, রামপ্রসাদের ন্যায় উচ্চতম কৌল-সাধকের পক্ষে সুরা সুধাই বটে। রামপ্রসাদ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। ভক্তবৎসলা জগজ্জননী অন্নপূর্ণা রামপ্রসাদের পরাভক্তিপ্রসূত সঙ্গীতরসে আকৃষ্টা হইয়া কন্যারূপে তাঁহার ভবনে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার গান শুনিয়া ও ভগ্নগৃহের বেড়া বাঁধিয়া দিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। একটি গীতে রামপ্রসাদ তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ঃ—

প্রসাদী সুর, একতালা।

"মন! কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও-মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি বাঁধ দিয়া ভক্তি-দড়া॥
নয়ন থাকতে দেখ্‌লে না মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া!
মা যে ভক্তি ছলিতে, তনয়া রূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া॥

মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যুশেষে, করে দু'চার দণ্ড
কান্নাকাটা, শেষে দিবে গোবরছড়া ॥

ভাই বন্ধু দারা সুত, কেবল মাত্র মায়ার গোঁড়া ঃ—
মলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী, কড়ি দিবে আট কড়া ॥
অঙ্গেতে আভরণ, সকলই করিবে হরণ,
দোছোট বস্ত্র গায়ে দিবে, চার্‌কোণা মাঝখানে ছেঁড়া ॥
যেই ভাবে একমনে, সেই পাবে কালিকা তারা।
বের্ হয়ে দেখ্ কন্যারূপে রামপ্রসাদের বাঁধ্‌ছে বেড়া ॥"

তান্ত্রিকী সাধনা বিষয়ক শাস্ত্রীয় প্রমাণবচন দ্বারা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বীর ও দিব্যভাবের সাধক ব্যতীত আর কাহারও মদ্যাদি পঞ্চতত্ত্ব স্পর্শ করিবার অধিকার নাই এবং সেরূপ ভাবের সাধকও বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষে, অন্ততঃ গৃহস্থাশ্রমে অতীব দুর্লভ। কিন্তু তদ্ভিন্ন যাহারা পানাসক্তি নিবৃত্তি বা বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য বামাচার বা কৌলাচারের ভাণ করিয়া অনধিকারে মদ্যপান করিয়া থাকে, তাহারা যে মহাপাতকী হইয়া জীবনান্তে ঘোর নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

অব্দ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত।

ভারত-প্রদক্ষিণ করিলে পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফললাভ হয়। ইহা ভূপৃষ্ঠের সমমণ্ডলে অবস্থিত হইলেও কোন স্থানে প্রচণ্ড তাপ, কোথাও বা দুরন্ত শীত অনুভূত হয়। পর্ব্বত, সাগর, মালভূমি ও মরু, তুষার উপত্যকা সিকতা, নিম্ন-ভূমি এবং দ্বীপসমন্বিত হইয়া এই স্থান এতদূর রমণীয় হইয়াছে। উদ্ভিদ ও জীব-সংস্থান, তজ্জন্য বৈচিত্র্যপূর্ণ। উষ্ণ ও হিম কটিবন্ধে আমাদের যাইবার প্রয়োজন নাই; ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান।

তৎকালে পূর্ব্ব উপকূল হইতে চেন্নপট্টন পর্য্যন্ত রেলপথ না হওয়ায় আমরা কালীকাক্ষেত্র হইতে রায়চরের পথে যাত্রা করিলাম। জব্বলপুর হইতে খাণ্ডব পর্য্যন্ত প্রবেশিকা (টিকিট) ক্রয় করা হইল। অধ্বপার্শ্বে মালব অরণ্যানী। প্রস্তর-খণ্ড সমূহের মধ্য দিয়া স্রোতস্বতী চলিয়াছে, একটী মৃগ নয়নপথের পথিক হইয়া অদৃশ্য হইল। এ দেশে আসিলে, ঠগীদের কাহিনী বিস্তর শুনিতে পাওয়া যায়। দূরে তাহাদের ভগ্নস্মৃতি জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। ক্ষেত্রে কার্পাস প্রসূন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া প্রস্ফুটিত। উষ্ণিষধারী কৃষক ভূমিকর্ষণে ব্যস্ত আছে। তদীয় পত্নী কূলের মধ্যভাগে উত্থিত কাষ্ঠ ধারণ করিয়া করগুস্থ গোধূম বপনের জন্য নিক্ষেপ করিয়া যাইতেছে। সেই স্ত্রীলোক লালসাড়ী কাছা দিয়া পরিধান করায় মহারাষ্ট্র দেশের নৈকট্য সূচনা হইল। দেশজ ভাষার নাম নিমাড়ি। বিচারালয়ে হিন্দী প্রচলিত। আমরা জব্বলপুরের মত খণ্ডোয়ার রেলওয়ে পান্থনিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। রাজপথে বহির্গত হইয়া কি দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে স্মরণ হয় না। স্মারক লিপিতে লিখিত আছে, মহাদেব রামেশ্বর ছত্তরের পশুব্যায়াম বিজ্ঞাপনী প্রথমে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল; রামেশ্বরের নিকটবর্ত্তী এক কুণ্ড আছে। তন্মধ্যে কোন উৎস থাকায় প্রভূত জল বহির্গত হইতেছে। নগর মধ্যে নলযোগে ইহা নীত হয়। কোন বাঙ্গালী ব্যবহারাজীবের গৃহে কালী-প্রতিমা নির্ম্মিত হইতেছে, দেখিয়া আসিলাম। "বিশ্বকোষে" দেখিতেছি,—এখানে আরও দ্রষ্টব্য আছে, কিন্তু আমরা সেখানে যাই নাই, অতএব তাহার উল্লেখ করিব না।

নিমাড় মালবের অন্তর্গত মধ্যভারতে অবস্থিত। উজ্জয়িনীর নাতি দূরবর্ত্তিনী, সম্মুখস্থ অন্যতর লৌহবর্ত্ম ইহা স্মরণে আনিয়া দিল। তথায় গমন ও খাণ্ডবে উপবিষ্ট হইয়া নিমিলিত চক্ষে অবন্তিকা দর্শন এতদুভয়ে ভেদ নাই। প্রাচীন উজ্জয়িনী আপন গৌরবের সহিত ধরণীগর্ভে লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছে। মহাতেজস্বী বিক্রমাদিত্য ও কালিদাসের মহিমা কেবল তথায় আবদ্ধ নহে। সমস্ত ভারতে তাহা পরিব্যাপ্ত। রাজপাট খনন করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ গ্রীক, বাহ্লীক শক ও দেশীয় রাজাদের সময়ে প্রচলিত প্রাচীন মুদ্রা বহির্গত করিয়াছেন, শকারী বিক্রমার্কের পূর্ব্বে বহু নৃপতি অবন্তিনগরে আধিপত্য করিয়াছিলেন। বিক্রম ও কালিদাসের নামে মুগ্ধ হইয়া দেশের কত মহিপাল ও সাহিত্যিকগণ তত্তন্নাম ধারণ করিয়া ধন্য হইলেন। ইহাতে শিলালিপি এবং কাব্যক্ষেত্রে কয়েকজন বিক্রমা-দিত্য ও কালিদাসকে প্রত্যক্ষ করিয়া পণ্ডিতসমাজে কালনির্ণয়ের পক্ষে বিশেষ মত-

হইয়াছেন। কবি কহেন,—"বিক্রমাদিত্য অত্যুন্নত দ্রাবিড় বৃক্ষের কুঠার স্বরূপ, লাটাটবী দাবাগ্নি, বলবদ্ বঙ্গ ভুজঙ্গরাজ্যের গরুড়, সমুদ্রের অগস্ত্য গর্জ্জিত গুর্জ্জর রাজ করির হরি, ধারান্ধাকারের অর্জ্জমা কালেরা জাম্ব জের চন্দ্রমা ছিলেন। উজ্জয়িনী নিবাসী কালিদাস সংবৎ সংস্থাপক বিক্রমের রাজ্যকালে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন সন্দেহ নাই। মানবচরিত্র চিত্রণে, স্বভাব বর্ণনে ও সুমধুর ছন্দ গ্রন্থনে তাঁহার তুল্য সংস্কৃত সাহিত্যে কবি দ্বিতীয় কেহ নাই।

প্রাচীন উজ্জয়িনীর সন্নিকটে, আধুনিক নগরে যাত্রাকালে সপ্তপুরী দর্শনকারীগণ অবন্তিতীর্থ-যাত্রা সম্পন্ন করেন। মহারাষ্ট্ররাজ সিন্ধে ইহার অধিপতি। অদ্যাপি জ্যোতির্ব্বিদগণ মাধ্যায়ন বৃত্ত বা প্রাথমিক দ্রাঘিমা এখান হইতে গণিয়া থাকেন। এক সময়ে ভারতের কেন্দ্ররূপ মধ্যভারতে বিক্রমার্ক উদিত হইয়া চতুর্দ্দিকে তেজ বিকীরণ করিয়াছিলেন; তৎকালে আদিত্যের গ্রহ হইয়া কালিদাস তাঁহার পার্শ্বচর হন। কিয়ৎকাল পরে সে সূর্য্য তেজহীন হইলে তিনি গ্রহস্বরূপে মহাকবির আলোক দীপ্তিমান থাকিয়া পারিপার্শ্বিকভাবে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিক্রম অপেক্ষা, সাহিত্যিকের বিক্রম দীর্ঘকাল স্থায়ী।

প্রসিদ্ধ চোর তাতিয়া ভিল, এখানকার নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে ধৃত হয়। এক ব্রাহ্মণীর সহিত তাহার ভ্রাতৃ সম্পর্ক ছিল। আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে ভগিনী-দ্বারা হস্তে রাখিবন্ধন করাইতে আসিত; নিমন্ত্রিতকালে আগমনের সন্ধান পাইয়া নগরাধ্যক্ষ একশত প্রহরী দ্বারা গৃহ বেষ্টন করিল। তদ্দর্শনে প্রচণ্ড সাহসী কহিল "তোমরা ভীত হইও না; আমার আহার শেষহইলে ধৃত করিও। আমি আর পলায়ন করিব না।" ভগিনীপতি অর্থলোভে দণ্ডশক্তিকে সংবাদ দিয়াছিল। ভগিনী তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। কথিত আছে, তাতিয়া সক্ষমের বিত্ত অপহরণ করিয়া অক্ষমকে দান করিত। বাজরার রোটিকা লবণ ও লঙ্কা সহযোগে আহার করিতে তাহার নিজের জন্য অতি সামান্য অর্থের প্রয়োজন হইত।

ভিল জাতি নিকটবর্ত্তী খানদেশস্থিত বনভূমিতে বাস করে। আরাবলী পর্ব্বত-মালা হইতে সিন্ধু ও রাজস্থানের মরুস্থলী এবং গুজরাতের গিরিকানন ইহাদের আবাস। রাজপুতনা তাহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। স্থানবিশেষে সিংহাসন আরোহণ কালে, ভিল সামন্ত আসিয়া রাজতিলক প্রদান না করিলে তথায় অদ্যাপি রাজন্যের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। ইহারা আদিমনিবাসী জাতি সমূহের অন্তর। ভারতের আদিম-নিবাসী মাত্রেই দ্রাবিড় শব্দ বাচ্য। ভিলগণ কৃষি-

মৃগয়া ও দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করে। শরণাগতের প্রতি এমনি দয়াবান, নিজ প্রাণ দিয়া তাহার মঙ্গলবিধানে তৎপর হয়।

অত্রত্য পুরুষের পরিচ্ছদ ও বাক্য আলোচনা করিলে হিন্দুস্থানী ও তাহার ভাষাকে ত্রিবিধ ভাষা বোধ হয়। দ্রাবিড় আর্য্যভারতী হইতে এত বিভিন্ন প্রকৃতি যে, মধ্যভারতের অধিবাসীতে তাহার চিহ্ন অতিঅল্প। আর্য্যপুরুষ মহারাষ্ট্র পর্য্যন্ত আপন ভাষা লইয়া গিয়া কর্ণাটে পরাস্ত হইয়াছে।

কয়েকটী রেলওয়ে ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া আমরা অসেরগড় দেখিতে পাইলাম। গণ্ড শৈলের উপর কতকগুলি আবাস ও মহম্মদীয় ভজনালয়ের চূড়া দৃষ্ট হইতেছে। দুর্গমূলে নদী প্রবাহিতা। ক্রমশঃ সাতপুরা নামধেয় বিন্ধ্য গিরি-শ্রেণী দর্শন করি। খানদেশ প্রাকৃত সৌন্দর্য্যে মালওয়া সদৃশ। মৃত্তিকা কৃষ্ণ-বর্ণ; তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোয়ারামঞ্জরী অঙ্কুরিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে ঈষৎ নিম্ন কৃষ্ণ কঙ্করাচ্ছাদিত রথ্যা। বন মধ্যে পথ উদ্ভিদ্ পূর্ণ কেন, এবং ইহা প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্য কি, বুঝিলাম না। পরে বুঝা গেল, সে গুলি নদীগর্ভ, প্রবাহ না থাকায় অতি সুন্দর অধ্ববৎ প্রতীয়মান হইতেছে। ধুণ্ডমনমাড় সরল পথ আমা-দিগকে মোহময়ী ও পুণ্যপত্তনে যাইতে নিষেধ করিল। জি, আই, পি, রেলপথ মহারাষ্ট্র অতিক্রমণ করিয়া আমাদিগকে কর্ণাটের নিজাম্‌রাজ্যে অবতরণ করাইয়া দিল। তক্রবিক্রেতার রব দেশভেদ বুঝাইয়া দিতেছে। আমরা অবতরণ করিবার পূর্ব্বে নিম্নতন শান্তিরক্ষক আসিয়া গাড়ীর স্নানগৃহ প্রভৃতি উদ্ঘাটন করতঃ পরি-দর্শন করিলেন।

রায়চর। চেন্নপট্টননিবাসী গুর্জ্জর বণিক খোলাশদাস খানদাসের ধর্ম্মশালায় আমরা অবস্থিত রহিলাম। বাত্যা ও বারিপাত নিবন্ধন বীজাপুর প্রভৃতি রাজন্য সেবিত দুর্গ দেখিতে যাওয়া হইল না। ধর্ম্মশালাধ্যক্ষ কহিলেন, "সেখানে দর্শ-নীয় আর কি থাকিতে পারে। তথাকার অধিবাসীবর্গ অর্থলালসায় প্রস্তর পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া থাকেন। আদিল সাহী বিজয়পুর ১৪৮৯ হইতে ১৬৮৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বিজয় ঘোষণা করণান্তে আওরঙ্গজেবের প্রতাপভার অবসন্ন হইয়াছে। সেই আওরঙ্গ প্রতাপ মহারাষ্ট্রীয় অভ্যুদয়ে খর্ব্ব হইল, আসফ্‌জা স্বাধীন হইয়া নিজাম উলমূলক হন, হায়দরাবাদ তাঁহারি স্থাপিত। এক্ষণে মোগল সাম্রা-

জ্যের অবশিষ্টাংশ দেখিতে হইলে ঐ স্থানে যাওয়া উচিত। নিজাম ভারতীয় সামন্ত রাজন্যবর্গের শীর্ষস্থানীয় রাজ্যের আয় বার্ষিক ৪ চারি কোটি মুদ্রা।

কর্ণাট পরিদর্শনে বঙ্গীয় একটী দৃশ্য লক্ষিত হইয়াছে। ক্ষেত্রের একস্থানে আমাদের পৌষপার্ব্বণে ব্যবহৃত, মৃৎপাত্র আচ্ছাদন দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুতিকৃত হইতেছে ইহা কি বঙ্গের দ্রাবিড় চিহ্ন নহে ?

রেলষ্টেশনে, ম্লেচ্ছগণ হিন্দুকে মিষ্টান্ন বিক্রয় করিতেছে। ইহা রায়চর গ্রামের এক জঙ্গম কর্ত্তৃক প্রস্তুত। তাহা বিক্রেতার সংস্পর্শে অখাদ্য হইতেছে, অপরাহ্ণে মদ্রাস লৌহপথের গাড়ী ছাড়িল। কিছুক্ষণ পরে তুঙ্গভদ্রার পাষাণ-বদ্ধ কান্তির চমৎকার দৃশ্য শেষ করিয়া আমাদিগকে তমসাবৃত হইতে হইল।

গ্রাম্য ভৌগলিক মতে, পৃথিবী ত্রিকোণ। ভারত জগৎ প্রায় সেইরূপ, সন্দেহ নাই। তন্মধ্যে দক্ষিণাপথ অবশ্যই তদ্বৎ। ইহার পর্ব্বতমালা ত্রিভূজাকৃতি। পূর্ব্ব পশ্চিমঘাট, তাহা দক্ষিণে নীলগিরিতে মিলিত হইয়া সাগর বলয়ান্বিত হইয়াছে। পৌরাণিক যুগে আর্ষিকরণ প্রভাবে এই ভূমি ভারতবর্ষের অন্তর্গত হয়। দক্ষিণাবর্ত্তের প্রধান নদীগুলি গিরিদ্বয়ের বিচ্ছেদভাব অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত। এই বিচ্ছেদের জন্য পর্ব্বতের নাম ঘাট হইয়াছে। যমল ভূধরের মধ্যভাগে তিনশত ক্রোশ দাক্ষিণাত্য মালভূমি অম্বুবীর স্থানভেদে নৈসর্গীক দৃশ্যের যথেষ্ট ব্যতিক্রম আছে। নীলগিরি ভিন্ন প্রায় সর্ব্বত্র সমোশীতোষ্ণ। আর্য্যজাতি তাঁহাদের দক্ষিণাবর্ত্তে ঋতু বৈষম্যের অভাব নিবন্ধন নানাপ্রকারের খাদ্যসামগ্রী আনয়ন করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। কেবল, দ্রাবিড়, কর্ণাট ও তৈলঙ্গ দেশ চতুষ্টয় বহুল অংশে সদৃশ। দেবালয় নির্ম্মাণ প্রণালী, পরিচ্ছদ, ভাষা ও আচারগত মৌলিক ভেদ নাই। জাতিতে দ্রাবিড়ের প্রসার, মিশ্রভাবে ভারতে প্রায় সর্ব্বব্যাপী। আর্য্য ও মঙ্গোলিয়ার স্থান সন্নিবেশ অতিমাত্র হ্রস্ব। বাক্য ও বর্ণাশ্রম, ধর্ম্ম সমন্বয়ে ভারত বহুল পরিমাণে আর্য্যপ্রভাব সন্নিবেশিত হইতেছে।

ক্রমশঃ

বকুলকুমারী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, বি, এল,

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বাসপরিবর্ত্তন।

বিদায় হইয়া মাখনলাল যখন সদরমহলে আসিলেন, রাত্রি তখন ১১ টা। ততরাত্রে তথা হইতে ফিরিয়া গেলে, রামজীবন বাবু কি মনে করিবেন, সেই আশঙ্কায় সে রাত্রে তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইলেন না, পরিচিত বৈঠকখানায় শয়ন করিয়া কষ্টে শ্রেষ্টে রজনী অতিবাহিত করিলেন।

প্রভাত হইল। দিনমানে বকুলকুমারীর পাচিকার হস্তেই মাখনের আহার করা হইত, সে দিন আর তিনি সে নিয়ম রক্ষা করিলেন না, একটী ব্যাগ আর ছড়ি-গাছটি সঙ্গে লইয়া রামজীবন বাবুর বাটীতেই চলিয়া গেলেন।

রামজীবন বাবু বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়াছিলেন, তত সকালে অপ্রত্যাশিত-রূপে মাখনকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, এতো সকালেই কি আহার কোরেছ?

মাখনলাল উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে না, সেখানে আর আমি আহার করিব না; বিস্তর গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। আহারের জন্য স্ত্রীলোকের গঞ্জনা সহ্য করা বড়ই অপমানের কথা; সে বাড়ীতে আর আমি যাব না। আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট স্নেহ, যথেষ্ট দয়া, আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে এইখানেই আহার করিব, রাত্রে এইখানেই শয়ন করিয়া থাকিব।"

মাখনলাল বসিলেন। ফুল্লবদনে ঈষৎ হাস্য করিয়া রামজীবন বাবু বলি-লেন, "অনুমতির অপেক্ষা কি? এ বাড়ী তোমার নিজের মনে কর, আমি তোমাকে পুত্রের মত দেখি, সচ্ছন্দে থাক।"

সেই দিন অবধি মাখনলালের বাসস্থানের পরিবর্ত্তন হইল। রামজীবন বাবুর বাটীতে দুইবেলা আহার করেন, তথা হইতে আফিসে যান, আফিস হইতে আসিয়া সেইখানেই থাকেন, সেইখানেই রাত্রিবাস।

এই প্রকারে প্রায় দুই মাস অতিবাহিত। এই দুই মাসের মধ্যে কয়েকদিন মাখনলালের সহিত সৌদামিনীর সাক্ষাত হইয়াছিল। দুই মাস পূর্ব্বে সেই ঝড়-বৃষ্টির রজনীতে উভয়ে যে প্রকার কথোপকথন হয়, ঐ সকল গুপ্ত সাক্ষাতে তদ-পেক্ষা কিছু অধিক মিশামিশি ভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল। শেষবারের দর্শনে

মাখনলাল বলিয়াছিলেন, "তোমার বুদ্ধি বড় চমৎকার, বাগযুদ্ধে তোমার শক্তিও অসাধারণ, কিন্তু ভাই, লজ্জার সঙ্গে যুদ্ধে তোমার পরাজয়।"

সৌদা। লজ্জা নারীজাতির ভূষণ, লজ্জার কাছে, পরাজয় স্বীকার না কোল্লে কুলস্ত্রীর কুলগৌরব রক্ষা হয় না।

মাখন। তা তো বটেই, তা তো বটেই, কিন্তু দু-একটা সংসারের কথায় কথা কাটাকাটি চলে, তাতে লজ্জার কিছু অগৌরব হয় কি ?

সৌদা। অগৌরব না হোতে পারে, কিন্তু সংসার কারে বলে, তা আমি বুঝি না। হাঁ, ভাল কথা,—যে কথাটা জিজ্ঞাসা কোর্‌বো মনে করি, এই দুমাসের মধ্যে সেটা আর উত্থাপন করবার সময়ই পাই নি, তোমার সেই সহুরে বউটির সঙ্গে আর দেখা কর না কেন ? রাত্রে আর সেখানে যাও না কেন ? তার সঙ্গে আবার হলো কি ?

মাখন। কাটান্ ছাড়ান্ হোয়ে গেছে। তার সঙ্গে আমার মন মেলে না। সত্য কথা বোল্‌তে কি, তোমার মতন একটি স্ত্রীরত্ন যদি আমি পেতেম, তা' হ'লে অহরহ সুখসাগরে সাঁতার খেলে বেড়াতেম। সেই যে, কি একটি পুরাতন গীত আছে ঃ—

"প্রেম কাননে আমি হংস হইব. তোমারে হংসিনী করিব, দুজনে প্রেমসাগরে ভাসিব।" সে গীতটী কেমন ?

সৌদা। (মৃদু হাসিয়া) গীতটি যিনি বেঁধেছেন তিনি বেশ সুপ্রেমিক।

মাখন। (মৃদু হাসিয়া) যার মুখে শুন্‌লে, তারে কি সুপ্রেমিক বোধ হয় না ?

সৌদা। যার কাছে হও, তার কাছেই তাই, আমার কাছে কি ?

রাত্রি অধিক হইয়াছিল, বাড়ীর সকলে স্ব স্ব গৃহে নিদ্রাভিভূত, গোপনে উভয়ের কথা কহিবার কোন বাধা ছিল না। উত্তম অবসর বুঝিয়া মাখনলাল বলিলেন, ''আচ্ছা সদু, আমি যদি স্বতন্ত্র একটা বাসা করি, তা হলে কি তুমি আমার কাছে থাকৃতে পার ?

সৌদা। (নতবদনে মৃদু ভাষে) আমার কি তেমন ভাগ্য হবে ? তোমার সঙ্গে একত্র বাস কি আমার ভাগ্যে মিল্‌বে ? সংসারে আমার ত কেহই নাই, তুমি যদি দয়া কোরে আশ্রয় দাও, তা হ'লে প্রাণপণে সাধ্যমত আমি তোমার সেবা করি।

মাখন। (উল্লাসিত হইয়া) তবে তাই একটা স্থির করা যাক্।

সৌদা। (চিন্তা করিয়া) একটা কথা জানতে আমার বাকী আছে। কল্‌কেতায় যেটিকে তুমি বিয়ে করেছ, সেটির নাম কি ?

মাখন। কেন, সে নামে তোমার কি দরকার ?

সৌদা। তবু, তবু, শুনেই রাখি না।

মাখন। বকুলকুমারী।

সৌদা। বাঃ! বেশ নাম! আচ্ছা, আমারে নিয়ে যদি তুমি আলাদা বাস কর, তবে তোমার বকুলকুমারীর কি দশা হবে ?

মাখন। আগেই তো বোলেছি, তার সঙ্গে আমার মন মেলে না। তুমি যদি আমার চিরসঙ্গিনী হও, তা'হলে তাকে আমি জন্মের মত ভুলে যাব।

সৌদা। (মৃদু হাসিয়া) আশ্চর্য্য কথা বটে! যিনি এই বিশ্ব-চিড়িয়াখানার কর্ত্তা, তাঁর সকল খেলাই নূতন! আচ্ছা, চেষ্টা করি, দেখি দেখি, তোমার সঙ্গিনী হতে পারি কি, না পারি।

আরো এক কথা,—তুমি বোল্‌চো, বকুলকুমারীর সঙ্গে তোমার মন মেলে না, আমার সঙ্গে যে মিল্‌বে, তার কি প্রমাণ ?

মাখন। তোমার ঐ সুমধুর বাক্যগুলি ও সুমধুর ব্যবহারই তাহার প্রমাণ।

সৌদা। খোসামোদ আমি ভালবাসি না। চক্ষুলজ্জার খাতিরে মোহবশে তুমি আমার খোসামোদ কোচ্চ। ওভাবটা ভুলে গিয়ে, মনস্থির কোরে পূর্ব্বাপর বিবেচনা কর, স্থির হয়ে নির্জ্জনে বোসে আমিও বিবেচনা করি। তোমার মুখের কথাগুলি সত্য সত্য তোমার অন্তরের কথা কি না, পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

মাখন। অগ্নিপরীক্ষাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট পরীক্ষা ; তোমার রূপের অনলে আমার মনের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গিয়েছে।

সৌদা। আমার একটু বাকী আছে। এখন আমি বিদায় হই।

বিদায় চাহিয়া সৌদামিনী ক্ষণকাল নতমুখী হইয়া রহিল ; তাহার সে সময়ের মুখজ্যোতিঃ অতি অপরূপ দেখাইতে লাগিল।

রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া, লজ্জা-সঙ্কুচিতা দুঃখিনী বঙ্গবালা দ্রুতপদে সেই গৃহ হইতে প্রস্থান করিল।

ক্রমশঃ

সেবকের আকিঞ্চন।

লেখক,—রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত।

গীত।

সুরট-মল্লার,—আড়াঠেকা।

তুমি হে পরশমণি, দেবের দুর্লভ ধন।
ছুঁয়ে নাথ করমোরে, শুদ্ধ কষিত কাঞ্চন॥
রামকৃষ্ণ-কল্পতরু, কাঙ্গালের ইষ্টগুরু,
বিচিত্র চরিত্র চারু, কোথা পতিতপাবন॥
এস পুন সংগোপনে, ছোঁও এ পতিতজনে,
কৃপা-চক্ষে চাহ দীনে, ওহে কমললোচন;—
নররূপে কর লীলা, আঁখি ভ'রে দেখি খেলা,
প'ড়ে মোর আসে বেলা, দাও ভেলা শ্রীচরণ॥

কান্তা।

স্ত্রীশিক্ষা।

অনুবাদক,—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি,-এ,

কোন একটি স্ত্রীর স্বভাব কিঞ্চিৎ রুক্ষ ও উগ্র ছিল। তাহার উপর তিনি অভিমানিনীও ছিলেন। এবম্বিধা গুণযুক্তা ছিলেন বলিয়া তাঁহার উপর তদীয় স্বামীরও তাদৃশ রুচি ছিল না। পতির নিজপ্রতি এরূপ অবহেলা দেখিয়া তাঁহার পত্নী স্বামীর বশীকরণ জন্য নানা প্রকার মন্ত্রতন্ত্রের প্রয়োগ করিতে ও করাইতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে ধূর্ত্ত পাষণ্ডেরা তাঁহাকে নানাবিধ মন্ত্রতন্ত্রের (ডোর, তাগা ও কবচ প্রভৃতির) প্রয়োগ বাতলাইয়া অর্থ আকর্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল; তথাপি রমণীর মনস্কামনা সিদ্ধ হইলনা। প্রসঙ্গক্রমে উক্ত রমণী তাঁহার এক সঙ্গিনীকে নিজ দুঃখ জ্ঞাপন করেন। চতুরা বন্ধু রমণীর মূর্খতা বুঝিলেন এবং যাহাতে তিনি অর্থাপহারকদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পান, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহার (বন্ধুর) বাটীতে এক (মন্ত্রশাস্ত্রী) বিচারনিপুণ ব্রাহ্মণ আতিথ্য গ্রহণ করেন,

তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণের লক্ষণ অবগত ছিলেন, অতিথিকে তল্লক্ষণযুক্ত বুঝিতে পারিয়া নিজ দুঃখিনী বন্ধুর কথা বলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার বন্ধু (স্ত্রী) কে একবার ডাকিয়া আনিতে বলেন এবং আরো বলিয়া দিলেন যে, "আমি যে সত্য মন্ত্র (বিচার) ও তন্ত্র (যুক্তি) বলিয়া দিব তাহার জন্য কোন অর্থব্যয় করিতে হইবে না।" ফলে রমণী ব্রাহ্মণের নিকট আসিলেন এবং নিজের দুঃখকাহিনী এবং দুঃখমোচনের কি কি, উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন যে, স্ত্রীলোকটির বুদ্ধিহীনতাই তাহার সমস্ত দুঃখের মূল কারণ। একথা সে-কথার পর, ব্রাহ্মণ একটু কাগজে কিছু লিখিয়া মুড়িয়া স্ত্রীলোকটিকে দিলেন ও ধারণ করিতে বলিলেন এবং নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি নিত্য করিবার আদেশ করিলেন :—

১। পতিগৃহাগত হইলে যুক্তকরে অভ্যর্থনা করিবে ; নমস্কার করিবে।

২। ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। কদাচিত অপরিষ্কার না থাকে।

৩। কখনও মিথ্যা বলিবে না।

৪। পতির উপদেশ ও আদেশ অনুযায়ী চলিবে। তাঁহার আজ্ঞা কখন লঙ্ঘণ করিবে না।

৫। কাহারও উপর ক্রোধ করিবে না, পতি যদি কখনও বিনা কারণে রুষ্ট হয়েন, তথাপিও চুপ করিয়া সহ্য করিয়া যাইবে। কাহাকেও অপমান করিবে না।

৬। রন্ধনের দ্রব্য এবং আহার্য্য দ্রব্যগুলি বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া শুদ্ধাচারে রন্ধন করিয়া পতিকে ভোজন করাইবে।

৭। পতি গৃহে আসিলে, হাল্‌কা স্ত্রীলোকদিগের মত কোন হাবভাব দেখাইবে না।

৮। পতির প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি যথাসময়ে সংগ্রহ করিয়া রাখিবে।

৯। পতির অনুপস্থিতিতে যদি বাটিতে কোন সাধু, ব্রাহ্মণ বা অপর কোন ব্যক্তি আগমন করেন তো তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না এবং অপরের বাটীতে পতির অনুজ্ঞা ব্যতীত যাইবে না।

১০। পতির সহিত কথা কহিবার সময় নম্রভাবে ও হাস্যমুখে কথা বলিবে পতির প্রতি সম্মান ও পূজ্যভাব রাখিবে।

উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী যদি ছয়মাস চলিতে পার তো আমার মন্ত্রের ও তন্ত্র-

অন্তর্ভূত ফল জানিতে পারিবে। তোমার উপর পতির কৃপা হইবেই হইবে।

রমণী ব্রাহ্মণোপদিষ্ট পথে চলিতে লাগিল। একমাস না গত হইতেই পতির মনে নানারূপ সংশয় আসিয়া উদয় হইতে লাগিল। কখনও ভাবেন যে, তাঁহার পত্নী বোধ হয় বয়স্থা ও বুদ্ধিমতী হইতেছে, সেইজন্য তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। কখনও বা মনে করেন যে, হয়ত তাঁহার স্ত্রী কোন বশীকরণ মন্ত্র তন্ত্রাদি করিয়া তাঁহার মন ফিরাইয়া দিয়াছে এবং সেই জন্য তাঁহাকে এত প্রিয় বলিয়া বোধ হইতেছে। আবার ভাবেন হয় ত এরূপ আচরণ সম্পূর্ণ কৃত্রিম যেহেতু স্ত্রী চরিত্র দুর্জ্ঞেয়। এইরূপ সংশয়াকুলিত মানসিক অবস্থায় তিনি কোন বন্ধুর সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করেন। মূর্খ বন্ধু তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী নিশ্চয়ই কোন বশীকরণ করিয়াছে। তথাপি পতির মনের সন্দেহ দূর হইল না। এমন সময়ে তিনি সেই কবচটি খুলিয়া রাখেন। কিন্তু ভুলক্রমে যথাস্থানে (গোপনীয়) রক্ষিত না হওয়াতে উহা পতির হস্তগত হয়। পতি কবচটি ভাঙ্গিয়া কাগজটি বাহির করিয়া দেখেন, তাহাতে এই লেখা ছিল।

"পতিই আমার ঈশ্বরতুল্য, তাঁহার সুখে আমার সুখ, তাঁহার দুঃখে আমার দুঃখ। তিনি আমার স্বামী, আমি কায়মনোবাক্যে তাঁহার দাসী মাত্র। হে পরমেশ্বর! আমাদের উভয়ের যেন বিচ্ছেদ না ঘটে, আমার মন যেন ভুলেও তাঁহার চরণছাড়া না হয়, আমার মূর্খতার জন্য আমার প্রতি পতির যে উপেক্ষা তাহা দূর কর, কারণ আমি অনন্যাশ্রয় অবলা, করুণাপাত্রী ও তাঁহার দাসী। পতি যেন সদা আমাকে দয়া ও কৃপাদৃষ্টিতে দেখেন, এই ভিক্ষা দাও হে পরমেশ্বর!"

লেখা পড়িয়া পতি বড়ই প্রীত হইলেন। পরামর্শদাতা বন্ধুটিকে মূর্খ জানিতে পারিয়া কবচের কথা আর কিছু বলিলেন না। পত্নীরও মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। উভয়ে পূর্ণানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

ভগ্নি, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বিদ্যার প্রভাব যে কি, তাহা বোধ হয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ। দেখ, বিদ্বান ব্রাহ্মণ "মন্ত্র" অর্থাৎ বিচার, 'তন্ত্র' অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা দুজনকে সুখী করিয়া দিলেন। যদ্যপি ঐ স্ত্রী জ্ঞানবতী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পতি তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইবার অবসরও পাইতেন না। এই জন্যই স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যক। ইহাই মন্ত্র আর ইহাই তন্ত্র।

ক্রমশঃ



প্রিন্স অব ওয়েলস্

বৃটনাধিপতি ভারতসম্রাট মহামান্য পঞ্চমজর্জ্জের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স এড্‌ওয়ার্ড যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। গত বৎসর তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে ওয়েষ্টমিনষ্টার প্রাসাদে তিনি প্রিন্স অব ওয়েলস্ উপাধিধারণ করিয়া অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, উৎসব ক্রিয়া অবশিষ্ট ছিল; বর্ত্তমান (১৯১১) ১৩ই জুলাই তারিখে খাস ওয়েলস্ প্রদেশের কারণারভন প্রাসাদে সেই যৌবরাজ্যের অভিষেকের মহা-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে; রাজা পঞ্চমজর্জ্জ, মহিমান্বিতা রাজ্ঞী মেরী, রাজ-পরিবারবর্গ, প্রধান মন্ত্রী লর্ড আস্‌কুইথ, রাজস্ব সচীব লয়েডজর্জ্জ এবং বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ অভিষেকসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; দলে দলে সৈন্য সামন্ত বারখাড়া হইয়াছিল, যুবরাজ হলিহেড্ প্রাসাদ হইতে কারণারভন্ প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে সহস্র সহস্র বদনে জয়ধ্বনি, মনোহর বাদ্যধ্বনি এবং দুর্গ হইতে একবিংশতি তোপধ্বনি হইল। অনন্তর অভিষেক ক্রিয়া

সমাহিত হইলে রাজা যুবরাজকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক সময়োচিত সদ্‌উপদেশ-প্রদান করিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন।

বহুদিনের পর কারণারভন্ প্রাসাদ সুসংস্কৃত হইয়া সুসজ্জিত হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের রাজগণের জ্যেষ্ঠ পুত্রেরা প্রিন্সঅব ওয়েলস্ হন, ইহা প্রসিদ্ধ প্রথা কি সূত্রে এই প্রথার প্রবর্ত্তন,ঐতিহাসিক কিম্বদন্তী প্রমাণে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থলে প্রকাশ করা গেল।

কারণারভন্ প্রাসাদে ইংলণ্ডের প্রিন্স অব ওয়েলসের অভিষেক এটি এক-প্রকার নূতন প্রথা, ছয়শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে প্রথম এডওয়ার্ড যখন ইংলণ্ডের রাজা, তৎকালে ১২৮৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে ঐ কারণারভন প্রাসাদেই রাজা এড-ওয়ার্ডের মহিষী এলিনর একটী পুত্রসন্তান প্রসব করেন. সেই পুত্রই পরিশেষে দ্বিতীয় এডওয়ার্ড নামে ইংলণ্ডের রাজা হইয়াছিলেন। রাজা প্রথম এডওয়ার্ড যখন ইংণ্ডের রাজত্ব করেন. ওয়েলস্‌প্রদেশ তখন একপ্রকার স্বাধীন ছিল, তথাকার প্রধান প্রধান ভূস্বামীগণ রাজোচিত কার্য্যের সুব্যবস্থা করিতেন; তাঁহাদের মধ্যে যিনি সমধিক শক্তিশালী, তিনি আপনাকে লর্ড স্নোডাউন উপাধিতে পরিচিত করিয়া রাজক্ষমতা পরিচালন করিতেন। বীরকেশরী রাজা প্রথম এডওয়ার্ড স্বীয় ভুজবিক্রমে সেই পরাক্রান্ত ভূস্বামীগণকে বশীভূত করিয়া মিষ্টবচনে তাঁহা-দিগকে বলেন, "আমি যদি আমার পুত্রকে কারণারভন্ প্রাসাদে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রিন্স অব ওয়েলস্ উপাধি দান করি, তিনি যদি ওয়েলস্ প্রদেশে রাজক্ষমতা ধারণ করেন, তাহাতে রাজসম্মান প্রদান করিতে আপনাদের কি কোন আপত্তি আছে?"

রাজাকে অভিবাদন করিয়া ভূস্বামীগণ সেই প্রস্তাবে প্রভূত আনন্দ বিজ্ঞাপন করিলেন। কেবল ভূস্বামীরাই আনন্দিত হইলেন, তাহা নহে,—সমগ্র ওয়েলস্ প্রদেশের অধিবাসীবর্গ একবাক্যে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা বুঝিয়া-ছিলেন, ইংলণ্ডের রাজার অধীন না হইয়া স্বদেশে আপনাদের মধ্যে ইংলণ্ডের রাজপুত্রকে রাজা প্রাপ্ত হওয়া শ্লাঘার বিষয়।

তাঁহাদের শ্লাঘা সেই সময়েই কার্য্যে পরিণত হয়। রাজা প্রথম এডওয়ার্ড অচীরে রাজ্ঞী এলিনরের গর্ভজাত পুত্রকে প্রিন্স অব ওয়েলস্ উপাধি দিয়া কার-ণারভন প্রাসাদে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। ইংলণ্ডের প্রিন্স অব ওয়েলস্ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে খাস ওয়েলস্ প্রদেশের রাজা হন। ওয়েলসের অধিবাসীগণ

পরম্পরা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের অধীন হইয়া আসেন।

ওয়েলস্ প্রদেশকে অধীন করিবার কর্ত্তাও প্রথম এডওয়ার্ড, প্রিন্স অব ওয়েলস্ পদের সৃষ্টিকর্ত্তাও প্রথম এডওয়ার্ড। ছয় শতাধিক বর্ষকাল এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু দ্বিতীয় এডওয়ার্ড ব্যতীত আর কোন রাজকুমার অথবা প্রিন্স অব ওয়েলস্ ঐ কারণারভন্ প্রাসাদে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন, ইতিহাসে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সদাশয় রাজা পঞ্চম জর্জ্জ প্রজারঞ্জনের অনুরোধে এই প্রথাটি নূতন জাগ্রত করিলেন।

প্রজারঞ্জন করিতে হইলে, এইরূপ উদারতা প্রদর্শন করাই বিশুদ্ধ আদর্শ রাজনীতি। এই কার্য্যের জন্য সমস্ত লোক তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছেন; সকলেই বলিতেছেন, যে দিনে প্রিন্স এডওয়ার্ড কারণারভন প্রাসাদে অভিষিক্ত হইলেন, সেই দিনটি আমাদের স্মরণীয় হইয়া থাকিল।

প্রিন্স অব ওয়েলস্ প্রিন্স এডওয়ার্ড যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, এই মাঙ্গলিক উৎসবে আনন্দিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সভাসমিতি হইতে যুবরাজকে কয়েকখানি অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইয়াছে। যুবরাজ সেই সকল অভিনন্দন পত্রের যেরূপ সদ উত্তর প্রদান করিয়াছেন, প্রশংসার সহিত তাহা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "আমার বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষ মাত্র; পরম শ্রদ্ধাস্পদ জনকজননীর উপদেশ মতেই কার্য্য করিতেছি, চিরজীবন তাঁহাদের উপদেশানুসারে কার্য্য করিব।"

পিতৃভক্ত বালকের এই উদার অঙ্গীকার সর্ব্বতোভাবেই শ্লাঘনীয়। এক্ষণে আমরা ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, রাজা, রাণী, রাজপুত্র এবং ইংলণ্ডের রাজপরিবারবর্গ জগদীশ্বর প্রসাদে দীর্ঘজীবন লাভ করুন; ধর্ম্মাত্মা রাজা পঞ্চমজর্জ্জ চিরদিন সুখশান্তি লাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন করিতে থাকুন।

উৎসর্গ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্রনাথ মিত্র।

অমৃতধামে গেছ তুমি মায়ের কাছে।
জীবন পেয়েছ তুমি কি ভাবনা আছে॥
মার ভালবাসা কত জেনেছ এবারে।
আর কি বাসনা হয় ফিরিতে সংসারে॥
কত সুখ দিব্যধামে তুমি পাইতেছ।
ঐহিকের সব দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছ॥
যা কখনো জান নাই, তাহা তুমি জানিলে।
যা কখনো দেখ নাই তাহা তুমি দেখিলে॥
শরীর গিয়াছে বলে তুমি যাও নাই।
আত্মারূপে আছ পরমাত্মাতে সদাই॥
যখন ধ্যানে বসিব দেখিব তোমারে।
আরও নিকট হলে দেখিব ভিতরে॥
ক্ষণিক সম্বন্ধ দেহের দুঃখের কারণ।
দহন করয়ে তাহা জাগায় না জীবন॥
যারা মাকে ভুলে মোজে থাকে এ সংসারে।
মৃত্যু ভয়ে তারা সদা কেঁপে কেঁপে মরে॥
সংসার অনিত্য সুখে যারা ভোলে নাই।
পরলোকে যেতে তারা প্রস্তুত সদাই॥
অমর ধামেতে নাহি হিংসা পরদ্বেষ।
আছে মাত্র ভালবাসা নাই দুঃখলেশ॥
তথা সব আপনার, কেহ নহে পর।
মায়ের সন্তান হয়ে সুখে করে ঘর॥
আহা! কি সুখেতে তুমি সেখানে রয়েছ।
মা যে কত ভালবাসে তাহা জানিতেছ॥
আমার ক্ষতির জন্য ক্ষেদ না করিব।
তুমি সুখে আছ শুনে সুখেতে থাকিব॥

নিরাকার হয়ে সদা আছ নিরাকারে।
নিরাকার আত্মা মম ধরিবে তোমারে॥
সাকার সম্বন্ধ মাত্র আছে ইহকাল।
নিরাকার সম্বন্ধটী থাকে চিরকাল॥
এখানেতে তুমি মম কত প্রিয় ছিলে।
আরো প্রিয় হলে তুমি জননীর কোলে॥
মার সঙ্গে সদা তুমি জাগিতেছ মনে।
অন্তরে তোমারে আমি হেরি প্রতিক্ষণে॥
কত আত্মীয় তুমি পেয়েছ সেখানে।
মিলেছ তাদের সঙ্গে প্রমোদিত প্রাণে॥
মিলেছ পতির সঙ্গে শচী লয়ে কোলে।
পবিত্র সম্বন্ধ তব দেহ গেছে বলে॥
পিতামাতা ভাই আদি আছে মম যত।
তোমারে দেখিয়া সেথা যত্ন করে কত॥
ভাই ভগ্নীগুলি তব ডাকে দিদি বলে।
কতই আনন্দে তারা উঠে তব কোলে॥
তোমরা জীবন পেয়েছ আমরা আছি ঘোরে।
কত দুঃখ তোমাদের মোদের দশা হেরে॥
যখন সকল ভুলে বসি মার ধ্যানে।
ক্ষণ-স্বর্গ-শোভা দেখি আমরা এখানে॥
সুখ হেতু মোরা যাহা ধরিবারে যাই।
তাহাতেই কেঁদে মরি বড় দুঃখ পাই॥
আপন আপন করি সকলি হারাই।
স্বার্থদাস হয়ে ঘোর আঁধারে বেড়াই॥
জানি না মোদের কবে এ দশা ঘুচিবে।
মোহ তম গিয়ে আঁখি প্রভা নিরখিবে॥
পরলোকে তোমাদের দেখিব সকলে।
সুখে মার নাম গাব মোরা সবে মিলে॥

জন্মিয়াছি মোরা শুধু মা নাম গাইতে।
চিরকাল রব সুখে আমরা তাহাতে॥
মায়ার আবর্ত্তে পড়ি ঘুরে ঘুরে মরি।
তাই মৃত্যু ভয়ে কাঁপি আপনা পাসরি॥
পতিহীনা হয়ে তুমি ছিলে মম ঘরে।
প্রেমপুণ্যে সাজাতেম তোমারে আদরে॥
লভিয়া পতির পতি পাবে পরিত্রাণ।
তাই মা সে নাম আমি করিতাম গান॥
অমৃতপুরীতে এবে সর্ব্বসুখ পাইলে।
কত ভাগ্যবতী তুমি তাহা এবে জানিলে॥
শৈশবে হারায়েছিনু স্নেহময়ী জননীরে।
বার্দ্ধক্যে তোমারে পেয়ে ভেসেছিনু সুখনীরে।
তোমার যতন স্নেহ মনেতে ভাবিলে।
বড় ক্লেশ হয় ভাসি নয়ন সলিলে॥
কিন্তু মা, প্রবোধ পাই এ অশান্ত মনে।
মঙ্গলার মঙ্গল ইচ্ছা ভাবি যেই ক্ষণে॥
তিনি মা মঙ্গলময়ী, তাঁহার কৃপায়।
সকল অভাব ঘোচে. বন্ধ দূরে যায়॥
শরীরে যেমন কষ্ট পেয়েছিলে এখানে
আত্মায় তেমনি সুখ পাইতেছ সেখানে॥
রোগ যাতনায় আহা তুমি কত কাঁদিতে।
আনন্দধামেতে এবে রহিয়াছ সুখেতে॥
সে রোদন নাহি আর সংসারের ব্যাধিতে।
আমরা রয়েছি হেথা যাতনাতে কাঁদিতে॥
আনন্দধামেতে এবে কি আনন্দ পেতেছ।
প্রেমানন্দ সিন্ধুনীরে ভেসে ভেসে যেতেছ।
দেহের যন্ত্রণা দুঃখ আর তব কিছু নাই।
নিত্যানন্দ শান্তিসুখ ভুঞ্জিতেছ সর্ব্বদাই॥

মায়ের মুখের হাঁসি দেখি সদা হাঁসিছ।
আনন্দে তাঁহার সঙ্গে সুখনীরে ভাসিছ॥
জীবনে এমন সুখ কভু তুমি পাও নাই।
বাসনা পোরে না হেথা শুধু অসুখের ঠাঁই॥
সেখানে বাসনা শুধু মার পদ সেবিতে।
সে সেবা হাঁসায় সদা না কাঁদায় দুঃখেতে॥
এখানে সঁপয়ে যারা প্রাণ মার চরণে।
দুঃখ নাহি পায় তারা জীবনে কি মরণে॥
চরমে যদ্যাপি হয় বাসনার ক্ষয়।
সে সময় এ দেহে মৃত্যু বড় বন্ধু হয়॥
শরীরে বিরাজ করে হিংসা আর দ্বেষ।
যাহে দেয় আমাদের যন্ত্রণা অশেষ॥
সুখী হওয়া নাহি যায় থাকিতে শরীর।
তাই তিনি ভেঙ্গে দেন গঠন মাটির॥
মৃত্যু আছে বলেপ্রাণে সুখ আশা আছে।
তা না হলে থাকিতাম অনলের কাছে॥
পুড়িতাম অগ্নিকুণ্ডে শান্তিসুখ না পেয়ে।
ছট্‌ফট্‌ করিতাম তীব্রবিষ খেয়ে॥
আছেন দয়ার নিধি শান্তি দেন আদরে।
লয়ে যান সুখ-ধামে বাহি দয়া-সাগরে॥
এখন তোমার তুমি শিক্ষাদাতা হয়েছ।
শুদ্ধাত্মা রূপে মম হৃদয়েতে রয়েছ॥
সুন্দর অনন্ত ছবি তুমি মোরে দেখালে।
অনন্ত সতন্ত্র নহে, মিশেছে ইহকালে॥
নদী যেমন মিশে আছে সমুদ্রের জলে।
মিশে তথা ইহকাল অনন্তের কালে॥
ইহকালে পরকালে তুমি রহিয়াছ।
কেবল অনিত্য দেহ ছাড়িয়া গিয়াছ।

আত্মস্থ হইলে তোমা সর্ব্বকালে দেখিব।
তোমার বিরহে আমি কেন খেদ করিব ॥
দু-দিন পরেতে আমি তব সহ মিলিব।
আনন্দে আনন্দে সদা মাঁর কাছে থাকিব ॥
স্বদেশে গিয়াছ তুমি আমি আছি বিদেশে।
ক'দিন থাকিব আর প্রবাসের এ ক্লেশে ॥
ঘরে যেতে চায় প্রাণ, ভগ্ন হয় দেহ।
সেই ধন্য, শীঘ্র যদি যেতে পারে কেহ ॥
কত পাপ করিতেছি ভুলিয়া মায়ায়।
মুক্ত তুমি, মায়া আর ছোবেনা তোমায় ॥
হে বিধি ! বিচিত্র তব প্রেমের বিধান।
মৃত্যু দিয়ে করিতেছ দুঃখ অবসান ॥
মনেতে জেগেছে আশা গেছে সব ভাবনা।
দুঃখের সংসারে কভু চিরদিন রবনা ॥
আনন্দময়ীর নামে সর্ব্বজয়ী হয়ে।
আনন্দে চলিয়ে যাব আনন্দ-আলয়ে ॥
অমৃতধামের সুখ এত যদি জানিতে।
তা হলেকি মৃত্যুর ভয়ে কভু তুমি কাঁদিতে ॥
অতীত ঘটনা সব হয়েছে যেন স্বপন।
ভুলিতেছ একে একে পেয়ে আনন্দ নূতন ॥
যে বিধি, তোমারে হেথা রেখেছিলা যতনে।
সে বিধি জানেন সেথা রাখিবেন কেমনে ॥
ধনী যথা ভুলে থাকে গরীবের দশা।
তেমনি জগতে ভুলে পেয়ে নবআশা ॥
মায়ের রূপেতে যবে মহানন্দ পাও।
সংসারের পোড়া দশা সব ভুলে যাও ॥
জগতে মানুষ বদ্ধ পশুর মতন।
মুক্ত হয়ে পায় নর দেবের জীবন ॥

দেবত্ব পাইলে সে পশুত্ব দূরে যায়।
ভাবনা কল্পনা রীতি ভিন্নভাব হয়॥
সদা থাকে মত্ত হয়ে মায়ের চিন্তায়।
আপনাকে ভুলে থাকে পরের সেবায়।
পরের দুঃখেতে সেই সদা দুঃখী হয়।
নিজের ভাবনা চিন্তা নাহি কিছু রয়॥
কষ্ট নাহি থাকে তার মায়ের কৃপায়।
শত্রুমিত্র সমভাব সাম্য গুণ পায়।
ধ্যানে যোগে দেখে সেই সদা জননীকে।
সর্ব্বজীবে আপনাকে দেখে সর্ব্বদিকে।
হেঁসে খেলে ভ্রমে সদা শিশুর মতন।
সর্ব্বজীবে ভালবাসে প্রেম-নিমগন॥
সতত পরের সুখে হয়ে থাকে সুখী।
আপনার দুঃখে কভু নাহি হয় দুঃখী॥
প্রেম পূর্ণ হয় তার পবিত্র জীবন।
শ্রদ্ধায় বিনয়ে ধরে সবার চরণ॥
সকলেই গুরু তার, গুরুবাক্যে শেখে।
জননীর রূপ বিনা কিছু নাহি দেখে॥
সঞ্চিত রাখে না কিছু কল্যকার তরে।
দুঃখী বলে আপনাকে ধন্য মনে করে॥
কাঁদিবারে ভালবাসে হাসিবারে চায় না।
কান্নায় সে সুখ পায় হেসে সুখ পায় না॥
দুঃখেতে জীবন ধন্য তাই সুখ চায় না।
আনন্দেতে মৃত্যু তাই তার কাছে যায় না॥
বাহিরে দুঃখ পায় অন্তরেতে সুখ।
বাহিরে হাঁসিতে চায় অন্তরে অসুখ॥
নিত্য সুখ পেয়ে সে অনিত্য পরিহরে।
ইন্দ্রিয় সুখের তরে কত লোক মরে॥

মঙ্গলময়ের মৃত্যু মঙ্গলবিধান।
এস ভাই গাই সবে তাঁর গুণগান।
তাঁর নাম গানে হবে সর্ব্বপাপক্ষয়।
কোন দুঃখ থাকিবে না হবে মৃত্যুঞ্জয়॥
তাঁহাকে ধরিলে আহা কত সুখী হবে।
তাঁহাকে ভুলিলে চির অন্ধকারে রবে॥
কোথাও যাব না মোরা তাঁর কাছে থাকিব।
সকলেই এক হয়ে তাঁর গুণ গাহিব॥
সকলে থাকিব বেঁচে মরিব না কেহ।
কি ভাবনা আমাদের যাক্ না কেন দেহ॥
অনিত্য সংসারে মোরা কেন করি কলহ।
কিসের বা গণ্ডগোল করি অহরহ॥
সকলেই চলে যাবে থাকিবে না কিছু।
তবে কেন কেঁদে মরি ছুটি কার পিছু॥
সকলেই এক হয়ে গাইব মায়ের নাম।
নশ্বর সংসারে সবে নেহারিব স্বর্গধাম॥
সকলে ডাকিব মাকে খুলিয়া হৃদয়।
দেখিব মায়ের নামে কত সুখোদয়॥
এস মোরা জেগে উঠি দয়াময়ী মার নামে।
মোহ-নিদ্রা ঘুচে যাবে অসার অনিত্য-ধামে॥
সর্ব্বদুঃখ দূরে যাবে হবে জ্ঞানোদয়।
জ্ঞান-আঁখি নিরখিবে তাঁরে সর্ব্বময়॥
আশার সঞ্চার হবে ঘুচিবে সংশয়।
নিরখিব এ সংসার নিত্য-সুধাময়॥
দেখিতে দেখিতে হয় লীলা অবসান।
চিন্তা হয় কোথা গিয়ে জুড়াইবে প্রাণ॥
কি ভাবনা সার কর পরব্রহ্ম নাম।
তার-ব্রহ্ম বলে চল যাই ব্রহ্মধাম॥

বিলম্ব করিছ কেন উঠ এক হয়ে।
মিটাও মনের সাধ তাঁকে প্রাণে লয়ে॥
স্বর্গের দেবতা মোরা স্বর্গে চলে যাব।
পরব্রহ্ম জয়গান দিবানিশি গাব॥
দুঃখ পাইবারে মোরা এ সংসারে আসি নাই।
নিজের দোষেই মোরা দেবত্ব সুখ হারাই॥
তারকব্রহ্ম নাম গানে সর্ব্বদোষ যাবে।
প্রেমের সাগরে ভেসে দেবভাব পাবে॥
প্রেমিক হইলে পরে সর্ব্ব জয় করিবে।
রিপুগণ ভীত হয়ে তব পদে ধরিবে॥
প্রেমধনে ধনী হ'লে সর্ব্বধন পাইবে।
প্রেমচক্ষু পেলে পরে সর্ব্ববস্তু দেখিবে॥
প্রেমে গলে এস সবে এক হয়ে যাই।
প্রেম বিনা ত্রিভুবনে আর কিছু নাই।
প্রেমামৃতে বিশ্বভাণ্ড রহিয়াছে ভরি।
বিশ্বেশ্বর প্রেমে সবে বল হরি হরি।

তৃতীয় পক্ষ।

(গল্প)

লেখক,—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যখন নৌকা ছাড়িয়া দিল, তখন আকাশের উত্তরপশ্চিম কোণে সামান্য মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল। সেই মেঘের গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চঞ্চলা চপলাসুন্দরী গোপীনাথকে দেখিয়া বিদ্যুৎ-কটাক্ষে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া লুকাইতেছিল।

অনতিতীব্র বায়ু শোঁ শোঁ শব্দে বহিয়া যাইয়া, যেন গোপীনাথের কর্ণসমীপে মুখ লইয়া গিয়া তাহাকে শত ধিক্কার দিতেছিল।

নদীর উভয় পার্শ্বস্থিত দু-একটা বৃক্ষে দু-একটা পক্ষী থাকিয়া থাকিয়া কলরব করিয়া যেন মূঢ় গোপীনাথকে তাঁহার অদূর ভবিষ্যৎ ভাবনায় আশঙ্কা ও আকুলতা জ্ঞাপন করিতেছিল।

ক্রমে বাতাস উঠিল। নৌকা টল্‌মল্ করিতে লাগিল, ভয়ে গোপীনাথের চক্ষে জল আসিল। নৌকাযোগে যাতায়াতে সর্ব্বদা অভ্যস্ত ঘটকঠাকুর গোপীনাথকে শত ভরসাজনক বাক্যে আশ্বস্ত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। গোপীনাথ সাশ্রুনয়নে দুর্গানাম জপ করিতে একাগ্রচিত্ত হইল। এই সময়ে নৌকা গ্রাম ত্যাগ করিয়া দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করিল।

পিতা কিরূপভাবে কোথায় যান, তাহার সন্ধান লইবার নিমিত্ত সন্দেহদিগ্ধা বিজয়া ভৃত্য নফরকে উপদেশ দিয়াছিল। বিজয়ার আজ্ঞামত কর্ত্তব্যপরায়ণ নফর প্রভুর নয়নান্তরালে থাকিয়া তাহার অনুগমনপূর্ব্বক ঘাটের সন্নিকটে আসিয়া দূর হইতে দেখিতে পাইল, নৌকার সম্মুখে বসিয়া ঘটকঠাকুর। সে স্থির করিল, এ বিয়ে পাগলা বুড়ার সরিষা কেনা নয়—শুভ বিবাহযাত্রা।

ভৃত্য নফরচন্দ্রকে বিধাতাপুরুষ নারীসুলভ একটি গুণ বা দোষ দিয়াছিলেন, সেটি কোন গোপনীয় বা কৌতুকাবহ ঘটনা গোপন করিবার তাহার অসামর্থ্য। কোন কথা গোপন রাখিলে স্ত্রীলোকের ন্যায় তাহার উদরাধ্মান পীড়া জন্মিত। সে আসিতে আসিতে পথে গ্রামের যাহাকে পাইল, তাহাকেই তাহার মনিবের বিবাহের কথা বলিয়া বিশেষ আমোদ উপভোগ করিতে করিতে বাটী আসিল।

চিন্তাভারগ্রস্তা বিজয়া নফরের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। নফর বাটী প্রবেশ করিতেই জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?"

উত্তরে নফর বলিল, "খবর চমৎকার। কর্ত্তা বিয়ে কোর্‌তে গেলেন।"

বিজয়া আগ্রহ-সহকারে জিজ্ঞাসিল, "কিসে জান্‌লি?"

নফর কহিল, "কেন? সেই ঘটকঠাকুরকে নৌকায় দেখিলাম।"

বিজয়া নফরকে আর কোন প্রশ্ন করিল না, নীরবে রোদন করিতে লাগিল। রমানাথ বাটী ছিল না, বাটী আসিয়া নফরের মুখে পূর্ব্বোক্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষ হইতে যখন সে বাহির হইল, তখন দেখা গেল, তাহার হস্তে একখানি বড় ভোজালী। ভোজালী

আনয়নপূর্ব্বক রমানাথ নিবিষ্টচিত্তে পাথরের উপর বালুকাসংযোগে শান দানে প্রবৃত্ত হইল। তাহা দেখিয়া বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওতে শান দেওয়া কেন?"

ভুজালীতে নিবদ্ধদৃষ্টি রমানাথ কর্কশস্বরে উত্তর করিল, "প্রয়োজন আছে।"

বিজয়া শিহরিল। দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। সে জানিত রমানাথের রাগিলে জ্ঞান থাকে না।

ভ্রাতা ও ভগ্নীর এইভাব দর্শনে নফরচন্দ্রের আনন্দোদ্দীপ্ত বদনখানি ম্লান হইয়া পড়িল, সে বাটীর বহির্দ্দেশে চলিয়া গেল। বাটীর বাহিরে যাইতেই, যে দেখে সেই তাহাকে ঘোষাল মহাশয়ের বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু আর তাহার সেরূপ উত্তেজনা নাই। ঘাট হইতে ফিরিবার কালে বিবাহের কথাযাহাকে তাহাকে বলিয়া যেরূপ হাস্য পরিহাস্য ও আনন্দানুভব করিয়াছিল, তাহার সেরূপ ভাবের এখন অবসাদ হইয়াছে; সুতরাং সে উত্তরে বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল, "কোথায় গিয়াছে—তা সেই জানে, পারত খুঁজে দেখগে।" একটু ক্রোধে কহিল, "তোমাদের তাকে নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন? তার টাকা আছে, সে যদি দশটা বিয়ে করে, তাতে তোমাদের কি?"

নফরচন্দ্র প্রভুর বিবাহ লইয়া কতক্ষণ পূর্ব্বে কত আনন্দ হাস্যপরিহাস করিতেছিল, তাহার প্রকৃতির এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনে সকলেই তাহার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বহির্দ্দেশে থাকা তখনকার মত অবিধেয় বিবেচনা করিয়া নফরচন্দ্র বৈঠকখানায় প্রবেশপূর্ব্বক একখানি মোটা চাদরে পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত আবরিত করিয়া দণ্ডবৎ শয়ন করিল।

রমানাথ প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া ভুজালীতে শান দিয়া ভুজালীখানিতে তৈল মাখাইয়া খাপের ভিতর পুরিয়া আপনার কক্ষের কোথায় লুকাইয়া রাখিল। বিজয়া জননীর নাম উল্লেখ করিয়া মৃদুস্বরে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছিল। রমানাথ বলিল, দিদি তুমি কাঁদ কেন? আমরাত ভাসিয়া আসিনি, বাবা বৌ নিয়ে আসুক, তার পর দেখা যাবে। তুমি চুপ কর, তুমি ফের যদি কাঁদ ত আমি আত্মহত্যা করিব।

ভ্রাতৃস্নেহোৎসরূপিণী বিজয়া ভ্রাতার কথায় তাহার ক্রন্দনের বেগ চেষ্টায় সংযত করিল। রমানাথ বাটীর বাহিরে গেল। সে যখন বৈঠকখানার নিকট দিয়া যায়, তখন তাহার কর্ণে নাসিকাধ্বনি শ্রুত হইল।

এ নাসিকাধ্বনি নফরচন্দ্রের।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গোপীনাথের জীবনশূন্য ক্ষুদ্র তরণীখানি ঝঞ্ঝাবাত্যায় নদীর উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গে আছাড় খাইতে খাইতে ডুবুডুবু হইয়া নির্জীবের প্রায় বিবাহের দিন অতি প্রত্যুষে শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের ঘাটে আসিয়া লাগিল। ঘটকঠাকুর, গোপীনাথ ও ভৃত্যসহ হরেরাম চক্রবর্ত্তীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই হরেরাম চক্রবর্ত্তীই গোপীনাথের ভাবী শ্বশুর। হরেরামের বাটীতে তিন চারিখানি উলুখড়ে ছাওয়া মাটির ঘর, ঘরগুলি পরিচ্ছন্ন। বাটীর অবস্থা দেখিলে উক্ত হরেরামের সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল বলিয়া বোধ হয় না। ভাবী জামাতার বিপুলায়ত ভ্রমরকৃষ্ণ দেহ দেখিয়া হরেরামের বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডটা স্পন্দিত হইয়া উঠিল। কিন্তু অর্থ লোলুপ হরেরাম যখন একসঙ্গে সহস্র রজত মুদ্রার চাকচিক্যময় রূপ ধ্যান করিলেন, তখন যেন ক্রমে ক্রমে তাহার মানস-নয়নে ভাবী জামাতার ওই বিরাট দেহ সৌষ্ঠবসম্পন্ন ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিল, গাত্রের বর্ণ যেন ক্রমে উজ্জ্বল হইয়া নবজলধর-শ্যাম-শোভায় শোভিত হইল। ক্রমে হরেরাম ভাবী জামাতাকে সুন্দর দেখিতে লাগিলেন।

এই সময়ে দ্বারের আড়াল হইতে হরেরামের গৃহিণী ভাবী জামাতাকে দেখিয়াই দ্রুতপদে অন্য ঘরে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া চীৎকার শব্দে কাঁদিয়া উঠিলেন। ভাবী বিপৎপাতের আশঙ্কায় হরেরাম তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ধাবমান হইলেন। দেখিলেন গৃহিণী রোরুদ্যমানা প্রপাত ধরণীতলে। পার্শ্বে কন্যা সৌদামিনী— সেও নিয়ত নীরবে ক্রন্দন করিতেছিল। হরেরাম এই ব্যাপার দেখিয়াই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কি বলিয়া গৃহিণী এবং কন্যাকে সান্ত্বনা করিবেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! চুপ—চুপ,—মঙ্গলের দিনে এমন অমঙ্গল! লোকে বলিবে কি?"

গৃহিণী উক্ত কথায় ক্রন্দন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওই তেকেলে বুড়ো হাতীর সঙ্গে আমার সোণার প্রতিমার বিবাহ কখনই দিব না। ইহাতে তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, করিও।"

হরেরাম ব্যতিব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "আরে থামো, থামো, অত চেঁচিও না—বর শুন্‌তে পাবে, বল্‌বে কি? একটু বোঝ—বোঝ,— তুমিত অবুঝ নও।"

কুপিতা গৃহিণী বলিলেন, "তুমি যদি ঐ পাত্রে আমার সৌদামিনীর বিবাহ দেও ত আমি গলায় দড়ী দেব।"

হরেরাম বলিলেন, "আরে না, না—অত দূর আর করিতে হবে না। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি আস্‌ছি।" এই বলিয়া সে ঘর হইতে হরেরাম তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া, যে ঘরে জামাতা ও ঘটক বসিয়াছিল, সেই ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক ঘটকের কাণে কাণে বলিলেন. "গৃহিণী বড় রুষ্টা হইয়াছেন, গহনাগুলা ও টাকাটা দিন, তাহাকে থামাইয়া আসি।"

পার্শ্বের ঘর হইতে পূর্ব্বোক্ত বাগবিতণ্ডা গোপীনাথের শুনিতে বাকী ছিল না। ঘটকের কথামত গোপীনাথ গহনার বাক্স খুলিয়া প্রায় তিন হাজার টাকার গহনা ও হাজার টাকার একশত টাকা করিয়া দশকেতা নোট বাহির করিল। ঘটকঠাকুর টাকা ও গহনা শুদ্ধ বাক্স লইয়া যে ঘরে হরে-রামের গৃহিণী অশ্রুসিক্তলোচনা কন্যাকে লইয়া বিয়োগান্ত নাটকের একটী ক্ষুদ্র মর্ম্মান্তক দৃশ্যের অভিনয়ের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াই এক শত টাকা করিয়া দশখানি নোট এক, দুই, তিন করিয়া গণনাপূর্ব্বক হরেরামের গৃহিণীর সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। হরেরামের গৃহিণী ঘটককে দেখিয়া তাহার উন্মুক্ত মুখে ঈষৎ ঘোম্‌টা টানিয়া ঘোম্‌টার আড়াল হইতে নোট দর্শনে অঞ্চলে অশ্রুসিক্ত নয়ন মুছিলেন। তৎপরে যখন বুদ্ধিমান ঘটকঠাকুর একে একে তাহার সম্মুখে তিনসহস্র টাকা মূল্যের নূতন স্বর্ণালঙ্কারগুলি সাজাইয়া দিলেন, তখন হরে-রামের গৃহিণী সেই আভরণগুলির কারুকার্য্য এবং ঔজ্জ্বল্য নিরীক্ষণে একেবারে বিস্ময়ে ও আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল বর্ষণান্তে মেঘমুক্ত নীলাকাশের শারদ চন্দ্রমার ন্যায় পুলক-প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

জননীর হাস্যময় মুখনিরীক্ষণে পঞ্চদশবর্ষীয়া তরুণী সৌদামিনী একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বুঝিলাম পিতামাতা আমাকে অর্থের সহিত বিবাহ দিতেছেন।" এই বলিয়া সৌদামিনী সে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ

সমালোচনা।

খাদ্য।—রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু এম, বি, এফ, সি, এস, প্রণীত; দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য এক টাকা মাত্র।

এই সংস্করণ পাঠ করিয়া আমরা যারপরনাই প্রীতি অনুভব করিলাম। প্রথম সংস্করণের আলোচনায় পুস্তকের গুণ ও উপকারিতা সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য বিশদরূপে সর্ব্বসাধারণের গোচর করা হইয়াছে; সেই সংস্করণ পাঠ করিয়া দেশের বিস্তর লোক, বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ পরমানন্দলাভে উপকৃত হইয়া গ্রন্থকর্ত্তাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সংস্করণে কতকগুলি অতিরিক্ত বিশেষপ্রয়োজনীয় নূতন বিষয়ের সংযোগ দর্শনে গ্রন্থকারমহাশয়কে আমরা অগণ্য সাধুবাদ অর্পণ করিতেছি, দেশের লোকের দৈনিকখাদ্যের বিচারে যেরূপ বৈজ্ঞানিকসিদ্ধান্ত, প্রথম সংস্করণে তাহা আছে; দ্বিতীয় সংস্করণের উপকারিতার বিশেষত্ব এই যে, স্বাস্থ্যপ্রদ সাধারণ খাদ্যের নাম ও গুণ নির্দ্দেশ, দ্বিতীয়তঃ ভিন্ন ভিন্ন রোগবিশেষে কি কি সুপথ্য, কি কি দ্রব্য বিজ্ঞানসম্মত সুখাদ্য, তাহা অবধারণ। চিকিৎসাশাস্ত্র মতে যে যে খাদ্য সুফলপ্রদ শাস্ত্রাভিজ্ঞ সাধারণ লোকে তা জানে না, ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয় তৎবিষয়ে সাধারণের চক্ষু ফুটাইয়া দিয়া, যেরূপ মহোপকারের পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, সমালোচনার ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করা দুর্ঘট; অতএব আমরা এই সমাদৃত পুস্তকখানি সর্ব্বসাধারণকে অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। নির্দ্দিষ্ট নিয়মগুলি প্রতিপালন করিলে ব্যাধিমন্দিরের অধিকারীগণ প্রকৃতির নিয়মানুসারে পূর্ণস্বাস্থ্য লাভ করিয়া নিরাময় হইতে পারিবেন, চিরজীবন দুর্লভ স্বাস্থ্যসুখে সুখী হইয়া থাকিবেন, গৌরব করিয়া সহস্রবার একথা বলা যাইতে পারে। বঙ্গের গৃহস্থ লোকের গৃহে গৃহে এই বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের প্রকৃত আদর হইলে আমরা পরম সুখী হইব, ডাক্তার চুণীলাল বসুর নাম অক্ষয় হইয়া থাকিবে। সাধারণ পাঠকের বিশেষ সুবিধা এই যে, পুস্তকে ৭৫ পৃষ্ঠা নূতন সংযোজিত হইলেও প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা ইহার মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই, উভয় সংস্করণের মূল্য সমান আছে।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৯শ বর্ষ। | ১৩১৮ সাল, ভাদ্র। | ৫ম সংখ্যা।

সুখ ও দুঃখ।*

লেখক,—শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

আজ আমি আপনাদিগের সমক্ষে সুখ ও দুঃখ বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠে উদ্যত হইয়াছি। বিবিধ দর্শনশাস্ত্রে সুখ বা দুঃখ সম্বন্ধে যে সমুদয় আলোচনা হইয়াছে, এস্থলে তাহার বিশদরূপে উল্লেখ হইবে বলিয়া এ প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। সুখ বা দুঃখ বলিলে আমরা কি বুঝিয়া থাকি? সুখ বা দুঃখ বলিলে জীব মাত্রের ভোগ্য বিশেষ বিশেষ অবস্থার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজা ও প্রজা, জ্ঞানী ও

* সাহিত্য-সভার ১২শ বার্ষিক ২য় মাসিক (২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ সাল) অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর দ্বারা পঠিত।

অজ্ঞান, ধনী ও দরিদ্র, সুখ ও দুঃখ বলিলে যাহা বুঝিয়া থাকে, সেই সর্ব্বসাধারণের অনুভূত সুখ ও দুঃখের আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার সুখ ও দুঃখই অদ্যকার প্রবন্ধের আলোচ্য। ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না।

সুখ ও দুঃখ প্রধানতঃ আমাদিগের অনুভব শক্তি ও তাহার উত্তেজক কারণগুলির উপর নির্ভর করিয়া থাকে, এবং অনুভব-শক্তি, শরীর ও মনের উপাদান ও গঠন এবং উত্তেজক কারণের সংযোগকালীন তাহাদের কার্য্যকরী অবস্থার উপর নির্ভর করে। অতএব দেখা যায় যে, সুখ বা দুঃখভোগের কোন অবস্থাই নিত্য নহে।

যুক্তি ও তর্কদ্বারা সুখ বা দুঃখ-ভোগের প্রকৃত অবস্থার নির্ণয় বা উহার অনিত্যতা প্রতিপাদন সহজেই করা যাইতে পারে। কিন্তু যুক্তি ও তর্কের বলে তদবস্থার স্থায়িত্বের কাল বৃদ্ধি করা সম্ভবপর নহে; বরং দেখা যায় যে. কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া বা কর্ম্মদ্বারা ইহার স্থায়িত্ব কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয়। এই জন্য অনেক নরনারী যুক্তি ও তর্কে বৃথা কালক্ষেপণ না করিয়া, স্ব স্ব কর্ম্মে মনোনিবেশ পূর্ব্বক প্রভূত সুখলাভে সমর্থ হয়। যুক্তি ও তর্ক, সুখ-দুঃখের অনিত্যতা প্রতিপাদন করিয়া, দুঃখ প্রশমনের উপায়স্বরূপ হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গেই সুখেরও তীব্রতা দমন করিয়া সুখবৃদ্ধিরও প্রতিকূল হইয়া উঠে। সুখ দুঃখের কারণ পরিজ্ঞাত হইলেই কি আমাদিগের দুঃখ দূর হইয়া সকল প্রকার সুখ লাভ ঘটে? অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই এ জগতে আত্মপরীক্ষা বা আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা সুখলাভে সমর্থ হইয়াছেন। সুখ বা দুঃখ মায়াময়, অলীক এবং অনিত্য এই ধারণা মনোমধ্যে জাগরূক থাকা সত্বেও প্রিয়জন-বিরহে আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হই। দুঃসহ ব্যাধি-যন্ত্রণা বা দারিদ্রজ্বালার উৎপীড়নে আমরা আত্মহারা হই। আত্ম-পরীক্ষা বা আত্মবিশ্লেষণ, "এই সংসার মায়াময়" এই প্রবোধবাক্যে আর তখন মতিস্থির করাইতে পারে না। এমন কি সর্ব্বনিয়ন্তা পরমকারুণিক পরমেশ্বরকেও এই এই অনুযোগ করি যে, তিনি আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুঃখক্লিষ্ট করিতেছেন। অবিমৃশ্যকারিতা ও অপরিণামদর্শিতা হেতু অনেক সময় আমাদিগকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। জ্ঞানার্জ্জন ও চেষ্টা দ্বারা এই প্রকার স্বকার্য্যজনিত দুঃখের অনেক উপশম হইয়া থাকে।

সুখ ও দুঃখ কি? এবিষয়ে নানাপ্রকার মতবাদ প্রচলিত আছে। সকলগুলির আলোচনা এস্থলে হইতে পারে না। সংক্ষেপে কয়েকটী মাত্র বিভিন্ন

দলের মতের উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিকগণের মধ্যে সুখ-দুঃখের মূলপ্রকৃতি সম্বন্ধেই বিরুদ্ধ প্রকারের ধারণা বিদ্যমান আছে। হিতবাদী (Utilitarian) দিগের সিদ্ধান্তে সুখই ভাল দুঃখই মন্দ। যে কার্য্যের ফলে মানব-মণ্ডলীর সুখ বৃদ্ধি হয়, তাহাই ধর্ম্ম এবং যাহার ফলে দুঃখ বৃদ্ধি হয়, তাহাই অধর্ম্ম। হিতবাদিগণ কহিয়া থাকেন, কর্ত্তব্যজ্ঞান বিজ্ঞ স্বার্থ জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে এই জ্ঞান বহুকালব্যাপী পরীক্ষার ফল মাত্র। ম্যানডেভিল (Mandeville) তাঁহার "নৈতিক ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান" (Enquiry into the Origin of Moral Virtue) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, শাসকগণের চতুরতা হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। রিপুকে প্রশ্রয় দেওয়া অপেক্ষা তাহার বেগধারণ মহত্তর, এই উপদেশ প্রচারের সহিত পরোপকারের জন্য সুখ্যাতি, পদ-মর্য্যাদা, স্মারক চিহ্নাদির ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা লোক সকলের অভিমান উদ্দীপন করেন ও তদ্দ্বারা আপনাদিগের কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লয়েন। এই ভাবে স্বার্থত্যাগাদি ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের ফলস্বরূপ দুঃখনিবারণ ও সুখবৃদ্ধি হয় বুঝিতে পারিয়া, লোকসকল ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। "The Chief thing therefore which lawgivers and other wise men that have laboured for the establishment of society have endeavoured has been to make the people they were to govern believe that it was more beneficial for every body to conquer than to indulge his appetites and much better to mind the public than what seemed his private interest......observing that none were either so savage as not to be charmed with praise or so despicable as patiently to bear contempt they justly concluded that flattery must be the most powerful argument that could be used to human creatures. Making use of this bewitching engine they extolled the excellency of our nature above other animals...... by the help of which we were capable of performing the most noble achievements. Having by this artful flattery insinuated themselves into the hearts of men they began to instruct them in the notions of honour and shame &c—Enquiry into the

origine of moral Virtue. দার্শনিক হবস্ (Hobbes) বলেন—কাহারও পক্ষে কোন কার্য্য ভাল কি মন্দ ইহার বিচার করার অর্থ এই যে, সেই কার্য্য তাহার স্বার্থের অনুকূল কি প্রতিকূল ইহার নিরূপণ করা মাত্র। ভাল ও মন্দ আমাদিগের অনুরাগ ও বিরাগের অপর নাম মাত্র।

I conceive that when a man deliberates whether he shall do a thing or not do it he does nothing else but consider whether it be better for himself to do it or not to do it. (Hobbes—On Liberty and Necessity.)

Good and evil are names that signify our appetites and aversions. (Leviathan Part 1 Ch xvi.)

ব্রাউন (Brown) বলেন যে, সুখলাভেচ্ছা ভিন্ন মনুষ্যের অপর কোন কার্য্য প্রবৃত্তি নাই।

The only reason or motive by which individuals can possibly be induced to the practice of virtue must be the feeling immediate or the prospect of future private happiness. (Brown On the Characteristies p. 159)

বেন্থামের মতবাদ এই যে, প্রকৃতি, মনুষ্যকে সুখ ও দুঃখের সম্পূর্ণ অধীন করিয়াছে এবং সুখ ও দুঃখই আমাদের কর্ত্তব্য ও কার্য্যের স্বরূপ অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দেয় এবং যুক্তি ও তর্ক কার্য্যের ফল বিচার পূর্ব্বক ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নির্দ্ধারণ বিষয়ে আমাদিগের পথপ্রদর্শক হয়।

Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do as well as to determine what we shall do...... (Bentham's Principles of morals and Legislation Chap. 1.)

দার্শনিক লকের মতও উপরোক্ত সুধীগণের মতের অনুকূল। তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভাল ও মন্দ, সুখ ও দুঃখ ব্যতিরেকে আর কিছুই হইতে পারে না; অর্থাৎ যাহা হইতে সুখের উৎপত্তি হয়, তাহাই ভাল এবং যাহা হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয় তাহাই মন্দ, যে কার্য্যের স্বাভাবিক ফল সুখবৃদ্ধি, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সেই কার্য্য করাই পুণ্য এবং তদ্বিপরীত কার্য্যের অনুষ্ঠানই পাপ। এব-

বিধ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্য্যের ফলস্বরূপ শাসকদিগের বা নিয়ম-সৃষ্টিকারকদিগের নিয়মানুযায়ী সুখ বা দুঃখ ভোগই পুরস্কার বা দণ্ড নামে অভিহিত হইয়া থাকে। Good and evil are nothing but pleasure and pain or that which occasions or procures pleasure or pain to us. Moralgood aud Moralevil therefore is only the conformity or disagreement of of our voluntery actions to some law whereby good and evil is drawn on us by the will and power of the lawmaker, which good and evil, pleasure or pain attending our observance or breach of the law by the decree of the lawmaker is that we call reward or punishment (Locke's Essays Book 11xxvii.)

এই মতাবলম্বী দার্শনিকগণের মতে নীতিবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সমাজবদ্ধ অবস্থায় থাকিবার কালীন লোক সমুহের সুখবৃদ্ধি ও দুঃখনিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করা মাত্র। রীতি, মতবাদ, সংস্কার ও প্রবৃত্তির বৈলক্ষণ্য হেতু মানবগণ মধ্যে বিবাদ, বিসম্বাদ ও পরিণামে যুদ্ধবিগ্রহ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে, সুতরাং সকলেই স্বীকার করেন যে, শান্তি সম্ভোগই সুখকর ও শান্তিপ্রদ উপায় সমূহই ভাল অর্থাৎ ন্যায়পরতা, কৃতজ্ঞতা অদাম্ভিকতা, দয়া সহানুভূতি প্রভৃতি গুণ সকলের অনুশীলনই কর্ত্তব্য। ইঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নিস্বার্থ পরোপকারী বীরচরিত্র, অভ্রান্ত স্বার্থবিচারের ফল মাত্র। অধ্যাপক বেন (Bain) বলেন যে, আপন চিত্ত ব্যতিরেকে অপরের চিত্ত দ্বারা সুখের উপলব্ধি হইতে পারে না। কতকগুলি সুখ এরূপ আছে যে, তাহা আহরণ করিতে হইলে অপরকেও সুখী করিতে হয়, যথা দয়া, সহানুভূতি ইত্যাদি। আবার কতকগুলি এমন সুখ আছে যে, তাহাদের উপভোগের জন্য অপর কাহাকেও সুখে বা দুঃখে জড়িত করিতে হয় না। পান, ভোজন, স্বাস্থ্যরক্ষা, সম্পত্তিসম্ভোগ, কর্তৃত্ব ও পদমর্য্যাদা ইত্যাদি এই প্রকারের সুখ। আর এক প্রকারের সুখ আছে, যাহার উপভোগের জন্য অপরকে দুঃখে নিমগ্ন করিতে হয়। মৃগয়া, উৎপীড়ন প্রভৃতি দ্বারা সুখার্জ্জন করা এই প্রকারের সুখ। তৃতীয় শ্রেণীর এই নিকৃষ্ট সুখকেই স্বার্থপরতা প্রভৃতি নিন্দাসূচক আখ্যায় অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয় বা মধ্যম শ্রেণীর সুখও কতক নিন্দাভাজন এবং প্রথম শ্রেণীর সুখই নিঃস্বার্থতা, উদারতা, আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি প্রশংসাসূচক আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে।

All pleasure is necessarilly self regarding for it is impossible to have any feelings out of our own mind. But there are modes of delight that bring also satisfaction to others from the round that they take in there course. Such are the pleasures of benevolence. Others imply no particioation by any second party, as, for example, eating, drinking, bodily warmth, property and power; while a third class are felt by the pains and privations of fellow beings, as the delights of sport and tyrany. The condemnatory phrase, selfishness applies with special emphasis to the last mentioned class and in a qualified degree to the second group, while such terms as unselfishness, disinterestedness, self-devotion are applied to the vicarious position wherein we seek our own satisfaction in that of others. (Bain on the Emotions and Will p. 113.)

চার্ব্বাক-মতাবলম্বী প্রাচ্য দার্শনিকগণ উপরোক্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের সহিত এ বিষয়ে এক মত। তাঁহারাও সুখই জীবনের লক্ষ্য এইমত প্রচার করিয়াছেন। চার্ব্বাকগণ অনেক স্থলে বর্ত্তমান সুখের অত্যন্ত পক্ষপাতী। তাঁহারা অপহরণ করিয়াও ঘৃত পান করিতে বলেন; ঋণ করিয়াও সুখ সাধন করিতে বলেন। পাশ্চাত্য হিতবাদিগণ কার্য্যের সুখপ্রদ ফল সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে এত সংকীর্ণ প্রথা অবলম্বন করেন নাই। বেন্থাম (Bentham) বলেন যে, সুখ দুঃখের পরিমাণ স্থির করিতে হইলে, তাহাদিগের নিম্নলিখিত অবস্থার বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক,—

১ম—তীব্রতা।
২য়—স্থায়িত্ব।
৩য়—নিশ্চয়তা।
৪র্থ—নৈকট্য।

৫ম—উৎপাদিকা-শক্তি অর্থাৎ এক প্রকারের সুখ বা দুঃখ হইতে অপর প্রকারের সুখ বা দুঃখ হয় কি না।

৬ষ্ঠ—নির্ম্মলতা অর্থাৎ সেই সুখ বা দুঃখ হইতে তদ্বিপরীত দুঃখ বা সুখ উৎ-

পন্ন হয় কি না।

৭ম—বিস্তৃতি অর্থাৎ সেই সুখ বা দুঃখ কত লোক ভোগ করে।

অষ্টিন (Austin) বলেন, কার্য্যের ফল বিচার করিবার সময় একাকী সেই কার্য্য করিলে কি ফল হয়, তাহার বিবেচনা করিলেই চলিবেক না, পরন্তু জনসাধারণ সেই কার্য্যে ব্রতী হইলে, তাহার ফল কিরূপ হয়, তাহাই বিবেচনা করিতে হইবে।

এইরূপে হিতবাদ পরার্থতার সহিত সংযুক্ত হইয়া চার্ব্বাক অভীপ্সিত ঘোরতর সংকীর্ণ স্বার্থবাদ হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।

গ্রীক ও রোমান দার্শনিকগণ সাধারণতঃ স্বার্থবাদী নহেন। তাঁহাদিগের সৌন্দর্য্য বোধ ও সম্পূর্ণতার পক্ষে বিভিন্ন অংশের সুচারু সম্মিলনের আবশ্যকতার অনুভব শক্তি বিশেষ প্রবল ছিল। তাঁহারা সর্ব্বগুণাধার মনুষ্যত্বের উপাসক ছিলেন। বন্ধুতা, বদান্যতা, ন্যায়পরতা, পরার্থতা ও বীরত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণ দেবচরিত্র নিষ্পাপ আদর্শ মনুষ্যের উপযুক্ত বলিয়াই এই সকলের অনুশীলন করিতেন। তাঁহারা ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, গুণের নিমিত্তই গুণের পক্ষপাতী হইতেন। বিভিন্ন মতাবলম্বী দার্শনিকগণের মনোভাব ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশে দার্শনিক লক (Looke) বলেন যে, "প্রতিজ্ঞা পূরণের কর্ত্তব্যতার হেতু কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে পরজন্মে সুখ দুঃখ ভোগে বিশ্বাসী ক্রিশ্চিয়ান বলিবেন, যে ইহা পাপ-পুণ্যের অনন্ত-ফলদাতা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের আদেশ; হবস মতাবলম্বী দার্শনিক বলিবেন যে, সমাজ শাসকের ইহা নিয়ম এবং নিয়মভঙ্গ করিয়া প্রতিজ্ঞা পূরণ না করিলে, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারী নিয়মমতে দণ্ডিত হইবে। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব দার্শনিক বলিবেন যে, এরূপ না করা অসৎ কার্য্য, মনুষ্যত্বের গরিমা-নাশক, ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন ফূর্ত্তির বিরোধী।

If a Christian who has the view of happiness and misery in another life, be asked why a man must keep his word, he will give this as a reason because God, who has the power of eternal life and death, requires it of us. But if an Hobbist be asked why, he will answer, because the public requires it and the Leviathan will punish you if you do not. And if one of the old healthen philosophers had been asked, he would have

answered, because it was dishonest, below the dignity of man and opposite to virtue the highest, perfetion of human nature to do otherwise (Locke's Esseys I. 3.)

প্রাচীন দার্শনিকদিগের মধ্যে এপিকিউরাস (Epicurous) সুখবাদী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মতবাদ সে সময়ে আধুনিক কালের ন্যায় এত বিস্তৃত ভাবে আদৃত হইত না। ফলতঃ প্রাচীন দার্শনিকদিগের সাধারণ মত এই ছিল যে, সুখই যদি জীবনের লক্ষ্য হইত, স্বার্থসিদ্ধিই যদি আমাদিগের কর্ত্তব্য হইত, তাহা হইলে বন্ধুতা ন্যায় পরতা, বদান্যতা প্রভৃতি মনুষ্য হৃদয়ের সদবৃত্তিগুলির লোপ হইয়া যাইত। মনুষ্যমধ্যে বীরত্বের উত্তেজনা কি থাকিত ? ক্লেশকে যে দূরে রাখিতে চায়, সে কি কখনও বীর বলিয়া গণ্য হইতে পারে ? মহাজ্ঞানী সক্রেটিস পাপকে শরীরের স্ফোটকের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া দুঃখকে স্ফোটকে অস্ত্র প্রয়োগের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা যেমন স্ফোটকের দূষিত রক্ত বাহির করা হয়, সেইরূপ দুঃখ ও কষ্ট ভোগ দ্বারা আমাদিগের পাপক্ষয় হইয়া থাকে।

ফলাপেক্ষী না হইয়া সদ্‌গুণের জন্যই সদ্‌গুণের চর্চ্চা করিবার প্রবৃত্তি সম্বন্ধে হিতবাদিগণ বলেন,—

কতকগুলি প্রিয় জিনিসের দ্বারা আমাদিগের ভাল অর্থাৎ সুখ বৃদ্ধি হয় বলিয়া আমরা প্রথমতঃ ধারণা বা কল্পনা করি। ক্রমে সেই সকল জিনিস ও সুখবোধ একত্র মনোমধ্যে এরূপভাবে বিজড়িত হইয়া পড়ে যে, একের চিন্তা করিলে অপরটী সঙ্গে সঙ্গে মনোমধ্যে উদিত হয় এবং মনের এই ভাব সংমিশ্রণের প্রকৃত কারণ লোপ হইতেও মনে থাকিয়া যায়। এই সঙ্গে অর্থ বা ক্ষমতা দ্বারা আমাদিগের সঙ্কল্প সিদ্ধি হয় বলিয়াই অর্থ ও ক্ষমতা অর্জ্জনের জন্য সকলেই চেষ্টিত হয়।

We first perceive or imagine some real good ; i. e. fitness to promote our happiness in those thing which we love or approve of ..... Hence those things and pleasures are so tied together and associated in our minds that we cannot present itself, but the other will also occour. And the association remains even after that which at first give then the connection is quite forgotten, or perhaps does not exist, but the contryary. Gay's Esseys p. p. 1I.

Thus as soon as we come to apprehend the use of wealth or power to gratify any of our original desires we must also desire them. Hence arises the universality of those desires of wealth and power, since the means of gratifying all our desires (Hutchison on the Passions.)

হিতবাদিগণের বিরুদ্ধমতাবলম্বী দার্শনিকগণ যে- অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় আমাদের সদসৎ বিচারের বা কর্ত্তব্য বোধের একটী বৃত্তি আছে। সেই বৃত্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই আমরা কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। যদি এই বৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে কোনও কার্য্যে সুখদায়ক হইলেই যে তাহা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য ইহা আমরা কিরূপে বুঝিতে পারি ? সদ্‌গুণের আনুষঙ্গিক ফল সুখ হইতে পারে, কিন্তু এই ফল লক্ষ্য করিয়াই যদি কার্য্য করা হইত, তাহা হইলে সেই সদ্‌গুণের সুচারু অনুশীলন হইতেই পারিত না এবং নিঃস্বার্থ না হইলে এইরূপ কার্য্যের গরিমা বা মহত্ত্ব থাকিত না।

যে সুখ দুঃখের কথা হইতেছে, তাহা লৌকিক, জন্য ও অবস্থা-সাপেক্ষ ইন্দ্রিয়াদি ও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। দেখা যায়, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের ফলে শরীর ও মন গঠিত হইলে বাহ্যবস্তু সকল বিভিন্ন ভাবে শরীর ও মনকে উত্তেজিত করে এবং তৎফলে সুখ ও দুঃখের অনুভব বিভিন্নরূপ হয়। বেন্থাম (Bentham) কহেন যে, অনুভবশক্তি প্রধানতঃ জন্মগত প্রকৃতি অর্থাৎ জন্মকালীন শারীরিক উপাদান ও জীবনব্যাপী মূল প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে। জন্মান্তরবাদিগণ ইহাকে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার বলিয়া থাকেন। এই সংস্কার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্বকৃত কার্য্যের ফলস্বরূপ ভৌতিক শরীরের উপাদান সকলের সমবেত চেষ্টা মাত্র। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ,অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "যাহা হইতে ভূত সকলের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয় তাহাই কর্ম্ম।" এইরূপে জন্মগত প্রবৃত্তি বা মূল সংস্কার, বাহ্য বস্তুর সহিত সংযোগকালীন শরীর ও মনের অবস্থা এবং বাহ্যবস্তু এই তিনটীর উপর আমাদের সুখ দুঃখ নির্ভর করে। কর্ম্মবদ্ধ প্রাণীগণ আসক্তি ও তাহার ফলস্বরূপ সুখ ও দুঃখের প্রভাব এড়াইতে পারে না। সুখ ও দুঃখের এবংবিধ সর্ব্বগত প্রভাব উপলব্ধি করিয়া পাশ্চাত্য হিতবাদিগণ সুখ দুঃখকে তাঁহাদের নীতিশাস্ত্রের মূলভিত্তি করিয়াছেন।

The principle of utility recognises this subjection (the governace of two sovereign masters pleasure and pain) and assumes it for the foundation of that system, the object of which is to rear the fabric of felicity by the hands of reason and of law Benthain's Principles of Morals and Legislation Book I.

এবং দণ্ডনীতিজ্ঞ সুধী ও সমাজশাসকগণ ইহাদিগকে পুরস্কার ও দণ্ড স্বরূপে ব্যবহার করিয়া সমাজরক্ষার উপায়ে পরিণত করিয়াছেন।

চার্ব্বাক-বিরোধী প্রাচ্য দার্শনিকগণ উপরোক্ত অবস্থাসাক্ষেপ অনিত্য সুখ দুঃখের অধীনতা মুক্তির বিরোধী বলিয়া সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জ্জনীয় না হইলেও বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "হে অর্জ্জুন বাহ্য বস্তুতে ইন্দ্রিয়ের অভিনিবেশই শীতোষ্ণ সুখ দুঃখের হেতু ; উহা উৎপত্তি ও বিনাশশীল সুতরাং অনিত্য, অ তএব তাহা সহ্য কর।"

বেন্থাম বলেন, যে প্রাণীর মনে আমরা সুখ বা দুঃখের উদ্রেক করিতে না পারি, সে আমাদের আয়ত্তের সীমার বহির্ভূত-সম্পূর্ণ স্বাধীন। মুক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে হিন্দুদর্শনশাস্ত্রে মতভেদ দেখা যায়। কোন কোন দর্শনের মতে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই মুক্তি। লৌকিক প্রতিকারে দুঃখের নিঃশেষ হয় না। কিয়ৎকালের জন্য নিবৃত্ত থাকিয়া, পুনর্ব্বার প্রকাশ পায় অথবা এক প্রকার দুঃখের শান্তি হইলে, অন্য প্রকার দুঃখ উপস্থিত হয়। অতীত দেহের জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত জীব কেবল দুঃখের প্রতিকার করিয়াছে, বর্ত্তমান দেহের ও জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত তাহাই করিতেছে এবং ভাবি দেহের ও জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত তাহাই করিবে। কিন্তু কোন প্রকার উপায়ে যদি অনন্তকালের মধ্যে আর কখন দুঃখের মুখাবলোকন করিতে না হয়, তাহা হইলেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইল—তাহাই মুক্তি। লৌকিক সুখ মাত্রেই দুঃখ মিশ্রিত। কোন কোন প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকের মতে দুঃখের সাহায্য ব্যতিরেকে সুখ আত্মপ্রকাশে অসমর্থ। তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইলেই সুশীতল জলপানে আনন্দ জন্মে ; ক্ষুধায় কাতর হইলেই ভোজনে সুখ বোধ হয়। এইরূপ লৌকিক সকল প্রকার সুখই দুঃখের অপেক্ষা করিয়া থাকে। এ সুখ সুখই নহে। দুঃখের সহায়তা ব্যতিরেকে অনন্তকাল নিরবচ্ছিন্ন সুখানুভবই সুখ এবং তাহাই মুক্তি। বেদান্ত মতে জীবে বাস্তবিক দুঃখ সম্বন্ধ নাই, অবিদ্যাই জীবের দুঃখের কারণ দুঃখে সুখভ্রান্তি, অনিত্যে নিত্যতাভ্রান্তি, অশুচিতে শুচিতাভ্রান্তি ও জড়ে

চৈতন্য ভ্রান্তিই অবিদ্যা। উপনিষদ বলিয়াছেন, যদি জীব, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বরূপও ব্রহ্মের ন্যায় আনন্দময়। সেই আনন্দস্বরূপের অবিদ্যারূপ আবরণ উন্মোচিত হইলেই জীব মুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হয়।

সুখ দুঃখের প্রভাব কি অলঙ্ঘনীয়? অদৃষ্টবাদিগণ কহিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বজন্মকৃত কার্য্যের ফলস্বরূপ ইহজন্মে আমরা সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। অধুনাতন কালে এই দুরূহ ও গভীর সমস্যার কেহ যে সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে সক্ষম হইবেন তাহার সম্ভাবনা অল্প। দৈবশক্তি দ্বারা মনুষ্যজীবন কিভাবে শাসিত হইতেছে, তাহা আমাদিগের অজ্ঞেয়। চিন্তাশীল ফরাসী পণ্ডিত ভল্‌টেয়ার কহিয়াছেন, ঘটনাবলীর মূল আবিষ্কার করিবার শক্তি আমাদের নাই। জগতে আসিয়া কার্য্য করিয়া থাকি এবং সময় আসিলেই মরিয়া যাই। বঙ্গের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠাশালী কবি ও লেখক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের "বুদ্ধদেব-চরিত" নামক পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত গীতটী এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম,—

"জুড়াইতে চাই —কোথায় জুড়াই?
কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই?
ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।
এ খেলায় আমি খেলি বা কেন,
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন,
এ কেমন ঘোর হবে নাকি ভোর,
অধীর—অধীরে যেমতি সমীর
অবিরাম গতি —নিয়ত ধাই।"

এই সকল উক্তি প্রাণীগণের অনিত্যতার উপলব্ধির সহিত তাহাদের নিত্যতার অনুভবের সংমিশ্রণ-জনিত সংশয়ের মধুর অস্ফুট কাকলি বলিয়া মনে হয়। জীবের অনিত্যতা ও নিত্যতা সম্বন্ধে উপলব্ধির তারতম্য অনুসারে সুখ ও দুঃখের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। অনিত্যতা বোধের প্রাবল্যের উপর অনেক সময়েই বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি আস্থার প্রাবল্য নির্ভর করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সুখের প্রতি আসক্তিও প্রবল হয়। আসন্ন ধ্বংসের সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া ইজিপসিয়ান ফারওয়া বলিয়াছিলেন যে, আজ পান ভোজন ও আনন্দে উন্মত্ত হও, কারণ কালই আমাদিগকে মরিতে হইবে। কোন বাউল সম্প্রদায়ও গাহিয়াছিল—

"হেসে খেলে নাওরে যাদু পার যে কদিন।" প্রাণীগণের অনিত্যতা, কামের প্রভাব ও লোভের কার্য্যকারিতা স্বীকার করিয়াই স্বার্থবাদের উৎপত্তি হইয়াছে এবং প্রত্যেক মনুষ্যের বিনাশ ঘটিলেও সমাজের নিত্যতার ব্যতিক্রম হয় না ইহা উপলব্ধি করিয়াই স্বার্থবাদ আধুনিক পরিসর প্রাপ্ত হিতবাদে পরিণত হইয়াছে। আধুনিক হিতবাদিগণের মতে, কার্য্যের ফল সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইলে, ব্যক্তিবিশেষের সুখের পরিমাণ দেখিলে চলিবে না সমাজের সুখের পরিমাণও দেখিতে হইবে, অর্থাৎ greatest good দেখিলেই চলিবে না, greatest good of the greatest number দেখিতে হইবে। মুক্তিমার্গাবলম্বী ভারতীয় দার্শনিকগণ জীবের নিত্যতা স্বীকার করিয়া বর্ত্তমান জীবনের সর্ব্বপ্রাধান্য স্বীকার করেন না। এবং বর্ত্তমান অনিত্য অবস্থাসাপেক্ষ সুখ দুঃখকে তাহাদের ক্ষণিক-ধর্ম্মিত্বের উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—ভুত সকল আদিতে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত, আবার নিধনে অব্যক্ত, সেখানে শোক বিলাপ কি? "বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করিবেন।" অর্থাৎ মুক্তিলাভের জন্য সুখপ্রদ ও দুঃখপ্রদ উভয়বিধ কার্য্যই অনাসক্ত হইয়া করিবেন। বিনাশশীল ব্যক্তিদ্বারা গঠিত আমাদের চির-স্থায়িত্ব স্বীকারের ফলে স্বার্থবাদ যেরূপ হিতবাদে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ ব্যক্ত জীবের অব্যক্ত অবস্থা অর্থাৎ ভূত সকলের নিত্যতা এবং কাম ও লোভের মুক্তি-বিরোধিত্ব ও তাহাদের প্রভাবের অতিক্রমণীয়তা স্বীকারের ফলে ঈশ্বরবাদী হিন্দু দার্শনিকগণের হস্তে হিতবাদও মুক্তিবাদে পরিণত হইয়াছে। নিত্যজীবের অনিত্য অবস্থার প্রতি আসক্তি পরিহার্য্য বলিয়াও সমাজরক্ষার্থ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, "যাহারা প্রকৃতির গুণে বিমূঢ়, তাহারা ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মে অনুরাগযুক্ত হয়, সেই সকল মন্দবুদ্ধি অল্পজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে জ্ঞানীগণ বিচালিত করিবেন না।" "হে ভারত! যেমন অবিদ্বানেরা কর্ম্মে আসক্তিবিশিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে, তেমনই লোকসংগ্রহচিকীর্ষু (অর্থাৎ লোকরক্ষার্থ) বিদ্বানেরা অনাসক্ত হইয়া কার্য্য করিবেন।"

হিতবাদিগণ মুক্তিবাদীদিগের স্বীকৃত বদ্ধাবস্থা ও সুখ দুঃখের প্রভাব অনতিক্রম্য বলিয়া থাকেন, কিন্তু মুক্তিবাদিগণ জীবের নিত্যতা স্বীকার করিয়া এই অবস্থা অতিক্রম্য বলিয়া থাকেন। অর্জ্জুন মনের নিগ্রহ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "হে মহাবাহো! মন দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল ইহাতে সংশয় নাই; কিন্তু হে কৌন্তেয়, কর্ম্মযোগাভ্যাস দ্বারা এবং তদুৎপন্ন বৈরাগ্য দ্বারা মনকে

নিগৃহীত করা যায়।" এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইলে জীবের স্বাধীনতা কত দূর ?" এই প্রশ্ন মনোমধ্যে উদয় হয়। দার্শনিকগণ ঈশ্বরে জীবের চালকতা, কর্ম্ম-ফল, নিয়মপ্রভৃতি স্বীকার করিয়াও জীবের স্বাধীনতা প্রায় অসীম বলিয়া থাকেন, এ বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা এ স্থলে অনাবশ্যক। মহামতি বার্ক (Burke) কহিয়াছেন যে, মনুষ্যই তাঁহার ভাগ্যচক্র পরিচালন করিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনিই তাঁহার অদৃষ্টের বিধি স্বরূপ। (It is the pretrogative of man to be in a great degree the creature of his own making,) দার্শনিক কাণ্ট (Kant) বিবেচনা করেন যে জীবের যদি স্বাধীনতা না থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্য-হৃদয়ে এত অধিক পরিমাণে বিবেচনা ও কর্ত্তব্যবোধ পরিস্ফুট হইত না। শক্তির বহির্ভূত কার্য্যের জন্য কেহ দায়ী হইতে পারে না, এবং দায়িত্ব না থাকি-লেও কর্ত্তব্যও আইসে না। সুতরাং স্বাধীনতা না থাকিলে পাপ ও পুণ্যের পার্থক্য থাকে না, কারণ ঘটনাচক্র দ্বারা মনুষ্য যদি সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হইত, তাহা হইলে তাহার পক্ষে কোন কার্য্যই পালন করা উচিত বলিয়া বিবেচিত হইত না। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, কর্ত্তব্যের পরিমাণ আমাদিগের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিতেছে। এক্ষণে দেখা যাউক স্বাধীনতা কি ? যে ইচ্ছা করিলে যাহা করিতে পারে, সে তদ্বিষয়ে স্বাধীন, যে যাহা না করিয়া পারে না, সে তদ্বিষয়ে অধীন। দেখা যায় একই কর্ম্ম সম্বন্ধে একদিকে আমরা স্বাধীন, কিন্তু অন্যদিকে অধীন। আমি ইচ্ছা করিলে ভোজন করিতে পারি, ইচ্ছা না করিলে ভোজন করিব না, অতএব আমি ভোজনে স্বাধীন; কিন্তু ক্ষুধা-প্রেরিত হইয়া ভোজন করিতে বাধ্য। গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে উপকরণ সংগ্রহ ও তাহাদিগের যথা-যথ সন্নিবেশ বিষয়ে আমি স্বাধীন, কিন্তু উপকরণ সামগ্রীর মিশ্রণ ফলে পরস্পর একীভূত হওয়ার গুণ বিষয়ে আমি অধীন। জনষ্টুয়ার্ট মিল দ্রব্য উৎপন্ন করিতে হইলে কি কি আবশ্যক এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, "উৎপন্ন দ্রব্যের উপকরণগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা ভিন্ন মনুষ্য আর কিছুই করে না, অন্য সমস্তই স্বভাবের গুণে হয়।

Labour then, in the physical world, is always and solely employed in putting objects in motion; the properties of matter the laws of nature, do the rest.

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "প্রকৃতির গুণ সকলের দ্বারা সর্ব্ব-

প্রকার কর্ম্ম ক্রিয়মাণ। কিন্তু যাহার বুদ্ধি অহঙ্কারে বিমুগ্ধ সে আপনাকে কর্ত্তা মনে করে।" অতএব দেখা গেল যে কার্য্য সম্বন্ধে মনুষ্য, প্রকৃতির সম্পূর্ণ অধীন কিন্তু সেই কার্য্য হউক বা না হউক, এই অভিপ্রায় বা সঙ্কল্প সম্বন্ধে মনুষ্য স্বাধীন এবং এই সংকল্প সিদ্ধির জন্য মনুষ্য প্রকৃতির গুণ সকলের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সঙ্কল্প যদি কামনা, সুখেচ্ছা বা ইন্দ্রিয়াদির আসঙ্গলিপ্সা প্রেরিত হইয়া উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে কার্য্য না করা সত্বেও সঙ্কল্পকারীকে বদ্ধ হইতে হয়। শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল স্মরণ করিয়া থাকে, সেই বিমূঢ়াত্মাকে কপটাচারী বলা যায়।" কিন্তু এই সংকল্প যদি কর্ত্তব্যজ্ঞান-প্রণোদিত হইয়া, যথাযথ ভাবে চালিত হয়, তাহা হইলে কার্য্য ও তাহার স্বাভাবিকা ফলস্বরূপ সুখাদি ভোগ করিয়াও জীব মুক্ত হইতে পারে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "হে অর্জ্জুন! কিন্তু যিনি মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ দ্বারা কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, ফল-কামনাহীন তিনি বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রশংসাযোগ্য হন।"

———:০:———

আগমনী সঙ্গীত।

লেখক,—নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

আমার উমা এলো বলে,—
পাগলিনী গিরিরাণী ধায় আকুল কুন্তলে।
"মা এলো মা এলো" সাড়া পড়িল নগরে,
সারি সারি নাগরী ধাইল সত্বরে,
মত্ত হৃদিবেগে জীবন তরঙ্গ চলে।
আধ তিলক কারো আধ রচিত বেণী,
শৃঙ্খলাহীন আধ অঙ্গে ভূষণ শ্রেণী,
"কোথা মা কোথা মা" বলে ছোটে কুলবালাদলে।

———০:০:০———

তৃতীয় পক্ষ।

(গল্প)

লেখক,—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হরেরামের ক্ষুদ্র গ্রামরূপ চা'এর পেয়ালায় নানারূপ জল্পনা-কল্পনা সমালোচনায় প্রকৃতই একটা তুমুল ঝটিকা সৃজিত হইল।

যাহা ভবিতব্য তাহা ঘটিবেই। বিধাতাপুরুষকর্ত্তৃক ললাটলিখন একবার লিখিত হইলে, এমন কোন রবার বা ছুরী নাই, যাহাদ্বারা ললাটলিপির কোন শব্দ বা ছত্র চাঁচিয়া তুলিয়া সেই স্থলে নূতন কিছু লেখা যায়।

বিনা আড়ম্বরে ক্ষীণ শঙ্খধ্বনিতে সেই রাত্রে গোপীনাথের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের অগ্রে গোপীনাথকে দেখিয়া এক কূটবুদ্ধি বালক বলিয়াছিল,—"হ্যাঁগা! তুমি বরের কে হও।" এই কথা শ্রবণে গোপীনাথের বুকে খিল লাগিয়াছিল।

আর এক বালক বলিয়াছিল, "হ্যাঁগা! তোমার দুধে দাঁত ত ভাঙ্গিয়াছে—কবে ভাল দাঁত উঠিবে।" ইহা শ্রবণে গোপীনাথ তাহাকে শমনসদনে প্রেরণার্থে কোন দেবতাকে স্মরণ করিয়া থাকিবে।

কিন্তু বর না চোর! বর-ক'নে বাসরঘরে গেলে কোন স্ত্রীলোকই সে বাসরঘরে প্রবেশ করিল না। বাহির হইতে উকিঝুঁকি মারিয়া, বরের কৃষ্ণবর্ণ দেহ দর্শন করিয়া তাহারা স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিতে লাগিল।

এক যুবতী আর এক যুবতীকে বলিল, "আয়না ভাই, একবার বাসরে যাই।" উত্তরে প্রথমা যুবতী বলিল, "ও মাগো! ওমাগথেকো শ্মশানের ফেরত তেকেলে বুড়োর কাছে সখ থাকে ত তুই যা। মাগো পয়সার লোভে এমন সোণার চাঁদ মেয়েটাকে কি ক'রে বাপমায়ে জলে বিসর্জ্জন দিল।"

বরের পক্ষে বাসর ঘরটা কোলাহল-মুখরিত জনাকীর্ণ নির্জ্জন কারাগার বিশেষ! যতই চতুর হউন, বাসরের আসরে বরের স্বরে খিল ধরে, মুখ দিয়া বাক্য সরে না। তদুপরি যুবতী প্রহারিণীগণের নাসিকা-কর্ণ-মর্দ্দন-শাস্তি কিছু গুরুতর পীড়াজনক। যাহা হউক পিতৃপুরুষের পুণ্যবলে গোপীনাথ সে কঠোর

শাস্তি হইতে নিস্কৃতি লাভ করিলেও তাহার সমবয়স্ক পাড়ার দু-একটি বৃদ্ধার কম্পিত হস্তের সরল কর্ণমর্দ্দনের সুখানুভব করিতে বঞ্চিত হয় নাই।

গোপীনাথ আড়নয়নের ট্যাড়চা দৃষ্টিতে যৌবনভারাবনতা সৌদামিনীর সৌন্দর্য্য-মোহে একেবারে তন্ময় হইয়া গেল। সে ভাবিল, স্বর্গ কোথায়? আর কোথায়—হরেরামের সেই ক্ষুদ্র মৃণ্ময়-গৃহের ক্ষুদ্র দীপালোকিত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বাসর ঘরে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আমাদের গল্পের নায়ক গোপীনাথ, ঘটক এবং একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক সহ নববধুকে লইয়া নৌকাযোগে নিজগ্রামে পদার্পণ করিতেই চতুর্দ্দিক উদ্বেলিত করিয়া দশ পোনেরটা ঢাক, পাঁচ সাতটা ঢোল সজোরে বাদ্যোদ্যম সহকারে নব-দম্পতির মঙ্গল-সম্ভাষণ করিতে লাগিল। গোপীনাথ ও ঘটক ঠাকুর তদ্দর্শনে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহারা ত্রিভুবন অন্বেষণ করিয়াও এই বিপুল বাদ্যোদ্যমের কারণ অনুসন্ধান করিয়া কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না। বাজনা-বাদ্য ত হইতেই লাগিল, উপরন্তু গোপীনাথ দেখিল, দশপোনের জন বালক মশাল জ্বালিয়া তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া "বলহরি হরিবোল" ধ্বনি করতঃ গ্রাম তোল-পাড় করিতে লাগিল। কৌতুক দর্শনপ্রয়াসী গ্রামের বহু নিষ্কর্ম্মা লোক মুহূর্ত্ত-মধ্যে তথায় উপস্থিত হইল। কোন কোন অল্পবুদ্ধি বালক গোপীনাথের গাত্রে ধূলিনিক্ষেপ করিতেও লজ্জাবোধ করিল না।

গোপীনাথ মনে মনে প্রমাদ গণিল। তাহার বাক্যরোধ হইয়া গেল। এই রূপ হাস্যজনক অবস্থায় গোপীনাথ সদলবলে নিজ বাটীতে প্রবেশ করিতেই রমানাথ, বিশ্বয়া ও ভৃত্য নফর অবাক্ হইয়া গেল। বরক'নের সঙ্গে সঙ্গে বহু-লোক বাটীতে প্রবেশ করিল। পিতাকে তদবস্থ সন্দর্শন করিয়া, ক্রোধোন্মত্ত রমানাথ ক্ষিপ্রগতিতে শাণিত ভোজালী লইয়া পিতাকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে কি আত্মঘাতী হইবার মানসে বিচরণ করিতে লাগিল। কি সর্ব্বনাশ! এই অননুমেয় ভীষণ দৃশ্য দর্শনে সকল লোকেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল।

বিশেষতঃ যে প্রৌঢ়া রমণী নববধূর সঙ্গে আসিয়াছিল, সে কত লোকের বাটী কত নববধুকে লইয়া গিয়াছে, তাহার কার্য্যই এই,—কিন্তু এরূপ বিপদে সে কখনও পতিত হয় নাই। সে উপরোক্ত ভীষণ প্রাণান্তকর ব্যাপার দর্শনে অতি-মাত্র সন্ত্রস্তা হইয়া স্বীয় প্রাণরক্ষার্থে নিরাপদাশ্রয় লাভের অভিপ্রায়ে পলায়নপূর্ব্বক গৃহের পার্শ্বস্থিত পায়খানায় প্রবেশপূর্ব্বক পাছে তাহাকে কেহ দেখিতে পায়, এই আতঙ্কে স্বীয় চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিয়া একটী কোণে বসিয়া রহিল।

বৃদ্ধ গোপীনাথ প্রাণভয়ে পলায়ন করতঃ একটা কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক দ্বার অর্গল বদ্ধ করিয়া সেই তক্তপোষের তলদেশে লুক্কাইত থাকিবার অভিপ্রায়ে ভূপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া তাহার বিরাট বপু তত্তলে প্রবেশ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সেই আকুল চেষ্টা অর্দ্ধেক ফলবতী হইল, কারণ তাহার উপরের দেহার্দ্ধ-ভাগ ভিতরে প্রবিষ্ট হইল ও নিম্নার্দ্ধ বহির্ভাগেই রহিল।

গোপীনাথ যখন দ্বাররুদ্ধ করিল, তখন রমানাথের বিপুল উদ্যমটা সকল সর্ব্বনাশের মূল সেই ঘটকঠাকুরের উপর পতিত হইল। রমানাথ ঘটক-ঠাকুরের পশ্চাতে ভোজালী হস্তে ছুটিল, ঘটকঠাকুর বেগতিক বোধে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে প্রায় উন্মত্ত অবস্থায় প্রতিবাসী বীরভদ্র মল্লিকের অন্দরে প্রবেশ করিল। অন্দরের বৌ-ঝিরা একজন অপরিচিত লোককে এরূপভাবে অন্দরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিকট চীৎকারে যে যেখানে সুবিধা বুঝিল পলায়ন করিল। তাহা দেখিয়া বৃদ্ধ ঘটকঠাকুর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "মা সকল পালিও না, আমায় রক্ষা কর—আমায় রক্ষা কর, কোন খানে লুকাইয়া রাখ। আমাকে খুন করিতে আসিতেছে, গোপীনাথ ঘোষালের ছেলে দেখিতে পাইলে আমাকে খুন করিয়া ফেলিবে। মা সকল তোমাদের পায়ে পড়ি আমায় রক্ষা কর।" বীরভদ্র মল্লিকের অন্দরে ঘটককর্তৃক একটা প্রকাণ্ড কোলাহলের সৃষ্টি হইল।

এদিকে হতবুদ্ধি গোপীনাথ না পারে বাহির হইতে—না পারে তক্তপোষের তলায় পূর্ণ প্রবেশ করিতে। হায়! তাহার এই প্রাণপণ চেষ্টায় পৃষ্ঠের খানিকটা চর্ম্ম ছিন্ন হইয়া তৎস্থান হইতে দরদরধারায় রক্তপাত হইতে লাগিল। সে কতক্ষণ এরূপ "ন যযৌ ন তস্থৌ" ভাবে থাকিল তাহা বলিতে পারি না। কিছুকাল পরে, বাদ্যোদ্যম থামিয়া গেল; অনেক লোক কৌতুহল নিবৃত্তি করিয়া দুর্ম্মতি গোপী-

নাথকে শত ধিক্কার দিতে দিতে সে স্থান ত্যাগ করিল। তখন ভূমিতলে লুণ্ঠিতা বিজয়ার কাতরতাব্যঞ্জক ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। সে ক্রন্দন কোন কোন দুর্ব্বলহৃদয়া প্রতিবেশিনীর নয়ন হইতে অশ্রু আকর্ষণ করিল।

গোপীনাথের মুক্তপ্রাঙ্গণে গোলাপের দিদিমা, হরির শ্বশ্রূঠাকুরাণী, ঠানদিদি, মুক্তকেশী পিসী প্রভৃতি মাতব্বরী স্ত্রীলোকগণের একটা মজলিস বসিয়া গেল। এমন সময়ে কতিপয় ভদ্রলোক, যে কক্ষে গোপীনাথ ছিল, সেই কক্ষদ্বার উন্মোচন করিতে সজোরে দ্বারে ক্রমাগত করাঘাত করিতে লাগিল। বহির্দ্দেশ হইতে তাহারা কক্ষমধ্যে কাতরতাব্যঞ্জক অব্যক্ত ধ্বনি শুনিতে পাইল মাত্র। আঘাতের গুরুত্বে দ্বার আপনাআপনি অর্গলচ্যুত হইয়া গেল। তদবস্থা দেখিয়া দশ বারোজন লোক শালকাষ্ঠনির্ম্মিত অতি গুরুভার তক্তপোষের তলদেশ হইতে গোপীনাথকে সজোরে টানিয়া বাহির করিল, তাহারা দেখিল গোপীনাথ সংজ্ঞা-হীন। চক্ষে ও মুখে নিয়ত জলসেকে চৈতন্য আসিতেই গোপীনাথ চক্ষু চাহিয়া করজোড়ে সকলকে বলিতে লাগিল, "তোরা বাবারা—তোদের পায়ে পড়ি আমাকে খুন করিস্‌নে। তোরা যা চাস্‌ আমি তাই দিব। দোহাই তোদের।" তাহার সেই কাতরতায় সকলেই মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। আর সৌদামিনী?—সে ভয়ে ও বিস্ময়ে আপনার লাল চেলীর কাপড়ের ভিতর মিশাইয়া গেল।

পরদিন হইতে রমানাথকে গ্রামে কেহই দেখিতে পাইল না।

অহো দুর্বুদ্ধি!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গোপীনাথ ভৃত্য নফর ও অন্যান্য খাতকের দ্বারা সন্ধান লইল, রমানাথ গ্রামের কোথায় লুকাইয়া আছে কি না। সকলেই অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইল, রমানাথ গ্রাম ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। পিতৃদ্রোহী পুত্রের স্বেচ্ছা-কৃত গৃহত্যাগে গোপীনাথ নিরুদ্বিগ্ন হইল। তাহার চিন্তাজালজড়িত বদনমণ্ডল প্রফুল্ল দেখা গেল। বিজয়ার কথা আর কি বলিব, সে কোন দিন খায়, কোন দিন খায় না। প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকদের কেহ কেহ কোন কোন দিন তাহাকে নিজ

বাটীতে ধরিয়া লইয়া গিয়া জোর করিয়া খাওয়ায়। নববধুর সহিত তাহার বাক্যালাপ নাই। নববধূ রন্ধনকার্য্যে পারগ নহে বলিয়া পতিপুত্রহীনা প্রতিবাসিনী মুক্তকেশী পিসী মাসিক চারি টাকা বেতন এবং যথারীতি আহারের ব্যবস্থায় গোপীনাথের গৃহে পাচিকার কার্য্যে নিযুক্তা হইলেন। তিনি ক্রমে বুদ্ধিচাতুর্য্যবলে সৌদামিনীর মনোহরণ করিয়া, বলিতে কি, দুই দিনেই গোপীনাথের নিষ্কণ্টক গৃহের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। কি গোপীনাথ, কি সৌদামিনী উভয়েই প্রৌঢ়বয়স্কা মুক্তকেশী পিসীকে আপনার হইতে অধিক দেখিতে লাগিল। দুইদিনেই মুক্তকেশী সৌদামিনীর অভিভাবিকা হইয়া উঠিলেন। এখন সৌদামিনী তাহার কথায় মরে বাঁচে। মুক্তকেশীর মুখে সৌদামিনীর কি রূপ কি গুণের প্রশংসা ধরে না। ভগবান সকল মনুষ্যের ন্যায় তাহাকে একটী মুখ দিয়াছেন বলিয়া সে নিতান্ত দুঃখিতা। তাঁহার যদি সহস্র মুখ হইত, তাহা হইলে গোপীনাথের বিশেষতঃ তৎপত্নী সৌদামিনীর রূপ গুণ বর্ণনা করিয়া তিনি এই রূপগুণহীন সংসারটার চৈতন্য উৎপাদন করিয়া দিতেন। মুক্তকেশী সকাল সন্ধ্যায় হরিনামের মালা জপেন। সকাল সন্ধ্যায় তিলক কাটেন—তাঁহার সেই সুগোল নাশায় তিলক বড়ই মানায়—এমনি মানায় যে, তাঁহার যৌবনকালের নাসাগ্রের তিলক দেখিয়া অনেক ধর্ম্ম-ভীরু সদাশয় ব্যক্তির মন বিমোহিত হইত। এ গল্প আমাদের নয়, তাঁহার নিজের। গোপীনাথের ভবনে মুক্তকেশী পিসীর শুভ পদার্পণে সরলা বিজয়ার মনে ক্রমে অশান্তি জন্মিতে লাগিল। সে অশান্তি ক্রমে যন্ত্রণায় পরিণত হইয়া অসহ্য হইয়া উঠিল। বিজয়াও লজ্জা ত্যাগ করিয়া তাহার "চোখের বালীর" বাটীতে আশ্রয় লইল।

প্রতিবাসী গৌরহরি চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী বিজয়ার চোখেরবালী। বিজয়ার এই অবস্থা দেখিয়া গৌরহরি এবং তাহার পত্নী মর্ম্মান্তিক দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাকে বাটীতে স্থান দিয়া অতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে বিজয়া নিঃসম্বল নহে, সে তথায় আপনার অর্থব্যয়ে কাল যাপন করিতে লাগিল। একদিন মুক্তাকেশী পিসী নানা ছন্দালঙ্কারে ভূষিত করিয়া এ সংবাদ গোপীনাথকে জ্ঞাপন করিলে গোপীনাথ তচ্ছ্রবণে না রাম না গঙ্গা কিছুই বলিল না। চতুরা মুক্তাকেশী বুঝিল গোপীনাথ এ সংবাদে সন্তুষ্ট ব্যতীত অসন্তুষ্ট নয়। নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতার জন্য দুঃখে বিজয়ার মর্ম্মস্থল সময়ে সময়ে মুচড়াইয়া উঠিলেও সে পরের বাটীতে থাকে বলিয়া প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে পারেনা। নয়নের অশ্রু সে নয়নেই অতি কষ্টে সম্বরণ

করিয়া থাকে। বিজয়া দিন দিন তুষানলে ভস্মীভূতা হইতে লাগিল।

হায়! যে প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে পারেনা তাহার মত দুর্ভাগা বুঝি এ জগতে আর নাই।

বিবাহের কিছুকাল পরেই সৌদামিনীর মুখের অপাণ্ডুরতা, মৃত্তিকাশয়ন, অরুচি ইত্যাদি শারীরিক অসুস্থতার অনেক লক্ষণ প্রকাশ পাইল। চতুরা মুক্তকেশী ভিন্ন অপর কেহ তাহা লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইল না। কি করিয়া পাইবে?—বৃদ্ধ ভৃত্য নফর ব্যতীত গোপীনাথের গৃহে কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের প্রবেশ একেবারে নিষেধ। এমন কি—দালান ও বৈঠকখানা দিয়া বাহিরে যাতায়াত হইত, সদর দ্বারের কপাট সর্ব্বদাই ভিতর হইতে তালাবদ্ধ থাকিত।

বিজয়া পিতার নিকট টাকার ও টাকার সুদের তাগাদায় মাঝে মাঝে আসিলেও সে বৈঠকখানাতেই পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিত, ভুলিয়াও বাটীর ভিতর প্রবেশ করিত না।

বিবাহান্তে দেড় বৎসর পরে সৌদামিনীর একটী নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইল। মুক্তকেশী পিসী সজোরে শঙ্খধ্বনি করিয়া এ শুভ বারতা সকলকে জানাইলেন। আট মাসে যে সন্তান হয়, সে সন্তানকে লোকে আটাশে ছেলে বলে। সে সন্তান প্রায়ই অসম্পূর্ণাঙ্গ হয়, কদাচিৎ বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু এ সন্তান তাহা নহে, দিব্য পুষ্টাঙ্গ, পূর্ণগর্ভের সন্তানের ন্যায়। নবকুমার হইয়াছে শুনিয়া পত্নীব্রত বৃদ্ধ গোপীনাথ মনে মনে অতিশয় আনন্দিত হইল। এ বয়সে এরূপ অপরূপ পুত্রধনলাভ তাহার সৌভাগ্যের লক্ষণস্বরূপ জ্ঞান করিল। রমানাথকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়া অদৃষ্টবলে তাহার স্থলে আর একটী জলপিণ্ডাধিকারী লাভে গোপীনাথ আপনাকে ধন্য বলিয়া মানিল। গ্রামের দুষ্ট লোকগুলা ঈর্ষায় গোপনে চক্রান্ত করিয়া "গোপীনাথ হীনজাতীয়া কন্যা বিবাহ করিয়া আনিয়াছে", এই কথা প্রচার করিয়া প্রকাশ্যে গোপীনাথকে "একঘরে" করিল। ভোলাময়রা বা এণ্টনী সাহেবের বিংশশতাব্দীর নবীন সংস্করণের কোন গ্রামস্থ কবি গোপীনাথের নামে শ্লীলতাবর্জ্জিত গান ও ছড়া রচনা করিয়া লোককে শুনাইতে লাগিল। বিজয়া লজ্জায়—ঘৃণায় মরমে মরিয়া গেল।

অতিশয় দুঃখপ্রকাশে লিখিতে হইতেছে যে, গোপীনাথের এই নূতন জলপিণ্ডাধিকারী চোরাবিকারে হঠাৎ একদিন ধুলাপায়েই ইহলোক ত্যাগ করিল। গোপীনাথ নবকুমারকে হারাইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল, তাহার অরুণ নয়নে এবার দুই এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। সৌদামিনীও কাঁদিল—কিন্তু হাপুস

নয়নে কাঁদিয়া অশ্রু ও নাসিকানিঃসৃত শ্লেষ্মায় বাটীর সমস্ত কক্ষ, দালান ও প্রাঙ্গন সিক্ত করিল মুক্তকেশী পিসী। মুক্তকেশী পিসী আকুলকণ্ঠে গোপীনাথ ও সৌদামিনীকে বলিল, "তাহার আপন পুত্র প্রাণত্যাগ করিতেও তাহার এত শোকোচ্ছাস হয় নাই, বুলিতে কি মুক্তাকেশী পিসীর দেহের পেশী, শিরা, স্নায়ু, রক্ত, মাংসএবং অস্থি সমুদায়ই মমতায় গঠিত। মুক্তকেশীর যদি এমনকোন তপস্যা জানা থাকিত, তাহা হইলে সে সেই তপস্যাবলে ত্রিলোকানুসন্ধানে নবকুমারকে ফিরিয়া আনিয়া সৌদামিনীর ক্রোড়ে তুলিয়া দিত! সে কি করিবে—নাচার!

গোপীনাথের শ্বশুরের প্রতিবাসী আনন্দমোহন ঘোষালের ভবানীপুরে বিবাহ হয়। আনন্দমোহন সঙ্গতিসম্পন্ন। তাহার একমাত্র শ্যালক গোরাচাঁদ সংসার-বিজ্ঞানের সর্ব্বজনবিদিত সূত্রানুসারে ভগ্নীর অন্নে কায়াপুষ্টি করিবার জন্য প্রায়ই ভগ্নীর গৃহে যাতায়াত করিত। প্রয়োজনানুরোধে পাঁচ, সাত, পোনের দিন এমন কি একমাস, দুইমাসও ভগ্নীর গৃহে চর্ব্ব-চুষ্য-লেহ-পেয় আহারে নিশ্চিন্ত ভাবে সময় অতিবাহিত করিত। গোরাচাঁদের বয়ক্রম পয়ত্রিশ বৎসর হইবে। কিন্তু বিধাতার নিয়মের ব্যভিচারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ গোরাচাঁদের শ্মশ্রুবর্জ্জিত বদনমণ্ডলে এ পর্য্যন্ত গোঁপদাড়ীর চিহ্নমাত্র ছিল না। সেই নিমিত্ত তাহার বয়সের অনুমান করা দুঃসাধ্য হইত। তাহাকে যুবকের মত দেখাইত। গোরাচাঁদের দেহের বর্ণ সুবর্ণতুল্য। মস্তকের কেশগুলি কুঞ্চিত—সর্ব্বদাই সুবিন্যস্ত। গায়ে প্লেটওয়ালা কামিজ, পরণে বহুমূল্য দিশী কালাপেড়ে ধুতি, পায়ে বিচিত্র বর্ণের হাফমোজা ও বার্ণিস করা পম্প সু। বুকপকেটে সোণার চেইন-যুক্ত ঘড়ী ও অটো ডি রোজ মাখান রুমাল। ব্যাচিলার গোরাচাঁদের অনেক গুণ—সে বেশ গান করিতে পারে, কণ্ঠস্বর মিষ্ট। সে নাকি ভবানীপুরের সখের থিয়েটারে স্ত্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নাচে—গায়। ফলতঃ এ গ্রামে সে বাবুর সেরা শালাবাবু। গ্রামের সকলেই তাহাকে ভালবাসে।

গোপীনাথের বাটীর পশ্চাতে গলি-রাস্তা, তাহা শুধু আনন্দমোহনের বাটীতে যাতায়তের জন্য—সাধারণের চলিবার পথ নহে। গোরাচাঁদ এবার এক বৎসর পরে ভগ্নীর বাটীতে আসিয়াছে। সে একদিন উপরোক্ত গলি দিয়া যাইতে যাইতে সৌদামিনীকে দেখিল। সৌদামিনী গলির ধারের বাতায়নে আপন মনে বসিয়াছিল—সেও গোরাচাঁদকে দেখিল।

সেই দিন হইতে প্রত্যহ দুই তিনবার সৌদামিনী ও গোরাচাঁদে দেখা

শুনা হইতে লাগিল। এই সুযোগে সংসারের সুখ দুঃখের বহু প্রাচীন মর্ম্মভেদী দুই একটী কথার বিনিময় উভয়ের মধ্যে চলিতে আরম্ভ হইল।

সৌদামিনী ক্রমে পিত্রালয়ের পরিচয়ে আপন ভ্রাতার ন্যায় মনে করিতে লাগিল। সৌদামিনীর মনে হইতে লাগিল, যেন পৃথিবীর সমস্ত গুণরাশি কেন্দ্রীভূত হইয়া গোরাচাঁদের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আর গোরাচাঁদের? তাহার ত কথাই নাই। সে সৌদামিনীর গুণ বর্ণনা করিয়া গল্প করিত, সকলকে লোক-সমাজেবহু চেষ্টাতেও বুঝাইতে পারিত না।

এই সময়ে সেই গ্রামে বারোয়ারী পূজার খুব ধূম পড়িয়া গেল। বারোয়ারীতলা লোকে লোকারণ্য। চারি পাঁচ ক্রোশ দূর হইতে যাত্রা শুনিতে কত লোক আসিয়াছে। কত পান ও বিড়ি, সোডা,লেমনেডের দোকান—নানাবিধ খেলানার দোকান বসিয়াছে। চারিধারে ফেরিওয়ালা "সখের জলপান", "সাড়ে আঠারো ভাজা", "নানখাতাই" ইত্যাদি হাঁকিতেছে।

প্রথম পূজার রাত্রে নিত্যানন্দ অধিকারীর যাত্রা। সীতাহরণের পালা। বিকালে যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। তখন রাত্রি আটটা। সীতাকে রাবণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, রাম সীতার অদর্শনে খেদ করিতেছিলেন। রামের সেই মর্ম্মান্তিক খেদে শ্রোতৃমণ্ডলী নয়নজলে তাহাদের বস্ত্র সিক্ত করিতেছিল। চারিদিক হইতে বড়ই বাহবার রোল উঠিতেছিল। ঠিক এই সময়ে একঘ'রে গোপীনাথ বৈঠকখানার রোয়াকে বসিয়া হুঁকাহস্তে ধূমপান করিতেছিল। বারেয়ারীতলা সে স্থান হইতে অতি নিকটে, গান বা বক্তৃতা সেখান হইতে বেশ স্পষ্ট শুনা যায়। গোপীনাথ উৎকর্ণ হইয়া তাহার রোয়াক হইতেই যাত্রা শুনিতেছিল।

গোপীনাথ বড়ই সঙ্গীতানুরাগী—সেও একজন যাত্রার প্রধান পাণ্ডা, তবে সে এবার একঘ'রে। কি করিবে, বাটীতেই বিষন্নচিত্তে বসিয়া ছিল। এই সময়ে গ্রামের কতকগুলা যুবক এই বারোয়ারী পর্ব্বোপলক্ষে আনন্দোন্মত্ত হইয়া সহসা গোপীনাথের নিকট আসিয়া "এই যে খুড়ো—এই যে খুড়ো"বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে গোপীনাথকে চ্যাংদোলা করিয়া লইয়া গিয়া আসরের মাঝখানে বসাইল। বলিল, "শিবহীন যজ্ঞ—সে কি হয়? খুড়োর বাহবা আর কান্না না হ'লে কি যাত্রা জমে। ওসব ভুলে যাও—তুমি খুড়ো বারোযারীর প্রধান পাণ্ডা, তোমাহেন সোণা ফেলে, আঁচলে গেরো। খুড়ো খুব বাহবা দেও, খুব তারিফ দেও।" কিরূপ খুড়ো বলিতে পারি না, খুড়ো গোপীনাথ তখন সকল

শোক-দুঃখ, মনোমালিন্য ভুলিয়া রাম লক্ষ্মণকে যখন তিরস্কার করিতেছিলেন, সেই তিরস্কার শ্রবণে গোপীনাথ ভেউ ভেউ শব্দে কৃত্রিম অশ্রুশূন্য ক্রন্দনে যাত্রা জমাইয়া দিল। গোপীনাথের হাস্যোদ্দীপক ক্রন্দনে কি শ্রোতা. কি যাত্রাওয়ালা, সকলেই চমকিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

প্রথম দিন বলিয়া কৌতূহলাক্রান্তা মুক্তকেশী পিসীও একটু যাত্রা শুনিতে গিয়াছিলেন। সৌদামিনী পিত্রালয়ে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল, গোরাচাঁদ তাহাকে একখানি গাত্রবস্ত্রে গহনা বস্ত্র বাঁধিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে তুলিয়া পিত্রালয়ে লইয়া গেল। গোলমালে তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না।গাড়ীতে আরোহণ করিবার সময় সৌদামিনীর বক্ষের হৃৎপিণ্ডটা তাহার বক্ষের অস্থিতে সজোরে একটা ধাক্কা দিল। হায়, নিরীহ গোপীনাথ এই ঘটনার কিছুই জানিল না, সে মাথা চালিয়া, হাত পা নাড়িয়া ক্রমাগত বাহবা দিতে লাগিল। এমন সময়ে মুক্তকেশী-পিসী আসিয়া গোপীনাথকে অতি ব্যস্ততা সহকারে শীঘ্র বাটী আসিতে বলিলেন। গোপীনাথ তাড়াতাড়ি উঠিতে যায়, যুবকদল তাহাকে বসাইয়া দেয়। যাহা হউক গোপীনাথের প্রবল চেষ্টার পর যুবকেরা তাহাকে দশমিনিটের মধ্যে আসিতে স্বীকৃত করিয়া লইয়া ছাড়িয়া দিল। উতলা গোপীনাথ মুক্তকেশী পিশীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?"

মুক্তকেশীর মুখ বিবর্ণ। সে অশ্রুসিক্ত নয়নে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌমা কোথায়?" গোপীনাথ ভয়ে—"তা—তা—আ—আমি কি জানি?" বলিতে বলিতে ছুটিয়া বাটী আসিল। তাহার শয়ন-কক্ষ অন্বেষণ করিতেই দেখিল, যে তোরঙ্গে অলঙ্কারের বাক্স থাকে, তাহা খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাতে অলঙ্কারের বাক্স নাই। গোপীনাথ এঘর, ওঘর, আনাচ-কানাচ, পায়খানা প্রভৃতি অন্বেষণ করিয়া সৌদামিনীকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সেই সময়ে সে লোচনযুগলে দেখিল, তাহার বহুমূল্যে ক্রীত সর্ষপবৃক্ষে আর কুসুম নাই।

অঙ্ক।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত।

তিরুপতি, তৈলঙ্গ দেশের প্রান্তভাগে অবস্থিত। তিরুমলয়ে বেঙকটরাম দর্শন অভিলাষে হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব এখানে আসিয়া থাকেন। দেব নামের বিকট ধ্বনি অপনোদনার্থ তাহারা বালাজী কহে। শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা, শ্রীনিবাস হইয়াছে। ত্রিপতি গ্রাম ও ত্রিপতি শৈল পূর্ব্বঘাট গিরির মধ্যে। বেঙকটাচল মাহাত্ম্যে নাগ কথা সন্নিবেশিত করিবার জন্ত পর্ব্বতকে শেষাচল হইতে হইল। আমরা যাঁহার বাটীতে অতিথি হইয়াছি, তাঁহারও নাম বেঙ্কট রাও। তিনি উর্দ্ধে যাইবার আয়োজন করিয়া দিলেন। পাদুকা ত্যাগ করিতে হইল। যবনের উত্থান নিষিদ্ধ। অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপী সোপান পরম্পরা অতি ক্রমণ করিয়া বহুস্তরে সজ্জিত মহাশিখর বিশিষ্ট পুর-দ্বার পাইলাম। তলদেশে তিরুপতি গ্রামের শোভা অতি সুন্দর বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া যাউক। হৃদয়ের মধ্যে এক্ষণে সে চিত্র নাই। শিবিকা পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে লইয়া যাইতেছিল। অনেক বাহক এই মলয় উপত্যকায় উদ্ভুত চন্দন বৃন্ত আনিয়া দিল।

তোরণের সমৃদ্ধি দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, সেইটী মন্দির। এই প্রণালীতে গঠিত গোপুর এবং সমধিক প্রকার বিস্তৃতি দ্রাবিড় স্থাপত্যের বিশেষভাব। দেবায়তন, এত অধিক স্থান ব্যাপ্ত হয়, যে ওড্রে পুরীনামে খ্যাত হইয়াছে। প্রাচীরত্রয়ে বেষ্টিত। গোপুরের শিল্প নৈপুণ্য ও চিত্রকার্য্য দেখিয়া, বিস্মিত হইতে হইল। কর্ণাট্য শব্দের অর্থে, তোরণের বর্ণনা হইয়া যায়। আমার বোধহয়, ইহা হইতেই দেশের নাম কর্ণাট হইয়া থাকিবে। কর্ণ × তির্য্যক রেখা, অট্ট + উচ্চগৃহ। গৃহের চতুর্দ্দিকস্থ উপরিভাগ, তির্য্যকভাবে, বহুস্তর বিশিষ্ট হইয়া উত্থিত। প্রথম প্রকার, কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্ম্মিত। উহার এক স্থানে অনুশাসন লিপি উৎকীর্ণ আছে। প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ২৭৫ হস্ত, প্রস্থে ১৭৫ হস্ত। গর্ভ গৃহে পাষাণ মূর্ত্তি অতি বৃহৎ। দক্ষিণের এক হস্তে চক্র, অপর হস্ত পৃথিবীর দিকে এবং বাম হস্তের একটিতে শঙ্খ, অপরটীতে পদ্ম, সচল মূর্ত্তি, কিন্তু অন্যরূপ। শিরে শেষ নাগ, হস্তে গদা চক্র, ও বরাহ-ভয়দাতা। তাঁহার সেবা বিশেষ ব্যয় সাধ্য। একটাকা দিয়া, কপূর্রা লোকে

সাক্ষাৎ করা হইল। সদা শিবের মত, শ্রীনিবাস সদা অধিগম্য নহেন। সাধারণের জন্য, অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল, অর্চ্চনার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কুলোত্তুঙ্গ চোলের পুত্র, তোণ্ডমন চক্রবর্ত্তী এই প্রসিদ্ধ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। সে চারিশত বৎসরের কথা। দেবালয়ের উন্নতি কল্পে যাঁহারা বিশেষ সহায়তা করিয়া ছিলেন, আজি পর্য্যন্ত মন্ত্র-পুষ্পের সহিত তাঁহাদের নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে। মঠের আয় বার্ষিক ২১ হাজার, ব্যয় ১৫ হাজার টাকা। মন্দির পার্শ্বে, সহস্র স্তম্ভ মণ্ডপের কারুকার্য্য অতি পরিপাটি। তাহার বহির্দ্দেশে প্রত্যেকটীতে বৃহৎ মূর্ত্তি খোদিত। এখানে পক্ক তণ্ডুলের প্রসাদ বিক্রয় হইতেছে। এক হিন্দুস্থানী ব্রহ্মচারী আমাকে ভাত কিনিয়া দিতে কহিল, স্পর্শ দোষ নাই। এক প্রকোষ্ঠে চন্দ্র গিরির রাজা তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় ও তদীয় পত্নীর ধাতু মূর্ত্তি দেখাগেল। আর একস্থানে রামানুজ স্বামী পূজারি হইয়াছেন। ভগবান দাস মহান্ত স্বর্ণধ্বজ স্তম্ভের নিম্নের প্রোথিত উদ্বৃত্ত অর্থ অপহরণাপরাধে কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নব অধ্যক্ষের সহিত তাঁহার বিবাদ হইতেছে মহাবীর দাসের নামে অভিযোগ উপস্থিত।

বেঙ্কটেশের জন্য সহস্রাধিক লোক পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। থিরু বাঙ্কোড় মহীসুর, কালহস্তীও বেঙ্কট গিরি নৃপতির পান্থশালা সকলের জন্য উন্মুক্ত। একরাত্রি বাস করিয়া, আমরা তিলঙ্গ ভূমিতে অবতরণ করি।

কুচ্চি বেঙ্কট রাও মহাশয়ের উপবেশন গৃহ, রাজ সভার মত গঠিত। তিনি কতকগুলি পুরাণ স্বর্ণ মুদ্রা, রামটেঁকির সহিত হিরণ্ময় হরপার্ব্বতী মূর্ত্তি একত্রিত করিয়া কোষের কোষে রক্ষণ করিয়াছিলেন; নিষ্কাশন করিয়া আমাকে দর্শন করাইলেন। ইহাতে কালিঙ্গ, অন্ধ্র, পাণ্ড্য, চোল, চাণক্যও কাদম্ব বংশীয় মুদ্রা ছিল কি না আমি মুদ্রাতত্ত্ব জ্ঞাত না থাকায়, পরীক্ষা করিতে পারিলাম না। রামটেঁকি, বোধ করি, কান্যকুব্জের রঘুবংশীয় মুদ্রা হইবে। রাম চরিত্রের মাধুর্য্যের গুণে, কৃত্রিম রামটঙ্ক নির্ম্মিত হইয়া দেশ বিদেশে, অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। এবং তদ্দ্বারা নির্ম্মিত স্বর্ণালঙ্কার অতি মহার্ঘ। রামটেঁকির আকৃতি ন্যুব্জ ও বৃহৎ। এই সকল মুদ্রাও অনুশাসন লিপি, ভারতীয় পুরাবৃত্ত সঙ্কলন কল্পে অতীব হিতকারী। নন্দ, গুপ্ত, পাল, নাগ ও মৌখরি মুদ্রা আবিষ্কৃত না হইলে, ঐতিহাসিক রহস্য প্রচ্ছন্ন থাকিত। বেঙ্কট রাওয়ের কৌলিক উপাধি, কুচ্চি। এতদ্দেশে, নামের পূর্ব্বে উপাধি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিদায় কালে, তিরুমলয়ে

অধিষ্ঠাত্রী দেবের অঙ্গে প্রদত্ত কেশর ও অগুরু মিশ্রিত চন্দন, তাম্বলপুগ এবং পুষ্পাগন্ধ নির্য্যাস উপহার প্রাপ্ত হইলাম।

ত্রিপতির তিন ক্রোশ পশ্চিমে, চন্দ্রগিরি। চোলগণ, একাদশ হইতে পঞ্চাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এইস্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে অন্য বংশ চন্দ্র গিরির প্রভু হন। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অত্রত্য রাজা বঙ্গরায়ের নিকট হইতে চোলমণ্ডল উপকূলে মান্দ্রাজ বন্দর স্থাপন জন্য সনন্দ গ্রহণ করেন। ২৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বাব্দে চোলবীর কর্ত্তৃক সিংহল অধিকৃত হয়। মধ্যে, তাহারা হীন বল হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে পাণ্ড্য ও পুনরায় প্রবল হইয়া কম্বু রাজ্য আক্রমন করে। তাহার পূর্ব্বেই ইহারা বঙ্গ মগধ পয্যন্ত জয় করিয়াছিল। দ্রাবিড়ে, দর্শনীয়, বস্তুর একমাত্র বহিবঙ্গ দেবালয় নিচয় ইঁহাদেরই নির্ম্মিত।

তৈলঙ্গ প্রাচীন অন্ধ্র। অন্ধ্র নৃপতিগণ চোলদিগের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাহাদের বিশেষ বিবরণ নাই। তিরুপতির মঠাধ্যক্ষের নিকট দ্বিশকটীক শিলা লিপি ও তাম্র শাসন আছে। পাঠক আসিলে, নানা তত্ত্ব প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা অন্ধ্রগণ বৌদ্ধ ও মগধের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। চোল ও অন্ধ্র জাতি, অন্তজ এবং ম্লেচ্ছ ক্ষত্রিয় বলিয়া পুরাণে উল্লিখিত। চালুক্য রাজ চোল দৌহিত্র। চলুক্যবংশের সহিত কাদম্বদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ এবং পাণ্ড্য ও চোলে উক্ত সংস্রব দেখিয়া তাহাদিগকে দ্রাবিড় জাতীয় বলিবার হেতু মিলে।

চালুক্যবংশের আদি পুরুষ, চুলুক শৈলে রাজছত্র তলে অধিষ্ঠিত হন। পুলিকেশী বল্লভ ৪৮৯ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জরে রাজ্য আরম্ভ করেন। ৫৫৬ খৃষ্টাব্দে কির্ত্তীবর্ম্মার পুত্র সত্যাশ্রয় বল্লভ প্রতীচ্য ও কুব্জ বিষ্ণুবর্দ্ধন প্রাচ্য চালুক্য রাজ্যের অধিনায়ক হইলেন। তৈলঙ্গে, কুব্জের বংশাবলীতে সর্ব্বশেষে দ্বিতীয় কুলতুঙ্গ চোড়দেব, ১০৭২ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত। পঞ্চশত বর্ষ, দাক্ষিণাত্য শাসন দণ্ড, যাহাদের হস্তে ছিল, তাহাদের বিবরণ, কেবল সময় নির্ণয়ে পর্য্যাপ্ত হইলেও উল্লেখ যোগ্য হইয়াছে। চোল সাম্রাজ্য অষ্টাদশ শত বর্ষ ব্যাপী হইয়াছিল। এত দীর্ঘকাল যে শক্তি কার্য্যকারী ছিল, তাহার রাজনীতি, পরাক্রম ও সুযোগের ইতিহাস শূন্য রহিয়াছে।

পৌরাণিক যুগ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতে আর্য্যজাতি দক্ষিণাবর্ত্তন আরম্ভ করেন আপস্তম্ভ ও বৌধায়ন তিনশত পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তৎকালের সাহিত্যিকগণ যাহা লিখিতেন, সূত্রাকারে গ্রথিত হইত। আপস্তম্ভ, কল্পসূত্র ও

বৌধায়ণ স্মার্ত্ত সূত্রের প্রণেতা। তিনি লিখিয়াছিলেন; অদীক্ষিত ব্যক্তির সহিত আহার, সন্ত্রীক ভোজন পর্য্যুসিত দ্রব্য আহার মাতুলী ও পিতৃস্বশার কন্যা বিবাহ দক্ষিণে প্রচলিত।

আর্য্য আগমনের পূর্ব্বে ও অব্যবাহিত পরে ভারতে কেবল ব্যবহার মাত্র প্রচলিত ছিল। স্থান বিশেষ তাহা উদার ভাবানুযায়ী সংশোধন করিতে হইয়াছে। যে পর্য্যন্তভিন্ন মতাবলম্বী লোকের প্রভাব উপস্থিত হয় নাই, ততদিন ব্রাহ্মণগণ সরল হৃদয়ে ব্যবহার লিপি বদ্ধ করিতেন, পরে আধিপত্য রক্ষার জন্য উহাকে অপৌরুষেয় কহিতে লাগিলেন। কিন্তু আচার সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন শীল। প্রয়োজনানুরূপ না করিলে চলে না। মম্বাদির মত, কদাপি সম্পূর্ণ ভাবে প্রচলিত ছিল না এক্ষণে কোন দেশে চারিশত সৎসরের অধিক প্রাচীন নিবন্ধ প্রচলিত নাই। দায় সম্বন্ধে বোম্বাই প্রদেশে ময়ূখ বঙ্গের জীমূত বাহন, কাশীরাজ্য মিতাক্ষরা, টীকা বা সংগ্রহ আকারে প্রচলিত হইয়া দেশাচারকে দৃঢ় করিয়াছে। যাহা শ্রেয় অবলম্বনীয়, তদনুসারে শাস্ত্র প্রস্তুত হইবে। শাস্ত্রে নাই বলিয়া, পরান্মুখ হওয়া উচিত নহে। একজন নিবন্ধকার কহিয়াছিলেন,—

মম্বাদি শাস্ত্রাণি গুরোরধিত্য,
সম্যক তথাভ্যস্ত চিরং প্রয়ত্য।
দৃষ্ট্বাচ শিষ্টাচরণং করোমি,
শ্রীবিশ্বনাথ স্মৃতি সার সংগ্রহ॥

সমাজের হিতের জন্য কখন শাস্ত্র, কোন সময়ে ব্যবহারকে অবলম্বন করিয়া লোক রঞ্জন করা আবশ্যক। শ্রেয়ঃ কি তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয়। অতএব, কিছুদিন উভয় সংঘর্ষ দ্বারা অতিবাহিত করা সঙ্গত।

আপস্তম্ভ, যজ্ঞানুষ্ঠান প্রতিপাদক কল্প সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দস এই ষটশাস্ত্র, বৈদিক-সাহিত্যে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে অধিতব্য। প্রথমে বৌদ্ধ, পরে মুসলমান প্রভাবে জগতের এই প্রাচীন সাহিত্য, লুপ্ত হইয়াছিল। আর্য্যবর্ত্তে, বিক্রমাদিত্য জৈনমত পরিত্যাগ করিল, ব্রাহ্মণ প্রভাবে পুনরুত্থান করে। দক্ষিণাপথে, ত্রয়ী চতুষ্টয় অবচ্ছেদানবচ্ছেদে বিদ্যমান। দাক্ষিণাত্যের ভট্টাচার্য্য বেশ, এই রক্ষণ শীতলতার নিদর্শন দিবে হিন্দুস্থানীরা, দক্ষিণীদের নিকট যজুস অধ্যয়ন করিয়া, ইদানীং অগ্নি হোত্রি হইতেছেন। অনার্য্য দেশে যাইয়া, আর্য্যধন রক্ষিত হইল। সাম সাহিত্য গুর্জ্জরে

চলিত। ঋগ্বেদী অতি দুর্লভ হইয়াছে। কাশীর মত স্থানে বসন্ত পূজা কালে দুই জন মাত্র পাইয়াছিলাম।

বেদ আমরা কথায় মানি; কার্য্যতঃ নহে। কাশীতে ৩ সহস্র দক্ষিণী আছেন, তাঁহারা বেদকে পুরুষানুক্রমে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ক্রমশঃ অধ্যয়ন শালা হ্রাস পাইতেছে। শাস্ত্র ব্যবসায়ীগণ, বেদপাঠি সম্প্রদায় হইতে বিছিন্ন। দান সভায় একত্রিত হইতে ইচ্ছা করেন না গুরু পরম্পরায় অর্থবোধ প্রচলিত না থাকায়, বৈদিকগণ বেদ কণ্ঠাভরণ হইয়াও অনভিজ্ঞ। বেদাঙ্গের সাহায্যে অর্থ করা ভিন্ন বেদজ্ঞ হইবার অন্য উপায় নাই। চেষ্টা দ্বারায় স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি করে।

দুর্গোৎসব।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ রায়।

সম্বৎসরান্তে ভগবতী আনন্দময়ী পুনর্ব্বার বঙ্গধামে আগমন করিয়াছেন, আনন্দময়ীর আগমনে নিরানন্দ বঙ্গ মহানন্দে পরিপূর্ণ। দুর্গোৎসবের তুল্য মহোৎসব বঙ্গদেশে আর নাই। ভারতের স্থানে স্থানে আজকাল ভিন্ন ভিন্ন আফিসের বাঙ্গালি বাবুরা চাঁদা করিয়া এক এক খানি দুর্গা প্রতিমা আনিতেছেন। ইহাও অবশ্য জাতীয় উৎসবের অভ্যুদয় বলিতে হইবে, বাঙ্গালি হিন্দুসন্তান মাত্রেই এই পর্ব্বকে মহাপর্ব্ব বলিয়া জানেন. বঙ্গবাসিগণ সেই কারণে শারদীয় মহোৎসবে সর্ব্ব দুঃখ ভুলিয়া আনন্দময়ী নামের সার্থকতা দেখান, সকলেই পূর্ণানন্দে পূর্ণ হন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে একজন কবি গাহিয়া গিয়াছেন :—

"মা তোমার আগমনে, ওমা দুঃখ হরা!
এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ, তবু রঙ্গ ভরা!!"

শারদীয় উৎসব সমাগত। দীন হীন বাঙ্গালী নিরন্ন হইলেও বৎসরান্তে মার

দর্শন পাইবে, প্রাণ ভরিয়া "মা মা" বলিয়া ডাকিবে! মৃয়মান উষর হৃদয়ে আবার ভক্তিরসের উৎস বহিবে, শুষ্ক প্রাণ-নদে আবার ভাদ্রের জোয়ার ছুটিবে। আনন্দময়ী মার আগমনে আমাদের আনন্দোৎসব। বৎসরান্তে মা তাঁর ক্ষুন্ন দুঃখী সন্তানদের নিকট তিন দিন পূজা পান; ধনী হউক নির্দ্ধনী হউক বিদ্বান হউক মূর্খ হউক, প্রবীণ হউক, বালক হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, সকলে একই সময়ে একপ্রাণে একতানে 'মা আনন্দময়ী!' বলিয়া ডাকিবার সুযোগ পাইয়াছে। নিরানন্দ বাঙ্গালী আজ আনন্দে মাতিয়াছে—ধনী মধ্যবিত্ত যোত্রহীন সকলেইত এক মায়ের সন্তান, সকলেরই মায়ের উপর সমান দাবী, সমান আব্দার। মহমারী দৈত্য দুর্ভিক্ষে যখন দেশে প্রবেশ করে নাই, যখন এক টাকা, দেড় টাকা চাউলের মন ছিল, যখন একখানি ধুতি, একখানি চাদর হইলেই সমাজে বাহির হইতে পারা যাইত, বাবুআনা বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া বাঙ্গালী যখন আপন অভাব বাড়াইতে শিখে নাই, তখনকার দিনে শারদীয় মহাপূজায় যে কি আনন্দ ছিল, তাহা যাঁহারা সে সময় উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। এখন অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, গৃহস্থের আয় অনেক বাড়িয়াছে, কিন্তু অভাব কিছুতেই পূরণ হয় না, আমরা দীনাদপি দীন দরিদ্র মায়ের পূজাও তাই দিন দিন ব্যয় সংক্ষেপ কোন কোন স্থলে বা একেবারেই বন্ধ দর্শন করা যাইতেছে। হউক না কেন অবস্থার পরিবর্ত্তন মায়ের পূজার আবার উন্নত অবনত অবস্থার বিচার কেন—আমরাও মার সেই সন্তান মাও আমাদের সেই মা। যেখানে দেবভোগ্য নৈবদ্য দিয়া ষোড়শোপচারে পূজা হইত, আজ অভাবে পড়িয়া না হয়, কদলী তণ্ডুল দিয়াই পূজা হইবে, মা তাহাই হৃষ্টন্তকরণে গ্রহণ করিবেন,—মা ত আর আমাদের পর নন। আজ মার আগমন প্রতীক্ষায় সমগ্র বঙ্গসন্তান দাঁড়াইয়া আছি—এসো মা আনন্দময়ি! দুর্গে! একবার তোমার ত্রিতাপহরা পাদমূলে জবা-বিল্বদল দিয়া কৃতার্থ হইব—আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া একবার মা, মা বলিয়া ডাকিব।

বৎসরের পর বৎসর আসে যায়, প্রতি শরৎকালে মার বোধন আবাহন এবং পূজা হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কৈ কয়জন আমরা এ মহোৎসবের তত্ত্ব জিজ্ঞাসু? আদ্যাশক্তি মহামায়ার বহু আকারে পূজার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, এ শারদীয়া মহাপূজা তন্মধ্যে কেন কি উদ্দেশে হইয়া আসিতেছে, তাহার উপদেশ আমরা পাই কৈ?

সুরথ রাজা বসন্তকালে এই পূজা ভারতে প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। তৎপরে ত্রেতাযুগে রাবণবধের জন্য লঙ্কার সমুদ্রকূলে শরৎকালে শ্রীরামচন্দ্র দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। রামের পূজার দৃষ্টান্তেই আমাদের ভ্রান্ত, কামনার দাস মানব যখন দেখিল যে, রাবণরাজা বাসন্তীপূজা করিয়াও সবংশে নিহত হইলেন। আর রামচন্দ্র শারদীয়া পূজা করিয়া, সীতা-উদ্ধারাদি কামনা পূর্ণ করিলেন; তখন অধিকাংশ লোকই কাম্যবস্তু লাভার্থে শরতকালেই দুর্গোৎসব আরম্ভ করিল।

এখন আলোচ্য, পুরাণোক্ত এই দেবী-কীর্ত্তি দেবাসুরযুদ্ধে মহিষাসুর বধপ্রভৃতি কি যথার্থ ঘটনা না কল্পনাপ্রসূত। শাস্ত্রোক্ত বাক্যকে মিথ্যা বলিলে পাপ হয়। একটিকে অলীক বলিলে, কর্ম্মকাণ্ড, শ্রুতি, স্মৃতি সকল গুলিকেই মিথ্যা বলিতে হয়। হিন্দুর মধ্যে এমন পাষণ্ড কে আছে যে, ঋষিবাক্যকে মিথ্যা বলিবে? তবে এই দুর্গোৎসবের মধ্যে যে গূঢ় আধ্যাত্ম তত্ত্ব নিহিত নাই, তাহা বলাও সমীচিন নহে। তাহা বলিয়া সাকার বা প্রত্যক্ষ পূজা ত্যাগ করিয়া কেবল আধ্যাত্ম-তত্ত্বের নিরূপণ করিতে গেলে নাস্তিক হইয়া পড়িতে হয়। যখন এই বিশ্ব-পরিচালনে একজন কর্ত্তা আছেন, স্বীকার করিতে হইতেছে, তখন সেই কর্ত্তাকে (বা কর্ত্তৃকে) সাকার বলিয়া স্বীকার করিলে, সাধনার কুশল অর্থাৎ সুবিধাই হইয়া থাকে। যেমন পিতা হইতে পুত্র, তাহা হইতে পৌত্র প্রভৃতির উৎপত্তি পূর্ব্বতন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তদ্রূপ আমাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, রীতি, নীতি, উপাসনাদিও পুরুষ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, এত কালের রীত্যানুমোদিত জগতের আদি পিতাকে সাকার স্বীকার করা দোষের কথা নয়। ভগবান নির্গুণ গুণাতীত হইলেও কার্য্যকালে (সৃষ্টিকালে) নিশ্চয়ই তিনি সগুণ ও রূপবান হইয়াছিলেন, নতুবা কার্য্য করা অসম্ভব। যাহা হউক, এক্ষণে এই সাকার দেবী উপাসনার মধ্যে গূঢ় অধ্যাত্ম কথার আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের অভিপ্রায়।

মা দুর্গে প্রসন্না হও মা। তোমার নাম স্মরণে সকল দুর্গতি খণ্ডন হয় মা। তোমার ধ্যানে তোমার নাম কীর্ত্তনে জীব সকল সুখ প্রাপ্ত হয়, এবং অন্তে তোমার পদচ্ছায়ায় আশ্রয় পায়। মা তুমি সকল দেবের শক্তি- সমষ্টি, তুমি আদ্যা শক্তি জগন্মাতা তোমার মূঢ় সন্তানকে শান্তিমার্গ দেখাইয়া দাও মা! অশিব-নাশিনি মা আমার, তোমার শ্রীচরণে স্থান দাও। যোগীশ্বর মহাদেব তোমার মহিমাবর্ননে করিতে অশক্ত। মাদৃশ অধম মানবের পক্ষে তোমার মহিমাবর্ণনে প্রয়াস, পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের চেষ্টা মাত্র। তথাপি মা তুমি, মা তোমার মহিমা

গান করা প্রত্যেক সন্তানেরই কর্ত্তব্য। মূর্খ বলিয়া কি মার গুণগাথা বর্ণন করিতে সন্তানকে বিরত থাকিতে আছে। হই না মূঢ়, নাই বা পারিলাম, ভাষার বিন্যাস করিতে, নাই বা পারিলাম অলঙ্কারের ছটা দেখাইতে. মার নাম গাহিব। মার দয়া হইলে, পঙ্গুই গিরিলঙ্ঘে, মূক বাকপটু হয়।

দেহতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া মহাপুরুষগণ বাহ্যজগতের সহিত মানব-দেহের সাদৃশ পুনঃ পুনঃ দেখাইয়া গিয়াছেন। বাহ্যজগতে যে যে পদার্থ আছে, মানবদেহও সেই সেই উপাদানে সৃষ্ট। এক পরমাত্মা ভিন্ন জগতে সকল দ্রব্যই নশ্বর। সকল প্রকার জীব ও পদার্থই আত্মার অংশে সৃষ্ট, আবার সেই সেই আত্মাই সকলের শেষ আধার। জীবগুলি সেই পরমাত্মার অংশ, তাই পঞ্চভূতাত্মক দেহের ধ্বংসেও আত্মার নাশ নাই।

সেই পরমাত্মাই যে দুর্গা, এবং তিনিই যে এই জগতপ্রকাশ ও রক্ষা করিতে-ছেন, ইহা দেখানই দুর্গোৎসবের উদ্দেশ্য।

দুর্গা শব্দের কতকগুলি বুৎপত্তি ও অর্থ হইতে পারে। দুর্গ নামক অসুরকে যিনি বিনাশ করিয়াছেন. তিনিই দুর্গা। অপর দুঃখেও (অতি যত্নেও) যাঁহাকে জানা যায় না, চেনা যায় না. তিনিই দুর্গা। এই বাক্যে জ্ঞানাতীত জ্ঞানময়ী আদ্যাশক্তিকেও দুর্গা বলা হইতেছে। ইনি বাক্যের অতীত, সামান্য বুদ্ধিতে ধারণার অতীত—"অবাঙ্মনস্ গোচর।" "নৈনং বাচা বদতে মনসান মন্যুতে।" অথবা অপর পক্ষে দুর্গ অর্থাৎ দুর্দ্দমনীয় অসৎপ্রবৃত্তিগুলিকে যাঁহার সাহায্যে ধ্বংশ করা যায়। সেই জ্ঞান-শক্তিকে দুর্গা বলা যাইতে পারা যায় না কি?

যাহা হউক মোটামুটি ধরিয়া লউন যে দুর্গা ব্রহ্মের নামান্তর মাত্র। পুরাণে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রসিদ্ধ দেবাসুর সংগ্রামের বর্ণনে দেবগণ প্রথমতঃ কিরূপ অসুরবল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন এবং তৎপরে আদ্যাশক্তি দুর্গা কিরূপে মহিষাসুর নাশ করিয়া দেবগণকে স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ উল্লেখ আছে। এক্ষণে আমাদের নিজ নিজ দেহতত্ত্ব বিচারে সেই দেবাসুর সংগ্রাম ও মহিষাসুর বধ কি তাহাই আলোচ্য। বাহিরে যেমন ব্রহ্মাণ্ড, এক একটি জীবদেহও তদ্রূপ এক একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। বহির্জগতে পরমাত্মার বিকাশে ও শক্তিকর্ত্তৃক যেমন অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত, ভিন্ন ভিন্ন দেহীর দেহরূপ ক্ষুদ্র (miniature) ব্রহ্মাণ্ডগুলিও তদ্রূপ পরমাত্মার অংশরূপী জীবাত্মার বিকাশে ও শক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত।

পুরাণে ইন্দ্রাদি দিকপালগণকে দেব, দেব-বৈরীদিগকে অসুর, অসুরাধিপতিকে মহিষাসুর এবং মহাশক্তি দুর্গাকে মহিষমর্দ্দিনী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে ঐসকল দেব অসুর ও শক্তির জীবদেহে কিরূপ কার্য্য হইতে পারে, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করি আসুন। যে মহিষাসুরের প্রবল প্রতাপে দেববল বিধ্বস্ত যাহার ধ্বংশের জন্য মহাশক্তি দুর্গার উৎপত্তি সে মহিষ, যে সে মহিষ নহে, তাহা বোধকরি বুঝিতে পারিয়াছেন। এক মহিষকে আমরা যমের বাহন বলিয়া জানি। সংস্কৃত অনেক গ্রন্থে দেখা গিয়াছে, বাহন উপলক্ষে তৎস্বামিকে বুঝায়। এখানেও তাহাই বুঝিতে হইবে এখানে মহিষ অর্থে মহিষকে না বুঝাইয়া তাহার প্রভু যমকেই বুঝাইতেছে। নতুবা একটা সামান্য মহিষের তাড়নায় মহাবল দেবদলের পরাজয় সম্ভব কোথায়? অথচ পুরাণোক্ত ঋষিবাক্যও ত মিথ্যা নহে। কাজেই আমাদিগকে একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে, সূক্ষ্ম অনুসন্ধান আবশ্যক কারণ— "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্"।

সমালোচনা।

সচিত্র তীর্থভ্রমণ-কাহিনী।—শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর প্রণীত, মূল্য এক টাকা।

কাশী, গয়া, প্রয়াগ মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা ও কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি অনেকগুলি পুণ্যতীর্থ ভ্রমণ করিয়া বাবু গোষ্ঠবিহারী এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। যাঁহারা তীর্থদর্শনে অভিলাষী, এতদ্দ্বারা কেবল তাঁহাদের উপকার হইবে, এমন কথা নহে, যাঁহারা ঘরে বসিয়া পাঠ করিবেন, তাঁহারাও অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। তীর্থের অনেক স্থানের মাহাত্ম্য অনেকে অবগত নহেন, এই পুস্তকে বিশেষ বিশেষ পুণ্যস্থানের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য সন্নিবেশিত থাকাতে ইহা ভক্তগণের পরম আদরণীয় হইবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসার। শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ মজুমদার বিরচিত। মূল্য চারি আনা।

শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণদেবের জন্ম, শৈশবক্রীড়া, দক্ষিণেশ্বরে সিদ্ধিলাভ এবং ভক্তবৃন্দের আনন্দপ্রবাহ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতায় অতি সরল ভাষায় বিরচিত হইয়াছে। বিরচন-কর্ত্তা বিজয়নাথ পরমহংসদেবের একজন অকৃত্রিম ভক্ত। তাঁহার আন্তরিক উচ্ছ্বাস কবিতাগুলির প্রত্যেক পদে প্রতিভাত হইয়াছে।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৯শ বর্ষ। } ১৩১৮ সাল, আশ্বিন। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

দুর্গাপূজা-তত্ত্ব।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ রায়।

আমরা মাদুর্গাকে মহিষমর্দ্দিনী বলি; শাস্ত্রবাক্যে মহিষ আমাদের যম রাজের বাহন; বাহন পাইলেই তাহার প্রভুকে পাওয়া যায়, এইখানে আমরা "যম" রাজকে পাইলাম। যমের অপর নাম কাল, তিনি জীবের সংহার কর্ত্তা, তিনিজীবের মৃত্যু ঘটান।

মহিষাসুরের উপদ্রবে অথবা কালের তাড়নায় দেবগণ বিপন্ন হইয়াছিলেন সর্ব্ব-শক্তিময়ী দুর্গার সাহায্যে তাঁহারা পুনরায় দেবাধিকার প্রাপ্ত হন। যেমন সর্ব্বশক্তি-স্বরূপা দুর্গাই পরমাত্মা, ইন্দ্র, পবন, অগ্নি ও বরুণ প্রভৃতি দেবগণ পরব্রহ্মের অংশ,

তাঁহারা এক ব্রহ্মশক্তির দ্বারাই পরিচালিত, সেইরূপ জীব দেহস্থ ইন্দ্রিয়গণের শব্দ স্পর্শরূপ রস প্রভৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও তাহারাও (ইন্দ্রিয়গণও) জীবাত্মার অংশ এবং এক জীবাত্মাদ্বারাই পরিচালিত। হস্তের গ্রহণশক্তি, পদের গমনশক্তি, কর্ণের শ্রবণশক্তি ও চক্ষের দৃষ্টিশক্তি আছে বটে, কিন্তু এক পরমাত্মার অংশ জীবাত্মার অভাবে ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের আর বিকাশ বা কার্য্যকারিতা থাকে না। যেমন কালের তাড়নায় দেবগণ প্রথমে পরাভূত হইয়াছিলেন, পরে মহাশক্তির আশ্রয় পাইয়া তৎসাহায্যে স্বাধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন. তদ্রূপ প্রত্যেক দেহীর দেহরূপ জগন্মধ্যে জীবাত্মাই মহাশক্তির অংশ শক্তি, ইন্দ্রিয়গণ দেববল, অসৎ প্রবৃত্তি রোগ শোক অসুরবল এবং মৃত্যু মহিষাসুর। সেই কাল, যম বা মৃত্যু সততঃ ইন্দ্রিয়গণকে তাড়না করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতেছে, আত্মজ্ঞান রূপ শক্তিলাভ না করিতে পারিলে, সে কালকবল হইতে রক্ষার উপায় কৈ ?

পুরাণে কথিত আছে ঃ—

"দেবাসুর মভূদ্‌যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতংপুরা।
তত্রাসুরৈর্ম্মহাবীর্য্যৈ দেবসৈন্যং পরাজিতং॥"

দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে এ শক্তি এবং দেবশক্তির খর্ব্বতা কিরূপে হয় দেখুন। মানবের শতবর্ষ আয়ুষ্কাল। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই দেহীর (ইন্দ্রিয়াদি দেববর্গের) অসৎপ্রবৃত্তি, রোগ, শোক, জরা মৃত্যুর সহিত সততঃ যুদ্ধ চলিতেছে এবং পরিশেষে অসুরশ্রেষ্ঠ মৃত্যুই বিজয়ী হইয়া জীবের উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। ব্রহ্মময়ী মা দুর্গাই সর্ব্বজীবে জীবাত্মারূপে বিরাজিতা, তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারিলেই, জীবই শিব হয়। সেই তত্ত্বজ্ঞানে বলীয়ান শঙ্করাচার্য্য তাই বলিয়াছিলেন, "শিবোহং শিবোহং"।

দুর্গোৎসব সামান্য ব্যাপার নহে। মা সর্ব্বব্যাপিনী, যাহা হইতেই উৎপত্তি, তাহাতেই স্থিতি, তাহাতেই লয়। সেই জ্ঞানশক্তির প্রতি তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে সাধকের আর জন্মপীড়া, জরামৃত্যুর ভয় থাকে না।

এখন মার পূজা-পদ্ধতি-সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে। শ্রীরামচন্দ্রের সময় হইতে বাসন্তী ও শারদীয়া ভেদে ভারতে বৎসরে দুইবার করিয়া দুর্গোৎসব হইয়া আসিতেছে ; তাহার লৌকিক তাৎপর্য্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এখন বিশেষ তাৎপর্য্য কি তাহাই দেখাইবার প্রয়াস পাইতেছি। দেবীপূজা সম্বন্ধে তত্ত্ব-নির্ণয় মাদৃশ অধম দ্বারা সম্ভবে না, কিন্তু গুরুকৃপায় দুর্গোৎসব ব্যাপা-

রের অপূর্ব্ব গূঢ় ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম, তাহারই আভাষ এ স্থলে লিখিতে উৎসুক হইয়াছি। ক্ষেমঙ্করি মা! দয়া কর। অধম সন্তানের ধৃষ্টতায় রুষ্টা না হইয়া সন্তানের বালভাষণে, আনন্দময়ি মা আনন্দের আনন্দ উৎস ছুটাইয়া উৎসাহিত কর। পদ্মহস্ত তুলিয়া অধম সন্তানকে অভয় দান কর।

যদি তাই হয়, যদি মা দুর্গা আনন্দময়ী বিশ্বব্যাপিনী আদ্যাশক্তি, তবে সূক্ষ্মতত্ত্ব ত্যাগ করিয়া ঘটে, পটে, মূর্ত্তিতে তাঁহার পূজা করি কেন? মহামায়ার উৎসবে নিরন্তর অধ্যাত্মতত্ত্ব থাকিলেও একেবারে ঘট, পট ছাড়িলে চলে কৈ? বাসন্তী ও শারদীয়া পূজা আধ্যাত্ম জ্ঞানদ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা হইলেও, আমাদের মত মূঢ় মানবের জন্য বাহ্যাড়ম্বরাদি দ্বারা প্রতিমাপূজা করিবার ব্যবস্থা করিয়া পুরাণ-প্রণেতা প্রকারান্তরে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশই দিয়াছেন, পরমাত্মার স্বরূপ তত্ত্ব যাহাদের জানিবার বুঝিবার ক্ষমতা নাই, যাহারা কেবল লোভ, মোহ কামাদির দ্বারা অভিভূত হইয়া, জগতে ক্ষণিক সুখ উপভোগের জন্য ব্যস্ত, সমাজে খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভের জন্য সতত ব্যাকুল, আমাদের মত অজ্ঞান মানবের দ্বারাও যদি এই উপলক্ষে ব্রহ্মময়ী মার অর্চ্চনা ও পূজা করান হয়, তাহা হইলে ক্রমে জ্ঞান ফুটিবে, সংসারে শান্তি আসিবে। কঠোর যোগপ্রতিপাদ্য আধ্যাত্মিক দুর্গোৎসব যোগী ও জ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভবপর, সেই কষ্টসাধ্য এবং যোগপ্রতিপাদ্য বৃহৎকর্ম্ম যদি ঘোর সংসারী ও গৃহস্থাশ্রমীর দ্বারা প্রকারান্তরে সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ইষ্ট বই অনিষ্ট নাই। যাঁহারা ভ্রমপ্রমাদ বশতঃ আমরা পরমতত্ত্ব পাইয়াছি, বলিয়া লৌকিক দুর্গোৎসবের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, তাঁহাদের সাধনাই হয় নাই। আপনাদের যদি তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে, সেত পরম সুকৃতির কথা, তথাপি লোক-শিক্ষার্থে লৌকিক ও বাহ্যিক পূজার আবশ্যক। সগুণ বা সাকারে বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া, নির্গুণ ব্রহ্মোপসনা করিয়া কয়জন মুক্ত হইয়াছেন? যাঁহারা তদ্রূপ হইতে পারেন, তাঁহারা আজন্মই মুক্ত, তাঁহারা আমাদের মত সংসারী নহেন, অজ্ঞ নহেন। ভারতে বহু বহু তত্ত্বজ্ঞানী জন্মিয়াছিলেন, প্রথমে সকলে সগুণ ব্রহ্মে চিত্ত স্থির করিয়া গুণাতীত হইয়া গিয়াছেন। শুকদেব ও শঙ্করাচার্য্য কয়জন?

শরতে ও বসন্তে কেন পূজা হয়, এখন তাহাই দেখুন। সূর্য্যের গতিভেদে বৎসর দুইভাগে বিভক্ত,—উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন। ইহার প্রথমটি দেবযান, এ সময় দেবগণের জাগ্রত অবস্থা অর্থাৎ নিষ্কাম সাধকের সাধনার কাল, দেবার্চ্চ-

নার প্রশস্ত সময়। দেবগণের উত্তরায়ণে জাগরিত অবস্থা, সে জন্য দেবীর চৈত্র মাসের বাসন্তী পূজায় বোধন (ঘুমভাঙ্গান) নাই। উত্তরায়ণ দেবদেবী পূজার প্রশস্ত সময়, সে জন্য বাসন্তী পূজাই কালের ঠিক সময়ের পূজা।

দ্বিতীয় কাল অর্থাৎ দক্ষিণায়ন বা পিতৃযানে প্রবৃত্তিমার্গের অর্থাৎ সকল সাধকেরই সাধনার প্রশস্ত কাল। দেবদেবীগণের এসময় নিদ্রাবস্থা। আমরা শারদীয়া উৎসবের কথা কহিতেছি, কাজেই এই সময়ের পূজারই আলোচনা করিব।

উত্তরাণয়কে শাস্ত্রে বহুস্থলে নিবৃত্তিমার্গ এবং দক্ষিণায়নকে প্রবৃত্তিমার্গ বলা হইয়াছে। এখন উহার সদর্থ কি, দেখা যাউক।

যামল বলিয়াছেন,—

"প্রবৃত্তিমার্গঃ সংসারো নিবৃত্তিস্তদন্যথা।"

অর্থাৎ এই সংসারাশ্রমই প্রবৃত্তিমার্গ এবং তাহার বিপরীত সন্ন্যাসাশ্রমই নিবৃত্তিমার্গ। সংসারী আমরা প্রবৃত্তিমার্গের সকাম কর্ম্মী। সন্ন্যাসীগণ নিবৃত্তিমার্গের নিষ্কামকর্ম্মী। সংসাররূপ প্রবৃত্তিমার্গে থাকিয়া দেবীর উপাসনা করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে জ্ঞানোপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। সুপ্ত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করাই বোধন। ঘোর সংসারী আমরা ক্ষণে ক্ষণে দিশেহারা হই, জ্ঞানহারা হই, সেইজন্য আমাদিগকে জ্ঞানের বোধন করিতে হয়। জ্ঞানী সন্ন্যাসীরা যাগযজ্ঞ, তপঃ জপ দ্বারা সর্ব্বদাই জ্ঞানালোকে ভাসিতেছেন, তাই তাঁহাদের বোধনের আবশ্যক নাই। নিবৃত্তিমার্গের দেবযানের (উত্তরায়নের) পূজায় তাই বোধনের ব্যবস্থা নাই।

পূর্ব্বেই কহিয়াছি, দেহীর দেহই এক একটি জগৎ, ইন্দ্রিয়গণ দেব। নিবৃত্তিমার্গে দেবযানে উত্তরায়ণে যেমন সূর্য্যের গতি, তদ্রূপ দেহে সূর্য্যরূপিণী সুবর্ণ বর্ণা নাড়িদ্বারা যখন প্রাণবায়ু বাহিত হয়, অর্থাৎ যখন দক্ষিণ নাসা দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস গতায়াত করে, তখন দেহস্থ শক্তির জাগ্রত অবস্থা। এই সময়ে ধ্যান-ধারণা, পূজনাদি সহজে সুসিদ্ধ হয়। অপর প্রবৃত্তিমার্গে পিতৃযানে চন্দ্র (পিতৃলোক) রূপিণী রজতবর্ণ ইড়া নাড়িদ্বারা প্রাণবায়ু যখন বামনাসা দিয়া বাহিত হয়, তখন প্রবৃত্তিমার্গের সাংসারিক কাজকর্ম্ম অতি সহজে সুসিদ্ধ হয়, কিন্তু সে সময় দৈবকার্য্য করিতে হইলে ইন্দ্রিয়াদির সংযমার্থে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয়। প্রবৃত্তিমার্গস্থ সংসারী মানব দুর্গোৎসব করিয়া দুর্গার প্রসাদে যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতে পারেন এবং নিবৃত্তিমার্গের মানব যে মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন,

সুরথ এবং সমাধি ইহার উদাহরণ; অপিচ শ্রীরামচন্দ্র প্রবৃত্তিমার্গে সকাম পূজা করিয়া সীতা উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং রাবণ নিবৃত্তিমার্গে বাসন্তী পূজা করিয়া পূর্ণব্রহ্মের হস্তে প্রাণসমর্পণ করিয়া মোক্ষফল লাভ করিয়াছিলেন।

পুরাণ বলিতেছেন,—(শারদীয়া পূজা সম্বন্ধে)

"মূলাধারে স্থিতা দেবী যাবন্নিদ্রান্বিতা ভবেৎ।
তাবৎ কিঞ্চিন্নসিদ্ধেত মন্ত্র যন্ত্রার্চ্চনা দিকং॥
যদি সা বোধিতা দেবী বহুভিঃ পুণ্য সঞ্চয়ৈঃ।
তদা সর্ব্বং প্রসিদ্ধেত মন্ত্র যন্ত্রার্চ্চনা দিকং॥"

মূলাধারে দেবী যতদিন নিদ্রিত থাকেন, ততদিন মন্ত্রপূজায় কিছুই হয় না; কিন্তু যদি বহু পুণ্য সঞ্চয়ে সেই দেবীকে জাগাইতে পারা যায়, তাহা হইলে মন্ত্রাদি সমস্তই সিদ্ধ হয়। এখন দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে কি হয় তাহা দেখুন,—

দুর্গোৎসবের পক্ষ পূর্ব্বে কৃষ্ণপক্ষের (পিতৃপক্ষের) নবমীতে দেবীর কল্প আরম্ভ করিয়া পূজা করিতে, দেবী পক্ষের ষষ্ঠিতিথিতে দেবীর বোধন (জাগরণ) হয়। ইহাতেই বেশ বুঝা যায় যে, জ্ঞানের বোধন করিতে হইলে পূর্ব্ব হইতে অনেক প্রকার সাধনা ও যোগ-যাগের আবশ্যক। পিতৃপক্ষের শেষভাগে কল্প আরম্ভ করায় ইহাই বুঝা যায় যে, অহরহঃ সাংসারিক (কামনাপূর্ণ) কর্ম্মকাণ্ডে ব্যাপ্ত থাকিয়াও মানব যত্ন করিলে বৈরাগ্য-পথে অগ্রসর হইয়া মুক্ত হইতে পারেন। পিতৃকার্য্য কামনা বা ভোগ, দেবকার্য্য ত্যাগ বা বৈরাগ্য। সাধারণতঃ ইহাও দেখা যায়, যে বস্তু বহুভোগ করা যায়, ক্রমে তাহার উপর বিতৃষ্ণা জন্মে; তখন সে দ্রব্যে ক্রমশঃ বৈরাগ্য জন্মে, সে দ্রব্য প্রায়ই লোকে ত্যাগ করে, ভোগের প্রথমাবস্থায় বৈরাগ্য আসে না। এস্থলেও দেখুন, পিতৃপক্ষের (ভোগকালের) চরমসীমা পূর্ণ হইলে কল্প (বৈরাগ্য পথে গমনের প্রবৃত্তি) আরম্ভ।

কবে কোথায় বোধন করিতে হয়?—

"নবম্যাং আর্দ্রযোগতঃ শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামিত্বাং।"

আদ্রা নক্ষত্র যুক্ত নবমী তিথিতে, মা আজ শ্রীবৃক্ষে তোমার বোধন করিতেছি, এখন এই বাক্যের তাৎপর্য্য বিচার করি আসুন। এখন শ্রীবৃক্ষের অর্থ কি? শ্রীঐশ্বর্য্য যাহার ফল, তাহাই শ্রীফল; ভগবৎ বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য জগৎব্যাপী, মা আদ্যাশক্তি ঘটে, পটে, মঠে ঘাটে, মাঠে, দেশ, দেশান্তরে সর্ব্বত্রই আছেন, তিনি জগৎব্যাপিনী। অপর শ্রীকান্তি যাহার ফল, ইহাতে দেহার দেহকেও বুঝাই-

তেছে, অপিচ বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার দেহও পৃথক্ নহে। অতএব শ্রীবৃক্ষ বলিলে কেবল বেলগাছকে না বুঝাইয়া, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবদেহকেও বুঝাইতেছে। শ্রীবৃক্ষে ব্রহ্মরূপিনী জ্ঞানশক্তির শয়ন বলিলেও জীবদেহে সুপ্ত-চৈতন্য বুঝায় না কি? সেই সুপ্ত জ্ঞানশক্তির বোধন অর্থাৎ জ্ঞানোপার্জ্জন জন্য অনেক যাগ, যজ্ঞ, তপঃ, জপ বিশেষতঃ প্রাণায়াম করিতে হয়। আত্মতত্ত্বের বোধনের জন্য মানবের জ্ঞান-বোধনের আবশ্যক। উপরেই কহিয়াছি, প্রথমে ভোগ, তৎপরে বিরক্তি, তৎপরে ত্যাগ বা বৈরাগ্য, বৈরাগ্যের পর ভক্তি, ভক্তি হইতে জ্ঞানোদয়, জ্ঞানোদয়ে মুক্তি।

এক্ষণে "নবম্যাং আদ্রর্যোগতঃ" কথার ভাব দেখা যাক্। প্রতিপদ হইতে অষ্টমী পর্য্যন্ত প্রবৃত্তিমার্গে আমরা ক্রমাগত ভোগের লালসা বাড়াইয়া যাইতেছি। অষ্টমীতে ভোগের পরাকাষ্ঠা; পূর্ণ ভোগের পর বিরক্তি ও বৈরাগ্য আসে; বৈরাগ্য আসিলেই ভক্তির উদয়; ভক্তি আসিলেই সাধকের হৃদয় আর্দ্র হইয়া যায়; হৃদয় ভক্তিরসে গলিয়া বা ভিজিয়া না গেলে কি জ্ঞানোদয় হয়? তাই নবমীতে বৈরাগ্যের সহিত ভক্তি মিশিয়া সাধকের জ্ঞানপিপাসা প্রবল হয়, সাধক তত্ত্বজিজ্ঞাসু হন, বলিয়াই আর্দ্রাযোগে নবমীতে বোধনের ইঙ্গিত করিয়াছেন।

জগৎব্যাপিনী মা আমার, দেহ মধ্যস্থ চিন্ময়ী, জাগো মা, আমি অনেক ভোগ করিয়াছি, এত দিন তোমায় ভুলিয়া ছিলাম, ভোগে বিরক্তি আসিয়াছে, এখন মা আমি আর কিছু চাই না, কেবল তোমায় চাই। এই বলিয়া সাধক করুণ-কণ্ঠে যখন মা মা বলে ডাকেন, সেই আর্দ্রহৃদয়ে একাগ্রচিত্তে ডাকার নামই বোধন।

পূজা আরও নিকট হইয়া আসিল, প্রতিপদ হইতে ষষ্ঠী পয্যন্ত যে সকল পূজার রীতি-পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে, দেখি আসুন। অপর পক্ষের নবমীতে কল্প আরম্ভ হইলেও প্রকৃত পক্ষে শুক্লা ষষ্ঠিতেই বোধন হইয়া থাকে। ষষ্ঠী কালের একটি অংশ মাত্র। প্রতিপদ হইতে ষষ্ঠী পর্য্যন্ত গণনা করিলে ছয় দিন পাওয়া যায়, এই ছয় দিনের উল্লেখ এবং পৃথক্ পৃথক্ দিনে পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য দেবীকে উৎসর্গ করার ছলে যে যোগের ষড়ঙ্গেরই আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহাই দেখাইতেছি। যোগের অঙ্গ ছয়টি—আসন, সংযম, প্রাণায়াম; ধ্যান, ধারণা এবং সমাধি। প্রতিপদ হইতে ষষ্ঠী পর্য্যন্ত ছয় তিথিও ঠিক ঐ যোগাঙ্গ; যদি বলেন, তিথির সহিত যোগের ষড় অঙ্গের সাদৃশ্য কোথায়? তাহাও দেখাইতেছি। এখন দুর্গোৎসবে প্রতিপদ হইতে ষষ্ঠী পর্য্যন্ত আমরা করি কি? প্রতিপদে

দেবীকে রৌপ্যের আসন দান করিয়া উপাসনা করি; দ্বিতীয়াতে একগাছি ঘুন্‌সী বা কেশবন্ধন ডুরি দিয়া মার উপাসনা করি; উত্তরোত্তর ক্রমশঃ ঐরূপ তৃতীয়াতে স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্ম্মিত তিলক (নাসাভরণ); চতুর্থীতে ফল; পঞ্চমীতে কঙ্কতিকা অর্থাৎ চিরুণী; এবং ষষ্ঠীতে মধুপর্ক ও পঞ্চগব্য দান করিয়া দেবী পূজা করিয়া থাকি। এখন বুঝিয়া দেখুন, প্রতিপদে আসনদানে—১। আসনযোগ, দ্বিতীয়াতে কেশবন্ধন ডুরিদানে, ২। সংযম যোগ, তৃতীয়ায় স্বর্ণ ও রৌপ্যের নাসাভরণ দেওয়ায়, স্বর্ণবর্ণা পিঙ্গলা এবং রজতবর্ণ ইড়া নাড়ী দ্বারা ন্যাস-করণ উদ্দেশ্যে ৩। প্রাণায়াম যোগ, চতুর্থীতে ফলদানে সকল জীবের কাম্যফল-দাতা জগদীশ্বরের ধ্যান উদ্দেশ্যে ৪। ধ্যানযোগ, পঞ্চমীতে চিরুণী দানে (চিরুণী দিয়া আমরা কি করি? আমরা মাথার অসার খুস্‌কী, মলামাটি দূর করিয়া চুল পরিষ্কার করিয়া লই) অসার বস্তুর ত্যাগ এবং সার বস্তুর গ্রহণরূপ ৫। ধ্যান-যোগ এবং ষষ্ঠীতে মধুপর্ক পঞ্চগব্য দানে (অধিক মধুপান করিলে মত্ততা হেতু বাহ্যজ্ঞান হারাইতে হয়) বাহ্যজ্ঞানের অভাবজন্য ৬। সমাধিযোগেরই শিক্ষা পাওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য সাধককে একটির পর আর একটি যোগ অভ্যাস করিতে হয়, ইহা দেখাবার তাৎপর্য্যই প্রতিপদ হইতে ষষ্ঠী পর্যান্ত ছয় দিনে পর পর নূতন নূতন এক একটি "দিব্য" দানের ব্যবস্থা দিয়া পুরাণকার ও শাস্ত্রকারগণ ষড়ঙ্গ যোগের উপদেশ দান করিয়াছেন।

এখন বোধনের পর পূজা। আর্দ্রায় বোধন বসাইয়া ষষ্ঠীতে বোধন শেষ করিয়া সপ্তমীতে চরলগ্নে মূলানক্ষত্রে দেবীর প্রতিমা বা ঘটে প্রবেশন, শাস্ত্রে উক্ত আছে এবং সেই বিধিতে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। যথা,—

"আদ্রায়াং বোধয়েৎ দেবীং মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ।
পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং সংপূজ্য শ্রবণৈব বিসর্জ্জয়েৎ॥"

আর্দ্রায় বোধন, মূলায় প্রবেশন, পত্রিকা প্রবেশ বা প্রতিষ্ঠা, (এ কার্য্য মূলা নক্ষত্রযুক্ত সপ্তমীতেই হইয়া থাকে) পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রান্বিত অষ্টমী এবং উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রান্বিত নবমীতে পূজা এবং শ্রবণানক্ষত্রান্বিত দশমীতে বিসর্জ্জন হইয়া থাকে।

ইড়া ও পিঙ্গলা এই দুই নাড়ী দ্বারা প্রাণায়ামের পূরক, রেচক ন্যাসকার্য্য সিদ্ধ হয়; যখন ঐ দুই নাড়িদ্বারা বাহিত প্রাণবায়ু সুষম্না নাড়ীতে প্রবেশ করিয়া স্থির হয়, তখন তাহাকে কুম্ভক বা চরলগ্ন; চরলগ্ন অর্থে স্থির লগ্ন; সাধক বায়ুরোধ করিয়া যোগবলে তখন সেই বায়ুকে মূলে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ

করাইয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন। বাহ্যিক পূজায়ও সেইজন্য চরলগ্নে মূলায় প্রবেশন। বোধন বা জ্ঞানদীপ্তির পর মূলাধারে চৈতন্যশক্তি প্রবেশনই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি। ষষ্ঠির বোধনের পর সপ্তমীতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার। হিন্দুর সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্মেও শিরস্থিত ইষ্টদেবকে হৃদয়-পটে স্থাপন করিয়া মানসোপচারে পূজার ব্যবস্থা চিরপ্রচলিত, দুর্গোৎসবে সেই মানসপটের পরিবর্ত্তে প্রতিমা, মানসোপচারের পরিবর্ত্তে ফলমূলাদি লৌকিক উপচার। অষ্টমী, নবমী দুইদিন পূজার মধ্যে, অষ্টমীতে সাধকের জ্ঞানাঙ্কুরের পর জ্ঞানপিপাসা প্রবল, সকল দিকে তাঁর লক্ষ্য, ঐ দিন ভদ্রমণ্ডল বস্ত্রাদি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস আচরণ শক্তিপূজা প্রভৃতি কার্য্যদ্বারায় বাহুল্যভাবে পূজার ব্যবস্থা হওয়ায়, আমাদের দেহ-তত্ত্বের তাবৎ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; কাজেই অষ্টমীর দিন সাধক বিজ্ঞানময়। জ্ঞানী সাধক নবমীর দিন সদাই আনন্দময়, তখন আর তাঁহার আড়ম্বর আয়োজন বিশেষ কিছুই থাকে না। নবমীপূজায় তাই বাহুল্যভাবে পৃথক্ পৃথক্ পূজার ব্যবস্থা নাই, এককালে বহুউপচার দিয়াই পূজা হয়। ভক্ত হোম, আহুতি দিয়া বলেন, "ব্রহ্মময়ী মা, আমি তোমায় পাইয়াছি, সকল দ্রব্য তোমাতেই অর্পণ করিতেছি, মা আমার আর কোন অভিলাষ নাই, কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। নবমীকৃত্যা পূজা সাধকের মুক্তাবস্থা; যখন সাধক মার সাক্ষাৎ পাইয়াছেন; তাঁর জ্ঞানে ধ্যানে জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তখন কি আর তাঁহার অন্য বাসনা কিছু থাকিতে পারে? তাই শ্রবণাতে (দশমীতে) বিসর্জ্জন দিয়া সাধক লৌকিক কাজ শেষ করেন। নবমীতে যখন সাধকের তন্ময়ভাব, তখন তিনি সকল ভুলিয়া কেবল নিজ সাধিত প্রাণায়ামের প্রণব ধ্বনিই শুনিতে পান, অন্য কোন বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তখন শ্রবণশক্তিটুকুই থাকে। তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—"শ্রবণেন বিসর্জ্জয়েৎ।"

দুর্গোৎসব মহৎ ব্যাপার; ইহা যুগে যুগে, বৎসরে বৎসরে হইয়া আসিতেছে; লোকের ভক্তি মুক্তির উপায় এই মায়ের পূজা। লৌকিক ভাবে শরৎ উৎসব বৎসরে একবার হয়, কিন্তু ইহা হইতে যে উপদেশ পাইলাম, তাহাতে বুঝা যাই-তেছে যে, মানব-দেহে এ পূজা নিত্যই সাধিত হইতে পারে।

বহুপ্রকার ভোগের পর বৈরাগ্য আসিলে হৃদয় ভক্তিরসে গলে; জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা জীবের চৈতন্যলাভ হয়। সেই চৈতন্যের সাহায্যেই যোগন্যাসাদি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। মনোময় বিজ্ঞানময় কোষ উত্তীর্ণ হইয়া মানব যখন আনন্দ-

ময় কোষে সর্ব্বদাই পরমানন্দ উপভোগ করেন, তখন তিনি জীবন্মুক্ত; তখনই তাহার পূজা শেষ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

লৌকিক ব্যবহারে বিসর্জ্জনের পর সিদ্ধিপান এবং আলিঙ্গন সম্ভাষণ হইয়া থাকে, ইহারও একটা তাৎপর্য্য আছে। তখন সাধকের ইষ্টসিদ্ধি হইয়াছে, তখন আর তাঁহার আপন পর ভেদ থাকে না; প্রসারিত হস্তে তখন তিনি সকলকেই কোল দেন, তখন তাঁহার "বসুধৈব কুটুম্বকং।"

দুর্গোৎসবের সময় যদি এ সকল জ্ঞান না থাকে, দুর্গোৎসব যে ব্রহ্মেরই উপাসনা এ জ্ঞান যদি না আসে, তবে সকলই পণ্ডশ্রম। সাংসারিক কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াও ইচ্ছা, একাগ্রতা, ভক্তি থাকিলে, মার পূজা করিয়া তাঁহারই দয়ায় মুক্তিলাভও করা যায়, এ জ্ঞান থাকা সকলেরই প্রার্থনীয়। এ সকল সূক্ষ্ম বিষয়ে দৃষ্টি না রাখিয়া বিল্ববৃক্ষ মূলে ঘট স্থাপন করিলে, নামে মাত্র বোধন। নিজ হৃদয়-পটের মূলে ঘট বসাইয়া বোধনই প্রকৃত বোধন। যদি নিজ নিজ হৃদয়-ঘটে জ্ঞান-বোধন না ঘটে, তাহা হইলে মাটির ঘটে বোধন নামমাত্র বোধন।

মায়ের কোলে কারা?

ইচ্ছামতী নদীতীরে ইচ্ছাপুর গ্রামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, সময়ে তাঁহার প্রচুর ধনসম্পদ ছিল; বাটীতে বারোমাসে তেরোপার্ব্বণ হইত, তেরো অপেক্ষাও অধিক হইত, সমারোহের সীমা থাকিত না; লক্ষ লক্ষ লোক আহার পাইত, বিবস্ত্রেরা বস্ত্র পাইত, দানার্থীরা আশাধিক দান পাইত, লক্ষমুখে জয়ধ্বনিতে ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণের সুরম্যপুরী ঘন ঘন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত। পর্ব্বোৎসব ব্যতীত বৎসরের প্রায় সকল সময়েই দরিদ্রের প্রতি সেই উদারচিত্ত ব্রাহ্মণের অসীম দয়া প্রকাশ পাইত। দেব, দ্বিজ, বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। ধর্ম্মপথে সেই ব্রাহ্মণের কি যে সৎকার্য্য ছিল না, শাস্ত্রে তাহা অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট।

ভদ্রাসনের সন্নিকটে সুপ্রতিষ্ঠিত দেবালয় ছিল; একটী কক্ষে লক্ষ্মীনারায়ণের এবং অপর একটি কক্ষে সিংহবাহিনী দশভুজা জগদম্বার স্বর্ণময়ী প্রতিমা। ধনেশ্বর হইলেও ব্রাহ্মণ প্রতিদিন স্বয়ং সেই উভয় প্রতিমার পূজা করিতেন; পূজা, ভোগ ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি সমাপ্ত হইলে, অপরাহ্নে সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ যথাসম্ভব প্রসাদ পাইতেন। নিত্য নিত্য এই ভাব। এখনকার দিনে কোন ব্রাহ্মণের কিছু অর্থলাভ হইলে লোকের মুখে তিনি "বাবু" খেতাব প্রাপ্ত হন। বাটীতে শালগ্রামশিলা অথবা অন্য কোন বিগ্রহ থাকিলে তাঁহাদের অর্চ্চনার নিমিত্ত মাসিক দু'এক টাকা বেতনে একজন পূজারি ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হয়। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ঠাকুরসেবার নিমিত্ত পূজারিঠাকুর নিযুক্ত হয় কেন? কেন হয়—এ প্রশ্নের সাদা উত্তর, বাড়ীর কর্ত্তা হন একটি বাবু; বাবু স্বয়ং ঠাকুরপূজা করিলে লোকে নিন্দা করিবে, সে কারণেও বটে, বেশীর ভাগে নিজের দম্ভাভিমানের গর্ব্বেও বটে, ঠাকুরপূজার প্রতি বাবুর ঘৃণা হয়, ঠাকুরপূজাকে তিনি নীচকার্য্য বিবেচনা করেন। এখনকার বাবুলোকেরা সকলেই প্রায় ঐ শ্রেণীতে গণ্য। ইচ্ছাপুরের যে ব্রাহ্মণের কথা আমরা বলিতেছি, তিনি প্রকৃত বাবু হইবার যোগ্য হইলেও আপনাকে "বাবু" বলাইতেন না, বাবুগিরী ফলাইতেন না, কোন বিষয়েই অভিমান রাখিতেন না। মুখে সর্ব্বদাই রাধাকৃষ্ণের নাম ও জগদম্বা মা দুর্গার সহস্রনাম কীর্ত্তন। বিষ্ণুতে ও শক্তিতে তাঁহার সমান ভক্তি ছিল, সাদা কথায় অভেদজ্ঞান।

হায় হায়! সেই ধর্ম্মশীল ধনবান ব্রাহ্মণের সৎকার্য্যে ঈর্ষাপ্রকাশ করিয়া তাঁহার একজন পরাক্রান্ত আত্মীয় জ্ঞাতি ছলে বলে কৌশলে তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, ঐশ্বর্য্যশালী ব্রাহ্মণ পথের ভিখারী হন। তাঁহার নাম ছিল জটাধারী চৌধুরী। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখনও নামটি ঠিক বজায় ছিল, ভূষণেও তিনি জটাধারী হইয়াছিলেন। ভিখারী হইয়া অন্য এক ক্ষুদ্র গ্রামে ক্ষুদ্র একখানি কুটীর বাঁধিয়া তিনি বাস করিতেন। সঙ্গে ছিলেন ঐশ্বর্য্য সুখলালিতা সহধর্ম্মিনী ব্রাহ্মণী। অবস্থাগতিকে সেই সতীলক্ষ্মীও দীনবেশ-ধারিণী ভিখারিণী।

কালধর্ম্মের কেমন চমৎকার পরিবর্ত্তন, পাঠক মহাশয়েরা তাহা দেখুন। চিত্র দেখিলেন, যাহা শ্রোতব্য তাহা শুনিলেন, আর কিছু শুনিবেন কি? আপনারা শুনিতে না চাহিলেও কর্ত্তব্যবোধে আমাকে তাহা শুনাইতে হইবে। ধনে, মানে,

গৌরবে গ্রামের মধ্যে যিনি অতুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন, তিনি ভিখারী হইলেন, সেই হীনাবস্থায় তাহার অভ্যস্ত পর্ব্বোৎসব অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভবে না, তথাপি সেই ভিখারী জটাধারী বর্ষে বর্ষে মা জগদম্বার চরণে গঙ্গাজল, বিল্বপত্র অর্পণ করিতে বিরত ছিলেন না। কায়ক্লেশে মায়ের নামে ভিক্ষা করিয়া যে বৎসর তিনি কিছু অর্থ পাইতেন, সে বৎসর ছোট একখানি প্রতিমা গড়াইয়া, মাটির গহনায় সাজাইয়া তিনটি দিন তিনি বিমলানন্দে মায়ের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেন; যে বৎসর তদ্রূপ ভিক্ষা না মিলিত, সে বৎসর ঘটপূজা হইত; পূজা বন্ধ যাইত না।

এক বৎসর ভীষণ বিপত্তি! শরৎঋতু আসিল, আশ্বিন মাস পড়িল, কেশে ফুল ফুটিল; আনন্দময়ী আগমন করিবেন, ভাগ্যবানের ঘরে ঘরে আয়োজন হইতে লাগিল। জটাধারী ব্রাহ্মণের কিরূপ আয়োজন?

ব্রাহ্মণীর অনুমতি লইয়া ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বাহির হইলেন। গ্রহদেবতারা বিগুণ, ব্রাহ্মণ যে দ্বারে যান, সেই দ্বারেই তাড়া খান; কতদূর ভ্রমণ করিলেন, কেহই কিছু ভিক্ষা দিল না; একমুষ্টি তণ্ডুলও না!

কুটীরের ব্রাহ্মণ কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণী আসিয়া পার্শ্বে বসিলেন, ব্রাহ্মণীর মুখে গদ্‌গদ্ ভাষ, ব্রাহ্মণের চক্ষে দর্ দর্ অশ্রুধারা।

সে দিন দুর্গাপঞ্চমী। কাঁদিতে কাঁদিতে করজোড়ে ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন, "মা! জগদম্বে! এবারে তোমার চরণে আমি পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারিলাম না! কত দ্বারে ফিরিলাম, কেহই ভিক্ষা দিল না! মা! হ্যাঁ মা! যাহারা ভিখারীকে মুষ্টিভিক্ষা দিতে কাতর হয়, সেইরূপ পাষাণহৃদয় মানুষগুলিকে তুমি কুবেরের ঐশ্বর্য্যদান করিয়া সুখাসনে বসাইয়া রাখিয়াছ, আর আমি—আমি মা তোমার অধম অকিঞ্চন দরিদ্র সন্তান, তোমার অর্চ্চনার জন্য একমুষ্টি তণ্ডুলকণার অভাবে—আমাকে তুমি কাঁদাইতেছ! মা! হ্যাঁ মা! এ মা তোমার কেমন বিচার? মা! হ্যাঁ মা! তোমার নাম না আনন্দময়ী? তোমার নাম না দয়াময়ী? তোমার নাম না ব্রহ্মময়ী? ঠিক বটে! আনন্দময়ী না হইলে আমাকে নিরানন্দে ভাসাইয়া দিবে কেন? মা! থাকো তুমি! তোমার চরণে যদি আমি এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত অর্পণ করিতে না পারি, তবে মা, জগতকে আমি বলিয়া দিব, এ সংসারে দুর্গা নাম যেন কেহ না লয়।"

এই কথা বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের নেত্রজল অকস্মাৎ শুকাইয়া গেল, সর্ব্বশরীর হর্ষে রোমাঞ্চিত। মনঃকষ্ট, পথশ্রম, নৈরাশ্য, সমস্তই দূরে গেল; ব্রাহ্মণ

উঠিয়া দাঁড়াইলেন, একটা মৃণ্ময় কলসী হস্তে লইয়া চঞ্চলস্বরে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "কুটীর পরিষ্কার কর, আমি গঙ্গাজল আনি।"

ব্রাহ্মণ জল আনিতে গেলেন, ব্রাহ্মণী ঘর পরিষ্কার করিয়া রাখিলেন। গঙ্গাজল পূর্ণ কলস মস্তকে লইয়া ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাকালে কুটীরে ফিরিলেন; অন্তরে মহাকষ্ট থাকিলেও, কেমন এক অপূর্ব্ব আনন্দে আনন্দে উভয়ের নিশাযাপন হইল।

পরদিন ষষ্ঠি, সায়ংকালে বোধন। ভিখারী ব্রাহ্মণ পরিষ্কার কুটীরে ঘট-স্থাপন করিলেন, আমন্ত্রণ, অধিবাস, সংকল্প শাস্ত্রমত অনুষ্ঠিত হইল, বোধন হইয়া গেল।

রজনী প্রভাতে সপ্তমী। ব্রাহ্মণী অতি প্রত্যূষে উঠিয়া জবা-বিল্বদলাদি বহু পুষ্প চয়ন করিয়া আনিলেন। ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া পূজায় বসিলেন। নৈবেদ্য নাই! গৃহে একটি কণাও তণ্ডুল নাই! বিনা নৈবেদ্যে কি প্রকারে পূজা হয়? চিন্তাকুল নয়নে চারিদিকে চাহিয়া ব্রাহ্মণ সহসা ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "নৈবেদ্য নাই! তুমি অনেকগুলি ফুল তুলিয়া আনিয়াছ, ফুলের নৈবেদ্য কর; ভাঁড়ের ভিতর দুটি হরীতকী আছে, আনো, উপকরণ হউক। বেটী যেমনি পাষাণীর মেয়ে পাষাণী, তেমন বেটীকে আজ ফুল চাপাদিয়ে ফেল্‌ব! উপোস করিয়ে রাখ্‌ব!" মৃদুহাস্য করিয়া ব্রাহ্মণী পাঁচখানি ফুলের নৈবেদ্য সাজাইলেন। পূজা আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণী শঙ্খধ্বনি করিলেন। শঙ্খধ্বনির প্রতিধ্বনি শেষ হইবার অগ্রেই কুটীরের সম্মুখদিকে এককালে যেন সহস্র সৌদামিনী চমকিয়া উঠিল; এক ব্রহ্মতেজোময়ী ষোড়শী কামিনীমূর্ত্তি কুটীরদ্বারে দণ্ডায়মানা। পরক্ষণেই সেই মূর্ত্তিটি ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠিত দেবীঘটের দক্ষিণপার্শ্বে। মূর্ত্তির ক্রোড়ে জটাধারী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী অচেতন। ভয়ে অচেতন নহেন, পূর্ণানন্দে অচেতন। জগত জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছেন, সেই উল্লাসে তাঁহারা অচেতন।

ক্ষণপরেই ব্রাহ্মণী চৈতন্যলাভ করিয়া, দেবীমূর্ত্তির পাদপদ্ম হইতে মুখপদ্ম পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "এই বুঝি সেই তুমি? হাঁ, চিনেছি! চিনেছি! তুমি দেবী অন্নপূর্ণা! তুমি দেবী জগদম্বা! তুমি আমাদের মা দুর্গা!"

জটাধারীর কুটীরে অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে, এই সংবাদ রাষ্ট্র হওয়াতে পল্লীর অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষ সেই কুটীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মূর্ত্তি দর্শনে সকলেই অবাক। দেবীর ক্রোড়ে জটাধারী অচেতন, তাহা দেখিয়া আরও অধিক বিস্ময়। বিস্ময়ে বিস্ময়ে নির্ব্বাক অভিনয়। কাহার মুখে বাক্য নাই।

জটাধারীর চৈতন্য হইল। মায়ের ক্রোড়ে বসিয়াই তিনি মায়ের চরণপ্রান্তে প্রণিপাত করিলেন। অত্যধিক আনন্দে ব্রাহ্মণীর প্রণামটি ইত্যগ্রে ভুল হইয়াছিল, পতির প্রণতির দৃষ্টান্তে সতীলক্ষ্মীও মা দুর্গার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করিলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি সমাগত স্ত্রীপুরুষেরাও মা দুর্গার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন।

এই সময় আর এক আশ্চর্য্য ঘটনা। সুপরিচ্ছদ-পরিহিত এক যুবা পুরুষ এই সময় কুটীরে আসিয়া দর্শন দিলেন। অভ্যর্থনা করিয়া জটাধারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম ?"

যুবা উত্তর করিল, যাদুশঙ্কর।

"যাদুশঙ্কর" নাম শুনিয়াই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী উভয়ে এককালে বিস্ফারিত নেত্রে যুবার মুখখানি নিরীক্ষণ করিলেন। আনন্দে গাত্রোত্থান করিয়া জটাধারী প্রগাঢ় স্নেহে সেই যুবাকে আলিঙ্গন করিলেন, ব্রাহ্মণীও স্বস্নেহে থুতি ধারণপূর্ব্বক শিরশ্চুম্বন করিলেন। কোন প্রতিবেশিনী হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এত আদর কেন গা ?

সেরূপ প্রশ্ন যদি কেহ উত্থাপন করিতে চাহেন, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে যুবার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলেই উত্তর পাইবেন। কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবার অপেক্ষা থাকিবে না।

যৌবনে জটাধারীর একটি পুত্র হইয়াছিল, সেই পুত্রের নাম যাদুশঙ্কর। সেই যাদুশঙ্কর এই সম্মুখে উপস্থিত।

জটাধারীর ঈর্ষাকলুষিত প্রবল জ্ঞাতি যখন তাঁহার ভদ্রাসন পর্য্যন্ত অধিকার করেন, বাড়ীর পরিবারেরা তখন কে কোথায় গিয়াছিল, জটাধারী তাহার সকল খবর রাখেন না; যাদুশঙ্কর তখন কোথায় গিয়াছিল, ইহাও তিনি জানিতেন না। বিষয়চ্যুত হইয়া জটাধারী সাত বৎসর ভিখারী হইয়াছেন, সাত বৎসর পিতাপুত্রে বিচ্ছেদ, সাতবৎসরে বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের রূপ ভুলিয়া যাওয়া স্বভাববিরুদ্ধ; জটাধারী তাহা ভুলিয়া যান নাই; দেখিবামাত্র পুত্র বলিয়া চিনিয়াছেন। জননীর-চিনিবার বিস্তর কারণ।

পুত্রকে আদর করিতে বিপ্রদম্পতির ভক্তির ভাগ ক্ষণেকের জন্য কিঞ্চিৎ কম হইয়াছিল; মায়া তাঁহাদিগকে স্নেহের প্রাধান্য দিয়া ভক্তিভাব একটু ভুলাইয়া ছিল; ক্ষণপরে তাঁহারা চাহিয়া দেখিলেন, ঘটের পার্শ্বে সেই তেজোময়ী দেবীমূর্ত্তি আর নাই!

ব্রাহ্মণ প্রায় বিচেতন হইয়া মা মা বলিয়া কত ডাকিলেন, বিফল! তিনি বলিতে লাগিলেন, "মা—মা—মা! কোথায় গেলে?—দুর্গা—দুর্গা! এই ছিলে, কোথায় লুকালে? দেখা দিয়ে কোথায় পালালে? সপ্তমীতেই বিজয়া! এত নিষ্ঠুর তুমি?"

জটাধারীর এইরূপ বিলাপ, কিন্তু কি জানি তাঁহার স্ত্রীর প্রতি দেবতাদের কি অনুগ্রহ, দেবীর অদর্শনে ব্রাহ্মণী কিছুমাত্র বিচলিতা হইলেন না। তাঁহার প্রফুল্লবদনে অট্ট অট্ট হাস্য।

হাস্যের কারণ অচীরেই জানা গেল। দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি মা দুর্গার কৃপা। সেই দিন হইতে তাঁহাদের সর্ব্ব দুঃখ ঘুচিল, কুটীরখানি অট্টালিকা হইল, পরিবার বর্গ অজ্ঞাত স্থান হইতে একে একে ফিরিয়া আসিলেন, বাড়ীতে দাস দাসী নিযুক্ত হইল।

দেবীর অনুগ্রহে অর্থ প্রাপ্তি, বহুস্থলে এরূপ শ্রুতি আছে; জটাধারীর ভাগ্যে সে অনুগ্রহের ফল ফলিয়াছিল, ইহা বুঝিতে পারা যায়; অধিকন্তু যাদু-শঙ্করের লেখাপড়া চর্চ্চার সহিত বিষয় জ্ঞান বেশ জন্মিয়াছিল। পিতৃ দুরবস্থায় বিদেশ গমন করিয়া তিনি রাজস্থানের এক রাজসরকারে এক উচ্চপদে চাকরী পাইয়াছেন, মাসিক বেতন সাতশত টাকা। স্বদেশ ত্যাগের এক বৎসর পরেই চাকরী। চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, সুতরাং কর্ম্মস্থলে সম্ভ্রমানুযায়ী ন্যায্যখরচ বাদে ছয়-বৎসরের বেতনের অবশিষ্ট সমস্ত টাকা যাদুশঙ্কর এই যাত্রায় জননীর পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছেন।

জটাধারীর অবস্থা ফিরিল। অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল, মধ্যে কয়েক বৎসর অতি কষ্টে দিন কাটে, তাহার পর আবার সৌভাগ্যের উদয়। বার্ষিক দুর্গোৎ-সবে অধিক সমারোহ হয়, বৎসরান্তে দুর্গাপূজার সময় যাদুশঙ্কর গৃহে আইসেন, রাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত থাকেন। দুর্গোৎসবের পর কোজাগর লক্ষ্মী পূজা, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, কার্ত্তিক পূজা এবং রাসযাত্রা সুচারুরূপে যাদুশঙ্করের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়।

জটাধারী ও তাহার সহধর্ম্মিণী প্রতিদিন ঘটস্থাপনা করিয়া দুর্গা পূজা করেন। দুর্গা তাঁহাদের হৃদয়ে নিত্য বিরাজ করেন। পূজাতে নামজপে যত ফল না হউক, তাঁহারা যে করুণস্বরে "মা মা" বলিয়া ডাকেন, "মা দুর্গা মা দুর্গা" বলিয়া ক্রন্দন করেন, তাহাতেই দয়াময়ীর দয়া সহস্রধারে তাঁহাদের মস্তকে পরিবর্ষিত

হয়। এ গল্পে পূজার মহিমা যত না হউক, ভক্তির মহিমা দেখানো হইল।

বিজয়া।

বৎসরান্তে মা আসিয়াছিলেন, তিনটি দিন থাকিয়া মা আবার চলিয়া গিয়াছেন। আঁধার বঙ্গ আবার আঁধার সলিলে ডুবিয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসবের অনুকরণে আমাদের বিজয়োৎসব হয়। বর্ত্তমান প্রথায় ঐ উৎসবের সহিত কয়েকটি আনন্দময় অঙ্গ সংযোজিত হইয়াছে। বিজয়া-দশমীর সায়ংকালে প্রতিমা-বিসর্জ্জনের পর ভক্তবৃন্দ শান্তিজল গ্রহণ করিয়া, সিদ্ধি পান করিয়া, বিল্বদলে দুর্গানাম লিখিয়া, প্রণাম, নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ বিনিময় করিয়া, পরস্পর আলিঙ্গনে সুখী হন। এই আলিঙ্গন ভক্তির আলিঙ্গন, প্রেমের আলিঙ্গন এবং স্নেহের আলিঙ্গন। যাঁহারা এই সুখে আনন্দ উপভোগ করেন, তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম বুঝেন।

বিজয়োৎসবে নূতন পুরাতন রাগ, দ্বেষ, হিংসা ও শত্রুতা বিস্মৃতি-সাগরে নিমর্জ্জিত হয়; সজন, বন্ধুবান্ধব, স্ব স্ব পরিবারবর্গ, নিঃসম্পর্কীয় আগত মিত্র-গণের সহিত সুখসঙ্গম হইয়া থাকে। অতি অপূর্ব্ব সুখের সম্মিলন। দেশের মধ্যে সভা হয়, সমিতি হয়, সম্মিলনী হয়, কিন্তু এই শারদীয় সম্মিলনের তুল্য সর্ব্বজনীন সুখের সম্মিলন কেবল এই দিনটী ভিন্ন আর কস্মিনকালেও কোথাও হয় না, কখনও হইবেও না।

দুঃখের সহিত এইখানে একটি নূতন কথা বলিতে হইল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রথা ছিল, সম্বৎসর যাঁহারা প্রবাসে থাকিতেন, এই পূজার সময় তাঁহারা স্ব স্ব গৃহাশ্রমে আসিয়া মাতৃপাদপদ্ম দর্শন, পরিবারবর্গের মুখদর্শন ও স্বদেশীয় বন্ধুবান্ধবের সন্দ-র্শন লাভে সুখী হইতেন; এখন প্রথা হইয়াছে, মা সরস্বতির কৃপায় যাঁহারা কিছু উচ্চাঙ্গের পাশ্চাত্যশিক্ষার এবং মা কমলার কৃপায় বিপুল স্বর্ণ-রজতের অধি-কারী হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই পূজার সময় স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বাস্থ্যকর শৈলে শৈলে বিহার করিতে যান। দার্জ্জিলিং, মধুপুর, শিমুলতলা

এবং ওদিকে হাজারিবাগ, নাগপুর, খণ্ডোয়া সিংহল এবং রেঙ্গুন প্রভৃতি পবিত্র স্থানগুলি তাঁহাদের দুর্গোৎসবের বিরামস্থল হয়! মা দুর্গার শ্রীমুখ তাঁহারা দেখেন না, ঢাক ঢোলের শব্দ তাঁহাদের কর্ণে ভাল লাগে না, পূজার উৎসবেও তাঁহারা সুখানুভব করেন না, বিজয়োৎসবে ও সুখসম্মিলনে তাঁহারা অধিকারী হইতে চাহেন না। অধিক কথা কি, যাঁহাদের ভবনে মহামায়ার অধিষ্ঠান হয়, তাঁহারাও কেহ কেহ প্রতিমা দর্শনের ভয়ে পর্ব্বতে পলায়ন করেন! সামাজিক সংসারে এ একটা যে কি নূতন উপসর্গ তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

এইখানে একটি পুরাতন গল্প মনে পড়িল। আজকাল বঙ্গদেশে সাত্ত্বিক পূজা অতি বিরল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক ভক্তের গৃহে সাত্ত্বিক পূজা হইত; যাঁহার যেরূপ সংস্থান, তিনি সেইরূপ অবস্থানুসারে হৃদয়ের ভক্তিতে মা দুর্গার অর্চ্চনা করিতেন। এক জন গরীব ব্রাহ্মণ একদা সামান্য উপচারে জগদম্বার পূজা করিয়াছিলেন, নবমী পূজা সমাপ্ত হইবার পর পুরোহিত যখন দক্ষিণান্ত করিবার উদ্‌যোগ করেন, সেই সময় কে যেন কোথা হইতে আসিয়া ক্ষণেকের জন্য পুরোহিতের বাক্‌শক্তি হরণ করিলেন, মা যেন দক্ষিণান্তকারীর কাণে কাণে বলিলেন, "আমি যাইব না, মন্ত্রপাঠ করিও না; এই গৃহবাসী ব্রাহ্মণের ভক্তিতে আমি বাঁধা পড়িয়াছি, সম্বৎসর আমি এইখানেই থাকিব।"

প্রতিমা অবশ্য বিসর্জ্জন হইয়াছিল, কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপখানি নিত্য জম্‌জম্ করিত। কথিত আছে, আলিপনা দেওয়া চৌকির উপর পূজার ঘটটী রাখিয়া ব্রাহ্মণ প্রতিদিন পূজা করিতেন, ভোগ দিতেন, হোম করিতেন, সন্ধ্যাকালে আরতি করিতেন। দুঃখের সংসারে সুখের সঞ্চার, নিত্য নিত্য ভক্তির উৎসব।

একজন ভক্তকবি একটি গীত বাঁধিয়াছিলেন। প্রতিবর্ষে শারদীয়া দেবীর আগমনে দেবীপক্ষে আজিও হিন্দুর গৃহে গৃহে সেই গীতটি গীত হয়। গিরিরাণী মেনকা গিরিরাজকে বলিতেছেন :—

গীত।

"মনে আছে এই বাসনা।
জামাতা সহিতে, আনিব দুহিতে,
গিরিপুরে কর্‌ব শিবস্থাপনা॥
ঘর-জামাতা কোরে রাখ্‌ব কৃত্তিবাস,
গিরিপুরে কর্‌বো দ্বিতীয় কৈলাস,

হরগৌরীরূপ হের্‌বো বারোমাস,
বৎসরান্তে মাকে আন্‌তে হবে না ॥
জামাই আমার শিব, সদাই আশুতোষ,
বিল্বপত্র পেলে সদাই সন্তোষ,
বিল্বপত্র দিয়ে কর্‌বো পরিতোষ,
ভুলে রবে ভোলা, যেতে চাবে না ॥*

যে ব্রাহ্মণের গল্পটি উপরে বলা গেল, মেনকার ঐ বাসনা সেই ব্রাহ্মণটি পূর্ণ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের হৃদয়ে যথার্থ দুর্গাভক্তি আছে, তাঁহারা সাত্ত্বিকী পূজার এই অংশটির মহিমা স্মরণ করিবেন।

আমন্ত্রণ।

গিয়াছ কৈলাসেশ্বরি! কৈলাস অচলে,
কাঁদিছে কাতর বঙ্গ তব অদর্শনে।
শিখর হইতে দেবি, কৃপা-বিকাশিয়া—
সান্ত্বনি সন্তানগণে কর আশীর্ব্বাদ।
লহ মা প্রণতিসহ ভক্তি উপহার।
বৎসরান্তে দয়াময়ি! এসো মা আবার ॥

——:০:——

শ্রাদ্ধ ও পারলৌকিক অস্তিত্ব।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ।

বহুপূর্ব্বে নাস্তিক কুলচূড়ামণি চার্ব্বাক নিরাবিল শিক্ষাপ্রদ পুণ্যময় যুগে সগর্ব্বে ঘোষণা করিয়া গেলেন।

"মৃতানামপি জন্তুনাং শ্রাদ্ধং চেৎ তৃপ্তিকারকং।
নির্ব্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সংবর্দ্ধয়েচ্ছিখাং ॥"

শ্রাদ্ধ যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তিদায়ক হইতে পারে, তবে প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলে, তৈলনিষেকে কেন তাহা পুনরায় প্রজ্জলিত হয় না ? এ কথার উত্তরে প্রাচীন ঋষিগণ নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত দিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বতন আচার্য্যবর্গের যুক্তির শাণিত অসি আঘাতে, সনাতনশাস্ত্র-মাহাত্ম্যে সে নাস্তিকতা-বৃক্ষ সমূলে কর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজিকালিকার সেই চার্ব্বাকের সুলভ সংস্করণ নব্যবাবুরা পুরাতন কথারই চর্ব্বিতচর্ব্বণবৎ উদ্গার করিয়া থাকেন যে, "মরা গরু কি ঘাস খায় ?"

ইহা অবশ্য সত্য যে, প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলে আর তাহা তৈলনিষেকে জ্বলিয়া উঠে না, বা মরা গরু কখনও ঘাস খায় না। কিন্তু মৃতপিতৃগণ যে ভোজন করেন, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিলে উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দুইটি নিরর্থক হইয়া পড়ে। আমরা যেমন ভোজ্যদ্রব্য হস্তসাহায্যে মুখবিবরে তুলিয়া গলধঃকরণ করি, পরিশেষে তাহা রস, শোণিত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্ররূপে পরিণত হয়, পিতৃগণ সেরূপ ভোজন করেন না বা সে ভুক্তদ্রব্য রসাদিরূপে পরিণত হয় না, যেহেতু আমাদের মত তাঁহাদের পার্থিব শরীর নাই, স্থূলেন্দ্রিয়ও নাই।

শ্রীরামচন্দ্র যখন স্বর্গে দশরথের পদধূলি লইবার জন্য ভক্তিব্যগ্র হস্ত প্রসারিত করেন, তখন দশরথ বলেন যে, "আমরা যে ছায়াপুরুষ, আমাদের কি পার্থিব শরীর আছে যে, ধূলি লইবে ?" তবে পিতৃগণ যে ভোজন করেন, তাহা দেবগণের অমৃতভোজনের মত।

"ন বৈ দেবা অমৃতমশ্নন্তি দৃষ্ট্বা অমৃতেন তৃপ্যন্তি।"

ছান্দোগ্য উপনিষদ্।

দেবতারা অমৃত ভোজন করেন না, তবে তাহা দেখিয়া তৃপ্ত হয়েন মাত্র, তদ্রূপ পিতৃগণও শ্রাদ্ধ ভোজন করেন না, দৃষ্টি করিয়া থাকেন মাত্র এবং তাহাতেই তাঁহাদের তৃপ্তি, তাহাই তাঁহাদের অন্ন। স্বপ্নে অন্নভক্ষণ করিলে যেমন তৃপ্তি হয়, "শ্রদ্ধয়া দীয়তে যৎ তৎ শ্রাদ্ধং।" শ্রদ্ধাদত্ত শ্রাদ্ধদ্রব্য দর্শন করিয়া পিতৃগণ তদ্রূপ তৃপ্তিলাভ করেন, ইহাতে উপহাসের কোন কারণ নাই বা শ্রাদ্ধকারীর অবিশ্বাস হওয়ারও হেতু নাই।

বাহ্য বস্তুর অপেক্ষা করিলেও প্রকৃত সুখ বাহ্য বিষয়ে থাকে না। কারণ সুখ-দুঃখ অন্তঃকরণের পরিণাম, মানসিকবিকার মাত্র, বুদ্ধির অলীক অভিমান বিশেষ। পার্থিব সুখ ও দুঃখ বাহ্য বিষয়ের অপেক্ষা করিলেও অপার্থিব সুখ ও দুঃখ বাহ্য বিষয়ের অপেক্ষা করে না। তবে শ্রাদ্ধান্ন দৃষ্টি করিয়া পিতৃগণের যে

তৃপ্তি তাহাই তাঁহাদের অন্ন। শ্রাদ্ধ একটি সংস্কার বিশেষ। এই সংস্কার বশতঃ সুখ-দুঃখ। এই ভিত্তির উপরেই বেদান্তের প্রতিষ্ঠা। সংস্কার মানব-হৃদয়ে যে কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করে, তাহা অনির্ব্বাচ্য। সময়ে সময়ে জীবিত ব্যক্তির উপরও ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

উত্তরপাড়ার জমীদার রাজকৃষ্ণ বাবুর একবার বিকার হয়, সে বিকারে তিনি ঘোল খাইবার ইচ্ছা করিলে তখন কয়েকজন ব্রাহ্মণকে তাঁহার সম্মুখে ঘোল খাইতে দেওয়া হয়, তাহাতেই রাজকৃষ্ণ বাবুর ঘোল খাইবার সাধ মিটিয়াছিল।

কত লোক মৃতদেহের উপর সুরভিকুসুম অর্পণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, কত লোক কৃষ্ণচিহ্ন ধারণ করিয়া শোকব্যক্ত করে, আর আমরা মৃতের উদ্দেশ্যে অন্ন-প্রদান করিলে অন্যায় হইবে কেন? খাওয়াইয়া যে সুখ হয়, সে সুখ অপেক্ষা কি কুসুম অর্পণ অধিক কৃতজ্ঞতার পরিচায়ক? মেস্‌মিরিজেম করিয়া মৃত আত্মাকে অনর্থক আনয়ন করা অপেক্ষা,—কি সম্মুখে খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া মন্ত্র সাহায্যে আহ্বান করা ভাল নহে? মেসমেরিজমে আত্মা আইসে, আর শ্রাদ্ধে সেই কারণে পিতৃগণ আসিতে পারেন না? যাঁহারা শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহারাই জানেন, ইহাতে কত সুখ, কত তৃপ্তি। যাঁহারা নদীর জলে অবগাহন করেন নাই বা নদীর জল আস্বাদন করিবার সুযোগ পান নাই, তাঁহারা নদীর জলের গুণাগুণ কি বুঝিবেন? যখন আমরা বলি—

"অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধা কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু পরমাং গতিং॥"

যে পিতৃ সকল অগ্নিদগ্ধ বা অগ্নিদগ্ধ হয়েন নাই; এই জলদ্বারা তাঁহারা তৃপ্ত হউন, পরমগতি লাভ করুন। আবার যখন এই স্বর্গীয় মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকি :—

"যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু র্নৈবান্নসিদ্ধিঃ ন তথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ।"

যাঁহাদের পিতা, মাতা, আত্মীয়, স্বজন কেহ নাই, অন্ন পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই আমার দত্ত এই অন্নে তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করতঃ সুখময়-লোকে গমন করুন। "আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতাম্" বলিয়া যখন উপসংহার করি, সে সময়ে কি স্বর্গীয় আনন্দে অন্তরাত্মা নাচিয়া উঠে, মন বিভোর হয়, প্রাণ অজানিত তৃপ্তি-আপ্লুত হইয়া পড়ে। এ প্রকার সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, সর্ব্বভূতে সমভাব, সকল

জীবের সহিত সহানুভূতিপূর্ণ সাম্যভাব কি মহৎশিক্ষা প্রদান করে।

যখন আমরা পূত জাহ্নবী জল হস্তে লইয়া পিতৃগণ উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি প্রদান করি, মন্ত্র পড়ি—

"আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা দেবর্ষি মুনিমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃ মাতামহোদয়ঃ॥
অতীত কুল কোটীনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥"

ব্রহ্মলোক হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত যত লোক আছে, এবং দেবতা, ঋষি, পিতৃ-মাতৃগণ, মাতামহাদি সকলে তৃপ্ত হউন; আমি যতকোটি কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই অতীত কোটিকুল, সপ্তদ্বীপবাসী জীব সমুদায়, এই ভুবনত্রয় মৎপ্রদত্ত জলে তৃপ্ত হউক। সর্ব্বভূতে এই করুণ সমবেদনাপূর্ণ সাম্যভাব, এই ভূত দয়া, জগতের চির আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গরাজ্যেরপ্রোজ্জ্বল ছবি কি, নয়ন সম্মুখে দেখাইয়া দেয় না? স্বার্থত্যাগের পবিত্র প্রবাহে কি জগতের সমস্ত মালিন্য ভাসাইয়া দেয় না? আদর্শ মহাপুরুষ ভীষ্মদেবকে ব্রাহ্মণেরা যখন তর্পণ করেন, তখন কি এই মহাপুরুষ পূজাদ্বারা জাত্যভিমানী অপেক্ষা গুণীর আদর অধিক, ইহাকি প্রতিপন্ন করে না? শ্রাদ্ধের প্রত্যেক অবয়বে মাতৃপক্ষ পিতৃকুল মাতামহবংশের নামাবলী পাঠ করিতে হয়। প্রতি শুভকার্য্যের পূর্ব্বে পিতৃদেবগণের পবিত্র নামোচ্চারণ করা অপেক্ষা কি অসাড় জড় দেহের প্রস্তরময়ী প্রতিকৃতি গঠন করায় অধিক সম্মান প্রদর্শিত হয়? সে পবিত্র নামোচ্চারণে, ভোজনার্থ আমাদের সে সকরুণ আহ্বানে পিতৃদেবতার স্নেহময় আসন কি টলে না?

শ্রাদ্ধ একবার মাত্র করিলেই সন্তানের কর্ত্তব্যের সমাপ্তি হয় না। আমরা যেমন প্রত্যহ ভোজন করি, পিতৃপুরুষগণও সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রত্যহই ভোজনের ইচ্ছা করেন এবং সে আশায় আশান্বিত থাকেন। সন্তানপ্রদত্ত অন্নজলের অপেক্ষায় তাঁহাদের অপার্থিব শরীর চঞ্চল, অন্তঃকরণ আকুল হইয়া উঠে। আমাদের যেমন ষষ্ঠিদণ্ডে দিবারাত্রি, পিতৃগণের তদ্রূপ নহে,—আমাদের এক বর্ষে তাঁহাদের এক দিবস, তাই আমরা বার্ষিক শ্রাদ্ধ দ্বারা তাঁহাদের প্রাত্যাহিক ভোজনেচ্ছা পূরণ করি। পিতৃপুরুষগণ যেস্থানে বাস করেন, তাহা পিতৃলোক, যে লোক কর্ম্মদ্বারা পাওয়া যায়, "কর্ম্মনা পিতৃলোকঃ।

কেহ কেহ সামান্যমাত্র শারীরিক কষ্টের আশঙ্কায় উপবাসের কঠোরতায়

দোহাই দিয়া ধর্ম্মকার্য্য করিতে বিরত থাকেন। উপবাসের উপকারিতার কথা আর্য্যঋষিগণ শতমুখে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণ উপবাসে যে শরীর ভাল থাকে, দীর্ঘজীবন লাভ হয়, মানসিক উন্নতি ঘটে, ইহা স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যায়, গ্রহণে যে রস সঞ্চার হয় এবং সে সকল দিবসে যে উপবাস হিতকর, ইহা ইংরাজী-পণ্ডিতগণও স্বীকার করিতেছেন।

শ্রাদ্ধকারী মুণ্ডিত-মস্তকে, রুক্ষদেহে, অনাবৃত পায়ে, গলায় কাছা দিয়া যখন আপনার হতভাগ্যতার পরিচয় দিতে থাকেন, তখন সে মূর্ত্তি দেখিলে, যে সম-বেদনা ভাব জাগিয়া উঠে, শোক পরিচ্ছদে তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। এ সময়ে বিলাসিতার নাম গন্ধ নাই, ভোজনের পারিপাট্য করিতে নাই, প্রণাম-করণ বা প্রণাম গ্রহণে অধিকার নাই। পতিহীনা বিধবা যখন নিরলঙ্কার দেহে শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া, তরঙ্গিত কেশরাশি কাটিয়া ফেলিয়া, জনসাধারণের সম্মুখে দেখা দেন, তখন সে মূর্ত্তি দেখিলে কাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত না হয়? সে নিষ্কামের সজীব মূর্ত্তি। পবিত্রতার আদর্শখনি, মূর্ত্তিমতী করুণারূপে যে গৃহে বাস করেন, তথায় ধর্ম্মমাহাত্ম্য চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকে। এ মূর্ত্তির তাৎপর্য্য যাহাতে পাপস্মৃতি জাগিয়া না উঠে, যাহাতে দেবীভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে, এবং পুরুষের সতৃষ্ণ চক্ষুর বশবর্ত্তিনী হইয়া পবিত্র দেবীত্ব বিসর্জ্জন না দেয়, সেই মূর্ত্তিই পূজনীয়া।

হিন্দুর বিশ্বাস শ্রাদ্ধ না করিলে, পিতৃপুরুষগণ উপবাসী থাকেন, এবং প্রেত-যোনি হইতে মুক্ত হয়েন না। সেই পুণ্যময় ধারণার বশবর্ত্তিনী হইয়া কত সাধ্বী পতিব্রতা শোকের প্রথমাবস্থার প্রখর বেগ সহ্য করিয়া থাকেন, সন্তানেরা পিতা-মাতার শেষ মুহূর্ত্তে, যে সময় জ্ঞানলুপ্ত, বিবেকবুদ্ধি তিরোহিত, প্রাণ দিক্ বিদিক্ শূন্য হয়, সেই সময়ে সদ্গতি কামনায় সন্তানকে কঠোর আত্মসংযম শিক্ষা করিতে হয়, কি অসহনীয় ধৈর্য্য অভ্যাস করিতে হয়। গৃহিতাশৌচ পিতৃমাতৃহীন বালক, যখন গলায় কাছা বাঁধিয়া নগ্নপদে অনাবৃত মস্তকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন তাহার প্রতিপদক্ষেপে যেন শোকের করুণ রাগিনীবাজিতে থাকে, প্রতি চাহনিতে যেন সন্তানোচিত ভক্তিভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

দেহান্তে জীবের পারলৌকিক সত্তার উপর এই শ্রাদ্ধকার্য্যের প্রামাণ্য নির্ভর করিতেছে। এ স্থলে একটি বিষয় স্বতই আমাদের মনে সন্দেহ আনয়ন করে যে, "যখন জীব জলৌকার মত এক দেহ ত্যাগ করিয়া অপর দেহ আশ্রয় করে,

তখন দেহ বিমুক্ত জীবের অস্তিত্ব কোথায়?

এ কথার সন্তোষজনক উত্তর দিতে হইলে জটিল কর্ম্মপ্রণালী বুঝান ভিন্ন গত্যন্তর নাই। গীতায় ভগবান বলিয়া গিয়াছেন, "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।" কর্ম্ম তিনপ্রকার—প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ। পূর্ব্বজন্মকৃত যে কর্ম্ম বর্ত্তমান শরীরধারণের হেতু এবং যাহা ফলপ্রদানে উন্মুখ, তাহাই প্রারব্ধ। এই প্রারব্ধ কখন তাহার ফল না দেখাইয়া নিবৃত্ত হয় না, পুরুষকার ইহার একটি ফলও অন্যথা করিতে পারে না; ইহাকেই নিয়তি বলে। নৈষধকার শ্রীহর্ষদেব ইহারই মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য এই শ্লোকটি রচনা করেন :—

"অবশ্য ভব্যেষনবগ্রহ গ্রহা যয়া দিশা ধাবতি বেধসঃস্পৃহাঃ।
তৃণস্য বাত্যেব তয়ানুমন্যতে জনস্য চিত্তেন ভৃশাবশাত্মনা॥"

যাহা অবশ্যম্ভাবী, যাহার পথে কোন বিঘ্ন নাই, সেই বিধাতার ইচ্ছা যে দিক দিয়া চলিয়া যায়; মনুষ্যচিত্ত অবশ হইয়া সেই ইচ্ছার পশ্চাতে বাত্যার অনুসরণে তৃণের মত ছুটিতে থাকে। আর যাহা বর্ত্তমান শরীরে ফলদানে উন্মুখ নহে, অথচ মৃগনাভি সৌগন্ধে বস্ত্র যেমন সুরভি থাকে, তদ্রূপ জীবের সহিত অবিচ্ছেদ থাকিয়া যায়, তাহাই সঞ্চিত। জ্ঞানদ্বারা এই কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ভক্তিরসে এই কর্ম্মমালিন্য ধুইয়া যায়।

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥"

জ্ঞানাগ্নি যদি প্রারব্ধ কর্ম্ম (সঞ্চিত ক্রিয়মান ও দগ্ধ করেই) ভস্মীভূত করিতে পারিত, তবে জ্ঞানী বা ভগবদ্ভক্ত কদাপি কষ্ট পাইতেন না। বর্ত্তমান শরীরে যে সকল কর্ম্ম করা যায়, তাহাকেই ক্রিয়মান বলিয়া থাকে। ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারাই এই বিষয় বুঝাইতেছি। যেমন কোন ধানুষ্ক শরাসন হইতে বাণ নিক্ষেপের অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে সে বাণ সংহৃত করিতে পারেন, কিন্তু যে বাণ ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহার উপর আর কোন কর্ত্তৃত্বই খাটে না; তদ্রূপ জ্ঞানী বা ভক্তের ফলোন্মুখ কর্ম্মের (যাহা প্রারব্ধ) উপর কোনই কর্ত্তৃত্ব থাকে না। উষরভূমিতে বীজ পুঁতিলে যেমন তাহার অঙ্কুর জন্মে না, তদ্রূপ বর্ত্তমান জন্মকৃত কর্ম্মের বন্ধকতা (জ্ঞানী কর্ম্মী কিম্বা ভক্তের নিকট) থাকে না। এইবার প্রকৃত বিষয়ে আসা যাউক। সত্য বটে, জীব এক দেহ ত্যাগ করিয়াই অপর দেহ আশ্রয় করে। এবং ইহা বেদ, উপনিষদ্‌সিদ্ধ সত্য; কিন্তু তথাপি ইহার সর্ব্বত্র প্রমাণিকতা মানিতে পারা যায় না, কারণ সেই বেদোপনিষৎ সংহিতা পুরাণই আবার শ্রাদ্ধের

বিধান দিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র মানিতে হইলে, স্বর্গনরকাদির প্রামাণ্য থাকে না; দেহবিমুক্ত জীবের সর্ব্বজনসিদ্ধি অস্তিত্বের অপলাপ হইয়া পড়ে।

জীবগণ যে দেহান্তে দেহ আশ্রয় করেন, তাহা তাঁহাদেরই স্বকৃত কর্ম্মানুরূপ "যথা প্রজ্ঞং হি সংভবা" কিন্তু কর্ম্মানুরূপ দেহ সকলস্থলে সুলভ নহে, বলিয়াই কখন কখন জীবকে তজ্জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, উর্দ্ধ পর্য্যন্ত এক বৎসর। তবে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, বহুদিন দেহ বিমুক্ত অবস্থায়ও ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, ইহারই সংজ্ঞা প্রেত। তবে সর্ব্বত্রই না হউক, বহুস্থলে যে শ্রাদ্ধের উপকারিতা আছে, তাহা সত্য।

দেহান্তে জীবের চারিপ্রকার পরিণাম হইয়া থাকে। প্রথম মুক্তাবস্থা, অবশ্য এই অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে যে, কি সাধনার প্রয়োজন তাহা এ প্রবন্ধে প্রতিপাদ্য নহে। এরূপ ব্যক্তি সহস্রের মধ্যে একটিও পাওয়া যায় না।

"মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততে সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"
শ্রবণায়াপি বহুভির্যোন লভ্যং শৃন্বন্তোঽপি বহবোযংন বিদ্যুঃ।

এই সময়ে ইন্দ্রিয় মনে, মন প্রাণে, প্রাণ পরমাত্মায় লীন হয়; মায়া বিমুক্ত হওয়ায় বাসনার উচ্ছেদ হইয়া থাকে; জন্মকারণ কর্ম্মনিঃশেষে ক্ষয় পায়। এই সময়ের প্রথমাবস্থায় দেবগণ পর্য্যন্ত অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"তস্মোষাং ন দেবানাং প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যাঃ বিদ্যুঃ।"

দেবতারা, ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণ, এমন কি প্রকৃতি পর্য্যন্ত সে ব্যক্তির সাধনার পথে বিরুদ্ধাচরণ করেন। আবার যখন সে ব্যক্তি সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনার অভীপ্সিত ফলের অধিকারী হয়েন, তখন দেবতারা বশীভূত, ইন্দ্রিয়-মন প্রাণ নিয়ন্ত্রিত, প্রকৃতি দাসী হইয়া পড়েন। ইহাদের জন্যই শ্রাদ্ধ আবশ্যক করে না, শ্রাদ্ধ কেবল ইহাদেরই গতি সাব্যস্ত করিবার শক্তি রাখে না; ইহারা শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের অনেক উর্দ্ধে অবস্থিতি করেন। এইরূপ মুক্তপুরুষ বংশে জন্মগ্রহণ করিলে সেই বংশের উর্দ্ধতন ও অধস্তন সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া যায়।

দ্বিতীয়। স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ স্বর্গ, নরক ভোগ। এ ভোগ লিঙ্গদেহে ঘটিয়া

থাকে, —"মনোময়া ব্রহ্মলোকাঃ" সংকল্প মূলা হি ভোগাঃ *। মনোময় লোকে সংকল্পমূলক ভোগই স্বর্গসুখ।

তৃতীয়। ইহারা ক্ষুদ্র জন্তু। অনবরত সংসারাবর্ত্তে ভ্রমণ করাই ইহাদের স্বভাব। বিষ্ঠামধ্যস্থ কৃমি সকল যেমন বিষ্ঠাকেই সার মনে করে, এই জীবগণও তদ্রূপ সংসারকে ইহ-পরকাল-সর্ব্বস্ব ভাবিয়া গ্রন্থিবদ্ধ বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করিয়া থাকে।

"ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি জায়ন্তে।" (ছান্দোগ্য)

দংশ মশক, পশুপক্ষী, স্থাবরাদি জন্মগ্রহণ ইহাদের কষ্টকর পরিণাম। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ বা স্থাবরাদি জন্মে, কেবল মনুষ্য জন্মে কৃতপাপের ফলভোগ করিতে হয়; এ সকল জন্মে কর্ম্ম আর নূতন করিয়া সঞ্চিত হয় না, ক্রিয়মান কর্ম্মের কোনও অধিকার থাকে না। কথায় বলে, মহাপাপী অপেক্ষা পশু হওয়া ভাল, কারণ পশু, স্থাবরাদি জন্ম পাপের প্রায়শ্চিত্ত, ভগবদ্দত্ত কয়েদ বিশেষ। মুক্তপুরুষ ভিন্ন সকলের পক্ষেই শ্রাদ্ধ অন্নবিস্তর হিতকারী।

যাহা দেখা গেল, তাহাতে দেহ বিমুক্ত জীবের পারলৌকিক অস্তিত্ব, সেই সঙ্গে সঙ্গেই শ্রাদ্ধের প্রামাণ্য নিরূপিত হইয়া গেল, অথচ জলৌকা যেমন তৃণ হইতে তৃণান্তরে গমন করে, জীব যে তদ্রূপ দেহ হইতে দেহান্তর আশ্রয় করে, ইহাও স্থির হইল। এইরূপ সমন্বয় আমরা সময়ে সময়ে করিতে পারি না বলিয়াই শাস্ত্র বাক্যকে কখন রূপক, প্রক্ষিপ্ত, অসঙ্গত, মিথ্যা, গাঁজাখুরি ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করি। হায়রে আমাদের শিক্ষা, হায়রে কাল!

সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন যে,—

"ধর্ম্মঃ সঙ্কুচিত স্তপো বিচলিতং সত্যঞ্চ দূরং গতং।"

—:০:—

ভিক্ষুক ও মুমূর্ষু।

মায়াসরোবর কূলে বকরূপী ধর্ম্মরাজ পঞ্চপাণ্ডবকে যে কয়েকটি প্রশ্ন দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল, "তৃণ অপেক্ষা লঘু কে?"

* এ বিষয়টি "গুরু ও শিষ্য" প্রবন্ধে বুঝান হইয়াছে।

ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই, জলস্পর্শ করিবামাত্র পঞ্চত্ব পাইয়াছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দান করিয়া ঐ প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দেন যে, "যাহারা ভিখারী, তাহারা তৃণ অপেক্ষা লঘু।"

একটি সামাজিক দৃষ্টান্তদ্বারা আমরা এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝাইব।

একজন ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ শত শত দ্বারে ভিক্ষা করিয়াও পরিবার পোষণে অক্ষম হইয়াছিলেন; ব্রাহ্মণীর উপদেশে তিনি একদিন একজন দানশীল রাজার নিকট ভিক্ষা করিতে যান, সভার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমে তিনি কিন্তু একটিও কথা কহিতে পারিলেন না; তাঁহার বাক্‌রোধ হইল, সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মধারা ঝরিতে লাগিল, দেহ কম্পিত হইল, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিল। অবস্থা দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর! তুমি কাঁপিতেছ কেন? অমন করিতেছ কেন? তুমি আমার কাছে কি চাও?"

ব্রাহ্মণটি পণ্ডিত ছিলেন। মৌনভঙ্গ করিয়া তিনি অতি কষ্টে একটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। সে শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে মুমূর্ষুর যেমন কণ্ঠরোধ হয়, অবিরত ঘর্ম্ম হয়, শরীরে কম্প হয়, ঘন ঘন শ্বাস বয়, নেত্রপুট আচ্ছন্ন হয়, ভিক্ষা চাহিবার অগ্রে ভিক্ষুকের শরীরেও সেইরূপ সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমি মহারাজের নিকট ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি, দীনহীন দরিদ্র আমি, পরিবার পালনে অক্ষম, নিজের জীবন পোষণ করিতেও অসমর্থ। ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি, কিন্তু মুখ ফুটিবার অগ্রে আমার শরীরে মৃত্যু-লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

শ্লোক শ্রবণ করিয়া রাজা পরম সন্তুষ্ট হইলেন, ব্রাহ্মণের পরিবার পালনের উপযুক্ত সমুচিত বার্ষিক-বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন।

এই গল্পে এই উপদেশ পাওয়া যায় যে, ভিক্ষাবৃত্তি যারপরনাই নীচবৃত্তি। মহাজনবাক্যও আছে,—"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, কৃষিকার্য্যে তাহার অর্দ্ধেক, রাজ-সেবায় তাহারও অর্দ্ধেক, ভিক্ষায় নৈব চ নৈব চ।"

———০:*:০———

কেবল আমিই কি দুঃখী ?

এই প্রশ্ন যাহার মনে উদিত হয়, সে যদি আপনা আপনি মীমাংসা করিয়া লয় যে, সংসারে কেবল আমিই দুঃখী, তাহা হইলে তাহার মনে কোন ক্রমেই সান্ত্বনা আসিতে পারে না। আমিই দুঃখী, সংসারে আমার মত দুঃখী আর কেহ নাই, সর্ব্বদা এরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া সে লোক দিন দিন শীর্ণ হইয়া পড়ে ; বেশী দিন বাঁচিলে হয়ত পাগল হইয়া যায়, অল্পভোগী হইলে কেবল দুঃখের ভাবনা ভাবিয়া অকালে প্রাণ পরিত্যাগ করে। সংসারে সকলেই সুখী কেবল আমিই দুঃখের ভার বহন করি, আমারই কেবল অনন্ত অভাব, নিরন্তর এরূপ ভাবনা করিতে নাই ; সর্ব্বদাই সেরূপ ভাবনায় কেবল হতাশ আইসে, হতাশের সঙ্গে সঙ্গে পাপেরও উপচয় হয়। আমার অপেক্ষা আরও অধিক দুঃখী আছে, এরূপ ধারণা থাকিলে দুঃখীর মন সর্ব্বদা অপ্রসন্ন থাকে না, নিজের দুঃখ দূর করিবার আশার সঞ্চার হয়। আমার অপেক্ষা বেশী বেশী দুঃখী আছে, পরীক্ষায় ইহা জানিতে পারিয়া একটী লোক আপনাকে অপেক্ষাকৃত সুখী মনে করিয়াছিল ; প্রকৃত জীবনে এ বিষয়ের একটি উত্তম উপদেশ পূর্ণ গল্প আছে। গল্পটি এই :—

রমানাথ পাঠক এক সময়ে সঙ্গতিপন্ন লোক ছিল, বুদ্ধির দোষে অথবা গ্রহ-বৈগুণ্যে সমস্ত বিষয়সম্পত্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া বিষম দুরবস্থায় পতিত হয়।

হুতোম প্যাঁচার নক্সায় আমরা পাঠ করিয়াছি, "এক বাবুর এক গরীব মোসাহেব একদা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল, শীতকালে আমি যখন বাবুর প্রসাদী কাপড় পরিয়া, প্রসাদী শাল দোশালা উড়াইয়া বাবুর বগী গাড়ীতে বাবুর বামদিকে বুক ফুলাইয়া বসিয়া যাই তখন কোন লোকের চক্ষু আমার দিকে পড়ে না, যখন আমি বারোদ্বারী বালাপোষখানি গায়ে দিয়া খালি পায়ে রাস্তার একধার দিয়া হাঁটিয়া যাই, তখন সব শালার নজর আমার উপর পড়ে।"

এই গল্পের নায়ক রমানাথ পাঠক ঠিক সেইরূপ দুরবস্থায় পড়িয়াছিল। রমানাথ পাঠক দুরবস্থায় পড়িয়া, ছেঁড়া চটি পায়ে দিয়া নিতান্ত কুণ্ঠিত মনে রাস্তার একধার দিয়া চলিতেছিল, মনস্তাপে ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিল, "হায় ! আমি কি ছিলাম, কি হইয়াছি ! আমার তুল্য হতভাগ্য দুঃখী এ জগতে আর কেহ নাই।"

খানিক দূর যাইতে যাইতে রমানাথ দেখিল, আর একটি লোক চলিয়া যাইতেছে, তাহার এক পায়ে এক পাটি চটী আছে, সেই চটীর মস্তক ভেদ করিয়া

পাঁচটি অঙ্গুলী ঘন ঘন উঁকি মারিতেছে। তাহাকে দেখিয়া রমানাথ ভাবিল, ওঃ! তবে ত এই লোকটি আমার অপেক্ষাও দুঃখী।

আরও খানিক দূর গিয়া রমানাথ দেখিল, শূন্যপদে আর একজন চলিয়া যাইতেছে, আর তাহার পদদ্বয় ক্ষত-বিক্ষত। আরও কিছুদূর গিয়া রমানাথ দেখিতে পাইল, আর এক জনের একখানা পা নাই, লাঠির উপর ভর দিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতেছে। আরও কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া রমানাথ দেখিল, আর একজনের দুখানি কাঠের পা; কোথায় বা জুতা, কোথায় বা কি ?

তখন রমানাথের চক্ষু ফুটিল। সে তখন স্থির করিল, আছে তবে—ভগবানের বিচার আছে; সংসারে তিনি কাহাকেও অনন্ত দুঃখী করেন না; দুঃখীর চেয়েও দুঃখী আছে। এক প্রকারে আমি দুঃখ পাইতেছি, আমার দুঃখের অন্ত নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া একেবারে অবসন্ন হইলে ভগবানের কাছে অপরাধী হইতে হয়। ভগবান আমাকে হাত দিয়াছেন, পা দিয়াছেন, শক্তি দিয়াছেন, ভাগ্যদোষে অবস্থাহীন হইয়াছি, চেষ্টা করিলে আবার ভাগ্য প্রসন্ন হইতে পারে; চটী ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দু-দিন পরে ভাল জুতা হইতে পারে। এই সিদ্ধান্ত মনে আসাতে রমানাথ তদবধি নিজের অবস্থাহীনতায় অবসন্ন হইয়া রহিল না, যত্ন-পূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়া সম্ভবমত অর্থার্জ্জনে সমর্থ হইল। একবৎসরের মধ্যে তাহার অবস্থা ফিরিয়াছিল।

দুরবস্থায় পতিত হইয়া হতাশে যাঁহারা আলস্য-তরঙ্গে গা ঢালিয়া দেন তাঁহারা এই গল্পটী পাঠ করিবেন।

অস্ত্রার্থী অর্জ্জুন।

লেখক,—নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পাতালপুরী।

মুখ ও মুকুরা।

গীত।

মুখ। দানবী মায়ায়, ঢাকিব ধরায়, মানবী হৃদয়ে যাব।
দানবী প্রভাবে, চালিব মানবে, পরাভবি দেবভাব॥
কুলিশ তাড়নে তাপিত দানব,
সব কেন শব—কেন এত শব ?
জলবাসে কেন রব ? ভুবন ভুলাই, যাই যাই যাই, এখনি মেদিনী ছাব॥
অপমান, দহে প্রাণ, দানবী হৃদয়ে সহে—কত সহে—সদা দহে—
পাতাল প্রবাস, ত্যাজি জলবাস, অমর নিবাস পাব।
করিব ছলনা, হরিব বেদনা, কাঁদাব কাঁদাব দেবের ললনা,
কাঁদাব কাঁদাব কাঁদিল যেমন,—হেসে হেসে হেসে চাব॥

মুকুরা। বহুদিন পরে, ফিরে এলে ঘরে,
কেন নাথ পুনঃ যেতে চাও ?
তপ-যজ্ঞ হত, ব্রহ্মহত্যা কত,
দেবের অহিত—যথোচিত করিয়াছ প্রাণেশ্বর !
তব যশঃ গায় যত দানবমণ্ডল,
বিবঞ্চল আখণ্ডল সুরলোকে !
তবে কেন কিঙ্করীরে ত্যজিবারে চাও ?

মুখ। শুন সতি,
হলাহল বাতি—দিবারাতি জ্বলে হৃদিমাঝে॥
বজ্রাঘাতে বৃত্র যবে হইল নিধন,—
দেবগণ করিল গর্জ্জন—
বজ্রাঘাত সম বেজে আছে মোর প্রাণে।
বজ্রতেজে তেজী দেবদল,
দানব সকল অটল জলদতলে,

মহাবল কালকেয়গণ —
তমোময় পাতালে ভ্রমণ—
কতকাল করে মনোদুখে, —
এবে সবে করেছে মন্ত্রণা,—
স্বর্গপুরে শীঘ্র দিবে হানা ।
তপ, যজ্ঞ, ব্রত ভঙ্গ অর্পিত আমায়,
অসুরারিগণ হবে নিস্তেজ তাহায় ;
বজ্র হবে বিফল সমরে ।
সত্য করিয়াছি বহু বিঘ্ন অনুষ্ঠান,
তপ-যজ্ঞ, ব্রত-দান, তবু আছে ভবে ;
বিশেষতঃ ধর্ম্মঅংশে রাজা যুধিষ্ঠির—
বনবাসে—তবু করে ধর্ম্মের অর্চ্চনা ।
সঙ্গে নারী, ভাই চারিজনা,
তপনিষ্ঠ জনে জনে ।
বিশেষতঃ তৃতীয়পাণ্ডব—
আসিছে তপস্যা হেতু হিমাচল শিরে ।
তপঃ ভঙ্গ যদি তার করিবারে পারি,
দানবের করগত অমর-নগরী ।
লো সুন্দরি, তখনি হইবে ।
দেবকুল তখনি মজিবে,
পাবে দীপ্তি আসুরিক প্রভাব অমোঘ ।

মুকুরা । তৃতীয়পাণ্ডব ?　কে ? অর্জ্জুন ?
ধরি হে চরণে, যেওনা যেওনা নাথ !

মুখ ।　কেন ? কি ভয় অর্জ্জুনে ?

মুকুরা । নাথ, খাণ্ডব দাহনে—
দেখেছিলে বিক্রম তাহার,
যক্ষ, রক্ষ, দেবতা, দানব,
নাগ, বিহঙ্গম—মিলি ত্রিভুবন,
ঘোর রণ কৈল তার সনে ,

বিমুখিল একা শরজালে।
ভাবি নাথ, কি আছে কপালে—
যেতে চাও তাহার সদনে।

মুখ। নাহি ভয়,—
শুন কহি গুহ্য বিবরণ।
পূজিয়ে শঙ্কর, দানব নিকর—
মনোমত বর লভিয়াছে জনে জনে। সুলোচনে!
পাশুপত অস্ত্র বিনা দানব নির্ম্মূল—
কোনকালে না হইবে;
মহাকাল যেই অস্ত্রে নাশে ত্রিভুবন।
মম বর আরো উচ্চতর।
হর-হরি শক্তি যদি হয় সংমিলন,
যুগল প্রভাবে অস্ত্র হইলে ক্ষেপণ,
তবে তনু হবে ক্ষয়।
সম্ভব এ নয়,—সদাশিবে পূজে সবে।
এস সঙ্গে সবে, স্বচক্ষে দেখিবে—
তপভঙ্গ করি কি কৌশলে।

গীত।

আয় আয় আয়,—
চল চল উঠি, লহরমালায়, নাচিয়ে নাচিয়ে খেলি।
চাঁদ পানে চেয়ে, চাঁদের ঝলকে, উঠি, নামি, ছুলি, হেলি॥
মোহিনী দানবী বালা, মোহিনী কুসুম-মালা,
জ্বালা জুড়াব, ভাসিব ধূসর মেঘে,
ঢাকি শশী তারা ধাইব বেগে।
নন্দন-কুসুম, কুসুমের কায়, দেখিবে নয়ন মেলি॥
স্থল জল শিরে, মলয় সমীরে,
উঠিব, নামিব, ডুবিব, খেলিব;
যামিনী গমনে, দামিনীর সনে, মনোসাধে করি কেলী॥

(উভয়ের প্রস্থান।)

মহারাজা পরলোকে।

কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীকে, স্নেহাস্পদ পুত্রকন্যাগুলিকে, স্বদেশ বিদেশীয় বন্ধুবান্ধবগণকে এবং স্বীয় রাজ্যবাসী প্রজাবৃন্দকে কাঁদাইয়া অকালে পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর যখন লোকলীলা সম্বরণ করেন, নৃপেন্দ্র-নারায়ণ তখন তিন মাসের শিশু। তিনি সেই বয়সে রাজটীকা ধারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রতিনিধিগণের দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। নাবালক অবস্থায় মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে ছিলেন, সেইখানেই বিদ্যাশিক্ষা হয়। তথা হইতে বাহির হইয়া মহারাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে ব্যবস্থাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। ১লা আশ্বিন সোমবার তিনি ইংলণ্ডে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ৪৭ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল। জাতীয় প্রথানুসারে তাঁহার সৎকার হয় নাই; রাজদেহ কফিনে সংস্থাপন করিয়া বিলাতী মিলিটারী পদ্ধতি অনুসারে যথোপযুক্ত সমারোহে বিলাতেই সমাধি দেওয়া হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে তাঁহার ইংলণ্ডে যাওয়া অভ্যাস হইয়াছিল, তদ্দেশে তিনি সবিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে জি, সি, আই, উপাধি দিয়া প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের বাহিনী দলের লেপ্টেণ্যাণ্ট কর্ণেলের পদে অভিষিক্ত করেন, ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়াকে তিনি মাতৃসম্বোধন করিতেন, ইংরাজী নৃত্য সভার নৃত্য প্রণালীতে, পশু পক্ষী শীকারে, বিলিয়ার্ড খেলাতে, এবং আগ্নেয় অস্ত্রচালনে তিনি সুদক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। মহারাণী বর্ত্তমান, তাঁহার চারিটি পুত্র, তিনটি কন্যা। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর অশৌচান্তে যথোচিত সমারোহে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের অক্ষুন্ন অনুরাগ ছিল। সুযোগ্য মন্ত্রী কালিকাদাস দত্ত মহাশয়ের পরামর্শে রাজ্যমধ্যে তিনি অনেকগুলি হিতানুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। ভিক্টোরিয়াকলেজ, রেলওয়ে এবং আইনআদালতের সুশৃঙ্খলা তাহার প্রধান নিদর্শন।

সোহাগ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গুপ্ত বি, এ,

(১)

আমি শরতের
সুনীল অম্বর,
তুমি পূর্ণশশী
রবে অম্বরের।

(২)

তুমি জোছনা তটিনী-নীরে,
আমি তরঙ্গ, খেলিব সাথে ;
তরঙ্গ বহিবে ঝিকি মিকি
হাসি ধীরি ধীরি নৈশবাতে।

(৩)

তুমি ফুল্ল নলিনী, জীবনে,
হেরিবে সোহাগে মুখভাতি,
আমি গুঞ্জরি অলি, গাহিব
তব কাণে প্রেম-গীতি, মাতি।

(৪)

তুমি নব কিশলয়, ধনি,
রঞ্জিত তরুণারুণ-রাগে,
আমি প্রভাত মলয়, বহি—
চুম্বিব নবীন সোহাগে।

(৫)

হব মোরা মধুর বসন্তে,
'ক-উ' কোকিল-কল-কূজন,
হব, পুষ্পিত শ্যামল শাখে,
সুরভি ফুল মনোরঞ্জন।

(৬)

মানুষের ভালবাসা মোহ,
পরশে তুষার, দুইদিন পরে,

যাহা বলি পরম প্রণয়,
ভোগান্তে সে সুধা মনে না ধরে।

বকুলকুমারী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল,

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিবেক, চিঠি, প্রস্থান।

ইহার পর আরো তিন সপ্তাহ অতীত। প্রায় প্রতি রজনীতে পরিবারস্থ সকলের গোপনে মাখনের সহিত সৌদামিনীর সাক্ষাৎ হয়। তৃতীয় সপ্তাহের শেষ দিনের সাক্ষাতের পর সৌদামিনী বিদায় হইলে, মাখনলাল গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন।

প্রথম চিন্তা,—নূতন বাসা করিলে, সৌদামিনী আমার সঙ্গিনী হইবে, তাহা-তেও কোন সন্দেহ থাকিতেছে না; আপন মুখে যখন স্বীকার করিয়াছে, তখন আর সন্দেহ থাকিবার স্থান কোথা? নিঃসন্দেহে আশার সুসার।

দ্বিতীয় চিন্তা,—সৌদামিনী কি অসতী? না, তাহা কখনই না; তাদৃশী কামিনীর এমন সরল মাধুরী থাকিতে পারে না; লক্ষণ দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতেছি আমার ভাগ্যক্রমে আমারি সাক্ষাতে লজ্জাশীলা পবিত্র লজ্জার গুণ্ঠন অল্পে অল্পে বিমুক্ত হইয়াছে। আমার সমক্ষেই প্রথম পরীক্ষা।

তৃতীয় চিন্তা,—আমি এখন করি কি? বকুলকুমারীকে হৃদয়-বেদিকা হইতে বিসর্জ্জন দিয়াছি, তাহাকে এ হৃদয়ে আর পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব, তেমন আশা রাখি না; সৌদামিনীকে লইয়া সুখী হইতে পারিব, ক্ষণে ক্ষণে এমন আশার সঞ্চার হইতেছে, কিন্তু সেরূপ সুখের সংযোগ হইবার সম্ভাবনা আছে কি?

চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বিবেকের উদয়। মাখনলাল ভাবিলেন, এ বাড়ীতে থাকিয়া সে সুখের সংযোগ কি প্রকারে হয়? স্বতন্ত্র বাসা করিলেই বা কি সুখ? সৌদামিনী রামজীবন বাবুর পালিতা ও আশ্রিতা, রামজীবন বাবু আমারও আশ্রয়দাতা; আমি যদি সৌদামিনীকে আপন কর্ত্তৃত্বে আনয়ন করি, রামজীবন বাবু কি ভাবিবেন? কথা অপ্রকাশ থাকিবে না; পরিবারের লোকেরাই বা কি মনে করিবেন? তাঁহাদের কাছে, আমি অকৃতজ্ঞ হইব, অকৃতজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, ধর্ম্মের কাছে অবশ্য অপরাধী হইতে হইবে; না—তাহা আমি পারিব না। দূর হোক, সৌদামিনীর আশা পরিত্যাগ করিব; ধর্ম্মের পবিত্র মৃণাল হইতে সেই নির্ম্মল পদ্মফুলটীকে বিচ্যুৎ করিব না; কলিকাতা বড় বিষম স্থান, নানাপ্রলোভনে এ সহরে লোকের সাধু চরিত্র অতি অল্প দিনের মধ্যেই অসাধুভাবে কলুষিত হয়। কেন আমার সৌদামিনীকে নির্জ্জনে দেখিবার সাধ হইয়াছিল? নির্জ্জনে কেন আমি তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলাম? কেন আমি তাঁহার কর্ণে প্রেমানুরাগের কথা তুলিয়া দিয়াছিলাম? একটা প্রণয়ে নিরাস হইয়া দ্বিতীয় প্রণয়ের আশায় উদাস মনে কলিকাতায় বাস করা বিড়ম্বনা মাত্র, সেই বিড়ম্বনাই নূতন নূতন প্রলোভনের আকর্ষণ আনয়ন করে। প্রলোভনপূর্ণ কলিকাতাই অবিবেকী চিত্তকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া বিপথে লইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় কলিকাতা পরিত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়।

চিন্তায় চিন্তায় সে রাত্রে মাখনলালের ভালরূপ নিদ্রা হইল না, অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি জাগরণ করিলেন; উষার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ তন্দ্রা আসিয়াছিল, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তন্দ্রা ভঙ্গ।

যথাসময়ে তিনি আফিসে গেলেন, কাজকর্ম্ম ভাল লাগিল না, সর্ব্বক্ষণ বিমনা; সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাটীতে আসিলেন, সন্ধ্যার সময় রামজীবন বাবুর সঙ্গে ছুটী চারিটী ছাড়া ছাড়া কথা হইল, রামজীবন বাবু বুঝিলেন, মাখন অন্যমনস্ক; কারণ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, ক্ষণকাল উভয়ে নিস্তব্ধ। আহারের সময় হইল, আহার করিয়া মাখনলাল আপন শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। কর্ত্তা আর সে রাত্রে বাহিরে আসিলেন না।

গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া মাখনলাল একখানি চিঠি লিখিলেন, রামজীবন বাবুর নামে শিরোনাম দিলেন, গালা দিয়া আঁটিয়া রামজীবন বাবুর টেবিলের

উপর রাখিলেন। পূর্ব্বরাত্রের ন্যায় সে রাত্রেও মাখনলালের প্রায় জাগরণ; উষা আগমনের পূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ করিয়া ব্যাগটী ছড়িগাছটী লইয়া তিনি গৃহ হইতে বাহির হইলেন; বাটীর কেহই তখন উঠে নাই; নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া, ধীরে ধীরে সদর দরজা খুলিয়া তিনি বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন, কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। আফিসে মাসে মাসে তিনি যে বেতন পাইয়াছিলেন, সেই টাকাগুলি তাঁহার সঙ্গে রহিল।

—:•:—

গীত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মিত্র।

ঝিঁঝিট,—খাম্বাজ।

১নং

কে বলে শ্মশানে মাগো হও তুমি ভয়ঙ্করা।
হাসিমুখে সদাই আমায়, কোলে করে আছ তারা॥
আমি কাঁদি যখন নিরাশ মনে, কত কথা কও কানে কানে,
তোমার মাভৈঃ রব শুনলে আমি হই না গো মা দিশেহারা॥
আমি যেতে চাই তোমায় ছেড়ে, তুমি দুঃখ দিয়ে ফিরাও মোরে,
কাঁদাইয়ে হাসাও আবার, একি মা তোর প্রেমের ধারা॥
দুঃখেতে পাই যদি তোরে, কেন হাসাও আমায় বারে বারে,
এবার অভয় পদ বুকে ধরে, কেঁদে কেঁদে হব সারা॥

২নং

বারে বারে ভবের খেলায়, জেনেছি মা ভবানী।
তুমি মাত্র সার ভবে, আর কিছু নাই জননী॥

তুমি সারাৎসারা, পরাৎপরা, দুঃখ ভয় হারিণী :--
তাই ভবের বুকে দাঁড়িয়েছ মা, হয়ে বিশ্বরূপিণী ॥
বড় দাগা পেয়েছি আমি, জান সকল অন্তর্যামী,
আর কি দাগা পাব আমি, শুনেছি যে অভয়বাণী ॥
অভয় পদ করেছি সার, ভয় কি আমি রাখি আর,
এবার মোহিত হয়ে বর চেয়ে, দেখে তোমায় মনমোহিনী ॥
যত ভালবাসা হারাই, ততই মা ভালবাসা পাই,
এখন সকল ভালবাসা নিয়ে, তরাও আমায় তারিণী ॥

৩নং

পাগলা ভোলা শিবের মতন, তোর কালরূপে কে মজেছিল ?
চরণযুগল বুকে ধরে, শব হয়ে সে পড়েছিল ॥
শিব যখন শব হয়ে, ধরাতলে থাকেন শুয়ে,
ব্রহ্মময়ী তখন উদয় হয়ে, হৃদপদ্ম তার কর আলো ॥
আমি আঁধার কোণে যখন বসি, দেখি উজল কালশশী,
মাভৈ মাভৈ শুনে আমার জলে উঠে আশার আলো ॥
আমার যখন সব করলে কালো, লয়ে যাও আমায় যথায় আলো,
এবার কাল চরণ ধরে শিরে, যাব আমি যথায় আলো ॥

৪নং

হেসে হেসে বেড়াই যখন, দেখি না মা তোমায় তখন।
খেলা লয়ে ভুলে থাকি, ঠিক যেন বালকের মতন ॥
খেলনাগুলি ভেঙ্গে গেলে, কেঁদে উঠি মা মা বলে,
মা আমারে কোলে তুলে, নয়নের জল কর মোচন :—
বুকে ধরে আদর করে, কত বুঝাও তারস্বরে,
ভাবনা কিরে বোকা ছেলে, আবার খেলনা দিব নূতন নূতন ॥

তোর ও খেলনা চাইনা আর, তারা কাঁদাবে আমায় আবার,
এবার প্রেমের খেলায় খেলাও আমায়, দিয়ে তোর রাঙাচরণ॥

সমালোচনা।

মানবচিত্র।—জীবন-সংগ্রাম প্রণেতা শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য পাঁচসিকা।

একটি শিশুপুত্র-শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া গ্রন্থকার মহাশয় এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। পুত্রশোকে সকলেই কাতর হয়, তবে ইহার একটু বিশেষত্ব আছে, যাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিবেন, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিবেন। নিজের উক্তি-স্থলে স্নেহাস্পদ পিতা স্পষ্টই বলিয়াছেন, দুঃসহ-শোকাবেগে উন্মত্তবৎ হইয়া তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন, আত্মঘাতি হইবার ইচ্ছাও হইয়াছিল। তত শোকপ্রবাহের মধ্যেও তিনি একটি প্রবোধের সূত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শোকোপহত চিত্তের কল্পনায় জাগ্রত অবস্থাতেই হউক, কিংবা স্বপ্নাবস্থাতেই হউক, মৃত শিশুটিকে তিনি দেখিতে পাইতেন, শিশু তাঁহাকে উপদেশ দিত, "ঐশী শক্তিতে জীবের জন্ম, ঐশী শক্তির ইচ্ছাতেই মানবের মৃত্যু। মানবের শক্তি, সাধ্য অথবা ইচ্ছার সহিত ইহার কোন সম্পর্কই নাই। চিকিৎসা-জ্ঞান গর্ব্বিত চিকিৎসকেরা মানুষকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করেন, তাহা অতি তুচ্ছ; বাঁচাইবার শক্তি চিকিৎসকের নাই, কাহারও নাই, সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা। বিধাতা আমাকে কেনই বা পুত্র দিয়াছিলেন, কেনই বা অকালে হরিয়া লইলেন, এ প্রশ্নের উত্তর বিধাতা না হইলে আর কেহই দিতে পারেন না; অতএব শোক করা বৃথা।" মৃতশিশু তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিল, "তুমি আমার দেহকে ভালবাসিতে না, আত্মাকে ভালবাসিতে। দেহকে ভালবাসিলে সে দেহ কদাচ তুমি শ্মশানে ভস্ম করিতে পারিতে না। এখন বুঝিয়া দেখ, আত্মা অবিনাশী, আত্মার মৃত্যু নাই, তবে কাহার জন্য শোক কর?"

শোকের উচ্ছ্বাস ও স্বপ্নদর্শন বৃত্তান্ত গ্রন্থকার মহাশয় যে ভাবে বর্ণন করিয়া-

ছেন, তাহা পাঠকের মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ হয়। বিষম শোকের অবস্থায় ঐ প্রকারের স্বপ্ন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। শোকাতুর পিতা স্বপ্নে একরাত্রে এক বিরাট মহাপুরুষের সূক্ষ্মদেহের সহিত মৃত-শিশুর সূক্ষ্ম আত্মা দর্শন করেন, সেই দর্শনের ফলে তাঁহার তপ্ত হৃদয়ে প্রবোধ আইসে, শোকের অনেকটা লাঘব হয়।

শোকের প্রসঙ্গে গ্রন্থকার নিজ জীবনের কতক কতক পরিচয় দিয়াছেন। সে পরিচয়টি পাঠকগণের উপেক্ষণীয় হইবে না। একাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার পিতার ইচ্ছায় একটি ক্ষুদ্র বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সুযোগ পাইয়া তদুপলক্ষে তিনি এ দেশের বাল্যবিবাহের দোষগুণের কিঞ্চিৎ বিচার করিয়াছেন; বিচারে দেখাইয়াছেন, বাল্যবিবাহে দোষের অপেক্ষা গুণের ভাগ অধিক। সে বিচারের যুক্তির বল কতদূর, পাঠকেরা পুস্তকের যথাস্থানে তাহা দেখিবেন।

স্বীয় জীবনীর পোষকে গ্রন্থকারমহাশয় কয়েকটি গল্পের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া মানবচিত্রে বর্ণ ফলাইয়াছেন। দৃষ্টান্ত আমাদের বাঙ্গালাদেশের পক্ষে ফলপ্রদ; পৃথিবীর মানবচিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা না করিয়া চিত্রকরমহাশয় দেশের চিত্র দেশী পাঠকের চক্ষের কাছে ধরিয়াছেন; শেষে দেখাইয়াছেন, সংসারে সুখ নাই, সংসারে সুখী নাই, সংসারে দুশ্চিন্তাশূন্য লোক নাই। দারিদ্র্য পীড়নে দরিদ্রেরা দুঃখ পায়, ইহা আমরা বুঝিতেছি, কিন্তু রাজা মহারাজা প্রভৃতি মহামান্য ব্যক্তিগণ ফুল্লবদনে প্রচুর ঐশ্বর্য্যের উপর আধিপত্য করিতেছেন, তাঁহাদেরও দুঃখ অনেক। সাধারণ সংসারী লোক অপেক্ষা, অন্নহীন দরিদ্র লোক অপেক্ষা, তাঁহাদের দুঃখও অধিক, দুশ্চিন্তাও অধিক।

এখানি ভীষণ শোকাবাহক পুস্তক; ইহা পাঠ করিয়া আমরা অন্তরে অন্তরে কাতর হইয়াছি সত্য, কিন্তু ইহার লিপিকৌশল দর্শনে যারপরনাই সন্তোষলাভ করিয়াছি। বাবু রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সাহিত্য সংসারে অপরিচিত নহেন, তাঁহার "জীবন-সংগ্রাম" সাধারণ্যে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এই খানির প্রচারেও গ্রন্থকারের খ্যাতি প্রদীপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

এ পুস্তকখানি বহুগুণসম্পন্ন হইয়াছে, এই কথা বলাই উচিত। পাঠকমহাশয়েরা ইহা অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে বৃথা সময় নষ্ট হইবে না।

শৈব্যা।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য দেড় টাকা।

সূর্য্যবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের ইতিহাস রামায়ণ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেই ইতিহাসের প্রারম্ভে নূতন প্রকার কল্পনা যোজনা করিয়া গল্পটি সুসজ্জিত করিয়াছেন। দেবসভায় অপ্সরাগণের নৃত্য হইতেছিল, হঠাৎ পঞ্চ অপ্সরার তালভঙ্গ হওয়াতে দেবরাজ ইন্দ্র কুপিত হইয়া তাহাদিগকে শাপ দেন, তাহারা মানবীরূপে নরলোকে বিশ্বামিত্রের তপোবনে আসিয়া ক্রীড়া করিতে থাকে, তাহাদের বিলাসে তপোবন শ্রীভ্রষ্ট হওয়াতে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে লতাপাশে বন্দিনী হইবার অভিসম্পাত করেন, পঞ্চ-অপ্সরা বন্দিনী হয়; রাজা হরিশ্চন্দ্র দৈবযোগে তথায় উপস্থিত হইয়া তাহা-দিগকে মুক্ত করিয়া দেন। বিশ্বামিত্র যোগবলে তাহা অবগত হইয়া অযোধ্যা নগরীতে আগমনপূর্ব্বক সিংহাসনাধিষ্ঠিত রাজা হরিশ্চন্দ্রকে বলেন, "তুমি আমার বিধানানুসারে বন্দিনী অপ্সরাগণকে মুক্ত করিয়া দিয়াছ, তোমাকে তাহার উপযুক্ত দণ্ডভোগ করিতে হইবে।" অজ্ঞাতকৃত অপরাধ বলিয়া হরিশ্চন্দ্র ক্ষমা চাহেন, বিশ্বামিত্র বলেন, "যদি তুমি অজ্ঞান, তবে তুমি এই রাজদণ্ড গ্রহণের উপযুক্ত নও, এই রাজ্য আমাকে দান কর।" সত্যসন্ধ ধর্ম্মপরায়ণ রাজা হরিশ্চন্দ্র বিনা বাক্যব্যয়ে বিশ্বামিত্রকে রাজ্যসম্পদদান করিয়া মহিষী শৈব্যা ও পুত্র রোহিতাশ্বের সহিত দীনবেশে পুরী হইতে বহির্গত হন। তাহার পর যাহা যাহা হইয়াছিল, পুরাণ পাঠকেরা তাহা পরিজ্ঞাত আছেন।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত আছেন, তাঁহার "সাবিত্রী-সত্যবান" গত বৎসর আমাদের সাহিত্য সমাজকে স্বর্গীয় অমৃতদান করিয়াছে। বর্ত্তমান পুস্তকখানি তাঁহার মধুময়ী লেখনী প্রসূত। প্রকৃতি বর্ণনে, ভাবরস প্রকাশে এবং ভাষালালিত্যে সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়। রোহিতাশ্বের জন্য বিচিত্র মৃগশিশু আনয়নের উদ্দেশে মহিষীর অনুরোধে রাজা হরিশ্চন্দ্র মৃগয়াবেশে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করেন, প্রত্যাগমনে বিলম্ব হওয়াতে তাঁহার অদর্শনে পতিব্রতা শৈব্যাসুন্দরীর চিন্তাকুল বিমুগ্ধভাব সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; বিশ্বা-মিত্রের ছলনায় স্ত্রীপুত্র বিক্রয় ও স্বয়ং চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার বৃত্তান্ত রাজার বদান্যতার অত্যুজ্জ্বল প্রমাণ, সর্পাঘাতে বালক রোহিতাশ্বের মৃত্যু, মৃতপুত্র কোলে করিয়া শোকাতুরা জননীর শ্মশানে অবস্থিতি এবং শ্মশানে রাজা হরিশ্চন্দ্রের

স্নানভিক্ষা, আদ্যোপান্ত করুণরসে পরিপূর্ণ; বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেই করুণরসের প্রস্রবণ ছুটাইয়া নিতান্ত পাষাণ হৃদয়কেও গলাইয়া দিয়াছেন। ভাষার অঙ্গরাগ সাধনে তিনি অপূর্ব্ব ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন।

এই পুস্তকের ভূমিকাটি পাঠ করিয়া আমরা পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ষ্টার-থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু সেই ভূমিকাটি লিখিয়া দিয়াছেন। আধুনিক বাঙ্গালা পুস্তক সমূহে ইংরাজীর গন্ধ আছে, এ পুস্তকে তাহা নাই, ইহাই অমৃতবাবুর উক্তি। উক্তিপোষকতায় তিনি লিখিয়াছেন, "হবিষ্যান্নে পলাণ্ডু রসের গন্ধ।" সত্য কি, অমৃতবাবু হবিষ্যান্নে পলাণ্ডুর গন্ধ পাইয়াছেন? উপন্যাসাদি পুস্তকে এ কথাটা অনেকাংশে সত্য হইতে পারে, কিন্তু আমাদের অনুবাদিত পুরাণাদি গ্রন্থে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার ব্যতিক্রম ঘটে নাই, ইহা অবশ্যই অমৃতবাবুর জানা আছে। সুরেন্দ্রবাবুর বঙ্গভাষা নির্ম্মল ও প্রাঞ্জল ইহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। অমৃতবাবুর বাক্যপ্রমাণে সুরেন্দ্র-বাবু অবশ্যই ধন্য।

এই পুস্তকে কয়েকখানি অপূর্ব্ব সুরঞ্জিত চিত্র আছে, চিত্রগুলি বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত। পুষ্প অপ্সরা লতাপাশে বন্দিনী এবং মৃতপুত্র কোলে শ্মশানে শৈব্যা এই দুইখানি চিত্র অতুলনীয়। ভাষা পারিপাট্যের সহিত চিত্র, কাগজ, মুদ্রাঙ্কন ও বাঁধাই, সমস্তই অতি সুন্দর। এতাদৃশ সুন্দর পুস্তকের মূল্য দেড়টাকা মাত্র, ইহা আশাতীত সুলভ।

পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ।—শ্রীযুক্ত ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এল, এম, এস, প্রণীত।

এই খণ্ডে ভৈষজ্যাধিকার বর্ণিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ অতিপ্রাচীন শাস্ত্র, ইহার ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, মানবসৃষ্টির পূর্ব্বে ইহার প্রণয়ন; এই আয়ুর্ব্বেদ পঞ্চমবেদ নামে বিখ্যাত। প্রাচীন চীন ও প্রাচীন গ্রীক্ ভৈষজ্য বিজ্ঞান অপেক্ষা ইহা বহু প্রাচীন। সমগ্র আয়ুর্ব্বেদের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে মানবপ্রকৃতি ও নিরাময়মূলক ভৈষজ্য-তত্ত্বের জ্ঞানলাভ হয়। পূর্ণাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদের পূর্ণতা দর্শন করিলে আমরা অধিকতর সুখী হইব, এতদ্দ্বারা ভারত-বাসীগণের যথেষ্ট উপকার হইবে।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৯শ বর্ষ। | ১৩১৮ সাল, কার্ত্তিক। | ৭ম সংখ্যা।

শ্বেতকেতু।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ।

শ্বেতকেতু যখন পিতার মুখে "তত্ত্বমসি তুমিই সেই ব্রহ্ম", এই কথা শুনিলেন, যখন আবাল্য-সংস্কার, শাস্ত্রমত, আপনার বিবেক বুদ্ধির সিদ্ধান্ত বুঝিলেন, যখন দেখিলেন, একদিকে পিতার এই অভিনব তত্ত্ব, অপরদিকে আপনার শাস্ত্রজ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধি, তখন অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া শ্বেতকেতু পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ! একি কথা! আপনি অপূর্ব্ব জ্ঞানের কথা আরম্ভ করিয়া পরিশেষে এই শাস্ত্রবিরোধী, বুদ্ধির অগম্য "তত্ত্বমসি তুমিই সেই ব্রহ্ম" কেন বলি-লেন? আমি আলোকপথে যাইতে যাইতে সম্মুখে যে অন্ধকারের করাল ছায়া

দেখিতে পাইতেছি ; সম্মুখে তীর পাইব ভাবিতেছিলাম, কিন্তু কল্লোলবিক্ষুব্ধ সাগরের ক্ষীণ সীমাও যে দেখিতে পাইতেছি না।"

আরুণী।—বুদ্ধির অগম্য হয় হউক, শাস্ত্রবিরোধী কেন বলিলে ?

শ্বেত।—সকল শাস্ত্রেই ত বলে, এই পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য সমাকীর্ণ এই নদ, নদী, গিরি, কানন, সমুপেত সচরাচর জগৎ একমাত্র পরমকারণ পরমেশ্বরের সৃষ্টিকার্য্য মাত্র। সকল শাস্ত্রেরই ত মত যে, পরমেশ্বরের আরাধনা পরমপুরুষার্থ ; সকল ধর্ম্মেরই ত সার উদ্দেশ্য পরমেশ্বরে পরিণতি। তবে আমার প্রশ্ন অযৌক্তিক হইবে কেন ? আমি যদি ব্রহ্ম, জীব যদি ব্রহ্ম, তবে কেন জীব আপনার উপাসনা করিবে ? কেন স্রষ্টার অনুশাসন মানিবে ? বলুন দেখি, তাহা হইলে আপনার এই নূতনমত সকল শাস্ত্র, সকল ধর্ম্ম, সকল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হইল কি না ?

আরুণি।—সৃষ্টি কাহাকে বলে ? কুম্ভকার যে ঘট প্রস্তুত করে, তন্তুবায় যে বস্ত্র বয়ন করে তাহাও সৃষ্টি। ঊর্ণনাভ যে আপনার শরীর হইতে সূত্র বাহির করিয়া তাহাতে কারুকার্য্যময় জাল প্রস্তুত করে, আর কবি যে আপনার মস্তিষ্ক হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া কল্পনার সাহার্য্যে ভাষা উপাদানে বিচিত্র কাব্যসৌধ নির্ম্মাণ করেন, তাহাও সৃষ্টি ; আবার মায়াবী যে, বিনা উপাদানে কেবলমাত্র বিদ্যা, বুদ্ধিকৌশলে ও মায়ার সাহায্যে অলৌকিক দৃশ্যপ্রপঞ্চ দেখাইয়া থাকে, তাহাও সৃষ্টি। আচ্ছা, বল দেখি, কুম্ভকার যে মৃত্তিকা হইতে ঘট প্রস্তুত করে, তন্তুবায় যে সূত্রদ্বারা বস্ত্র বয়ন করে, সে ঘট বা সে বস্ত্র কি, তাহাদের কারণ মৃত্তিকা ও সূত্র হইতে স্বতন্ত্র, না তাহাদের অবস্থান্তর মাত্র ?

শ্বেত।—স্বতন্ত্রই বলিব, যেহেতু একটী কারণ, অপরটী কার্য্য ; যখন উভয়ের আকৃতি ও ক্রিয়াগত পার্থক্য দেখা যাইতেছে, ঘটের কার্য্য মৃত্তিকার দ্বারা সাধিত হয় না, বা বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা সূত্রদ্বারা সিদ্ধ হয় না, তবে স্বতন্ত্র হইবে না কেন ?

আরুণি।—কারণ ও কার্য্য প্রকৃত বিভিন্ন নহে। দুইয়ের উপাদান এক। আর মৃত্তিকা ও তন্তু ছাড়িয়া দিয়া স্বতন্ত্রভাবে কল্পনায় ঘট ও বস্ত্র আনয়ন করা যায় না ; মৃত্তিকা ও তন্তুর অস্তিত্ব, যখন ঘট ও বস্ত্রের অস্তিত্ব বুঝাইয়া দেয়, তখন কি করিয়া বলিবে, মৃত্তিকা ও ঘট, তন্তু ও বস্ত্র স্বতন্ত্র ? সর্পের কুণ্ডলিত

অবস্থা দেখিয়া কি বলিবে যে, কুণ্ডলিত সর্প ও দীর্ঘ সর্প স্বতন্ত্র? বিভিন্ন-প্রকার অবস্থা স্বতন্ত্রতার কারণ নহে, ইহা অবস্থান্তর মাত্র।

শ্বেত।—অবস্থান্তর বলিলে ইহাই ত বুঝিয়া থাকি যে, পূর্ব্ব অবস্থার ধ্বংস ও নূতন পৃথক অবস্থার উৎপত্তি। বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি, বীজ অবস্থার ধ্বংস হইয়াই অঙ্কুর অবস্থার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাই ত বীজের অবস্থান্তর, বীজই অঙ্কুর এ কথা যখন কেহ বলে না, তখন উভয়ে স্বতন্ত্র না বলিব কেন?

আরুণি।—অবস্থান্তর বলিলে যে, পূর্ব্বাবস্থার ধ্বংস ও পৃথক্ অবস্থার উৎপত্তি হইবে, এমত নহে; বীজ অবস্থার ধ্বংস হইয়া অঙ্কুর অবস্থার উৎপত্তি হয় না; বীজের যে উপাদান, অঙ্কুরেরও সেই সেই উপাদান; বীজাবয়ব কি অঙ্কুরাবয়ব হইতে পৃথক্? বীজাবয়বের ধ্বংস হয় না, স্বরূপের পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। বীজে যাহা ছিল, তাহা যদি অঙ্কুরে না থাকে, বটবৃক্ষের অঙ্কুরে যদি বীজের সত্তা নাই থাকিবে, তবে বটবৃক্ষ জন্মে কেন? আম্রবীজ হইতে বটবৃক্ষ জন্মে না কেন? বীজই অঙ্কুর, তাহাই বৃক্ষাকারে পরিণত হইতে থাকে; তবে কি করিয়া স্বতন্ত্র বলিবে?

শ্বেত।—মানিলাম, কিন্তু অবস্থান্তরে বস্তু পূর্ব্ববৎ থাকে না, স্বরূপেরও যখন পরিবর্ত্তন হয়, তখন ইহা বিক্রিয়ার মধ্যে পড়িল। তবে এই যে জগৎব্রহ্মাণ্ড সেই একমাত্র সৎপদার্থের অবস্থান্তর, ইহা বলিলেও বিক্রিয়াই স্বীকার করা হইল; তবে জগদোৎপত্তির পরেও সেই একমাত্র অদ্বিতীয় সৎপদার্থই আছেন, একথা আর বলা চলে না।

আরুণি।—বাস্তবিক মৃত্তিকা হইতে যেরূপ ঘট উৎপন্ন হয়, সেরূপ ভাবে জগৎ উৎপন্ন হইতে পারে না; অদ্বিতীয়, সৎপদার্থ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার; তাহার আবার পূর্ব্বাবস্থা পৃথক অবস্থা কি যে, বিক্রিয়ারূপ অবস্থান্তর হইবে? যখন তাহা হইতে স্বতন্ত্র কোনও বস্তু নাই যে, তাহার আকার ধারণ করিবে। এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, মৃত্তিকা ঘটরূপে পরিণত হইয়াও "মৃত্তিকা" এই জ্ঞানের অপলাপ করে না; এবং স্বতন্ত্র একটি পৃথক বস্তুরূপেও পরিণত হয় না। এই অদ্বিতীয় সৎপদার্থ জগৎ উৎপাদন করিয়াছে, ইহার অর্থ এই যে, সৎপদার্থই জগৎব্রহ্মাণ্ডের আকার ধারণ করিয়াছে, অথচ বিক্রিয়ারূপ অবস্থান্তর না হইয়া বিবর্ত্তরূপ অবস্থান্তর হই-

তেছে। এ অবস্থান্তর অবস্থান্তরের আভাস মাত্র।

শ্বেত।—অবস্থান্তরের আভাস, অথচ প্রকৃত অবস্থান্তর নহে, ইহার তাৎপর্য্য কি?

আরুণি।—মনে কর, একজন তোমার পদদ্বয় দৃঢ়বদ্ধ করিয়া রাখিল, তুমি চলিয়া যাইতে পারিলে না; আবার যদি কেহ তোমাকে রজ্জু দিয়া প্রকৃত বদ্ধ না করিয়াও এমন বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারে যে, তুমি বদ্ধ হইয়াছ, তাহা হইলে তুমি চলিয়া যাইতে পারিবে না। মনের সঙ্কল্প না হইলে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সম্বন্ধ ঘটে না। স্বপ্নে চক্ষু দেখে না, কর্ণ শুনে না, জিহ্বা আস্বাদন করে না, অথচ ভয়ে স্বেদনির্গম ও আনন্দে পুলক সঞ্চার প্রভৃতি কার্য্য হইতে দেখা যায়। মন ও ইন্দ্রিয় পরস্পর কার্য্যকারণ (বীজাঙ্কুর বৎ)। চিত্রকর চিত্র অঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে মনে সংকল্প করিয়া লয় ও পরে অঙ্কিত করে; (অবশ্য সে সংকল্প ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় সম্বন্ধের অপেক্ষা করে)। দেখা গেল যে, স্থূল ইন্দ্রিয় না থাকিলেও মনই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্থূল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করে। অন্ধ দেখিতে পায় না, বধির শুনিতে পায় না, তথাপি এমনও শুনিতে পাওয়া যায় যে, অন্ধ স্বপ্নে কোন দিব্য-মূর্ত্তি দেখিল, বধির সুমধুর সঙ্গীতালাপ শুনিল, পূর্ব্বজন্মের অনুভূত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ইহজন্মে প্রকাশ পাইল। যৌবনকালে কোন ব্যক্তি অন্ধ হইলে সে যেমন বাল্যানুভূত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য মনের দ্বারাই সম্পন্ন করে, তবে পূর্ব্ব জন্মানুভূত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য মন কেন না করিবে? তবেই দেখ, তোমাকে কেহ বদ্ধ না করিয়াও যদি এমন বিশ্বাস করাইয়া দিতে পারে যে, বদ্ধ করিয়াছে, তাহা হইলে তুমি বদ্ধতুল্য হইবে। এখানে বুঝিতে হইবে, কোন সময়ে ত্বগিন্দ্রিয় সাহায্যে তুমি বন্ধনজনিত কষ্টভোগ করিয়াছিলে, এখানে মনই ত্বগিন্দ্রিয়ের কার্য্য সমাধা করিল। এই যে কার্য্য, ইহাই অবস্থান্তরের আভাষ, ইহা বিক্রিয়া নহে। তবে স্বরূপতঃ দুইটি পৃথক হইলেও, কার্য্যে একই প্রকার ফল উৎপন্ন করে, বলিয়াই দুইটিকে অবস্থান্তর পদে বুঝান যাইতে পারে। অদ্বিতীয় সৎপদার্থ যে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইয়াছে, এখানে প্রকৃত অবস্থান্তর হইতে পারে না, হইলে অদ্বিতীয়, নিরবয়ব, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সৎপদার্থ, বহু সাবয়ব, সগুণ হইয়া পড়ে। আকাশ খণ্ডশঃ বিভক্ত (ঘটাকাশ, পটাকাশ, গৃহাকাশ, অন্তরাকাশ, ইত্যাদি) হইয়াও কি অবস্থান্তর হয়।

অনেকভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়? তবে সচ্চিদানন্দ নির্ব্বিশেষে, অপরিচ্ছিন্ন সৎপদার্থের অবস্থান্তররূপ বিক্রিয়া কখনই সম্ভব নহে।

শ্বেত।—এই আত্মা যখন কোটি কোটি জীব হইয়া এই সংসারপাশে বদ্ধ হইতেছেন, অথচ তখন বিভক্ত হয়েন না, ইহা কিরূপ সম্ভব?

আরুণি।—কেন, মণিময় গৃহে তুমি যদি প্রবেশ কর, তবে দেখিবে; স্বচ্ছমণির ভিত্তি গাত্রে তোমার মূর্ত্তি সহস্র সহস্র প্রতিফলিত হইতেছে। তুমি চলিতে থাক, তোমার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তিও চলিতে থাকিবে। প্রতিধ্বনি যখন পর্ব্বতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে বিচরণ করে, তখন তাহা চতুর্দ্দিকস্থ লোকগণের নিকট নানা স্বর বলিয়া বোধ হয় না কি? কিম্বা মায়াবী যখন ক্রীড়াস্থলে বহুজন সমক্ষে, আপনাকে কখন সম্মুখে কখন পশ্চাতে, শূন্যে, বৃক্ষশাখায় দেখাইয়া থাকে, কখন বা বহু পুরুষ এই প্রত্যয় করাইয়া থাকে। তখন কি সে ব্যক্তি একাই অনেক, এ বোধ জন্মাইয়া দেয় না? যদি মণিগৃহস্থিত তুমি বা সে মায়াবী নিজ স্বরূপে থাকিয়া বিভক্ত না হইয়াই পুরুষান্তরের ভ্রম জন্মাইয়া দিতে পারে, তবে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান মহামায়াবী পরমেশ্বর যে, মায়াসহযোগে এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিবেন—আশ্চর্য্য কি?

শ্বেত।—আপনি ত সে প্রশ্নের উত্তর বুঝাইলেন না। কেন জীব আমরা তাঁহার উপাসনা করিব, কেন শাস্ত্র বাক্য মানিব?

আরুণি।—এই নদ নদী, গিরিকানন-সমাকুল এই পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্যাদি জীব সমুপেত, আকাশ, বায়ু, তেজ, সলিলাত্মক এই সচরাচর জগৎ ব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হইয়াও যখন পৃথক প্রতীতি হইতেছে, যখন অচিন্ত্য কোন আবরণে আমরা আবরিত থাকিয়া, প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিতেছি না, এবং যে কারণ এই ভেদজ্ঞানের হেতু, সে আবরণ বা সে কারণ যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ এ পৃথক জ্ঞান, এ সংস্কার জনিত ভ্রান্তি, কোন প্রকারেই যাইবে না। যখন যাইবে না, তখন তদনুযায়ী কার্য্যও করিতে হইবে; তখন তিনি আমাদের স্রষ্টা, আমাদের একমাত্র আরাধ্য, ইহা বুঝিয়া তাঁহার উপাসনা, এবং ভেদবুদ্ধির উচিত বিধি নিষেধ প্রতিপাদক ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়মেও চলিতে হইবে। ধান্যার্থী যেমন ক্ষেত্র হইতে ধান্যবৃক্ষ আনয়ণ করিয়া, তাহা হইতে ধান্য পৃথক করিয়া লয়,

সেইরূপ ভেদবুদ্ধি উচিত, পৃথক বোধের উপর নিয়মিত এই শাস্ত্র হইতে উপাসনা জানিয়া সেই উপাসনা করিতে করিতে অবশেষে এক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইবে, তখন উপাসনা নাই, শাস্ত্রের নিয়ম নাই, সম্প্রদায় বা সমাজের কোন বন্ধনই নাই। তখন "সোহহং সদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্মী।"

শ্বেত।—আপনিই ত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে, "অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।" একটীমাত্র বটবীজ বটবৃক্ষে পরিণত হইয়া লক্ষ লক্ষ বটবৃক্ষরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তখন অগ্নির তেজক্ষয় হয়, বটবীজ বটবৃক্ষে পরিণত হইলে প্রকৃতই অনেক হইয়া থাকে। তবে এ দৃষ্টান্ত যে আপনার প্রতিকূলে যাইতেছে।

আরুণি।—বাস্তবিক অগ্নির স্ফুলিঙ্গ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলেও তাহা অগ্নি হইতে পৃথক নহে, এবং ইহাতে অগ্নির স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। একটি বটবীজ অনেক বটবৃক্ষরূপে পরিণত হইলেও সে বটবৃক্ষ, বটবীজ হইতে স্বতন্ত্র নহে, এবং যে বটবীজ সে বটবীজই থাকে। ইহাই এখানে দৃষ্টান্তের অর্থ। প্রভেদ এই যে, দৃষ্টান্তে যাহা প্রকৃত হইতেছে, দার্ষ্টান্তিকে কেবল এইরূপ একটি ভ্রান্তি জন্মাইতেছে মাত্র। জগৎসৃষ্টি বলিতে, জগতের আবির্ভাব বা প্রকাশমাত্র বুঝিবে। কুর্ম্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত, ঊর্ণনাভের জালের মত, ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালের মত, যখন আবির্ভাব হয়, তখন সৃষ্টি; যখন লীন হয়, তখন মহাপ্রলয়।

শ্বেত।—একই আত্মা, তাহা হইতে এই নাম রূপাদি অসংখ্য উপাধিভেদে অনেক হইয়াছেন, এক আত্মাই জীব ও জগৎরূপে অবস্থিত আছেন; এইরূপ ধারণা ত কৈ কোনরূপে করিতে পারি না। আর্যজ্ঞান সম্পন্ন মহাপুরুষের আত্মা ও বিষ্ঠাভোজী শূকরের আত্মা কি এক; এই উভয়কেই কি তুল্যজ্ঞান করিতে হইবে, এরূপ ভাবনা কি কখন হইতে পারে?

আরুণি।—কখন কেহ করিতে পারিয়াছে কি না, এ কথা পরে হইবে। এরূপ সমজ্ঞান করিতে বলিলেই কি পারিবে, সহস্র যুক্তিতর্কে বুঝাইলেই কি বুঝিবে, যতক্ষণ কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ জ্ঞান থাকিবে, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা এই অভিমান অস্থি মজ্জায় জড়িত রহিবে, যতক্ষণ এই ভেদজ্ঞান কাটিয়া না যাইবে, ততক্ষণ এরূপ ধারণা কেহ করিতে পারিবে না বা কাহাকেও করাইতে পারিবে না, যখন এই ...

সে জ্ঞান আসিবে ঃ—

"যমে বৈষ বৃণুতে তেনৈব লভ্য।
তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং॥"

শ্বেত।—সকল দেহে যদি একই আত্মা, তবে আমি যে সময়ে সুখভোগ করি, অন্যে সে সময়ে দুঃখভোগ করে কেন, একব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান হইলে সকল ব্যক্তি মুক্ত হয় না কেন, এ বৈষম্য তবে কেন হয়?

আরুণি।—পরমার্থতঃ সকল দেহে এক আত্মা থাকিলেও, এমন একটি আবরণ আছে, যাহাতে প্রতিদেহে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি হইয়া থাকে। যেমন এক অগ্নি প্রতি কাষ্ঠে, বনে, জলে, উদরে, গৃহে নানা অগ্নি নামে কথিত হয়; কার্য্য, গুণ ও আধার ভেদে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে, অথচ সকলই এক অগ্নি। আত্মাও তদ্রূপ প্রতিদেহে বিভিন্ন মত হইয়া বিভিন্নপ্রকার কার্য্য করিয়া থাকেন ও সুখ, দুঃখ ইত্যাদি নানাপ্রকার ফলভোগে জড়িত হয়েন, তদ্দ্বারা জীব এই সংসারে যাতায়াত করে, অথচ আত্মা এক অদ্বিতীয়ই আছেন ঃ—

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব॥"

শ্বেত।—তবে ত আত্মা কর্ত্তা, ভোক্তা ও কর্ম্মফল সম্বন্ধী সগুণ হইলেন; তবে ত আর নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সচ্চিদানন্দ রহিলেন না। ন্যায় বৈশেষিকোক্ত স্বতন্ত্র জীবাত্মা স্বীকার করিতে হইল।

আরুণি। এই জন্যই একটি আবরণ বলিয়াছি, যাহাকে মায়া বলে। এই মায়াবশেই আত্মা এক হইয়াও অনেক, অক্রিয় হইয়াও ক্রিয়াবান্, অভুক্ত হইয়াও ভোক্তা হইয়া থাকেন। এই কারণেই "তুমি আমি ভিন্ন" এই বোধ হয়; আমার গৃহ, আমার সংসার ইত্যাদি নানাপ্রকার অভিমান জন্মে, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি জ্ঞানী, আমি অজ্ঞানী, এইরূপ অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়।

শ্বেত।—তাহা হইলে প্রতিদেহ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আবরণ স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহা হইলে মায়াও অসংখ্য হইয়া পড়ে।

আরুণি।—মায়া একবিধ, অচিন্ত-অনন্ত-শক্তিমতী, জগন্মোহ-জনয়িত্রী চিৎশক্তি। তাহা এক হইয়াও অন্তঃকরণভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে; যেমন একই

বস্তু নানা কাচখণ্ডে প্রতিফলিত হইয়া নানারূপ ধারণ করে; তদ্রূপ অন্তঃকরণ উপাধি বশতঃই মায়া প্রতি শরীরে নানাবিধ হইয়া থাকে। তুমি যখন গুরুর নিকট, তখন ছাত্র, পিতার নিকট পুত্র, অন্যের চক্ষে ব্রহ্মচারী, এই যে নানা ভেদ, ইহাই উপাধি। স্ফটিকপাত্রে রক্তপদ্ম রাখিয়া দাও, স্ফটিকপাত্র রক্তবর্ণ বোধ হইবে, এই রক্তবর্ণই উপাধি "যঃস্বধর্ম্মং অন্যনিষ্ঠতয়া ভাসয়তি স উপাধিঃ" এই অন্তঃকরণ উপাধিভেদে মায়া কাহাকেও সুখী এবং কাহাকেও দুঃখী করে। এই উপাধি ভেদ জন্য যে অবিবেক, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিয়া থাকেন। এই উপাধি ভেদে অবিদ্যা অনন্ত বলিয়া, আত্মাও প্রতি শরীরভেদে পৃথক ও অনন্ত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে; তাই আত্মাকে বদ্ধ মুক্ত অজ্ঞানী, জ্ঞানী বলিয়া নানাপ্রকার মনে করা হয়। এই মায়াবশতঃই এই ভ্রান্তি বিদূরিত হয় না, বলিয়া পৃথক জ্ঞানও যায় না। এই পৃথক জ্ঞান যায় না, বলিয়াই একের মুক্তিতে সকলে মুক্ত হয় না।

শ্বেত।—জিজ্ঞাসা করি, "আমরা" শব্দে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া থাকি?

আরুণি।—বাস্তবিক আমরা সেই সচ্চিদানন্দ আত্মারই অধ্যাসিক অংশ মাত্র, কিন্তু অবিদ্যা জড়িত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মা এই সকল একত্রিত করিয়া এই অপূর্ব্ব এক 'আমরা' শব্দের উৎপত্তি করিয়াছি। প্রকৃত আমি বলিলে যাহা বুঝায়, সে 'আমি' ধারণা করিতে পারা শাস্ত্রজ্ঞানের অধীন নহে। যথার্থই বটে।

"আমি ব'লে আখ্যা আছে যার—
নহে তাহা চক্ষু কর্ণ নাসা, নহে তাহা সমগ্র শরীর।"

শ্বেত।—যদি এই অবিদ্যা প্রকৃতই আত্মাকে বদ্ধ করিতে পারে না, তবে আত্মা বদ্ধ হয় কেন?

আরুণি।—অবিদ্যা জড়ের ধর্ম্ম, যাহা জড়ের ধর্ম্ম, তাহা আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে না। একের ধর্ম্ম কখনও অপরে বহন করে না, আত্মা স্বয়ম্প্রকাশ, ধর্ম্মশূন্য, স্বতঃ পবিত্র বলিয়াই অবিদ্যা আত্মাকে প্রকৃত বদ্ধ করিতে পারে না। তবে জড়ের ধর্ম্ম আত্মায় আরোপিত হয় (অবিদ্যা; মায়া, অজ্ঞান পর্য্যায় শব্দ); অন্তঃকরণের ধর্ম্ম আত্মার উপর প্রতিভাত হয়, অন্তঃকরণের রাগ দ্বারা আত্মা রাগযুক্ত হয়েন। জবাকুসুমের রক্ততার জন্য শুভ্র কাচখণ্ড যেমন

লোহিত বর্ণ দেখায়, কিন্তু প্রকৃত লোহিতবর্ণ হয় না; আত্মাও তদ্রূপ প্রকৃত রাগযুক্ত হয় না; তবে এই অলীক রাগ অন্তঃকরণকে অনুরঞ্জিত করে বলিয়াই আত্মার স্বয়ম্প্রকাশ ভাব প্রকাশ পায় না। এই স্বরূপ জ্ঞানের অভাবই জীবগণকে সংসারে যাতায়াত করাইয়া থাকে। অল্পবিস্তৃত মেঘ বহু বিস্তীর্ণ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত না করিলেও আমাদের দৃষ্টিশক্তি আবরিত হয় বলিয়াই, সূর্য্য আবরিত হয়। এই স্বরূপের জ্ঞান হইলেই আর সংসারে আসিতে হয় না। এই মায়াবরণ সরাইয়া ফেলিলেই আত্মজ্যোতি প্রকাশ পায়, ইহাকেই মুক্তি বলে।

শ্বেত।—স্বয়ম্প্রকাশ ভাব প্রকাশ পায় না, বলিয়াই সংসার। তবে মোটের উপর সংসার ও নির্মুক্ততা আত্মার দুই অবস্থা দাঁড়াইল, একটি মিথ্যা, অপরটি সত্য, না দুটিই সত্য?

আরুণি। এক বস্তুর সত্য ও মিথ্যা এই দুইটি বিরোধী অবস্থা কখনও হইতে পারে না, বা বিরোধী দুইটি সত্য অবস্থাও সম্ভব নহে। সংসার ও নির্মুক্ততা এই দুইটি আলোক ও অন্ধকারের মত বিরোধী। আত্মার দুইটি অবস্থা বটে, একটি পারমার্থিক অন্যটি ব্যবহারিক। পারমার্থিক অবস্থা আত্মার নিত্য সিদ্ধ বলিয়া সত্য তাহাই আত্মার স্বরূপ; ব্যবহারিক অবস্থা কল্পিত বলিয়া মিথ্যা। এই ব্যবহারিক অবস্থায় যতক্ষণ আমাদিগকে থাকিতে হইবে, ততক্ষণ ঐ সময়োচিত সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মানিয়া চলিতে হইবে। ব্যবহারিক অবস্থায় থাকিয়া যে ব্যক্তি আপনাকে মুক্ত মনে করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম হইতে বিরত হইবে বা যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইবে; যে ব্যক্তিকে প্রকৃতি আপনিই চালাইবে। "প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি" লাভের মধ্যে উভভ্রষ্ট হইয়া প্রণষ্ট হইবে। ভগবান বলিয়াছেন;—

"স্বভাব জেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্য বশোঽপি তৎ॥"

শ্বেত।—সর্ব্বজ্ঞ অসংসারী আত্মা যে বুদ্ধিপূর্ব্বক এই জড়দেহে দুঃখভোগ উপলব্ধি করিতে আসিবেন, ইহা সম্ভব নহে, স্বভাব বিশুদ্ধ হইয়া এই সংসারের মলিনতার মধ্যে জড়িতবৎ হইবেন, ইহাও সম্ভব নহে। অথচ আত্মা না থাকিলে এই ইন্দ্রিয়,মন, প্রাণ সকলই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িত। আত্মা না

ধারণ করিলে সমস্ত স্থাবর জঙ্গম পদার্থ ধুলিমুষ্টির ন্যায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাব ধারণ করিত, এ সন্দেহ দূর করুন।

আরুণি।—আত্মা কি ভাবে দেহে প্রবেশ করেন, কি ভাবেই বা অবস্থান করেন, ইহা জানিলে এ সন্দেহ থাকিবে না। একটি পাত্রের মধ্যে যেমন বায়ু প্রবেশ করে, আত্মা সেরূপে প্রবেশ করেন না। অথচ প্রবিষ্ট না হইলে এই জড়, মন, ইন্দ্রিয় ইহারা পরস্পর মিলিত হইতে পারিত না। আত্মার সাহায্য না পাইলে প্রাণ আপনার কার্য্য, চেষ্টা আদি মন সংকল্প, বুদ্ধি নিশ্চয় করিতে পারিত না। এই আত্মা সর্ব্বজ্ঞ অসংসারী, ইহার প্রকৃত দেহ-প্রবেশ সম্ভবে না, এই জন্য দর্পণে পুরুষপ্রতিবিম্বের মত অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হয়েন মাত্র এবং মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি আদি সংসর্গে তত্তদাকারে প্রতিভাসিত হইয়া থাকেন, এবং নানারূপ ধারণ করেন। এই যে আত্ম-চৈতন্য অনুভূত হয়, তাহা চৈতন্যের আভাস মাত্র।

শ্বেত।—তত্তদাকারে যদি প্রতিফলিতই হইলেন, তবে সে সংসর্গে কোন ইতর-বিশেষ হয় না, ইহা কেমন করিয়া বুঝিব?

আরুণি।—তোমার মুখ যখন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন সে দর্পণের মালিন্য কি তোমার মুখস্পর্শ করে, সে দর্পণ শতধা ভঙ্গ করিলে, মুখের ছায়া আর তাহাতে পড়ে না, কিন্তু তাহাতে কি মুখের কোন ইতর বিশেষ হয়? তপন যখন প্রতিফলিত হয়, তখন সলিলের মালিন্য কি তপনকে স্পর্শ করে? সলিল আলোড়িত কর, আর তাহাতে বিম্বিত সূর্য্য দেখিতে পাইবে না, তাহাতে কি সূর্য্যের কোন ইতর বিশেষ হয়?

"সূর্য্যো যথা সর্ব্ব লোকস্য চক্ষু র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈ র্বাহ্যদোষৈঃ।"

শ্বেত।—যাহা প্রতিবিম্ব তাহা কি কখন প্রকৃত বস্তুর কার্য্য করিতে পারে?

আরুণি।—কেন করিবে না? তুমি যখন বিদেশে থাক, তোমার প্রতিমূর্ত্তি তখন কি প্রিয়জনের নেত্রসুখ, মানসিক আনন্দবিধান করে না? প্রেতের বিভীষিকা স্মৃতি কি ভীতি উৎপাদন করে না? এই আত্মা বায়ুর মত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধিষ্ঠিত না হইলেও অধ্যাস * সম্বন্ধে জীবদেহে বাস করেন, আত্মা নিরবয়ব বলিয়া জীবদেহে সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধে বাস করিতে পারেন না।

* জন্মভূমি প্রথমে অধ্যাস ব্যাখ্যা হইয়াছে।

শ্বেত।—যাহা কল্পিত যাহা মিথ্যা, যাহা কিছুই নহে, তাহার দ্বারা মনুষ্য বদ্ধ হইতেছে, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়?

আরুণি।—যাহা কল্পিত, তাহা মিথ্যা। মিথ্যার অর্থ যে "কিছুই নহে" তাহা নহে। মিথ্যা অর্থে অনিত্য, নশ্বর, ক্ষণিক ও স্বপ্নের মত। কিন্তু যখন উপলব্ধি হইতেছে, তখন অভাব, শূন্য বা "কিছুই নহে" বলিতে পারা যায় না।

শ্বেত।—বুঝিতে পারিলাম না, যাহা স্বপ্নের মত ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত, যাহা কল্পিতমাত্র ক্ষণিক, তাহা শূন্য "অভাব" কিছুই নহে বলিবে না কেন?

আরুণি।—এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎব্রহ্মাণ্ড যখন আত্মার অবস্থান্তর, এ সকল পদার্থের ভিতর যখন আত্মা অনুপ্রবিষ্ট আছেন, সমস্তই যখন আত্মসত্তায় সত্তাবান্, তখন তাহাদের সত্তা নাই বা অস্তিত্ব নাই বলা যায় না। যাহার সত্তা বা অস্তিত্ব থাকিল, তাঁহা ত ভাব বা শূন্য মাত্র, ইহা কল্পনা করিতে পারা যায় না। দেখ, প্রত্যেক বস্তুর উপলব্ধি করিতে হইলে দুইপ্রকার বুদ্ধির আবশ্যক পড়ে, একটি সৎ ও অপরটি অসৎ; সৎ অর্থে যাহা আছে, যাহার কখনও অভাব দেখা যায় না। অসৎ অর্থে যাহা সকল সময়ে থাকে না। অর্থাৎ একটি বস্তুর জ্ঞান করাইয়া নাশপ্রাপ্ত হয়।

এই যে ঘট উপলব্ধি করিতেছ, এখানে দুইটি বুদ্ধি রহিয়াছে, একটী ঘট বিষয়ক অসদ্বুদ্ধি, ইহা ঘটনাশের পর থাকে না বলিয়াই অসৎ। আর যেটি সদ্বুদ্ধি, তাহা ঘট নাশের পর পটাদিতে থাকে। এইরূপে সকল পদার্থের উপর যে বুদ্ধি ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহাই সৎ। এ সদ্বুদ্ধি না থাকিলে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব মাত্র বুঝা-যাইত না, এই যে মরুভূমে জলভ্রম, আকাশে গন্ধর্ব্ব নগর দৃষ্টি, স্বপ্নে অলীক ভোগ, ইহার ভিতরও সদ্বুদ্ধি নিয়ত জাগরূক। এই সদ্বুদ্ধি না থাকিলে এ সকল অনুভবগম্য হইত না। জাগ্রদবস্থা অপেক্ষা করিয়াই ইহাদিগকে মিথ্যা বলা হয়, প্রকৃত মিথ্যা অভাবমাত্র নহে। তাহা হইলে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড নশ্বর, ক্ষণিক স্বপ্ন মত ভ্রম এবং পরিবর্ত্তনশীল হইলেও ইহার যে সত্তা বা অস্তিত্ব নাই, বা ইহা যে অভাব বা শূন্য পদার্থ তাহা নহে। তবে সেই সত্তা জগৎব্রহ্মাণ্ডের নিজস্ব নহে। ইহাই আত্মসত্তা জানিও।

শ্বেত।—এই অনিত্য স্বপ্ন প্রপঞ্চেরও যদি সত্তা থাকে, তবে যখন প্রকৃতি এই জগৎব্রহ্মাণ্ড কুক্ষির ভিতর লইয়া, পরম কারণ ব্রহ্মে লীন হয়। তখন সত্তা হারাইয়া ফেলে। সত্তা কখন থাকে, কখন বা থাকে না; ইহা

কেমন করিয়া সম্ভব হয় ?

আরুণি।—সত্ত্বা যখন জগৎব্রহ্মাণ্ডের নিজস্ব ধর্ম্ম নহে, যখন আত্মসত্ত্বা, তখন সে সত্ত্বা যে কখন থাকিবে না, ইহা হইতে পারে না। এ সত্ত্বা কখনও লোপ পাইবেন না, এ সত্ত্বা চিরদিন স্বরূপে বিরাজ করিবে, এই কারণেই হারাইয়া ফেলে বলিয়াছি। প্রকৃত যখন মায়া, সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড আপনার বিশাল কুক্ষির ভিতর লইয়া পরমকারণ পরমব্রহ্মে লীন হয়, তখন আর সে সত্ত্বা পৃথক বলিয়া উপলব্ধি করা যায় না। যখন গঙ্গা, যমুনাদি নদীসকল সমুদ্রের বিশাল সলিলরাশির মধ্যে আসিয়া পড়ে, যখন আপনাদের নাম, আকার ত্যাগ করিয়া আপনাদের পৃথক পৃথক সত্ত্বা পর্য্যন্ত হারাইয়া সমুদ্রের সহিত একাত্মা হইয়া যায়; তখন এইটি গঙ্গা, ওইটি যমুনা বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু সে গঙ্গা, যমুনা যখন সমুদ্রেই পড়িয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সমুদ্রের ভিতর আছে; সমুদ্র জলে লবণের মত দেখা না যাইলেও উপায় বিশেষের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। আবার যখন ব্রহ্মের সিসৃক্ষা হয়, তখন সেই প্রকৃতি গর্ভে লীন, ব্রহ্মে মিশ্রিত হইয়াও অবিমিশ্র জীবগণ মায়ার সহিত পুনরায় তাহা হইতে বহির্গত হয়; পরে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারবশে সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

যেমন কোন ভূমির ভিতর স্বর্ণখনি থাকিলেও অক্ষেত্রজ্ঞ মনুষ্যগণ সে ভূমির উপর দিয়া গমনাগমন করিয়াও বুঝিতে পারে না যে, ইহার ভিতর স্বর্ণখনি আছে। তদ্রূপ প্রকৃতি সহযোগে অবশ, অজ্ঞ, জীবগণ ব্রহ্মে লীন হইয়াও বুঝিতে পারে না, যে ব্রহ্মে লীন হইয়াছে (কারণ তাহারা সপ্রকৃতিক ব্রহ্মে লীন হয়, প্রকৃতি বিমুক্ত ব্রহ্মে লীন হয় নাই)। এই স্বরূপ জ্ঞানের অভাবই তাহাদিগকে তদাত্মভাবে মিশিতে দেয় না, তজ্জন্য মুক্ত হয় না।

চৌর্য্যসন্দেহে কোন সাধু ও চোরকে হস্তদ্বারা তপ্ত পরশু গ্রহণ করিতে বলিলে যে সাধু তাহার হস্ত দগ্ধ হইবে না, কিন্তু যে চোর, তাহার হস্ত দগ্ধ হইবে। যে জানে আমি নিরপরাধ, তাহাকে অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না; তদ্রূপ জানিও, আমি মায়াবদ্ধ নহি, আমি প্রকৃত ব্রহ্মেই লীন হইয়াছি, সে ব্যক্তি অবিদ্যা (সংসারের কারণ) বিমুক্ত বলিয়া পুনরায় তাহাকে সংসারে ফিরিয়া আসিতে হইত না। মায়ার আধিপত্য তাহাতে খাটিত না, এই কারণে মায়ার

শ্বেত।—মায়াবদ্ধ জীব ব্রহ্মে লীন হইয়াও তদাত্মভাবে কেন লীন হইতে পারে না, কেন মহাসত্তার অসীম পবিত্রতার মধ্যেও সংসার মলিনতার কার্য্য দেখা হয়, এ বিষয়টি ঠিক অন্তরের সহিত বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি দৃষ্টান্ত প্রয়োগে বিশেদভাবে সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিন।

"শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং।"

আরুণি।—এই লীন হওয়া দুই প্রকারে হয়, একটি অখণ্ড নিরবচ্ছিন্ন মায়াবিমুক্ত পরমব্রহ্মে, অপর একটি মায়োপচিত চৈতন্যে; একটি পৃথিবী-সঞ্চারী বায়ুর অপ্রতিহত গতির সহিত উপমা দেওয়া যাইতে পারে, আর অন্যটি মুখাবৃত পাত্রস্থ বায়ুর সঙ্কীর্ণ গতির সহিত উপমা দেওয়া যাইতে পারে। একটি স্বয়ং রাজার সহিত পরিচিত হওয়ার মত; অপরটি কর্ম্মচারী দ্বারা পরিচিত হওয়ার তুল্য।

দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি শুন, "যেমন গঙ্গাবারিপূর্ণ কলস মুখ বন্ধ করিয়া সমুদ্রে ডুবাইয়া দিলেও সমুদ্রের সহিত মিশিয়া যায় না, যখনই তুলিবে, তখনই যে গঙ্গাজল সে গঙ্গাজলই থাকিবে; তদ্রূপ অবিদ্যাবাসনা জড়িত, শরীরেন্দ্রিয় অন্তঃকরণে আত্মাভিমানী জীবগণ, নিজ কর্ম্মফল ও বহুজন্মসঞ্চিত সংস্কার সহ প্রকৃতিতে লীন হয় বলিয়া (এই পথক পৃথক সংস্কার লইয়া গমন করে বলিয়াই) মহাসত্তার সহিত তদাত্মভাবে মিশিতে পারে না। এই আত্ম স্বরূপ বিবেক হইলেই ঐ ব্যবধান নাশ পাইবে,ঐ কলসের মুখবন্ধ খুলিয়া দিলেই গঙ্গাজল সমুদ্রে মিশিয়া যাইবে, এই বন্ধন নাশ করাকেই মুক্তি বলে। মুক্তি বলিতে নূতন কিছুই প্রাপ্তি নহে। মুক্তি স্বর্গাদির মত নহে। মুক্তি মুচ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ("মুচ্" মোচন বন্ধন মোচন) সংসারবন্ধন চিরদিনের জন্য মোচন হইলেই মুক্তি হইল।

শ্বেতকেতু! এই মুক্তির জন্য উত্থিত হও, এই সংসার বন্ধন মায়ার গ্রন্থি খুলিতে তৎপর হও, মোহনিদ্রার তমোময় সুখস্বপ্ন হইতে আপনাকে প্রবোধিত কর। আর তোমার দৃষ্টান্তে পুনঃ পুনঃ সংসার গমনাগমন-ক্লান্ত, প্রাক্তন কর্ম্মানুযায়ী জীবগণ আপনাদের উদ্ধারের জন্য গুরুর শরণাপন্ন হউক, বিষয়লালসা ত্যাগ করুক, জগন্মাতা উপনিষদ্দেবীর সেবা করুক।

স্বর্গবাসিনী-জননী।*

জননি! পশেছ তুমি পুণ্য-স্বর্গধামে।
পূজিতেছি হেথা মোরা মা তোমার নামে॥
হেরিয়া মূরতি তব মানস-নয়নে।
ঝর ঝর বারিধারা বহে দুনয়নে॥
পঞ্চবর্ষ হেরি নাই শ্রীমুখ তোমার।
চির-শান্তিময় যাহা, সুধার আধার॥
বঞ্চিত মা পঞ্চবর্ষ সেই সুধাপানে।
বলে কি জানাব মাগো, কি জ্বালা এ প্রাণে॥
ধন্য জননীর স্নেহ এ ভব-সংসারে।
পুত্র বিনা সেই স্নেহ কে বুঝিতে পারে॥
মূর্ত্তিমতী জননীরে নেত্রপথে রেখে॥
মাতৃসেবা করে যেবা, মাতৃমুখ দেখে।
আনন্দ-নির্ঝরে ঝরে যাহার নয়ন।
হেনরূপে মাতৃপূজা করে যেইজন॥
ধন্য পুণ্যবান সেই ইহ-ধরাধামে।
শুভ ভাগ্যোদয় তার হয় পরিণামে॥
হায় হায়! আমি সেই মা হারা হয়েছি।
পঞ্চবর্ষ মাতৃহীন হইয়ে রয়েছি॥
যদিও মানস-পদ্মে মা আছেন বসি।
বলিতেছি কাণে কাণে তুমি তত্ত্বমসি॥

---

* বিগত ১৩১৪ সাল, ২৫ শে কার্ত্তিক সোমবার বেলা ১২ টা ১০ মিনিটের সময়, আমাদের পরমারাধ্যা পরম পূজনীয়া স্নেহময়ী মাতাঠাকুরাণী আমাদিগকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া স্বর্গারোহণ করেন! ৫ম বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে লিখিত, লেখক।

তথাপি নয়নে মূর্ত্তি দেখিতে না পাই।
মাতৃহারা, দিশেহারা, শুধু ভাবি তাই॥
হাসি খেলি, কথা কই; আহরি আহার।
কিছু ভাল নাহি লাগে, আঁধার সংসার॥
মা তুমি স্বর্গেতে আছ, জানিতেছ সব।
কেন মা রয়েছ তবে হইয়ে নীরব?॥
মনে করি স্বর্গসুখে হয়েছ মগন।
সন্তানের মায়া-দয়া ভুলেছ এখন॥
মনে করি বটে, কিন্তু আসেনা প্রত্যয়।
স্নেহের পুতুলিগুলি ভুলিবার নয়॥
না পারি উপমা দিতে স্নেহের তোমার।
সে স্নেহ ভুলাতে পারে সাধ্য আছে কার?
তোমার মমতা স্নেহ, ঠিক তাই আছে।
দূরে আছ, আসিবারে নাহি পার কাছে॥
থাক মা সুখেতে থাকো, আত্মার কৃপায়।
তব আত্মা কভু যেন অশান্তি না পায়॥
একটি মিনতি মা গো, অধম সন্তান।
যাচিতেছে, কর দেবি! সেই ভিক্ষাদান॥
স্বর্গ হতে শান্তিজল কর বরিষণ।
আশীর্ব্বাদ পুষ্পসহ স্নেহের চন্দন—
মিশায়ে একত্রে করি কৃপা-বিতরণ।
স্নেহছলে ধরাতলে কর মা ক্ষেপণ
সেই শান্তি আশীর্ব্বাদ পাইয়া তোমার।
পলকে জুড়াবে তব তাপিত সংসার॥

যে পথে সবাই যায়, আমিও সে পথে—
সময়ে চলিয়ে যাব চড়ি দিব্যরথে ॥
আসুক সে শুভদিন, স্বর্গেতে পশিব।
মা তব চরণতলে আনন্দে বসিব ॥
আজি আমি ভক্তিভাবে শিরে তুলি হাত।
উদ্দেশে তোমার পদে করি প্রণিপাত ॥

জাতিস্মরা বালিকা।

নদীয়া জেলার উলা ও গুপ্তিপাড়া এবং চব্বিশপরগণায় বারাসত ও হালিসহর যে সময় ম্যালেরিয়া বিষের ভীষণ প্রতাপে সর্ব্বপ্রথমে জর্জ্জরীভুত, সেই সময় শান্তিপুরের অদূরবর্ত্তি একখানি অপ্রসিদ্ধ গ্রামে এক ব্রাহ্মণের এক কন্যা জন্মে; গ্রামের নাম ছিল ত্রিপলী, গ্রামে ভদ্রলোকের বাস অতি অল্প, নবশাক শূদ্র কিছু বেশী।

কথিত ব্রাহ্মণের সেই কন্যাটি অসাধারণ প্রতিভাশালিনী হইয়াছিল; বর্ষ পূর্ণ হইবার অগ্রেই তাহার কথা ফুটিয়াছিল। পাড়ার গোয়ালিনী প্রতিদিন সেই ব্রাহ্মণীর বাড়ীতে দুগ্ধ যোগান দিত; এক বৎসরের ন্যূন বয়স্কা বালিকা প্রতিদিন সেই গোয়ালিনীর মুখখানি চাহিয়া চাহিয়া দেখিত। একদিন ভারি বৃষ্টি হইতেছিল, গোয়ালিনী শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যাইতে না পারিয়া, ব্রাহ্মণের রন্ধনগৃহের দাওয়ায় বসিয়া গৃহিণীর সহিত গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল। গৃহিণী সেই ক্ষুদ্র বালিকার জননী; বালিকা আপন জননীর কোলে বসিয়া স্তনপান করিতেছিল, এক একবার গোয়ালিনীর মুখ পানে চাহিতেছিল; হঠাৎ স্তন্যপান ত্যাগ করিয়া গোয়ালিনীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল; মা মা বলিয়া গোয়ালিনীর স্তন অন্বেষণ করিতে লাগিল।

গোয়ালিনী সধবা, দুই বৎসর হইল তাহার একটি পুত্র হইয়াছে, তাহার স্তনেও দুগ্ধ ছিল, ক্ষুদ্র বালিকা সেই স্তন পান করিতে লাগিল; মুখে আর হাসি ধরে না। কি জানি কেন, গোয়ালিনীও যেন বালিকাটিকে আপন গর্ভজাত কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিল।

বৃষ্টি ধরিয়া গেল, বালিকাকে মায়ের ক্রোড়ে দিয়া গোয়ালিনী সে দিন বিদায় হইল, তাহার পর ক্রমাগত ঐ ভাব। গোয়ালিনী আসিলে বালিকা আর মায়ের কাছে থাকে না; তাহারই কোলে যায়, তাহারই মাই খায়, তাহারই সঙ্গে কথা কয়, গোয়ালিনীর ক্রোড় হইতে কন্যাকে গ্রহণ করা জননীর পক্ষেও অসাধ্য হইয়া উঠিল।

দুইবৎসর এইভাব। বালিকার বয়স তখন প্রায় তিনবৎসর; তাহার আদরের নাম হইয়াছে ননীবালা। গোয়ালিনী একদিন একটি ছেলে সঙ্গে করিয়া আসিল, ছেলেটির বয়স চারিবৎসর, নাম তারাপদ।

ননীবালাও শুনিল, ছেলেটির নাম তারাপদ। কেহ কিছু শিখাইয়া দিল না, অথচ ননীবালা ছুটিয়া গিয়া ছেলেটির হাত ধরিল, দাদা বলিয়া আদর করিতে লাগিল; কে জানে, কেন তাহার চক্ষে জল আসিল।

সজলনয়নে বালকের মুখপানে চাহিয়া ননীবালা বলিল, "দাদা! তোমার নাম তারাপদ? কে বলে তোমার নাম তারাপদ, ছি! ওনাম ভাল নয়, তোমার নাম দয়ালচাঁদ। ঐ শোন, ঐ শোন, আকাশ থেকে কে আমায় বলে দিচ্চে, তোমার নাম দয়ালচাঁদ। দাদা! তুমি কি দয়ালচাঁদ হবে না? আমি জান্‌তে পাচ্চি, তুমি আমার সেই দয়ালচাঁদ। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল।"

ননীবালার জননী সেইখানে ছিলেন, গোয়ালিনী ছিল, প্রতিবাসিনী আর দুটী কামিনীও ছিল। বালিকার আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া সকলেই সবিস্ময়ে হাঁ করিয়া রহিল।

তারাপদ সেই গোয়ালিনীর পুত্র এ পরিচয় এইখানেই প্রকাশ থাকুক। বেলা হইল, গোয়ালিনী ঘরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল, ননীবালা কিন্তু সে ছেলেটির হাত ছাড়িল না, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গোয়ালাপাড়ায় চলিল; সেই অবধি ননীবালা দিনমানে প্রায়ই আর ঘরে থাকে না, পথ চিনিয়া আসিয়াছিল, প্রত্যহ

সকালে উঠিয়া গোয়ালাপাড়ায় ছুটিয়া যায়, গোয়ালিনীর কোলে উঠে, তাতে আর তারাপদতে গোয়ালিনীর দুটি মাই খায়, এক সঙ্গে মুড়ি-মুড়কী খায়, দু-জনে এক-সঙ্গে খেলা করে। ননীবালা এক এক বার তারাপদকে দাদা বলে, এক এক-বার দয়ালচাঁদ বলিয়া ডাকে।

ক্রমশই দিনগত হইতে লাগিল, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, ননীবালা অষ্টমবর্ষীয়া, তারাপদ নবমবর্ষীয়। ক্রমশই সখ্যবৃদ্ধি, স্নেহবৃদ্ধি, ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি। ননীবালা এক একদিন তারাপদর সঙ্গে ভাত খাইতে চায়; "খেতে নেই, খেতে নেই" বলিয়া গোয়ালিনী নিষেধ করে, ননীবালা বাধা মানে না, দাদার সঙ্গে দুধেভাতে খাইয়া আনন্দপ্রকাশ করে। তাহার মাতাপিতা অথবা প্রতিবাসীরা কেহই তাহা জানিতে পারে না, গোয়ালিনীও কাহাকে কিছু বলে না।

এক একদিন গোয়ালিনীর বাড়ীতে ননীবালার সন্ধ্যা হইয়া যায়; বাড়ী বেশী দূর নয়, ননীর জননী নিজে আসিয়া মেয়েটীকে লইয়া যান। এইখানে বলিয়া রাখা উচিত, এক বৎসর পূর্ব্বে ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরে ননীবালার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল।

একদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, ননীবালা ঘরে যায় নাই, তাহার মাতাও তখন লইতে আইসেন নাই, রাত্রি প্রায় চারিদণ্ড। গোয়ালিনীর নাম আদ্যা-শক্তি; একটি ঘরে আদ্যাশক্তি, ননীবালা আর তারাপদ; গল্প চলিতেছে। কথায় কথায় বিস্ফারিত নেত্রে আদ্যাশক্তির বদন নিরীক্ষণ করিয়া ননীবালা জিজ্ঞাসা করিল, "মা! সেখানে তোমাদের বাড়ীর পশ্চিমদিকে একটি বকুল-ফুলের গাছ ছিল, সে কথা তোমার মনে আছে?"

আদ্যাশক্তি যেন আকাশ হইতে পড়িল; মনে মনে ভাবিল, পাগ্‌লি বলে কি? সেখানে বকুলফুলের গাছ ছিল, এ কথার ভাব কি? চক্ষু ফুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ননী! সেখানে বকুলগাছ ছিল বোল্‌ছিস্, সেখানে কোথায়?"

ননীবালা বলিল, "কেন? মনে নেই খুব ঝোঁকড়া ঝোঁকড়া গাছটি, তার তলায় বোসে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে আমি বউ বউ খেল্‌তুম। তুমি তখন ব্রাহ্মণ ছিলে, তোমার পেটে আমার জন্ম হয়েছিল, আমার বউ হবার সাধ হয়েছিল, দয়ালচাঁদের সঙ্গে আমার বিয়ে দিবার কথা তুমি তুলেছিলে, দয়ালচাঁদও ব্রাহ্মণ ছিল।

এই বলিয়া তারাপদকে দেখাইয়া বালিকা গম্ভীরবদনে বলিল, "সেই দয়াল-

চাঁদ এই, তুমি আমার সেই মা! দাদাকে তুমি তারাপদ বল, আর যাই বল, এই দাদা আমার সেই দয়ালচাঁদ; আমার সঙ্গে দয়ালচাঁদের বিয়ে হবে। আমি তোমাদের ভাত খাই, এ কথা তুমি আমার মাকে বলে দিও, তা হলে তারা আর আমাকে ঘরে নেবে না, তোমার বাড়ীতেই আমি থাকিব, আমি তোমার বউ হব, দয়ালচাঁদ আমার বর হবে।"

তোমরা এ জন্মে গয়লা হয়েছ, আমি পূর্ব্বজন্মে যা ছিলাম, তাই আছি, ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছি, তাতে দোষ কি? আমিও গয়লা হব।

কথাটা ক্রমে ক্রমে প্রচার হইয়া পড়িল, ননীর বিধবা জননী ক্রন্দন করিলেন, কিন্তু ক্রন্দন বিফল। ভবিতব্য খণ্ডন করিবে কে? তারাপদর সহিত ননীবালার বিবাহ হইল, বিবাহের সময় তারাপদের দ্বিতীয় নাম হইল দয়ালচাঁদ।

পাঠকমহাশয় বুঝিলেন, ননীবালা জাতিস্মরা; পূর্ব্বজন্মের সব কথা তাঁহার মনে ছিল। আর কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না, ব্রাহ্মণের কন্যা গোয়ালা হইল বলিয়া সকলেই আক্ষেপ করিতে লাগিল, আক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়।

পূর্ব্বজন্মের এক একটা সজীব দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা পূর্ব্বজন্ম বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা যাহা ভাবিতে চান ভাবুন, কিন্তু জন্মান্তর বৃত্তান্ত হিন্দুজাতির চিরন্তন বিশ্বাস। হিন্দুর পুরাণাদি শাস্ত্রেও পুনঃ জন্মের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে।

প্রসঙ্গের উপসংহারে আমি পৌরাণিক দৃষ্টান্ত দেখাইব। ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে রামলক্ষ্মণ যে দিন নাগপাশে বদ্ধ হন, গরুড়পক্ষী আসিয়া মুক্ত করে। গরুড় পক্ষী বিষ্ণুর বাহন, কৃষ্ণরূপ ভালবাসে, রামরূপ দেখিয়া তুষ্ট হইল না, পাখার ঘর করিয়া সংগোপনে রামকে কৃষ্ণ সাজাইয়া, বংশীধারী কৃষ্ণরূপ দর্শন করিলেন। হনুমান দূর হইতে তাহা দেখিয়া মনের দুঃখে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন:—

"প্রাণপণে সাধি মোরা শ্রীরামের হিত।
পক্ষীর সঙ্গেতে এত কিসের পিরীত॥
আমার সাক্ষাতে পাখী এত অহঙ্কার।
বংশীধারী সাজাইল শ্রীরামে আমার॥
আমিও লইব শোধ প্রতিজ্ঞা আমার।
আমার দারুণ পণ লঙ্ঘে সাধ্য কার॥
বাঁশী খসাইয়া দিব ধনুশর করে।

লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ অবতারে ॥"

হনুমান এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। দ্বাপরে যেদিন সত্যভামা, সুদর্শনচক্র ও গরুড়ের দর্পচূর্ণ হয়, হনুমান সেই দিন নীলপদ্ম মাথায় করিয়া দ্বারকাপুরী আইসেন। হনুমান কৃষ্ণরূপ দেখিবেন না, অন্তর্যামী কৃষ্ণচন্দ্র বাঁশী ছাড়িয়া ধনুর্ব্বাণধারণপূর্ব্বক রামরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; রুক্মিণীদেবী সীতা হইয়াছিলেন। অবতারের মহিমায় ইহাও শ্রীরামের পুনর্জন্ম।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।—বলিরাজের যজ্ঞে বামনরূপধারী নারায়ণ বংকালে একটি ছাতা মাথায় দিয়া গুড়্ গুড়্ করিয়া আসিয়া যজ্ঞসভায় দর্শন দেন, বলিরাজ-কন্যা প্রভাবতী সভাসন্নিহিত অন্তঃপুরের গবাক্ষে বসিয়াছিলেন, বামনদেবের রূপ দেখিয়া মনে মনে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল, এইরূপ একটি গুড়্গুড়ে ছেলে আমার হয়, তা হলে আমি সাধ মিটাইয়া ছেলেটির মুখে স্তন্য দান কোরে সুখী হই। অনন্তর ত্রিপদ ভূমিগ্রহণচ্ছলে বামনদেব যখন তৃতীয়পদ মস্তকে দিয়া বলিরাজাকে পাতালে দিলেন, সেই প্রভাবতী তখন বিষমক্রোধে মনে মনে ইচ্ছা করিলেন, এমন ছেলে যদি আমার হয়, তাহা হইলে আমি তাহাকে বিষ খাওয়াইয়ে মারি।"

ইচ্ছাময় ভগবান প্রভাবতীর সেই দুই ইচ্ছাই পূর্ণ করিয়াছিলেন। দ্বাপর অবতারে শ্রীকৃষ্ণ যখন নন্দালয়ে শিশু, পুতনা রাক্ষসী মায়াবলে সুন্দরী যুবতী সাজিয়া ব্রজপুরে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাসী হইয়া কৃষ্ণের মুখে স্তন দেয়, কংসের আদেশে পুতনা যুগল স্তনে বিষ মাখাইয়া দিয়াছিল, কৃষ্ণ সেই বিষস্তন দংশন করিয়া পুতনা রাক্ষসীকে বধ করিয়াছিলেন। দ্বাপরে বলিরাজকন্যা সেই প্রভাবতীই পুতনারাক্ষসী। তাহার দুই ইচ্ছাই সফল; মা বলিয়া কৃষ্ণ তাহার কোলে উঠিয়া স্তনে মুখ দিলেন, প্রকারান্তরে প্রভাবতীর বিষ দেওয়া হইল, প্রতারণার প্রায়শ্চিত্ত হইল। কৃষ্ণের কিছুই হইল না, পুতনারই প্রাণ গেল। প্রমাণ হইতেছে, পুতনারূপে প্রভাবতীর পুনর্জন্ম।

আমাদের কর্ত্তা।

বিষ্ণুনারদ-সংবাদ।

রাজা যুধিষ্ঠির কলিযুগের রাজা। তাঁহার স্বর্গারোহনের পর কলির পরাক্রমের ক্রমবিস্তার। কাশীধামের একজন প্রবীণ পণ্ডিতের মুখে একটি পুরাতন প্রবাদ শ্রবণ করা হইয়াছিল। মর্ম্ম এইরূপ যে পাণ্ডব প্রস্থানের পঞ্চ-সহস্র বৎসর পরে দেবর্ষি নারদ একদা বৈকুণ্ঠধামে বিষ্ণুদর্শনে গিয়াছিলেন; কথায় কথায় নারায়ণ তাঁহাকে বলেন, "নারদ! তুমি প্রায় নিয়তই ত্রিভুবন পরিভ্রমণ কর, কলির পরাক্রমে পৃথিবীর অবস্থা এখন কিরূপ, পৃথিবীর লোকেরা এখন কেমন আছে, তাহা কি বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছ? যদি করিয়া থাক, আমাকে বল।"

নারদ বলিলেন, "ঠাকুর! ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিয়া যাহা আমি দর্শন করি, বৈকুণ্ঠের পদ্মাসনে বসিয়া তদপেক্ষা শতগুণ—সহস্রগুণ সূক্ষ্মবিবরণ পরিজ্ঞাত হও। তথাপি ছলনা করিয়া আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তোমার গৌরবরক্ষার্থ অবশ্যই আমাকে তাহার উত্তর দিতে হইবে। লীলাময়! কৃষ্ণ অবতারে যখন তুমি লীলাচ্ছলে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় গিয়াছিলে, সেই সময় শ্রীরাধিকার দূতি বৃন্দাবলী প্রথমবার মথুরায় গিয়া বৃন্দাবনের অবস্থা তোমাকে যেরূপ শুনাইয়াছিল, অগ্রে আমি সেই কথাগুলি বলিব, তাহার পর অন্য কথা।

বৃন্দা তোমাকে বলিয়াছিল, কৃষ্ণ হে, তোমার বিরহে বৃন্দাবন এখন সত্য সত্যই নিবিড় বন। বৃন্দাবন এখন জীর্ণ শীর্ণ, পশুকুল তৃণভক্ষণ করে না, শিখি-কুল আনন্দে আনন্দে নৃত্য করে না, কোকিলকুল কুহুরব পরিত্যাগ করিয়াছে। সরোবরে কমলফুল প্রস্ফুটিত হয় না, অলিকুল ঝঙ্কার করিয়া পুষ্পমধু পান করে না, তোমার নিকুঞ্জবনে প্রেমের কুসুম প্রস্ফুটিত হয় না, সকলেই তোমার বিরহানলে দগ্ধ হইয়া নিস্তেজ হইয়া রহিয়াছে, কেবল কুরঙ্গনয়না গোপীকুলের নেত্রজলে যমুনার জল পরিস্ফীত হইয়াছে।

"বৈকুণ্ঠনাথ! সংক্ষেপে আমি বলিতে পারি, রাধিকার দূতী তোমাহারা বৃন্দাবনের যেরূপ চিত্রাবলী প্রস্তুত করিয়াছিল, পাপের পরাক্রমে পৃথিবীর এখন তেমান অবস্থা, ইহা বলা অতি সামান্য কথা; বিস্তৃত পৃথিবীর এখন সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব, ইহাই আমি দেখিয়াছি। পুরাতন ধর্ম্মভাব ক্রমশঃ শ্রীহীন হই-তেছে, দুই একটি নূতন ধর্ম্মের অভ্যুত্থিত হইতেছে। আপনি একবার স্থির-

বুদ্ধিতেই বিবেচনা করুন, এ অবস্থায় প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে; যেরূপ হইতে পারে তাহাই আমি দেখিয়াছি। সমস্ত পৃথিবীর স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে হইলে বহুদিন লাগিবে, তত আমি বলিব না। সংক্ষেপে যাহা আমি বলিলাম, তাহাতেই সার কথা ব্যক্ত হইল। একটু বিস্তৃতরূপে আমি বলিব, ভারতবর্ষের কথা। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতক্ষেত্রে ধর্ম্ম এখন সঙ্কুচিত হইতেছে, অধর্ম্ম প্রবল হইতেছে, সত্যের সমাদর হ্রাস হইতেছে, যাগযজ্ঞ বিলুপ্ত হইতেছে, ভারতের কেহই এখন তপস্য করে না, ব্রাহ্মণেরা এখন নিরগ্নিক এবং অর্থলোভী হইতেছে, কমলার প্রিয়পুত্রগণ অধর্ম্মপথে বিচরণ করিয়া কেবল অহঙ্কারের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতেছে, মানবগণ মানবীগণের নিতান্ত বাধ্য হইতেছে, মানবীগণ সতীত্বধর্ম্ম ভুলিয়া যাইতেছে, প্রলয়ঙ্করী অবলাকুল দিন দিন প্রবলা হইয়া উঠিতেছে, সন্তানেরা পিতৃমাতৃভক্তি বিসর্জ্জন দিতেছে, গৃহে গৃহে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটিতেছে, এই সকল পাপে এবং আনুষঙ্গিক নানাপ্রকার পাপে ধরণী দিন দিন শস্য হারা হইতেছে, গাভীগণ দুগ্ধহারা হইতেছে, তরুগণ ফলহারা হইতেছে, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, অনৃতবাদ, চৌর্য্য, ব্যভিচার এবং বেশ্যাসক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতে এখন ধর্ম্মের নামমাত্র আছে, ধর্ম্ম যেন মানের ভয়ে লোকসমাজ হইতে পলায়ন করিয়াছে, এইরূপ আমার মনে হয়। অবস্থা যখন দেখিয়াছি, তখন পলকে পলকে আমার লোমহর্ষণ হইয়াছিল, আমি মনে করিয়াছিলাম, আর বৃদ্ধি না হইলে ভাল হয়। হে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা! প্রথমে তুমি বটপত্রে ভাসিয়াছিলে, এই সময় একবার বটপত্রে ভাসো। পৃথিবী পাপভারাক্রান্ত।”

নারায়ণ বলিলেন, “নারদ! তোমাকে আমি অভ্রান্ত বলিয়া জানিতাম, দেখিতেছি তুমি নিতান্ত ভ্রান্ত। এখনি কি পাপের ভার বৃদ্ধি হইয়াছে? যে যে লক্ষণ তুমি বলিলে, তাহা ত বহুপূর্ব্বেই ভবিষ্যপুরাণে ভবিষ্যদ্বাণী হইয়া রহিয়াছে; পুরাণবাক্যের ভগ্নাংশমাত্র এখনো সিদ্ধ হয় নাই; অনেক বাকী। কলির পরমায়ু অনেক; পৃথিবীর সমস্ত লোককে ক্ষীণায়ু ও আচারভ্রষ্ট না করিয়া নিষ্ঠুর কাল ধর্ম্মের তৃপ্তিসাধন হইবে না; পাপের ভার আরও বৃদ্ধি হইলেই মহাপ্রলয় হইবে, এই সত্য তত্ত্বটি তুমি মনে করিয়া রাখ। যাহা যাহা তুমি বলিলে, তাহাত পুরাতন কথা, ভারতে নূতন যদি কিছু দেখিয়া থাক, বল।”

নারদ বলিলেন, “পদার্থ আছে, যাহা ছিল, তাহা নাই নূতন হইয়াছে।

অনেক নূতন আমি দেখিয়াছি, নূতনের ভাবগ্রহণ করিলে পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হয়। একটা নূতন তোমাকে আমি বলি,—ভারতের গৃহে গৃহে এক একজন প্রধান অভিভাবক আছে, তাহাদের আখ্যা হয় কর্ত্তা। প্রত্যেক গৃহেই কর্ত্তা আছে, কেবল দুইচারি জন অনাথা বিধবার বাড়ীতে কর্ত্তা নাই। কর্ত্তাগুলিকে বহু যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। কর্ত্তা যেখানে দরিদ্র, সেখানে একপ্রকার নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। কর্ত্তা যেখানে ধনশালী, সেখানে মদগর্ব্বে আধিপত্য যথেষ্ট, কিন্তু কর্ত্তা সংসার-নরকে নানাবিষয়ে যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য। সংসারের সকল কার্য্যেই কর্ত্তার অনুমতি আবশ্যক; কর্ত্তার কার্য্য অনেক, দায় অনেক, সঙ্কট অনেক। ধনশালী কর্ত্তার স্থির হইয়া থাকিবার সময় অল্প, প্রাতঃকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুগুলি আসিয়া কর্ত্তার ক্রোড়ে উঠে, পৃষ্ঠে উঠে, স্কন্ধে উঠে, মাথার চুল ধরিয়া টানে, কেহ কেহ গাত্রে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া দেয়, অম্লানবদনে কর্ত্তাকে তাহা সহ্য করিতে হয়, উৎপাতের বিনিময়ে শিশুগুলিকে জলপানি দিতে হয়; সংসারের দৈনিক ব্যবহারের দ্রব্যগুলির তালিকা রাখিতে হয়, পরিবারের সকলের প্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবস্থা করিতে হয়, একে একে প্রায় সকলকার্য্যই কর্ত্তার চক্ষু, কর্ণ ও হস্তের গোচরীভূত করিতে হয়, পরিবারের যাহা যখন আবশ্যক, কর্ত্তাকে তাহা জানাইতে হয়, পল্লীতে বিরোধ হইলে কর্ত্তাকে আহ্বান করে, উৎসব হইলে, কর্ত্তার নিমন্ত্রণ হয়, বিপদ হইলে কর্ত্তাকে ডাকে, বাড়ীতে দুর্ঘটনা হইলে শান্তিরক্ষক আসিয়া কর্ত্তাকে ধরে, পূর্ব্বের ঋণদায়ে কর্ত্তা দায়ী হয়। গরীব কর্ত্তারও এই সকল ঝঞ্ঝাট আছে, তাহাদের পক্ষে তাহা অধিক কষ্টকর, অধিক গুরুতর, ধনবানের পক্ষে কিছু লঘু, এইমাত্র ইতরবিশেষ। বলিয়া আসিয়াছি, পিতৃমাতৃভক্তির হ্রাস হইতেছে, তাহারও দৃষ্টান্ত এক একজন কর্ত্তা। যাহারা উত্তরাধিকারী হইবে, তাহারা যৌবনপ্রাপ্ত হইলে কর্ত্তাকে অবজ্ঞা করে, কর্ত্তার উপদেশের বিপরীত কার্য্য করে, শীঘ্র কর্ত্তার লোকান্তর হইলে তাহারা নিশ্চিন্ত হয়, এইরূপ তাহাদের মনের ভাব; লক্ষণ দেখিয়া অনেকস্থলে সেইরূপ ভাব আমি বুঝিতে পারিয়াছি। এরূপ ভাব যেখানে, সেখানে পিতৃভক্তি থাকিতেই পারে না, পিতৃভক্তির অভাবে মাতৃভক্তিও দূরে যায়। আমি মনে করিয়াছি—কর্ত্তাগুলি একরূপ কষ্টভোগী দুর্ভাগ্য জীব। তাহাদের অস্তিত্ব না থাকাই ভাল।

ঈষৎ হাসিয়া নারায়ণ বলিলেন, "এই তুমি নূতন দেখিয়া কর্ত্তার অস্তিত্ব লোপ

অতি আবশ্যক। কর্ত্তা না থাকিলে জগতের কোনকার্য্যই সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয় না। দৃষ্টান্তই জগৎ। আমাকে লোকে ঈশ্বর বলে, আমি কিসের ঈশ্বর, তাহা আমি জানি না, আমার মস্তকের উপর, জগতের মস্তকের উপর, ত্রিদশের মস্তকের উপর, ত্রিলোকের মস্তকের উপর, একজন সর্ব্বাতিরিক্ত সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বময় ঈশ্বর আছেন, তাঁহারও আখ্যা কর্ত্তা। ত্রিলোকের কর্ত্তা তিনি; তাঁহার প্রকৃতি চরাচর পরিব্যাপ্ত। তিনি আছেন এইবিশ্বাসে ত্রিলোকবাসীরা অসৎকার্য্যে ভয় করে, সদসৎ বিবেচনা করে, অজ্ঞানেও উপরদিকে চাহিয়া কার্য্য করে; কর্ত্তা নাই এই বিশ্বাসে থাকিলে—তিনলোকের বিশেষতঃ নরলোকের যে কি দুর্গতি হইত, তাহা অনুমান করিয়া দেখ। এই নিমিত্তই আমি বলিতেছি, সর্ব্বত্রই কর্ত্তার অস্তিত্ব একান্ত প্রয়োজন। নারদ! কর্ত্তার সম্বন্ধে যাহা তুমি বলিলে, তাহা একপ্রকার রহস্য; সুতরাং কর্ত্তার কথাও আমার নূতন বোধ হইল না; যদি কিছু নূতন দেখিয়া থাক, বল।"

কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া নারদ বলিলেন, "ঠাকুর! তোমার কাছে নূতন কিছুই নহে; তুমিই নূতন, তুমিই পুরাতন, তুমিই সব। পৃথিবীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সংক্ষেপে তাহাই আমি বলিলাম, ইহাতে কিন্তু কোন ফল হইল না। আমি ভাবিয়াছিলাম, তোমার কৃপায় পৃথিবীর পাপীলোকের পাপপ্রবৃত্তির লাঘব হইবে, কিন্তু তুমি বলিলে, "এখনও পাপের পরিণামের অনেক বিলম্ব, ইহা যখন স্থির, তবে আমি আর এখন সে বিষয়ে তোমার সহিত তর্কবিতর্ক কি করিব? বিদায় হইলাম।"

এই বলিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক দেবর্ষি নারদ বিদায় হইলেন; কমলার মুখপানে চাহিয়া নারায়ণ মৃদু মৃদু হাস্য করিলেন।

পাগল।

সূচনা।

প্রেমলতা। আচ্ছা, ঠাকুরঝি! তুই এত পাগলকে ভালবাসিস্ কেন? কোন পাগল দেখ্‌লেই, তাকে ডেকে খেতে দেওয়া, তার সঙ্গে গল্প করা, এতে তোর এত টান কেন?

লীলা। আমি বড় মজা পাই, ওরা বেশ মানুষ, হাসিকান্না সব সমান। তুমি মার, সে কাঁদ্‌তে ভুলে গিয়ে হয়ত হেসে ফেল্‌বে, আবার মজার গল্প বল, হয় ত সে হাউ হাউ ক'রে কাঁদ্‌বে, আমার পাগল বড় ভাল লাগে।

প্রেম। তাই নাকি? ওমা! একেবারে যে ক্ষেপ্‌লি দেখ্‌ছি! বেশ কথা! আজ তাঁকে বলে, তোর জন্যে ভাল পাগল আনিয়ে দেব। দেখিস্ যেন বে' করে ফেলিস্ নি।

এই সময়ে লীলার প্রফুল্ল আননখানি যেন কি একটা অব্যক্ত যাতনায় পাণ্ডু-বর্ণ ধারণ করিল। সে বদ্ধ যাতনার বেগ একটী দীর্ঘ নিশ্বাসে পর্য্যবসিত হইল। সেই সরল রহস্যালাপ হঠাৎ যেন কি একটা বাধা পাইয়া থামিয়া গেল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। আজ পূর্ণিমার রাত্রি, আকাশে চাঁদ আজ ভরাবুকে ভরা হাসি লইয়া সগর্ব্বে উঠিতেছে। স্থান কলিকাতা। একটী অনতি বৃহৎ ত্রিতল বাটীর ছাদের উপর বসিয়া এই দুইটী যৌবনের প্রস্ফুটমানা মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত কথোপকথনে নিমগ্না ছিল। প্রেমলতা হঠাৎ কি বলিতে কি এক অসঙ্গত কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, ভাবিয়া নিজেও বড় লজ্জিতা ও দুঃখিতা হইয়াছে। সে লীলাকে বড় ভালবাসে, কেন ভালবাসে তাহা সে জানে না; ভালবাসে কিনা তাহাও বলিতে পারে না। বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে আসিয়াই সে লীলাকে তাহার সাথী পাইয়াছে। উভয়েই সমবয়স্কা, উভয়েই রসিকা, উভয়েই শিক্ষিতা, সুন্দরী ও সরলা; কাজেই দুজনায় এত মিল। সমানে সমানে যথার্থ প্রণয়ই জগতের রীতি। ছোট বড়য় মিশ খায় না; ইহারা উভয়েই এক প্রকৃতির, সেইজন্যই ইহাদের ভালবাসা এত গাঢ় হইয়াছিল। আজ দৈবাৎ লীলার মনে ব্যথা দিয়া প্রেমলতা বড়ই বেদনা পাইয়াছে। লীলার মনটী কেমন করিয়া আবার ভিজাইবে, সেইজন্য "প্রেম" আজ এক দৃষ্টে তার মুখপানে চাহিয়া আছে; কত হৃদয়ের কথা বলিতে যাইতেছে, আর কে যেন তাহার

মুখ চাপিয়া ধরিতেছে ; বলিতে গিয়া বলা আর হয় না। তাহার কথায় কি যেন একটা লীলার জীবনের গুপ্তরহস্য হঠাৎ দেখা দিয়া চলিয়া গিয়াছে, ইহা সে বুঝিয়াছিল, কিন্তু লীলাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে আর সাহসে কুলাইতেছে না ; যদি আরও সে মনে ব্যাথা পায়, প্রেমলতা ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, একটা উপায় উদ্ভাবন করিতে তাহার মস্তিষ্ক যেন এখন সম্পূর্ণ অক্ষম ; বহুকষ্টে যদি একটা কি বলিতে যাইতেছিল,—ওকি ! সে কি দেখিল ; এ যে লীলার দুটী গণ্ড ভাসিয়া জলে প্লাবিত হইয়াছে, লীলা একদৃষ্টে চাঁদের পানে তাকাইয়া যেন কি মর্ম্মস্পর্শী আকুল আহ্বান নয়নের জলে ধৌত করিয়া কাহাকে কি নীরব ভাষায় জানাইতেছে।

এবার প্রেমলতা আর থাকিতে পারিল না, তার ক্ষুদ্র হৃদয়টি লীলার উদ্বেলিত হৃদয়ে মিশাইল। চারিটী চোখের চারিটী ধারায় যেন কি পরস্পর কথা কহিল, সে কথায় লীলার সংজ্ঞা হইল। সে তাড়াতাড়ি নিজের চক্ষের জল মুছিয়া হাসির ছল করিয়া বলিল, "ছি লতা, কাঁদ্‌ছিস্‌? দেখ আজ কেমন চাঁদ উঠেছে ; ইচ্ছা করে, দুজনায় সারারাত এখানে বসে গল্প করি, বেশ রাত্‌।"

লতা একবার লীলার মুখপানে চাহিল, দেখিল, লীলা আত্মব্যথা গোপন করিতে চেষ্টা করিয়া তাহাকে অন্য কথায় ভুলাইবার প্রয়াস পাইতেছে, ইহাতে "লতার" কষ্ট দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, সে লীলাকে আরও বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। লীলা এবার হারিল, তাহার হৃদয়ের দৃঢ়তা শিথিল হইল, বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, উভয়েই প্রাণভরিয়া কিছুক্ষণ কাঁদিল, হৃদয়ে হৃদয়ে তড়িৎ খেলিয়া গেল, ব্যথীতে ব্যথীতে সহানুভূতির ঢেউ খেলিল, উভয়েই যেন শান্তি পাইল।

এমন সময়ে নীচে হইতে কে ডাকিল, "বৌমা ! অনেক রাত হয়েছে, খাবে এস। লীলা কি উপরে আছিস্‌?"

ভগ্নস্বরে লীলা বলিল, "যাই মা।"

হায় ঈশ্বর ! সংসারে কেহ একটু শান্তি পায়, ইহা বোধ হয়, তোমার অভিপ্রেত নহে। তোমার কার্য্যের উপরে কাহারো হাত নাই ; কাজেই কিছুই বলিবারও নাই। যা হয় কর, তোমার খেলা কে বুঝিবে?

প্রথম পরিচ্ছেদ।

খুলনার বাসাবাটী।

(কর্ত্তা ও গিন্নি)

গি।—হাঁগা, কেশবপুরে কি চিঠি লিখেছ?

ক।—আ রে, তুমি যে আমাকে ক্ষেপালে দেখ্‌ছি। আফিস হ'তে এলুম, একটু বোস্‌তে দাও, আগে চোগা চাপকান্ খুলি, তার পর বল; ভাবনাটা যেন তোমারই একচেটে; এ পর্য্যন্ত চিঠি লিখে লিখে হায়রান্ হয়ে গেলুন, তবু যদি মেয়েটার একটা কিনারা করতে পাল্লুম। কেশবপুরের পত্র পেয়েছি, তাঁরা বলেন, ১৫০০৲ টাকা নগদ ও জামাইয়ের ঘড়ি ঘড়ির চেন ও হাজার টাকার গহনা দাও ত বিয়ে হয়।

গি।—ছেলেটী কি পাশ? টাকাকড়ি কেমন? বিষয়-আশয় আছে ত? দেখ্‌তে কেমন? ছেলে ভাল ত?

ক।—বলে যাও, আর আছে? ষ্টকিং দুটো ততক্ষণ খুলে নিই; হ্যাঁ, কি বোল্‌ছিলে?—

(১) ছেলেটী কি পাশ?—এণ্ট্রান্স পাশ।

(২) টাকাকড়ি, কেমন?—আমার চেয়ে বড়লোক্।

(৩) বিষয় আশয়?—নবাবের আমলের একখানি চারকুঠারী বাড়ী মাত্র।

(৪) দেখ্‌তে কেমন?—ময়ুরের উপর বসান ঠিক যায় না, তবে ঘোড়ার গাড়ীর কোচ্‌বাক্সে চল্‌তে পারে।

(৫) ছেলে ভাল ত?—মা বাপকে মারে না। এখন সব শুন্‌লে ত?

গি।—তোমার সকলটাতেই তামাসা। শুনে গা জ্বলে যায়। যে মেয়েটাকে দেখে সেই বলে, "ওমা! এত বড় হয়েছে, এখনও বিয়ে দাও নি?" আমি লজ্জায় মরে যাই। তোমায় এ মাসের মধ্যে একটা জায়গায় ঠিক কর্‌তেই হবে।

ক। কেন, কেশবপুরের এটী পছন্দ হল না?

গি। বিধাতা যদি ওইখানেই মাপিয়ে থাকেন, তাই হবে, তবে দেখেশুনে অত কাঙ্গালের ঘরে দেওয়া যায় কি?

ক। আচ্ছা, তোমার বের কথা মনে পড়ে?

গি। কেন পড়্‌বে না?

ক। তখন আমাদের কি ছিল, বল ত?

গি। তখনকার কথা আর এখনকার কথা সমান হল? তখন সাতসিকা করে চালের মন ছিল, সব সুবিধা ছিল, সামান্য ইংরাজী জানলেই মোটা মাহিনার চাকরী হ'ত, এখন কৈ হোক দেখি। তোমারি কাছে ত সেদিন একজন বি এ, পাশ ২৫৲ পঁচিশ টাকা মাহিনার কেরাণীগিরির জন্য উমেদারী করতে এসেছিল না?

ক। ভাল, তাই যেন হল; মেয়ের কপালের কথা মান ত? না— তাও মান না?

গি। তা মান্‌ব না কেন?

ক। তা হলেই হল। যদি কপালে থাকে, তা হ'লে একটা লক্ষ্মীছাড়ার হাতে দিলেও সুখে থাকবে; আর তা যদি না থাকে, রাজরাণী করে দিলেও সুখ পাবে না।

গি। তা কি বুঝিলে? তবে মন যে মানে না, একটু ভাল ঘরে, ভাল খাবে, ভাল পরবে, এই রকম দেখেই ত দিতে হয়। এ আর কার না সাধ হয়। আমরা মেয়েমানুষ, বলে খালাস মাত্র, তবে কি করি, বড় ভাবনা হয়েছে, তাই তোমায় বারবার বলি।

ক। সাঁতরাগাছীর আজ সংবাদ পেলুম।

গি। কি? কি? ভাল ত? ভগবান করুন, ওখানে হলে বড় ভাল হয়।

ক। চিঠিখানি শুন্‌বে? তোমার মামাতো ভাইয়ের সম্বন্ধী লিখেছে।

গি। পড় শুনি।

ক। (পত্রপাঠ)

মান্যবর শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বাগচী মহাশয়
সমীপেষু।

নমস্কার নিবেদনমিদং,

এখানকার সুরেশ বলিয়া ছেলেটী ভাল, কিন্তু বড় মাতাল; বি, এ, পাশ, বাপ ১৫০ দেড়শত টাকা মাহিনা পায়, দাদা আলিপুরের উকীল, কোম্পানীর কাগজও পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার আছে। ছেলে মাতাল, তবে একেবারে বে হেড নয়।

আর নরেন বলিয়া ছেলেটীর এক বৃদ্ধা মা আছেন, ছেলেটী এক বড়লোকের সাহায্যে এল, এ, পড়ছে, এণ্ট্রান্সে বৃত্তিও পাইয়াছিল। যদিচ গরীব, তথাপি আমার বিবেচনায় এইটী যদি বলেন ত স্থির করি। অত্রস্থ মঙ্গল। মহাশয়ের

কুশল প্রার্থনীয়—ইতি।

নিঃ শ্রীরমানাথ সান্যাল।

এখন বল দেখি, কোনটী তোমার পছন্দ হয় ?

গি। আমি আর কি বল্‌ব, তুমি যা ভাল বুঝ, তাই কর; তবে সুরেশের বে হলে বোধ হয় ওটুকু দোষ সেরে যেতে পারে।

ক। না, কখন না। তুমি যেমন গরীবের ঘরে মেয়ে দিতে নারাজ, আমিও তেমনি নেশাখোরের হাতে লীলাকে দিতে নারাজ। তার চেয়ে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেব, সেও ভাল।

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গৃহিণী নিম্নতলে নামিয়া গেলেন; আর কর্ত্তা মহাশয় নস্যদানি লইয়া মুহুর্মুহুঃ নস্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহা আজ ২৩ বৎসরের কথা হইবে। পূর্ব্বোক্ত পত্র হইতেই বেশ জানা যায় যে, ইঁহার নাম অম্বিকাবাবু, কিন্তু আমি ইঁহার বিশেষ জানি। ইঁহার নিবাস কলিকাতার কোন পল্লীতে ছিল। বয়স আন্দাজ ৫২ কি ৫৩ বৎসর হইবে। সংসারে মা, দুই ভাই ও তাঁহাদের সন্তান সন্ততি প্রভৃতি এবং নিজের স্ত্রী, একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা উপস্থিত বর্ত্তমান। লীলা জ্যেষ্ঠা, বেলা কনিষ্ঠা। লীলার বয়স এখন একাদশ বৎসর; কাজেই বিবাহ না দিলে চলে না।

পিতামাতার পূর্ব্বোক্ত কথোপকথনের সময় লীলা দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণনয়নে পিতামাতাকে দেখিতেছিল ও তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। কেমন একটা লজ্জা আসায় সে তাহাদের নিকট যাইতে পারে নাই। বিশেষতঃ তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছিল, সে যেন ঘোর একটী অন্যায় কার্য্য করিয়াছে—করিয়া যেন চোরের ন্যায় কপাটের পিছনে দাঁড়াইয়া অতি সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া দেখিতেছিল। এখন মা নীচে যাইলে সে ছুটিয়া বাপের কাছে গেল ও বলিল, "হ্যাঁ বাবা এখনও পা ধোন্ নি?"

ক। না মা, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

এই মুস্কিল—লীলার গলা আটকাইয়া গেল, সে ত মিথ্যা কথা বলিতে শেখে নাই, বিশেষতঃ জানিয়া শুনিয়া কেমন করিয়া কথা উল্টাইয়া বলিবে? সে কেবল একদৃষ্টে পিতার মুখপানে চাহিয়া রহিল। ক্ষণেক পরে কর্ত্তা বলিলেন, "কি দেখ্‌ছিস্?"

লীলা কোন কথা না বলিয়া কেবল একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল,

অম্বিকা বাবু সে নিশ্বাসের অর্থ বুঝিলেন, বুঝিয়া নিজেও একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ক্ষণপরে লীলা জলপূর্ণ গাড়ু ও গামছা আনিয়া পিতার পা ধোয়াইয়া গামছা দিয়া পা দুটী মুছিতে লাগিল। এমন সময়ে গৃহিণী রেকাবী করিয়া কিছু জলখাবার আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া আসন পাতিয়া দিলেন। লীলা ইত্যবসরে পান সাজিতে চলিয়া গেল। অম্বিকাবাবুও জলযোগে বসিলেন। খাইতে খাইতে গৃহিণীকে বলিলেন, "দেখ—লীলার সাক্ষাতে কখনও তার বিবাহের কথার আন্দোলন করিও না। সে আমার কষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে; আমার দৃঢ়বিশ্বাস সে আজ আমাদের কথোপকথন শুনিয়াছে ও আন্তরিক দুঃখিতা হইয়াছে। তার মুখখানি মলিন দেখ্‌লে মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়।"

গি। তা হলে কি কর্‌বে স্থির কর্‌লে?

ক। আমি এখনও কিছু ঠিক করিতে পারি নাই, দেখি ভগবান কি করেন, নিয়তির উপর আর কার হাত আছে!

গি। আজ খোকা বল্‌ছিল যে, তার কে একটী স্কুলের বন্ধু আছে। তারা বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন। ছেলেটী কিছু ছোট, বোধ হয় ১৫।১৬ বৎসর বয়স হবে। তার একটা খোজ নিলে হয় না?

ক। তুমি তা হলে মস্ত ঘটক জুটিয়েছ, শিবেও দেখ্‌ছি তা হলে মুরুব্বি হয়ে পড়্‌ল। যাক্ এখন একবার বাহিরে যাই, রামকৃষ্ণ সান্যালের আস্‌বার কথা আছে।

এমন সময়ে লীলা পান আনিয়া দিল, কর্ত্তা তাম্বুল চর্ব্বন করিতে করিতে বাহিরে গেলেন।

—— :•••: ——

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রামকৃষ্ণ সান্যালের বৈঠকখানা।

সাধারণ ভদ্রলোকের যেমন এক একটী ছোটখাট বৈঠকখানা হয়, একটি ভদ্রপল্লীর মধ্যে রামকৃষ্ণ বাবুও সেইরূপ একটী বাড়ী করিয়াছেন ও চারি আড়ার একটী বৈঠকখানা করিয়াছেন; আর অতি অল্প আয়, কোনরূপে সংসারনির্ব্বাহ

করেন। প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত ঘটনার দুই দিবস পরে, এই বৈঠকখানায় রামকৃষ্ণ বাবু ও তৎসহচর যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কি অস্পষ্টভাবে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। রামকৃষ্ণ বলিলেন, "সেই বেশ, বেটা যেমন আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, তেমনি ভাবে তাকে দমাতে হবে। এখন আর আমাদের সঙ্গে কথা কয় না!"

যো। তুমি যে পরশু খুলনায় তার বাসায় গিয়েছিলে; কি করে এলে?

রা। যা করিছি, তা আর আধ ঘণ্টা পরেই জান্‌তে পার্‌বে। সে এখনই আসবে, মনে থাকে যেন, আমি যে কথা বল্‌ব—তুমি তার কিছু জান আর না জান, আমার কথার সমর্থন কর্‌বে, সে তোমায় খুব বিশ্বাস করে।

যো। তা আর তোমায় শেখাতে হবে না হে। আমি কি করি, তাই দেখ। আরে,—আমি চিরকাল জানি, অম্বিকেটা মূর্খ, তবে কপালজোরে দেড়শ টাকা বেতন পাচ্চে।

রা। আর ছাই তার মাইনেতে কি হয়? উপরি পাওনা কত!

এইরূপ ভাবে এই দুইজনে কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে তৃতীয় শ্রেণীর একখানি গাড়ী আসিয়া দ্বারের নিকট থামিল। তখন উভয়েই ব্যস্ততার সহিত বাহির হইয়া বলিলেন, "এস, এস, তোমার জন্যে এতক্ষণ বসিয়া আছি!"

যিনি গাড়ী হইতে নামিলেন, তিনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত অম্বিকাবাবু। সকলে বৈঠকখানায় গিয়া উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রামকৃষ্ণ বলিলেন, "তোমার জন্য যে কত চেষ্টা কত দিকে করেছি, তা ভাই আর কি বল্‌ব। উপস্থিত রাধাপুরের জমীদার মতিলাল মৈত্রের একটী ছেলে আছে। একটু বোকা গোছের, কিন্তু অগাধ সম্পত্তি। তা হলেইবা মেয়েটাও সুখে থাক্‌বে, তাই তোমার যথেষ্ট। কি বল হে যোগেন?

যো। তা আর বল্‌তে। আমি মৈত্রমহাশয়কে খুব চিনি, ঋষিতুল্য লোক। অম্বিকেভায়া এ সুযোগ ছেড়োনা। রামদাদা যা বল্‌ছে এ অতি সুন্দর প্রস্তাব।

অ। তোমরা যখন এ বের ঘটক, তখন আর আমার ভাবনা কি?

রা। দেখ, ঘটকালী ত করছি, কিন্তু বিদায়টা যেন ফাঁকি দিও না।

যো। নিশ্চয়ই, তবে বিয়েটা হচ্ছে কবে?

রা। আমিত বলি, এই আষাঢ় মাসেই দিয়ে ফেলুক। কি জানি পাত্রটি হাত-

ছাড়া করলে, এমন আর মৈলা ভার হবে।

অ। বেশ ত, তাহলে একটা দিনস্থির করে, আমায় পত্র লিখ, গিয়ে আশীর্ব্বাদ করে আসা যাবে।

ঘো। সেই কথাই ভাল। একটা দিনস্থির করে, রামদাদা অম্বিকাকে চিঠি দিও, তা হলেই সব ঠিক হবে। আজ তা হলে এই পর্য্যন্ত থাক্‌ল।

অম্বিকাবাবু এই সময়ে পকেট হইতে ঘড়ীটি বাহির করিয়া দেখিলেন, ৫টা বাজে; ট্রেণের সময় আর বেশী নাই; অতএব এইরূপ কথার নিস্পত্তি অম্বিকাবাবু পুনরায় ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া শিয়ালদহা মুখে রওনা হইলেন।

রা। কেমন,—ঠিক হয় নি?

ঘো। বেশ হয়েছে। বেশ মতলব্ বাহির করেছ। তোমায় আর কি, বলব?

রা। আরে, মতি মৈত্রের ছেলেটা আজ ৫ বৎসর হতে পাগল হয়েছে। একবার এ বিয়েটা দিতে পার্‌লে হয়। তখন দেখবো চাঁদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয় কি না।

ঘো। সেবার কি আমার কম অপমানটা করেছে। সাঁত্রাগাছীর সুরেশের সঙ্গে বিয়ের ঠিক করাল; শেষে বল্‌লে কিনা ছেলেটা মাতাল, ওর সঙ্গে লীলার বিয়ে দেব না। এবার দেখুক মজা।

রা। সে ত দূরের কথা, আমার ভাগ্‌নের সঙ্গে বে'র ঠিক করে দিলুম, বল্লে কিনা, "গরীব, মেয়েটা খেতে পাবে না।" দেখ দেখি আক্কেলটা।

এইরূপ উভয়ে কথোপকথন চলিতে লাগিল। এ বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। জগতে এরূপ বিষকুম্ভ পয়োমুখের অভাব নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

খুল্‌নার বাসাবাটী।

রামকৃষ্ণ বাবুর বাটী হইতে অম্বিকাবাবুরআসার পর একমাস চলিয়া গিয়াছে। রাজাপুরে বিবাহ দেওয়া গিন্নির মত হয় নাই, বলিয়া তিনি শ্রীরামপুরে একটী পাত্রের চেষ্টা করিতেছেন, রামকৃষ্ণের বাটী হইতে আসিয়া গিন্নিকে রাজাপুরের কথা

বলায় গিন্নি বলিলেন যে, রাজাপুর একে পাড়াগাঁ, তার উপর যাতায়াতের সুবিধা নাই, তায় অনেক দূর, ওখানে বিবাহ দিয়া কাজ নাই, তুমি একবার শ্রীরামপুরে চেষ্টা দেখ। কাজেই গিন্নির কথা ঠেলিতে পারিলেন না, বিশেষতঃ রাজাপুরে বিবাহ দেওয়া অম্বিকাবাবুর আন্তরিক ইচ্ছাও ছিল না। এখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, গিন্নি ও পুত্র শিবনারায়ণ চুপ করিয়া দালানে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে অতি বিষণ্ণবদনে অম্বিকাবাবু আসিয়া একটী মর্ম্মভেদী উষ্ণনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ "আর বুঝি লীলার বিয়ে দিতে পার্‌লুম না" বলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

শিবনারায়ণ বেগতিক দেখিয়া দ্বিতলে চলিয়া গেল, গিয়া দেখে লীলা একখানি বই পড়িতেছে। তখন গম্ভীর মুখ করিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, "তোর জন্য আর মান থাকল না। বাবা কত জায়গায় ঘুরে ঘুরে আজ হতাশ হয়ে মাথায় দিয়ে বসে পড়্‌লেন। তোর জন্যই ত যত দায়।" কথা কয়টী লীলার ক্ষুদ্র হৃদয়ে বড় লাগিল, তাহার বুকের ভিতর গুম্‌টাইয়া গুম্‌টাইয়া কান্না আসিতে লাগিল। সে আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিল না, সে দৌড়িয়া চলিয়া গেল ; ছাদে গিয়া খানিকটা প্রাণভরিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিল। ভাবিল, কেন বিধাতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া স্নেহের পিতামাতাকে এত কষ্ট দিতেছেন।

এ সময় তাহার মৃত্যু হইলেই যে ভাল ছিল। বালিকা তাহার ক্ষুদ্র প্রাণটী লইয়া কত কথা মনোমধ্যে তোলাপাড়া করিল, অবশেষে যেন হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। এইরূপ ভাবে সে যে কতক্ষণ বসিয়াছিল, তাহা সে জানে না। উন্মুক্ত আকাশতলে ত সে ইতিপূর্ব্বে উন্মুক্ত প্রাণে খেলা করিয়াছে। কোন কষ্টই ত সে পায় নাই, কোন ভাবনাই ত তাহার ছিল না। আজ সে তাহার অশ্রুভারাক্রান্ত নয়ন দুটী লইয়া আপনাকে শতধিক্কার দিতেছে, ঠিক এই সময়ে ছোট বোন "বেলা" আসিয়া বলিল, "এই যে দিদি, তুমি এখানে। এস, মা তোমায় ডাকৃছে।" লীলা ভগ্নহৃদয়ে ছোট ভগ্নীর মুখে দুটী চুমু খাইয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া নামিয়া গেল। হঠাৎ বাহিরে কে,—"অম্বিকা বাসায় আছ? অম্বিকা বাসায় আছ" রবে ডাকিতে লাগিল। নীচে হইতে অম্বিকাবাবু তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া দেখেন, রামকৃষ্ণবাবু ও যোগেন দণ্ডায়মান। রামকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "কি হে! তোমার ব্যাপারখানা কি? আমি এদিকে সব স্থির কল্লুম, আর

তোমার কোনই চেষ্টা নাই, কি ব্যাপার বল ত ?

ভিতরে এস—সব বল্‌ছি, বলিয়া অম্বিকাবাবু তাঁহাদের বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন ও এতাবৎ যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা অকপটে খুলিয়া বলিলেন। তখন রামকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "স্ত্রীলোকেই যত বিঘ্নের গোড়া, এখনও যদি বল, তাহা হইলে উপায় আছে, নতুবা পাত্রটী হাতছাড়া হইয়া যাইবে।"

অ। না আর আমায় মিষ্ট মিষ্ট ভর্ৎসনা করিও না, আমি আগামীকল্য প্রাতেই রাজাপুরে রওনা হইব ও একেবারে পাত্র-আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিব। অতএব অম্বিকাবাবু সে রাত্রে তাঁহাদের নিজের বাসায় রাখিলেন ও পরদিন প্রত্যূষে রাজাপুরে রওনা হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার বাটীতে।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর * শ্রাবণ মাসেই রাজাপুরের মৈত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মৈত্রের সহিত লীলার শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

বিবাহের পর অম্বিকাবাবু রামকৃষ্ণের ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিলেন ও দারুণ অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। হায়, অভাগিনী লীলা! এখন বুঝিতেছ না—কি মর্ম্মবেদনা তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার করিতে চলিতেছে। যাহা হউক অম্বিকাবাবু তাঁহার দুই ভ্রাতাকে ভিন্ন আর কাহাকেও এ কথা বলেন নাই। এই রূপে বৎসরের পর বৎসর অতীত হইতে লাগিল; লীলাকে আর শ্বশুরবাটী হইতে লইতে আসে না বা অম্বিকা বাবুও লীলাকে আর শ্বশুরবাড়ী পাঠাইবার নামও করেন না। গৃহিণী, মাতা ও অন্যান্য স্ত্রীলোকগণকে বলিয়াছেন যে, "বড় লোকের সহিত আর সম্বন্ধস্থাপন করিবেন না, কারণ মৈত্র মহাশয় লীলাকে আর বাটীতে আনিবেন না ও অক্ষয়ের আবার বিবাহ দিবেন।" সকলে তাহাই জানে। কিন্তু অক্ষয় যে ঘোর উন্মাদ, তাহা কেহই জানে না।

* অম্বিকাবাবু কলিকাতায় বদলী হওয়ায়, সপরিবারে নিজ বাটীতে আসিয়াছেন।

ক্রমশঃ ছোট বালিকা লীলা যৌবনে পদার্পণ করিতে লাগিল। সংসারের রহস্য কিছু বুঝিতে পারিল। সে দেখিল, পাড়ার মেয়েদের বিবাহ হইতেছে; দিন কয়েক পরে তাহারা শ্বশুরালয়ে যাইতেছে; তাহাদের যেন কত আনন্দ, কত উৎসাহ। সকলেই স্বীয় স্বামীর কথা, শ্বশুরের কথা শ্বাশুড়ীর কথা, পরস্পর আলোচনা করে, কিন্তু কৈ তাহাকে ত কেউ ডাকে না, সেও ত বিবাহিতা। মনে কত কি ভাবিতে লাগিল। সেও কখন কাহারও সহিত মিশিত না, কেবলমাত্র এই ভয়, "পাছে কেহ তাহাকে তাহার পিত্রালয়ে থাকার কথা ও শ্বশুরালয়ের ব্যাপার জিজ্ঞাসা করে; সেও ইহার কিছুই জানে না। বিবাহ-রাত্রে যাহা মাত্র স্বামীকে দেখিয়াছে, তাহাও ভাল করিয়া লজ্জায় দেখিতে পারে নাই। সে কেমন করিয়া স্বামীর বিষয় বলিবে। এক একবার ভাবে ঠাকুর মাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তাহার শ্বশুরবাড়ীর কে কেমন আছে, ইত্যাদি; কিন্তু লজ্জা তখনই আসিয়া তাহার বাক্‌রোধ করিয়া ফেলে; আর জিজ্ঞাসা করা হয় না। মনের কথা মনেই চাপা দিয়া রাখে। যদি কখন তাহার শ্বশুরবাড়ীর কথা বাড়ীর ভিতর হয়, তখনই সে লজ্জায় সে স্থান হইতে উঠিয়া যায়, আর শোনা হয় না। সে কতবার মনে মনে ভাবিয়াছে, এ ছাই লজ্জা সে আর করিবে না, কিন্তু লজ্জাও এমনি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে যে, সে তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পায় না। বাটীর সকলেই তার পানে করুণনেত্রে তাকায়, সে ইহার কিছুই বুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু ইহার ভিতর যে একটা গূঢ়রহস্য নিহিত আছে, তাহা যেন তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে কে যেন সর্ব্বদাই ডাকিয়া বলিত। ক্রমশঃ চিন্তায় চিন্তায় আহার দেহের লাবণ্য মলিন হইতে লাগিল। অন্য কেহ ইহা লক্ষ্য করুক, আর নাই করুক, ইহা স্নেহময়ী জননীর চক্ষুর অগোচর রহিল না।

দৈবাৎ রাত্রে একদিন স্বপ্নে লীলা মৃদুস্বরে মাকে বলিতেছিল, "মা, আমার শ্বশুরবাড়ীর কে কে আছে, তাঁহারা কেহ আসেন না কেন?" মা তখন জাগিয়া ছিলেন; নিদ্রাঘোরে কন্যার এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, মার প্রাণ মেয়ের দুঃখে গলিয়া গেল; চক্ষে শতধারা বহিতে লাগিল, আলো জ্বালিয়া বার বার লীলার ফুটন্ত গোলাপসদৃশ মুখখানি দেখিতে লাগিলেন ও কতবার সস্নেহে ভগ্নহৃদয় লইয়া সেই মুখ-কমলে চুম্বন করিলেন। সহসা একফোঁটা জল লীলার গণ্ডে পড়িল, সে জাগিয়া উঠিল; দেখিল মা প্রদীপ জ্বালিয়া তার মুখপানে চাহিয়া কাঁদিতেছেন। কেন কাঁদিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিল না বটে, কিন্তু

মার চোখে জল দেখিয়া সে আর থাকিতে পারিল না, সেও কাঁদিয়া ফেলিল, করুণারূপিণী জননী তখন তাহাকে বক্ষে সাপটিয়া ধরিলেন, কথার মধ্যে লীলা ডাকিল, "মা" ! মা বলিলেন, "কি মা !"

লীলা। তুমি কাঁদ্‌ছিলে কেন ?

এ কথার উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। মার বুঝি আর উত্তর দিবার ক্ষমতা নাই, তিনি কেবল একদৃষ্টে কন্যার মুখপানে ক্ষণেক চাহিয়া উপর্য্যুপরি ক'টি চুমু খাইলেন। লীলা তখন যেন কিঞ্চিৎ সাহস পাইয়া বলিল, "বলনা মা, কি হইয়াছে ?"

মা ভাবিয়া পাইলেন না, কেমন করিয়া তাহার অদৃষ্টের কঠোর সংবাদ তাহাকে দিবেন ; ভাবিলেন, একে কন্যা দিন দিন চিন্তায় চিন্তায় মলিন হইয়া যাইতেছে, তাহার উপর এই নিদারুণ সংবাদে তাঁহাকে নিশ্চয়ই মর্ম্মাহত করিবে, হয় ত অকালে লীলা কুসুমবতী লীলাখেলার অবসান করিয়া অনন্তশূন্যে মিলাইয়া যাইবে। তাঁহার হৃদয় ঘন ঘন সে চিন্তায় কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু লীলা আজ নাছোড়, সে আজ লজ্জার আবরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাই আবার বলিল, "মা আমার কি হয়েছে বল, আমি সব সহ্য কর্‌তে পার্‌ব বল, আমার বড় ভাবনা হয়। হ্যাঁ মা, আমার শ্বশুরবাড়ী শুনেছি, সেই রাজাপুরে, সেখানে কে কে আছেন ?"

মা আর কি করিবেন, মেয়ে আজ আব্দার ধরিয়াছে, সে ত ছাড়িবে না ; বিশেষতঃ সে অত্যন্ত অভিমানী, না বলিলে হয়ত আর রজনী প্রাতে ভাল করিয়া খাইবে না, হাসিবে না, বেড়াইবে না। ইহাই ভাবিয়া, মনকে অতীব পাষাণ করিয়া বলিলেন, "মা ! তোমার সব আছেন, স্বামী আছেন, শ্বশুর আছেন, শ্বাশুড়ী আছেন, কিন্তু তাঁহারা বড়লোক, আর আমরা গরীব, সেইজন্য তাঁহারা তোমার বা আমাদের খোঁজ লন না। কর্ত্তা বড়লোকের ছেলে দেখিয়া বিবাহ দিলেন, তা তাঁর দোষ ছিল না ; তিনি বরাবরই গরীবের হাতে দিতে চাহিয়াছিলেন, আমিই কেবল জোর করিয়া বড়লোকের ঘরে তোমাব বিবাহ দেওয়াই ; আজ তার ফল এই। মা আমার ! মনে কিছু করো না, যদি ভগবান দিন দেন, তাহা হইলে স্বামীর ঘর কর্‌বে বৈ কি ? জগদম্বা কি এ কাঙ্গালিনীর কথা শুনিবেন না, নিশ্চয় শুনিবেন।" পরে উভয়েই নীরব ও ক্রমে নিদ্রা আসিয়া অজ্ঞাতে এ চিন্তাদায় হইতে এ দিনকার মত অব্যাহতি দিল। ইহার একমাস

পরেই শিবন রায়ণের মহাসমারোহে লক্ষ্মীপুরে বিবাহ হইয়া গেল, গৃহিণী সাহ্লাদে বরণ করিয়া পুত্রবধুটিকে ঘরে তুলিয়া লইলেন। গত বিবাহের দিন লীলা সারাদিনই হাসিয়া কাজ করিয়া বেড়াইয়াছে; লোক চক্ষের অন্তরালে তাহার দুই বিন্দু অশ্রুপাত কেহ দেখিয়াছিল কিনা জানিনা, অবে আজ সে অত্যন্ত বিষণ্ণ। সকলের বৌ দেখা হইয়া গেল; সে দোষীর ন্যায় চুপে চুপে অতি সন্তর্পণে বৌদিদির নিকটে আসিয়া বসিল। ঘোম্‌টার ভিতর হইতে নববধু ইহা লক্ষ্য করিলেন। প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসিয়া মনটা একটু বিষণ্ণ থাকায়, সমব্যথীপ্রায় লীলাকে দেখিয়া তাহার প্রতি মন আকৃষ্ট হইল। ক্রমে ক্রমে উভয়ের মধ্যে একটী স্বর্গীয় স্নেহের ও ভালবাসার বাঁধন আসিয়া পড়িল। কেহ জানিল না—কিরূপে আসিল। এখন এত ভালবাসা জন্মিয়াছে যে, লীলা তাহাকে ডাকে, কখন "লতা" কখন "প্রেম"। আর নববধুও লীলাকে লীলা বলিয়াই ডাকেন। এখন লীলার দিন অনেকটা ভালয় ভালয় কাটিয়া যাইতে লাগিল। এখন লীলা লতার ও লতা লীলার।

ক্রমশঃ

বকুলকুমারী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল,

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কোথায় গেল?

প্রভাতে চাপাত্র লইয়া মোক্ষদা দাসী মাখনলালের শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মাখনলাল ঘরে নাই, বিছানা শূন্য পড়িয়া আছে; বাড়ীর ভিতর গিয়া এই সংবাদ জানাইল। গৃহিণী বলিলেন, "তবে হয়তো কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে।"

সে দিন রামজীবনবাবুর উঠিতে কিছু বেলা হইয়াছিল, তিনি উঠিয়া ঐ কথা শুনিলেন। গৃহিণীর মুখেও যে কথা, কর্ত্তার মুখেও সেই কথা। "তবে হয় তো কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে।"

বেলা হইয়াছিল, কর্ত্তা আর বৈঠকখানায় আসিলেন না, স্নানের আয়োজন করিলেন। নয়টা বাজিয়াছিল, [illegible]

কর্ত্তা আহারে বসিলেন, সে সময়েও মাখনলালের কথার আন্দোলন। প্রশ্ন কেবল "কোথায় গেল ?"

কর্ত্তা আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া আফিসে বাহির হইলেন, মন কিন্তু বিচলিত রহিল।

ক্রমে দশটা বাজিল, এগারোটা বাজিল, ছুইপ্রহর বাজে, তখনও মাখনলাল ফিরিলেন না। বাড়ীর সকলেই উন্মনা; উদ্বেগে উদ্বেগে সকলেই আহার করিলেন, সকলেরই মনে অসুখ; সর্ব্বাপেক্ষা সৌদামিনীর চিন্তা অধিক।

ক্রমশঃ বেলা যাইতে লাগিল, মাখনলাল আসিলেন না। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে কর্ত্তা বাড়ী আসিলেন; সরাসর অন্দরে গিয়া শুনিলেন, মাখনলাল আইসে নাই। তাহার উদ্বেগ আরো বৃদ্ধি হইল; তিনি ভাবিলেন, "কোন দিন কোথাও যায় না, আজ তবে কোথায় গেল? সন্ধ্যা হইল, এখনও দেখা নাই, ব্যাপারখানা কি ?"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আফিসের কাপড় না ছাড়িয়াই রামজীবন বাবু বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন, যে ঘরে মাখনলাল শয়ন করে, অগ্রে সেই ঘরে গমন করিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিলেন, মাখনের ব্যাগটী নাই, ছড়ীও নাই, আন্‌লার উপর ছুইখানি মলিন বস্ত্র ও একখানি চাদর ঝুলিতেছে; শয্যার নিকটস্থ টেবিলের উপর গালাথাম করা একখানা চিঠি। চিঠিখানা হাতে করিয়া তুলিয়া তিনি সেই থামের উপর চক্ষু দিয়া দেখিলেন, তাঁহারি নামে শিরোনাম। মনে মনে বিতর্ক উঠিল, হাতখানি ঈষৎ কাঁপিল। ঠিক সেই অবসরে একজন চাকর বৈঠকখানায় আলো দিতে আসিল। "এ ঘরেও একটা আলো দিয়ে যা" কর্ত্তার হুকুম পাইয়া চাকর সে ঘরেও একটা সেজ লইয়া গেল। চেয়ারে বসিয়া চঞ্চলহস্তে খাম খুলিয়া কর্ত্তা মনে মনে সেই চিঠিখানি পাঠ করিলেন, বদন বিষণ্ণ হইল; চিঠিখানি হাতে করিয়াই তৎক্ষণাৎ তিনি অন্দরমহলে চলিয়া গেলেন, গৃহিণীকে ডাকিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "মাখনলাল পালিয়েছে, চিঠি রেখে গিয়েছে।"

উৎকণ্ঠিতস্বরে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লিখেছে ?"

কর্ত্তা বলিলেন, "ঘরে চল, শুন্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

কর্ত্তা-গৃহিণী উভয়েই শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, আলোর নিকটে বসিয়া কর্ত্তামহাশয় চিঠিখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্রে লেখা ছিল ঃ—

"পূজ্যপাদেষু।

রতায় আমি নির্ব্বোধের কার্য্য করিলাম। অকস্মাৎ আমার মনে নানাত্নশ্চিন্তার উদয় হওয়াতে আমি নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছি, অনেক চেষ্টা করিয়াও শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না; মানসিক শান্তিলাভের আশায় তীর্থযাত্রা করিতে আমার বাসনা হইয়াছে, সে বাসনা আপনার নিকট প্রকাশ করিলে স্নেহ-বশে আপনি পাছে বাধা দেন, সেই ভয়ে আপনার সাক্ষাতে কিছুই বলিতে পারিলাম না, মাতাঠাকুরাণীর অনুমতি লইতেও সাহস হইব না, গুপ্তভাবেই প্রস্থান করিলাম।

"মহাশয়! আমি অকৃতজ্ঞ নহি, অসময়ে আপনি আমার যতদূর উপকার করিয়াছেন, এ জীবনে তাহা আমি ভুলিব না। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীকে আমার প্রণাম দিবেন, শ্রীমতী নিতম্বিনীকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। না বলিয়া প্রস্থান করাতে তাঁহারা কেহ যেন আমার অপরাধ গ্রহণ না করেন। অপরাধী না হইয়াও আমি অপরাধীর ন্যায় কার্য্য করিলাম, কিন্তু আমি অবশ্যই ক্ষমার পাত্র।

বহু দিবসাবধি আমার তীর্থদর্শনে অভিলাষ, অর্থাভাবে ও সুযোগাভাবে সে অভিলাষ সিদ্ধ করিতে পারি নাই; অন্তরে বিবেকের উদয় হওয়াতে এই যাত্রায় সেই অভিলাষ পূর্ণ করিব মনে করিয়াছি। প্রথমে বৃন্দাবন, তার পর মথুরা, তদনন্তর প্রয়াগধাম, তাহার পর বারাণসী, একমাস এই সকল তীর্থ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে বিন্ধ্যাচলে গমন করিব। শুনিয়াছি, বিন্ধ্যাচল অতি রমণীয় স্থান, কিছু দীর্ঘকাল সেই স্থানে অবস্থান করিবার ইচ্ছা। জগৎপিতার যদি মনে থাকে, তাহা হইলে পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব; আপাততঃ বিদায়। ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম, ইতি।

ভবদীয় স্নেহাস্পদ
শ্রীমাখনলাল।"

পত্রপাঠ শ্রবণ করিয়া গৃহিণী বিরসবদনে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। নিতম্বিনী, সৌদামিনী ও মোক্ষদা পাশের ঘরেই ছিল, তাহারাও ঐ পত্রের নির্ঘণ্টগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট শুনিতে পাইল, তাহাদেরও চিত্ত চঞ্চল।

বিষণ্ণমনে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া রামজীবন বাবু যথানিয়মে নিশাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন, চিন্তায় চিন্তায় বিষাদে বিষাদে রজনী অতিবাহিত হইল। সৌদামিনীর পক্ষে যেন বিজয়াদশমী।

সমালোচনা।

রত্নাঞ্জলি।—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত, মূল্য আটআনা।

"হরিভক্তি", "সাধনা ও সিদ্ধি" ধর্ম্মানুগত এই দুই গল্পকে গ্রন্থকার মহাশয় "রত্ন" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, পুস্তকের নাম দেখিয়া ইহাই অনুমান করিয়া লওয়া গেল। পুস্তকের নাম 'রত্নাঞ্জলি। বস্তুতঃ ঐ দুটি গল্পেই এই "অঞ্জলি" পরিপূর্ণ। কল্পনা ও যোজনা অনুচিত হয় নাই; বাস্তবিক গল্প দুটি মহামূল্য রত্ন-বিশেষ।

প্রথম গল্পটি "হরিভক্তি"। ইহাতে কি আছে, ভক্তিপ্রয়াসী ভক্তজনগণের অবশ্য ইহা জানিবার ইচ্ছা হয়। জন্মভূমির পাঠক মহাশয়গণের স্মরণ থাকিতে পারে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ প্রণীত এই গল্পটি বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখ মাসের জন্মভূমি-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। স্মৃতিভ্রংশতাবশতই হউক, অথবা অন্য কোন গুহ্য কারণেই হউক, অম্বিকাচরণ বাবু এ পুস্তকের ভূমিকায় সে কথাটির বিন্দুমাত্র উল্লেখ না করিয়া গল্পটি মাত্র নূতন পুস্তকের গর্ভস্থ করিয়াছেন। ফলতঃ জন্মভূমির নাম উল্লেখ না থাকিলেও গল্পটি চিত্তরঞ্জন ও জ্ঞানোদ্দীপন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। গল্পটি ছয়মাস পূর্ব্বে পত্রস্থ করা হইয়াছে বলিয়া, পুনরুল্লেখ বিবেচনায় তাহার পূর্ণ নির্ঘণ্ট এস্থলে পুনঃ প্রকাশ করা অনাবশ্যক বোধ করা গেল।

দ্বিতীয় গল্প—সাধনা ও সিদ্ধি। এ গল্পটিতেও ভক্তিতত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ আছে ইহার সংক্ষিপ্ত নির্ঘণ্ট এইরূপ যে জনরঞ্জন নামে এক ব্রাহ্মণকুমার সকাম ধর্ম্মোপাসনায় প্রগাঢ় ভক্তিরত হইয়া সস্ত্রীক কাশীবাসী হন, সেখানে এক পাগলের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়, পাগলের নাম সুজন; গৃহবাসে সুজন একদিন অধিকরাত্রে ধর্ম্মোল্লাসে বাহির হইয়া "রাত দুপুরে দিনের আলো, এইটুকু ছেলের এত বড় দাড়ী" এই দুটি কথা মুখে লইয়া বাটীতে ফিরিয়া আইসে। তাহাতেই পাগল। সুজনের স্ত্রী সুমুখী অবশেষে স্বামীকে লইয়া কাশী যান, গল্পের নায়ক জনরঞ্জনের সহিত সুমুখীর জানাশুনা ছিল, সাক্ষাৎ হইলে পাগলের উপদ্রবে সুমুখী আত্মহত্যা করিবেন বলেন, আত্মহত্যাও করেন। শেষে সুরনাথ নামে পরিচিত এক সন্ন্যাসী তান্ত্রিক গুপ্তসাধনা মতে পাগলকে আরাম করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইলেন, জনরঞ্জন, সুজন, জনরঞ্জনের স্ত্রী শুভঙ্করী এই তিন জনে সিদ্ধি-কামনায় ভগবৎগীতার তত্ত্বগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরমপ্রীতি লাভ করিয়াছি।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৯শ বর্ষ। | ১৩১৮ সাল, অগ্রহায়ণ। | ৮ম সংখ্যা।

গার্হস্থ-ধর্ম্ম।

লেখক,—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গুহ রায়।

পবিত্র সনাতন ধর্ম্মে যতপ্রকার ধর্ম্মাচারণের বিধি বিহিত আছে, তন্মধ্যে গার্হস্থ-ধর্ম্মাচরণ বিহিতই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া গণ্য, ইহা শাস্ত্রকারগণই সম্যকরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তবে এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মাচরণ বিহিত, সংক্ষেপে বিবৃত করাই আমার উদ্দেশ্য। সংসার আশ্রমে বাস করিয়া গার্হস্থ জীবনের কর্ত্তব্য-পালন করাই শাস্ত্রসিদ্ধ, যুক্তিসিদ্ধ ও ব্যবহারসিদ্ধ। হিতাহিত বিবেকশক্তির আশ্রয়ে স্থিরভাবে কর্ত্তব্যপালন করিলেই গার্হস্থ ধর্ম্মাচরণ করা হইল। সেই কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে প্রথমতঃ হৃদয়ের সম, দম, তেজ, দয়া, দাক্ষিণ্য, তিতিক্ষা, সংযম, স্নেহ, ভক্তি প্রভৃতি সুপ্রবৃত্তিনিচয়ের উন্মেষসাধন এবং ইন্দ্রিয়াদি

কুপ্রবৃত্তির দমন প্রয়োজন। ইহাই এই ধর্ম্মাচরণের প্রধান সহায়। ক্রমে সুপ্রবৃত্তির উন্মেষসাধন হইলে তৎপরে মহাজনের উপদেশাবলী এবং বিবেকের সহায়তায় তাহাদিগকে কর্ম্মঠ ও বলশালী করিয়া, তাহাদেরই অধীনতা পাশে মনকে সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ রাখিতে হইবে, এবং সাধ্যানুসারে তাহাদের নিদেশ পালন করিতে হইবে, ইহাই এই ধর্ম্মাচরণের শেষ সাধন। এই ধর্ম্মে দৈহিক কষ্ট-কর বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হয় না। কারণ যে উদ্দেশ্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করা উচিত, তাহা সংসারে থাকিয়া করিলে, তাহাতে সমধিক সুফল দর্শে।

বিষয়-কামনার মোহজাল হইতে হৃদয়কে দূরে রাখিবার নিমিত্তই সে সব পরিত্যাগ করতঃ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি করিতে হয়; কিন্তু মোহময়, লোভনীয়, বিষয়-বাসনার মধ্যে অবস্থান করিয়া, সংযমদ্বারা প্রবৃত্তিকে দমন করাই প্রকৃত ধর্ম্মাচরণের পরিচায়ক। স্থূল কথায় বলিতে গেলে, আমরা এই বুঝিব যে, আমাদের যেমন কোন লোভনীয় বস্তুর অভাব আছে, কিন্তু অত্যধিক আয়াসেও তাহা লভ্য নহে, কাজেই সে স্থলে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে সেই লোভনীয় বস্তুর লোভ পরিত্যাগ করিতে হয়, কিন্তু সেই লোভসম্বরণ আমাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নহে, অভাবজনিত মাত্র। সেই বস্তু থাকা সত্ত্বে যদি আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া তাহার লোভসম্বরণ করিতে পারি, তবে তাহাই প্রকৃত নির্লোভীতার পরিচায়ক।

ইহা হইতেই আমরা আসক্তি এবং অনাসক্তির পরিচয় পাই। যাহাতে একবার আসক্ত হওয়া যায়, তাহা সহজে পরিত্যাগ করা যায় না, কিন্তু সেই আসক্তি লোভের অনুগামিনী, তবে লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেই আসক্তি দূরে পলায়ন করে, কিন্তু ইহাতে সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইয়া উদাসীন হইতে হইবে, গার্হস্থ-ধর্ম্মতত্ত্বের সেরূপ তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে না। সংসারে বাস করিয়া তাহাতে একান্ত আসক্ত হইতে হইবে না; কেবলমাত্র দেহকে সংসারপাশে আবদ্ধ রাখিয়া মনকে সর্ব্বদা কর্ত্তব্যপাশে আবদ্ধ রাখিতে হইবে। তাহা হইলেই পরমপিতা পরমেশ্বরের নিদেশানুসারে কাজ করা হইল এবং তাহাই ধর্ম্মাচরণের প্রকৃত উপায়।

পদ্ম যেমন জলে জন্মিয়া জলেই প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু সিক্ত হয় না। পদ্ম যদিও জলে অবস্থান করে, তথাপি সিক্ত না হইয়া আপন অভীষ্টদেব সূর্য্যপানেই আকৃষ্ট থাকে; যদিও বাত্যালোড়িত তরঙ্গাঘাতে কম্পিত হয়, পদ্ম তখন তাহার সার বস্তু, সৌরভরাশি সূর্য্যোদ্দেশে বাতাসে ছড়াইয়া দেয়। যদি সেই বাত্যা-

আলোড়নে তাহার ধ্বংস হয়, তাহাতেও তাহার ক্ষতি হয় না, কারণ তাহার অসার দেহমাত্র ধ্বংস হইয়া জলে মিশিয়া যায়, তাহার প্রাকৃতিক সৌরভরাশি ধ্বংস না হইয়া, তাঁহার অভীষ্ট স্থানে পৌছে।

আমাদেরও সেইরূপ সংসারে থাকিয়া, আত্মাকে পরমপিতার নিদেশানুসারে চালাইতে হইবে। যখন আমরা কোন বিপদ-ঝটিকায় আলোড়িত হইব, তখনই পদ্মফুলের ন্যায় আমাদের মনকে স্থিরভাবে, অভীষ্টদেবের শ্রীচরণোদ্দেশে অর্পণ করাই কর্ত্তব্য।

যদি সেই বিপদ-ঝটিকায় আমরা ধ্বংস হই, তাহাতেও আমাদের ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নহে। ক্ষণস্থায়ী নশ্বরদেহের একদিন না একদিন বিনাশ হইবেই হইবে। দেহ-বিনাশের পূর্ব্বেই যদি আমরা আত্মার গতি স্থির করিতে পারি, তবেই আমাদের কর্ত্তব্য পালন করা হয়।

আমাদের আত্মা অবিনাশী, কিন্তু দেহ বিনশ্বর, অতএব বিনশ্বর হইতে অবিনশ্বরকে সমধিক যত্ন করা উচিত, কিন্তু সেই আত্মার প্রসাদলাভের নিমিত্ত বিনশ্বর দেহকেও তদুপযুক্ত মার্জ্জিত রাখিতে হইবে। অর্থাৎ কর্ত্তব্যপালনে যেমন মনের একাগ্রতা সাধন করিতে হইবে, দেহকেও সেইরূপ সুস্থ রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে। এই উভয়ের সম্মিলন না হইলে, মনের উন্নতিসাধন অসম্ভব।

দেহ যদিও বিনশ্বর, তথাপি মনের বাসভবন, অতএব সাধ্যমত দেহের স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া যতদিন তাহাকে সুস্থভাবে রাখা যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। এইরূপ ভাবে সংসারক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, দেহান্তে অবিনশ্বর আত্মাও উন্নতিলাভ করিবে।

মানব যখন জননী-জঠরে অবস্থান করে, তখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে "যে পাপে আমায় জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, এবার ভূমিষ্ঠ হইয়া আর সেরূপ পাপাচরণ করিব না।" কিন্তু জীব ভূমিষ্ঠ হইয়াই সেই অঙ্গীকার বাক্য বিস্মৃত হইয়া অনায়াসে পাপপঙ্কে মগ্ন হয়, কিন্তু তাহারা যদি আপন কর্ত্তব্য পালন করে, তাহা হইলে আর পুনঃ পুনঃ জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। কর্ত্তব্যপালন করিলেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালন করা হয়।

শ্রীশ্রীমাধব-মিলন।

লেখক, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস,

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—বৃন্দাবন, যমুনা-পুলিন সময়—অরুণোদয়।

হরিনামের মালা হস্তে দেবী পৌর্ণমাসীর প্রবেশ,
পশ্চাতে বৈষ্ণব-বেশে মধুমঙ্গল।

পৌর্ণমাসী।—ভারতের প্রতিতীর্থ করিয়া ভ্রমণ,
দুঃখিনী খুঁজিছে যাহা, এতদিন পরে তাহা,
পাইয়াছে—হইয়াছে অভীষ্টপূরণ ;
পূর্ণ পৌর্ণমাসি তোর বৃন্দাবন আগমন !
আহা কি সুন্দর এই সুখময় স্থান !
পুণ্য বৃন্দাবন ধাম।
তুলি ধ'রে যেন বিধি, আঁকিয়াছে গিরি নদী,
প্রতিপত্র, প্রতিপুষ্প, অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ !
কি সুন্দর ! কি সুন্দর ! যমুনার তীর !
আহা কি সুন্দর মরি ! নিকুঞ্জকুটীর।
যে দিকেতে চাই, বলিহারি যাই,
একই বার্ত্তা সকলেই করিছে প্রচার !
কে যেন আসিবে ব'লে, আছে সবে মুখতুলে,
পেয়েছে কি যেন তারা শুভ-সমাচার !
কুরঙ্গ কুরঙ্গী সনে,
চেয়ে আছে পথপানে,
শুকসারী সারি সারি গাহিছে মঙ্গল-গীত !
তমালের তলে তলে, ময়ূরেরা দলে দলে
নাচিছে পেখম তুলে, প্রেমানন্দে পুলকিত !
যমুনার স্বচ্ছ জল, কল কল অবিরল,
সফেন তরঙ্গ তুলি করিতেছে কোলাকুলি,
শন্ শন্ বহিতেছে উর্দ্ধে সমীরণ—
একই তান, একই মান, একই সুরে বাঁধা গান,

একেরই বিজয় ভেরী, নিনাদিত ত্রিভুবন।
একেরই মহান্ স্তোত্র নিনাদিত জলে স্থলে,
একেরই শ্রীমুখে চেয়ে কৃতাঞ্জলি সবে মিলে!
কার যেন প্রতীক্ষায় জড় জীব একত্রিত,
কার যেন আবাহনে চেয়ে সবে আশাপথ।

(মধুমঙ্গলের প্রবেশ।)

মধুমঙ্গল।—বিশ্বের সম্রাট তিনি, তাই কি এমন?
—এই মহা আয়োজন?
তাই কি সুবাসে ভরা
পুষ্পিত কুসুম-বন?
শ্যাম দূর্ব্বাদলে মোড়া
তাই কি এ বসুন্ধরা?
তাই কি গো প্রকৃতির এ মোহন বেশ?
ভূমা তিনি—
তাই কি এ অভ্যর্থনা—অনন্ত—অশেষ?

পৌর্ণমাসী।—(জোড়হস্তে প্রার্থনার ভাবে) ভূমা—তিনি—
তাই যদি হবে, বল বল তবে,
হে ভূমন্! হে অনন্ত! বিশ্ব-অধিপতি!
হে বিরাট! হে ব্রহ্মণ! নিয়ামকশক্তি—
দুঃখিনীর ধ্যাননেত্রে কেন দেখা দিলে?
স্নিগ্ধ-ঘন-শ্যামদ্যুতি কেন প্রকাশিলে?
বনমালা বিভূষিত, নরবপু নরবেশ,
সহস্র সৌন্দর্য্য ঘেরা, শিখিপুচ্ছে বাঁধা কেশ;—
পীতধড়া কটিবেড়া, কৌস্তভ শোভিত বুক,
অনন্ত সুষমাস্নিগ্ধ মধুগন্ধ স্মিতমুখ;—
মধুর মুরলী হাতে, মদালস দুনয়ন,
কি এক আকুল দৃষ্টি, বাঞ্ছা-প্রেমে সম্মিলন;—
মকরন্দ তৃষাতুর মত্ত মধুব্রতপ্রায়,
ত্বমসি ত্বমসি বলে, কি যেন ফুটন্ত ফুলে—

অতৃপ্ত সে—নিত্যযুক্ত স্বদেহ মিশাতে চায় ;—
ক্ষুদ্র মানবের তরে অনন্তের এ অভিসার,
দেখিয়াছি নিজ চক্ষে,—নাহি ভ্রান্তি কিছু তার।

মধুমঙ্গল।—ভ্রান্তি কেন হবে দিদি !
নহে ব্যর্থ তোমার সাধন।
এসেছে সে,—আসিছে সে,—
জলেস্থলে প্রকাশিত সে শুভ লক্ষণ !
এই যমুনার তীর,
এই মলয় সমীর,
এই নিকুঞ্জ কুটীর,
ঐ তরু, ঐ লতা, ঐ গুল্ম, ঐ বন,
এই পশু, এই পাখী, ওই গিরি-গোবর্দ্ধন,—
মনে হয়, সব যেন গেঁথেছে কে এক তারে ;
জগতের কল্পবৃক্ষ নাহি ভেদ জীব জড়ে !
পাতাটিরও যে উদ্দেশ্য লতাটিরও তাই,—
মাটি জল পশুপাখী, সব যেন মাখামাখি,
সব যেন নিয়োজিত একেরই সেবায় !
একটি তুলিকা দিয়ে একসঙ্গে সব আঁকা,
ঊর্দ্ধস্তরে প্রতিষ্ঠিত মানব প্রধান শাখা।
একই উদ্দেশ্য পরস্পরে—একটি ফুটন্ত ফুল,
সুষমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সৌরভে অতুল ;
প্রেমের সুবাসে ভরা দশদিক আলো করা,
মানবের মধকেন্দ্রে হয় যদি স্বপ্রকাশ,
হয় ত আসিতে পারে, পরব্যোম পরপারে,
ত্রিপাদ হইতে নেমে—বুকভরা আশ,
মকরন্দ তৃষাতুর, মত্তভৃঙ্গ একদিন—
হয় ত হইতে পারে সে সৌন্দর্য্যে চিরলীন ;
এই আশা বুকে বহে,
ব্রহ্মাণ্ড বিশালদেহে,

ক্রম বিকশিত যাহা এতদিন পরে তাহা,—
মনে হয়, এইখানে লভিয়াছে পূর্ণ পরিণতি ;
বিকশিত সে রাধা-কুসুম,
আর মত্তভৃঙ্গ—নন্দালয়ে (হবে কি সে) শ্যামদ্যুতি,
ভূমা তিনি দিদি—

পৌর্ণমাসী।—ভূমা তিনি—আছে ওই নীলাম্বর—আছে সাগর-ভূধর
স্তরে স্তর,
ক্ষুদ্র এই বৃন্দাবন, বিলাস-ভবন
ক্ষুদ্র তার পশুপাখী, ক্ষুদ্র তরুলতা
ক্ষুদ্র ওই বংশীবট,
ক্ষুদ্র যমুনার তটে,
হইবেক ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্রে শুভ-সম্মিলন ;
নরবপু নরবেশে, জীবগনে পরমেশে—প্রেম-বিতরণ।
ক্ষুদ্র মানবের প্রতি অনন্তের অভিসার
বুঝিয়াছি এই বটে, ওই কালিন্দীর তটে উপযুক্ত স্থান তার।
এইখানে হৃষিকেশ, ধরি নটবর বেশ,
আকুল বংশীর গানে চেয়ে রবে পথপানে,
খুঁজিবে কাতরে তারে, কোথা কোথা প্রিয়তম।
যমুনা উজান ববে, ধেনু বৎস হাম্বারবে,
উর্দ্ধপুচ্ছ ঘিরিবে সে শ্যাম স্নিগ্ধ নব ঘন।
ব্রহ্মাণ্ড কটাহভিত্তি ভেদি সেই বেণুরব,
জানাইবে জড়জীবে প্রেমতত্ত্ব অভিনব।
শত শত যোগীজন করি নেত্র উন্মীলন
ব্যাকুল আসিবে ছুটে যমুনার পূণ্যতটে,
অদ্বৈতের একাকার—নীরস নিগড় তার,
হৃদয়ের মাঝে থেকে আপনি যাইবে টুটে।
ক্ষুদ্র মানবের তরে, এ হ'তে কি হ'তে পারে,
বল ভাই উচ্চ আশা, উচ্চ ধর্ম্ম, উচ্চ আকাঙ্ক্ষার,
ত্বমসি ত্বমসি বলি ক্ষুদ্র জীবে মহানের ক্ষুদ্র অভিসার ?

সে রাধ্য কুসুম কেন তবে সঙ্গোপন,
পরস্পর দূরে দূরে রেখে আর কাজ নেই,
কেন এ পরীক্ষা করা, কেন দিদি ভাঙ্গাগড়া,
বুঝেছ যখন তারা ঠিক সেই—ঠিক সেই!

ক্রমশঃ

পাগল।

লেখক,—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যদিও "লতাকে" পাইয়া লীলার আনন্দে বেশ দিন কাটিয়া যায়, তথাপি সে গোপনে শ্বশুরালয়ের সংবাদ লইতে লাগিল। প্রথমে অনেক কষ্টে শ্বশুরালয়ের ঠিকানা সংগ্রহ করিল। অনেক ভাবিয়া শেষে একদিন রাত্রে বসিয়া, স্বামীকে তার এই দগ্ধীভূত জীবনের ব্যাকুলতা লইয়া, সাশ্রুলোচনে একখানি পত্র লিখিতে বসিল; হায়! বালিকা কি লিখিবে, তাহা ত সে জানে না। কি বলিয়া লিখিবে, তাহাও ত অজ্ঞাত। এত যত্ন করিয়া, এত ব্যাকুলহৃদয়ে সে যে আজ তার কাতর প্রাণের করুণপ্রার্থনা পতির চরণে জানাইবে বলিয়া বসিয়াছে, তার কি অভিলাষ পূর্ণ হইবে না? অবশ্য হইবে। প্রাণের টানে যদি কেহ কাহাকে ডাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে ডাক আহূতের কাণে পৌঁছিবেই। লীলা অতি কষ্টে লিখিল :—

"হৃদয়দেবতা!

কেমন করিয়া তোমায় ডাকিতে হয়, তা জানি না; কি দিয়া তোমার পূজা করিতে হয়, তাহাও জানি না। কেবল একবার মাত্র ঐ রাঙ্গা পা-দুখানি দেখিয়াছি। তোমার উপাসিকা আজ ঐ পা-দুখানি পূজা করিবার জন্য লালায়িতা, একবার কি দেখা পাবে না? বিবাহের দিন যেমন করিয়া চাহিয়াছিলে, আর একবার কি আসিয়া তেমনি করিয়া তোমার এই দীনা উপাসিকার পানে চাহিবে না? হে দয়িত! অনাথার ব্যাকুল আহ্বান কি তোমার কর্ণে ক্ষণেকের জন্যও

স্থান পাইবে না ? আমি তোমারে কখনও চাইনি, তুমিই ত দয়াপরবশ হইয়া এ দাসীর প্রতি চাহিয়াছিলে। তোমার শ্রীচরণ দুখানি পূজা করিতে পারিলেও আমার জন্ম সার্থক। এস হে, আমার ধ্যেয় দেবতা! একবার আসিয়া দেখা দিয়ে যাও, আমি আর কিছুই চাহি না। আশাপথ চাহিয়া রহিলাম। করুণা-লাভে বঞ্চিত করোনা দেব! দাসীর শত নমস্কার গ্রহণ করিও। ইতি—

তোমার—

অভাগিনী—লীলা।"

এই কয়টী কথাই তাহার হৃদয়ের সমস্ত ব্যাকুলতা যেন জানাইয়া ডাকঘরে পাঠাইয়া দিল। পত্রের উত্তর অপেক্ষায় কতদিন পথপানে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কোন ডাকেই ত তার পত্রোত্তর আসিল না। আবার পত্র লিখিল, কোন উত্তর নাই। এইরূপে বারম্বার পত্র লিখিয়াও যখন নিষ্ফল হইল, তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিল, সে তাহাদের পুরাতন ঝিকে ডাকাইয়া কোনপ্রকারে রাজাপুরে যাতায়াতের খরচ দিয়া যথার্থ সংবাদ কি, তাহা জানিবার জন্য তাহাকে পাঠাইয়া দিল। চারিদিন পরে ঝি ফিরিয়া আসিল। এই চারিদিন সে যে কি ভাবে কাটাইয়াছিল, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বোঝা দুঃসাধ্য।

লীলা দেখিল, ঝির মুখ বিষণ্ণ, মনে মনে ভাবিল যে, না—সে আর উত্তর শুনিবে না, কি জানি যদি না সহিতে পারিয়া, এখনি তাহার হৃদয় ফাটিয়া যায়, কিন্তু এতদিনের চেষ্টার কি ফল, তাহা না জানিয়া যাওয়াও তাহার পক্ষে সাধ্যাতীত। ঝি বলিল, "মা! তোমার মত ভাগ্যবতী কেহ নাই, আবার তোমার মত হতভাগীও কেহ নাই; তোমার শ্বশুর অতুল ধনের অধিপতি, বাড়ীতে কত লোক চাকরী করছে, তার কে গণনা করে? কিন্তু মা এত থাক্‌তেও তোমার কপাল ভাল নয়। তোমার শ্বশুরের পাঁচ বেটা, তুমি মেজ ছেলের বৌ, কিন্তু তোমার কপালগুণে সেটী বদ্ধ পাগল, তার নাম অক্ষয়কুমার, তবে সকলেই প্রায় তাকে মেজো পাগ্‌লা বলেই ডাকে। তা হলেও তুমি হয় ত একদিন রাণীর হালে থাক্‌তে পার্‌তে, কিন্তু মা তোমার বিবাহের অল্পদিন পরেই উপর্য্যুপরি তোমার দুই ছোট দেবর মারা যায়, সেই জন্যই তোমাকে আর তাঁরা নিয়ে যায় না। কি করিবে বল, খুব করে শিবপূজা কর, যদি তাঁর দয়া হয়, তা হলে আবার সব পাবে, হতাশ হোয়ো না মা।"

এই বলিয়া বৃদ্ধা চলিয়া গেল। লীলা স্থিরনেত্রে যতদূর তাহাকে দেখা গেল, ততদূর দেখিল. পরে একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস সহ বাটীর ভিতর আসিল, বৃদ্ধার কথাটী তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে লাগিয়াছিল তাই সে পরদিন হইতে প্রত্যহ ৺শিবপূজা আরম্ভ করিল। আর এক খেয়াল হইল—পাগল দেখিলেই ডাকা, তাকে আদর যত্ন করা, খাওয়ান ইত্যাদি। এই সময়ে একদিন পূর্ণিমার রাত্রে লীলা ও লতা ছাদে বসিয়া সে সংসার-রঙ্গালয়ের একটী অংশ অভিনয় করিয়াছিল, তাহা গল্পের "সূচনায়" ব্যক্ত হইয়াছে।

পরদিবস লীলা বেলা দ্বিপ্রহরে ছাদের উপর দাঁড়াইয়া পথপানে তাকাইয়া কাহার যেন আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছিল, এখন যেন তার কাঁদাই সুখ। বৌদিদির সঙ্গও আর তত ভাল লাগে না. একাকিনী থাকিতেই সে ভালবাসে। মানুষের উষ্ণনিশ্বাস যেন তাহার শরীরে বিষ ঢালিয়া দেয়, তাই সে মানুষের চক্ষের আড়ালে থাকিতে চায়। মনের কথা আর কাহাকেও খুলিয়া বলে না, লীলা এখন গৃহে থাকিয়াও সন্ন্যাসিনী। সে একটু একলা থাকিবার জন্ত আজ ছাদে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে কাহাকেও দেখিতে পাউক আর নাই পাউক—দূরে দুটি উদাস-নয়ন স্থিরলক্ষে তাহার পানে চাহিয়াছিল। হঠাৎ চারি চোখে মিলিল। সঙ্গে সঙ্গে একটী তাড়িৎ বীজলী-বেগে তাহার বুকের মধ্যে খেলিয়া গেল। তার হৃদয়ের ভিতর কেমন করিতে লাগিল; লীলা সজোরে বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া উর্দ্ধনেত্রে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। পরে ছাদের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিল।

হায় জগদীশ! আজ তাহার এমন করিলে কেন? অভাগিনীকে যদি এতই মারিবার ইচ্ছা, তবে তাহাকে একেবারে ধরাপৃষ্ঠ হইতে কাড়িয়া লওনা কেন? এ তোমার কেমন বিচার? লীলা আবার উঠিল, এবার সে বক্ষ বাঁধিয়াছে, সে আর একবার উদাসনয়ন দুটিকে দেখিতে গেল, দেখিল; তেমনিভাবে সেই স্থলেই দাঁড়াইয়া আছে। এ মুখ যেন কখনও সে দেখিয়াছে, যেন কোনদিন চারিটী চোখে এইরূপ বিদ্যুৎ খেলিয়াছিল। মনে আসে আসে, আসে না,—তথাপি যেন পরিচিত চাহনি। লীলা নীচে নামিয়া গেল, সে দেখিল, সে একটী পাগল। সে পাগলকে ডাকিল, পাগল অমনি সুড়্ সুড়্ করিয়া আসিল, এই সময়ে পিছন হইতে একটী ছোট ছেলে দৌড়িয়া আসিয়া পাগলের কাপড় ধরিয়া টানিল। টানিবামাত্র কাপড় শিথিল হওয়ায় তিনখানি পত্র কটিদেশ হইতে খসিয়া পড়িল।

পাগল তাড়াতাড়ি সে পত্র তিনখানি কুড়াইয়া লইল ও বুকে চাপিয়া ধরিল। পাগলের দুই চোখ দিয়া অজস্রধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। লীলার বড় কষ্ট হইল, সে নিজ আঁচল দিয়া পাগলের চক্ষু মুছাইয়া দিল, পরে বলিল, "দেখি কার চিঠি"—তৎক্ষণাৎ সে চিঠি তিনখানি লীলার হাতে দিল। লীলা জিজ্ঞাসা করিল, এ চিঠি তুমি কোথায় পাইলে? কে তোমায় এ পত্র দিয়াছে? পাগল একবার হাসিল—হাসিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইল, "তুমি"। তখনি এক দৌড়ে কোথায় পলাইয়া গেল, লীলা অনেকক্ষণ দুয়ারে দাঁড়াইয়া রহিল, পাগল সেদিন আর অসিল না।

পরদিন পুনরায় লীলা ছাদে গিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই পাগল আসিয়া দেখা দিল। আজ যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ। লীলা অমনি নিম্নে নামিয়া গিয়া পাগলকে ডাকিল,—কিন্তু আজ আর সে তত কাছে গেল না; একটু তফাতে দাঁড়াইয়া রহিল। লীলা বলিল, "পাগল! তোমার খিদে পেয়েছে, কিছু খাবে?" সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ"। লীলা অনতিবিলম্বে দুটী সন্দেশ ও একঘটী জল আনিয়া দিল। পাগল সানন্দে সন্দেশ দুটী খাইয়া জলপানার্থ অঞ্জলি পাতিয়া দাঁড়াইল। লীলা পাগলের হাতে জল ঢালিয়া দিল, সে ঘটির সমস্ত জল খাইয়া বলিল, "আঃ" যেন এমনভাবে কেহ তাহার পিপাসা নিবারণ করে নাই। লীলা মন্ত্রমুগ্ধবৎ সব করিতেছিল—শেষে দেখিল, পাগল চলিয়া গিয়াছে। লীলা ধীরে ধীরে বাটীর ভিতর চলিয়া গেল। পাগল ও লীলার এইভাবে একমাস কাটিল এবং ক্রমশঃ পাগল সুস্থ হইতে লাগিল।

লীলার এইরূপে পাগলের প্রতি ভালবাসা, বাড়ীর মেয়েরা সকলেই জানিত, কিন্তু কেহ কখনও বাড়ীর পুরুষদের এ কথা বলে নাই। অম্বিকাবাবু ও তাঁহার ভ্রাতারা বেলা ১০টা বাজিতেই আফিসে চলিয়া যাইতেন, সুতরাং লীলার এ ব্যাপার কেহই জানিতেন না। আজ আবার পাগল আসিয়াছে, লীলা তাহার সহিত গল্প করিতেছে। পাগল সব বলিতেছে, কেবল নিজের নাম, বাড়ী ও পিতার নাম বলে না। লীলা যদিও মনে মনে স্বামী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে, তথাপি ঠিক পরিচয় না পাইলে কেমন করিয়া স্বামীর পদবন্দনা করে। পাগলের পাগলামী আজ মোটেই নাই। এমন সময়ে হঠাৎ অম্বিকাবাবু আফিস হইতে বাটী আসিলেন। দেখিলেন, এ কি! এ যে অক্ষয়! আজ কন্যা ও জামাতা কাছাকাছি বসিয়া, কতদিনের পরিচিতের ন্যায় গল্প করিতেছে। ভাবিলেন,

একি প্রহেলিকা, ঘটনাক্রমে সেই বৃদ্ধা ঝিও আসিয়া উপস্থিত। সে বলিল, "ওমা এ কি! জামাই কখন এলে?" এইবার অক্ষয় সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থের ন্যায় বলিল, "তোমার আসার পরই।" অম্বিকাবাবু যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাহাই হইল। অক্ষয় ধীরে ধীরে উঠিয়া শ্বশুরের পদে প্রণাম করিল; ইতাবসরে বাটীর ভিতর গিয়া ঝি এই শুভসংবাদ দিল। বাটীতে আজ মহানন্দ। লীলার আনন্দের আর সীমা নাই, তাহার "পাগল" আজ ধরা পড়িয়াছে।

উপসংহার।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনার পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অম্বিকাবাবুর বাটীতে এখন লীলার স্বরের সঙ্গে আর একটী কচিগলার ক্রন্দন স্বর শুনা যায়। লতা আদর করিয়া তার নাম রাখিয়াছে, উন্মাদিনী। রাজাপুরে মৈত্রমহাশয়ের মহা-আনন্দ। অক্ষয়ই এখন তাঁহাকে বিষয়কর্ম্ম দেখার ভার হইতে অবসর দিয়াছে। এখন আমরা লীলা ও উন্মাদিনীর স্বর মাঝে মাঝে কলিকাতায় ও অন্য সময়ে রাজাপুরে শুনিতে পাই। লীলা এখন অক্ষয়কে ডাকে "পাগল"। একদিন আমরা কলিকাতায় "লতাকে" বল্‌তে শুনেছি, "কেমন ঠাকুরঝি! সত্যই বিয়ে করলে, একটা "পাগল"?

পদ্মাবতী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত সুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(১)

রামপুরের হরিধন ঘোষ, সহধর্ম্মিণী, একটী পুত্র ও একটী বিধবা কন্যা রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করিয়াছে। সংসার সচ্ছল না হইলেও মৃত হরিধনের বুদ্ধিমতী বিধবা স্ত্রী করুণাময়ী অতি দীনভাবে দিন কাটাইত।

পুত্রটী বড়, নাম জীবনকৃষ্ণ। জীবন ছাপাখানার কর্ম্ম করিত, কন্যা পদ্মাবতী, তবে পাঁচুঠাকুরের দোরধরা বলিয়া, সকলে তাহাকে পাঁচী বলিয়া ডাকিত।

কথিত কাঞ্চনবর্ণা পাঁচী ষোড়শী, মস্তকে কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশদাম তরঙ্গায়িত। পাঁচী ধান ভানিত, জল তুলিত, বাসন মাজিত, গরুর তত্ত্বাবধান করিত। মধ্যাহ্নে কখন কখন প্রতিবাসী কালীপদ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে মহাভারত, রামায়ণ শুনিতে যাইত।

(২)

কালীপদ সুপুরুষ, যজমানী উপজীবিকা, একটু আধটু নেশাভাঙ করিত, মধ্যে মধ্যে নেশার ঘোরে পাঁচীর বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র করিত, কিন্তু কর্ত্তব্য-জ্ঞানবতী, বুদ্ধিমতী করুণাময়ীর নিকট সকল চক্রান্ত ভাসিয়া যাইত।

কালীপদের স্ত্রী কমলা, সুন্দরী, সুচতুরা ও মুখরা। ক্রমে ক্রমে কমলা স্বামীর কীর্ত্তির কথঞ্চিৎ আভাস পাইল, ক্ষুদ্র হৃদয়ে কালমেঘ উঠিল, দেখিতে দেখিতে, অশান্তির ঝড় বহিল।

পাঁচী পরম্পরায় শুনিল, তাহার কলঙ্কের ঢাক মৃদুমন্দ বাজিতেছে; মনে মনে ভাবিল, একি হইল? আমার নামে এরূপ কথা উঠিল কেন? মহাভারত শুনিতে যাইতাম বলিয়া দুষ্ট লোকেরা বাটীর বাহির হওয়ার জন্য দোষারোপ করিতেছে; দুর হউক, আর বাটীর বাহির হইব না। দুঃখে, কষ্টে, লজ্জায়, ঘৃণায়, পাঁচী আর বাটীর বাহির হইত না।

(৩)

জীবনকৃষ্ণ এ সংবাদ পাইল, দুঃখে, ক্রোধে ঘর ছাড়িয়া দেশত্যাগী হইল। জীবনের শোকে মাতা শয্যাশায়িনী, সংসার অচল, একদিন হাঁড়ী চড়িল না, উপবাস। পাঁচী ভাবিল, আমার অদৃষ্টের দোষে দাদা আজ গৃহত্যাগী, মাতা মরণাপন্ন; এমন একটী পয়সা নাই যে, সাগু কিনিব। মা যদি মরিয়া যান, তবে কোথায় দাঁড়াইব? এই কথা মনে উদিত হইবামাত্র তাহার ইন্দীবর লোচন যুগল অশ্রুভারাক্রান্ত হইল; অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে স্থির করিল, অমূল্যকে এই আকস্মিক বিপদ জানাইবে। * * *

গ্রামস্থ ধনী ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়; লোকপরম্পরায় তিনি শুনিলেন, করুণাময়ীর জীবন সংশয়, অর্থাভাবে চিকিৎসা হইতেছে না, পাঁচী আজ তিনদিন অনাহারী।

ললিতমোহন সুপুরুষ, বিদ্বান সৎচরিত্র, সুশিক্ষিত, ধার্ম্মিক যুবক। ললিতমোহনের স্ত্রী বসন্তকুমারী পরমাসুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও দয়াবতী। করুণাময়ীর জন্য উভয়ের প্রাণ কাঁদিল। ললিতমোহন একজন বিচক্ষণ সুচিকিৎসক লইয়া, করুণা-

ময়ীর কুটীরে আসিলেন; দারিদ্র রাক্ষসের ভীষণ করালবদন দেখিয়া ললিত-মোহনের নয়নে অশ্রু আসিল।

(৪)

একসপ্তাহ অতীত। ললিতমোহন চিকিৎসকসহ প্রত্যহ দুই তিনবার আসিয়া করুণাময়ীকে দেখিয়া যাইতেন। বসন্তকুমারী রোগীর পথ্যাপথ্য ও পাঁচীর খাদ্যসামগ্রী প্রত্যহ পাঠাইয়া দিতেন।

ললিতমোহনের ভুবনমোহন রূপ, নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা ও সৌজন্যতায় পাঁচীকে মুগ্ধ করিল। ললিতমোহন আসিলে, পাঁচী মাথায় অল্প কাপড় দিয়া রোগীর অবস্থা বলিত, ঔষধ কয়বার খাওয়াইয়াছে, তাহাও বলিত। ললিতমোহনকে জানাইলে, তাহার মা বাঁচিবে, তাহাদের দুঃখের দশা ঘুচিবে, নিরুদ্দেশ ভ্রাতা আবার ঘরে ফিরিয়া আসিবে, তাহা পাঁচী ঠিক বুঝিয়াছিল।

(৫)

যুবতী পাঁচী নিঃসহায়া, রাত্রিকালে একাকিনী থাকিবে, তাহা ভাল নয়, ইহা ভাবিয়া বসন্তকুমারী তাঁহার একজন দাসীকে রাত্রে তাহার কাছে শুইতে পাঠাইতেন।

বিচক্ষণ চিকিৎসকের ঔষধের অত্যাশ্চর্য্যগুণে করুণাময়ীর জীবনের আশা হইল; একমাস রীতিমত চিকিৎসা ও পথ্যের সুবন্দোবস্তে করুণাময়ী নবজীবন লাভ করিল। মাতা ও কন্যার ভরণপোষণের সকল ব্যয়ই ললিতমোহন বহন করিলেন। করুণাময়ীর বহুকালের পর্ণকুটীর শতছিদ্র হইয়া গিয়াছিল, ললিত-মোহনের দয়ায় আবার নূতন হইয়াছে, জীবনকৃষ্ণের অনুসন্ধানের জন্য যোগ্য যোগ্য লোক নিযুক্ত হইয়াছে। মাতাপুত্রী ললিতমোহনের চরণে জীবন বিক্রয় করিয়াছে।

(৬)

এক বৎসর অতীত। জীবনকৃষ্ণের কোন সন্ধান হইল না, তত্রাচ ললিত-মোহন অজস্র অর্থব্যয়ে একজন বিচক্ষণ মহারাষ্ট্রীয় গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন। করুণাময়ী প্রত্যহ যে পরিমাণে চাল ডাল ইত্যাদি পাইত, তাহার অর্দ্ধেকে দুই বেলা পরমসুখে কাটিয়া যাইত, বাকী সমস্ত দোকানে বিক্রয় করিয়া কিছু নগদ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল। এ সংবাদ ললিতমোহন পাইলেন, একদিন আসিয়া বলিয়া গেলেন, "তোমরা ওসমস্ত বিক্রয় করিও না, দীন, দুঃখীকে দান করিও,

অর্থের আবশ্যক হইলে জানাইও, আমি তোমাদের অভাব মোচন করিব।”

(৭)

কালীপদ সস্ত্রীক নৌকারোহণে ঠাকুর দেখিতে যাইতেছে শুনিয়া, ধর্ম্মপরায়ণা করুণাময়ী কন্যাসহ অপর নৌকাযোগে যাত্রা করিল। দেবতার স্থানে দুর্ভেদ্য জনতা, জনতা ভেদ করিয়া যাইবার ক্ষমতা করুণাময়ীর হইল না, অগত্যা কালীপদের সাহায্যে দেবতার স্থানে আসিল। অগ্রে কমলা, তৎপশ্চাতে করুণাময়ী, মাতার অল্পপশ্চাতে পাঁচী, তৎপার্শ্বে কালীপদ দাঁড়াইল। কালীপদ তখন নেশায় বিভোর, সুযোগ পাইয়া কম্পিতকণ্ঠে দুই একটা প্রেম সম্ভাষণ করিল; পাঁচী কোন উত্তর করিল না।

দেবতার নিকট হইতে আসিবার কালীন পাঁচী দলভ্রষ্টা হইল। কালীপদ বহু প্রয়াসে বিবিধ কৌশলে কোনরূপে জনতা ভেদ করিয়া কমলা ও করুণাময়ীকে নৌকায় রাখিয়া পাঁচীর তল্লাসে ছুটিল। অল্পক্ষণ অনুসন্ধানে পাঁচী মিলিল। আসিবার কালীন জনতার মধ্যে পাঁচীর নিকট দুরাচার সকাতরে প্রেম ভিক্ষা চাহিল। কত সাধ্যসাধনা করিল। কিন্তু পাঁচী কোন উত্তর করিল না।

(৮)

ইহার পর এক সপ্তাহ অতীত। পাঁচী সামান্য লেখাপড়া জানিত, সেই ভরসায় কালীপদ স্পষ্ট করিয়া একখানি প্রেমপত্র লিখিয়া পাঁচীর নিকট পাঠাইল। পাঁচী অতি কষ্টে তাহা পড়িয়া ভাব হৃদয়ঙ্গম করিল। পাঁচীর প্রাণে অশান্তি আসিয়াছে, অজানা সুখের পরশে সদাই চঞ্চল, সদাই টল্ মল্ করিতেছে। পাঁচীর মানস-পদ্মে ললিতমোহনের চিত্র শোভা পাইতেছে। ললিতমোহন যদি পাঁচীকে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে পাঁচী কালীপদের করে জীবন দান করিবে, এইরূপ ভাব।

নিভৃতে ললিতমোহনকে দেখিলে পাঁচী আয়তলোচনে অনিমেষে চাহিয়া থাকিত। পাঁচীর নয়নে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, কাতরতা মিনতি খেলিত। সে চাহনির অর্থ কি, তাহা ললিতমোহন বুঝিলেন, উপেক্ষিতা হইলে অভাগিনী অন্যে আসক্ত হইবে, তাহাও বুঝিলেন; অনুসন্ধানে কালীপদ সংক্রান্ত ঘটনাও শুনিলেন। গভীর চিন্তার পর স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, পাঁচীকে হাতছাড়া করা হইবে না।

একদিন পাঁচীর ক্ষুদ্র করপল্লবখানি সযত্নে ধরিয়া মাতৃসম্বোধনে কোমলস্বরে ললিতমোহন বলিয়াছিলেন, “তোমার চাহনি দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিয়াছি, তুমি যেন

সকাতরে আমার নিকট কিছু চাহিতেছ। তোমাকে আমি বড় ভালবাসি, তোমার অভাব হইলে আমার কষ্ট হয়, তোমাদের সুখের জন্য আমি এ প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে সর্ব্বদা প্রস্তত। তোমার অভাব, তোমার সাধ, তোমার বাসনা, আমায় বল, মুখে বলিতে যদি না পার, পত্রে লিখিয়া জানাইও।''

ললিতমোহনের পবিত্র অঙ্গস্পর্শে পাঁচী স্থিরা, জ্ঞানশূন্যা, অবসন্না; বদনে কথা সরিল না।

(৯)

এক সপ্তাহকাল পাঁচী আপন ক্ষুদ্র হৃদয়ের সহিত ছোট খাট রকমের যুদ্ধ করিয়া পাঁচ সাতখানি কাগজ ছিঁড়িয়া অবশেষে একখানি পত্র ললিতমোহনকে লিখিয়াছিল। পত্রে কেবল মিনতি, কাতরতা ও অবশেষে প্রেমভিক্ষা।

পাঁচীর প্রেমপত্র বসন্তকুমারীর হাতে পড়িয়াছিল। বসন্তকুমারী তাহা পাঠ করিয়া মৃদুহাস্যে স্বামীকে বলিয়াছিলেন, "এমন রত্ন ছাড়িবে? সুন্দরী যুবতী স্বেচ্ছায় তোমার চরণে তাহার জীবন যৌবন ঢালিয়া দিতেছে, সাদরে গ্রহণ কর, নতুবা বিষময় ফল ফলিবে; তাহার জন্য হয় ত আমাদের সোণার সংসার জ্বলিয়া যাইবে। ছাড়িও না, সাদরে গ্রহণ করিতে না পার, অভাগিনীকে উপদেশ দাও, সৎপথে তাহার মতিগতি ফিরাও। গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কর্ত্তব্য-স্থির কর।"

পত্রের উত্তরে ললিতমোহন পাঁচীকে লিখিয়াছিলেন, "তুমি যুবতী, সুন্দরী, পরস্ত্রী, বালবিধবা। তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি পবিত্র। সে পবিত্র হৃদয়ে কলঙ্কের দাগ আঁকিও না। আমার উপদেশ মত চলিবে, আমার কথা শুনিবে, ইহা যদি ঈশ্বরের নামে, ধর্ম্মের নামে শপথ কর, তাহা হইলে তোমার সকল সাধ প্রাণপণে পূরণ করিব।"

পাঁচী সে পত্রের এইরূপ উত্তর দিয়াছিল, ঈশ্বরের নামে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল।

(১০)

ললিতমোহনের গুরুদেব একজন সিদ্ধপুরুষ বহুদর্শী। ললিতমোহন এই আকস্মিক বিপদ গুরুদেবকে জানাইলেন। গুরুদেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার জন্য আজ একটী পবিত্র হৃদয় যখন কাঁদিতেছে, তখন অবশ্য আমি তোমাকে উপলক্ষ করিয়া তোমাকে দিয়াই দুঃখিনীর চোকের জল মুছাইব।"

গুরুদেব শুভদিনে পাঁচীকে দীক্ষিতা করিলেন; সর্ব্বদা ললিতমোহনকে দেবতারূপে মানসে অহঃরহ জপিতে ও প্রত্যহ এক সহস্র ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে বলিলেন। বেশী টান যদি না সহ্য হয়, সেইজন্য গুরুদেব আসিবার কালীন বলিয়াছিলেন, "শুদ্ধচিত্তে একবৎসরকাল এই প্রথায় থাকিলে, ললিতমোহন তোমারই হইবে।"

পাঁচী শুদ্ধচিত্তে একমনে ললিতমোহনকে ভাবিত, দিবারাত্র ইষ্টমন্ত্র জপিত। একসন্ধ্যা আতপ-তণ্ডুল স্বহস্তে সিদ্ধ করিয়া খাইত, শয্যার পরিবর্ত্তে ব্যাঘ্রচর্ম্মে শুইত। পাড়াপ্রতিবেশীরা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে পাঁচী বলিত, "পাঁচজনে আমায় ভাল থাকিতে দিলে কৈ? এ দশা কেবল তাদের জন্য। দুই চার মাস পরে পাঁচী আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিত না।

এক বৎসর অতীত। কালীপদ সাধ্যমত পাঁচীর সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিয়াছিল, সেই কারণে কমলার সহিত কালীপদের তুমুল বিবাদ হইল, দুঃখে, ক্ষোভে কমলা বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। কালীপদ পাঁচীর সহিত একদিন সাক্ষাৎ করিল, কত কাতরতা জানাইল, একবিন্দু করুণা ভিক্ষা করিল, কিন্তু পাঁচীর জলন্ত নয়ন তাহার সুখ, আশা এককালীন অতল জলে ডুবাইয়া দিল। কালীপদ আতঙ্কে মাথা তুলিয়া পাঁচীর প্রতি চাহিতে পারিল না, দেবীজ্ঞানে করজোড়ে ক্ষমা চাহিল, পাঁচী ক্ষমা করিল।

(১১)

বহু চেষ্টার পর সুদক্ষ মহারাষ্ট্রীয় গুপ্তচর জীবনকৃষ্ণকে লইয়া আসিল। ধুমধামের সহিত ললিতমোহন তাহার বিবাহ দিলেন। বসন্তকুমারী বধূকে এক গা গহনা দিয়াছিলেন। পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া করুণাময়ী বৃদ্ধাবস্থায় সুখের সাগরে ভাসিল। পাঁচী ললিতমোহনকে দেখিলে গল-লগ্নীকৃত-বাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিত। পাঁচী এখন সর্ব্বদাই ললিতমোহনকে আপন হৃদয় মধ্যে দেখিতে পাইতেছে, তাহার আর কোন কামনা নাই, পাঁচী মনে মনে বুঝিয়াছিল, বসন্তকুমারী হইতেও সে সুখী। ললিতমোহনের চিত্র পাঁচীর অস্থি, মজ্জা, শোণিতে মিশ্রিত পাঁচীর চক্ষে জগৎসংসার ললিতমোহন ময়। জীবন অন্তে ললিতমোহনের চরণে সে মিশিবে, তাহা পাঁচী বুঝিয়াছিল। ললিতমোহন তাহার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এক কথায় ললিতমোহন তাহার সমস্ত। —

(১২)

তিন বৎসর অতীত। পাঁচীর রূপ শতগুণে উচ্ছ্বলিত, অঙ্গে অপরূপ জ্যোতিঃ বিস্ফুরিত; পাঁচী স্বর্গপুরের দেবী। কালীপদ পূর্ব্বকৃত ঘৃণিত কর্ম্মের জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ। একদিবস পাঁচীর চরণতলে পড়িয়া সে হৃদয়ভেদী করুণ আর্ত্তনাদে অসহ্য দহনের কথঞ্চিৎ লাঘব করিয়াছিল।

ললিতমোহনের সংসারে দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ললিতমোহন একটী দেবালয়, শিবালয়, অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, পাঁচী সেই অতিথিশালার কর্ত্রী হইল, দেবীজ্ঞানে পাঁচীকে সকলেই নমস্কার করিত।

গুরুদেব একদিন দেবালয়ে আসিয়া পাচীকে বলিলেন, "মা অন্নপূর্ণে কাহার জয় হইল না?"

দেবালয়ের উপর দাঁড়াইয়া আলুলায়িত কুন্তলা পাঁচী উর্দ্ধে হস্ত তুলিয়া বলিল, "জয়, জয় ধর্ম্মের জয়!"

দেবীর বদন নিঃসৃত মধুর বাক্য জ্ঞানীর প্রাণ কাঁদাইয়া, পাপীর হৃদয়কন্দর কম্পিত করিয়া, চারিদিকে প্রতিধ্বনি হইল, "জয়, জয় ধর্ম্মের জয়!"

দাতার ঔদার্য্য।

আমাদের বঙ্গদেশে ধর্ম্মানুরাগী বদান্য মহানুভব ব্যক্তির প্রাচুর্য্য ছিল; আজ কাল কমিয়া আসিয়াছে। শতবর্ষ পূর্ব্বে এক একজন সাত্ত্বিক ধনশালী পুণ্যাত্মার দানের কথা শ্রবণ করিলে, এখন যেন উপকথা বলিয়া মনে হয়, পৌরাণিক দাতাগণের পুরাতন দৃষ্টান্ত জগৎ সংসারে অতুল্য; বর্ত্তমান যুগেও সাত্ত্বিক দাতার অভাব ছিল না। এক একজন দাতার দানশক্তির এরূপ মহিমা শুনা যায় যে, দানার্থী ব্যক্তি দারস্থ হইলে দাতা তাহার অভাবের বৃত্তান্ত অগ্রে অবগত হইতেন, হৃৎপ্রত্যয় জন্মিলে, বিবেচনাপূর্ব্বক দানার্থীর যত অভাব কিংবা যত প্রয়োজন, পাই পয়সাটি পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া এককালে তাহাকে তৎসমস্ত টাকা অর্পণ করিতেন। প্রাচীন লোকের মুখে শুনা যায়, এই কলিকাতার চূড়ামণি দত্তের এই-রূপ ক্ষমতা ছিল। আরও শুনা গিয়াছে, টাকীর প্রসিদ্ধ মুন্সীবংশীয়

কালীনাথ মুন্সীর ভ্রাতা বাবু বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সী এক বৎসর একদিন স্বয়ং আলিপুরের কালেক্টারী কাছারীতে সরকারী মালগুজারী দাখিল করিতে যাইতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে লক্ষটাকা ছিল। সেইদিন শোভাবাজারের কোন এক সম্ভ্রান্ত মহোদয়ের বাটীর প্রাঙ্গনে একটি সৎকার্য্যের জন্য চাঁদা সংগ্রহের নিমিত্ত এক সভা হয়; বৈকুণ্ঠনাথ বাবুর গাড়ী যখন শোভাবাজারের রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। তাঁহার একজন পরিচিত লোক সেই সময় তাঁহাকে দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য গাড়ী থামাইতে বলেন, ছুটিয়া গিয়া সভার অভিভাবক মহাশয়কে সংবাদ দেন, অভিভাবকের অনুমতি পাইয়া সেই লোকটি ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার আহ্বান জানাইয়া মুন্সীবাবুকে সভায় লইয়া যান। সভার উদ্দেশ্য শুনিয়া লক্ষটাকার চাঁদার প্রস্তাব শুনিয়া অকপটে বলেন, "চাঁদার খাতায় আমি স্বাক্ষর করিব না, ভাগে পুণ্যকর্ম্ম করা আমাদের ব্রত নয়, আপনারা চাঁদা বন্ধ করুন, আমি একাকী লক্ষটাকা দান করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ কালেক্টারী খাজানার সেই লক্ষটাকা সভায় সমর্পণ করিলেন। দাদার অজ্ঞাতে ঐ কার্য্য করা হইল, দাদা কি বলিবেন, ইহা ভাবিতে ভাবিতে তিনি বরাহনগরের বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। শীঘ্র প্রত্যাগত সহোদরের ম্লান বদন অবলোকন করিয়া তাঁহার দাদা সেই বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বৈকুণ্ঠনাথ বাবু কুণ্ঠিতভাবে মৃদুবচনে সত্য কথা বলিলেন, "বেশ করিয়াছ" বলিয়া দাদা সানন্দে ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তাহার পরদিন পুনরায় কালেক্টারীর টাকা প্রেরণ করা হয়। বাঙ্গালীর দানধর্ম্মের এই একটী মহৎ দৃষ্টান্ত। আরও কয়েকজন দানশীল পুণ্যাত্মার গৌরবের উদাহরণ আছে।

আর একজন দাতার উদারতা ও বদান্যতার কথা আমরা শ্রবণ করিয়াছি, ধর্ম্মার্থ সৎকার্য্যের জন্য কেহ তাঁহার নিকট দান প্রার্থনা করিতে গেলে, তিনি তাঁহাদের সকলকেই যথাসম্ভব অর্থ সাহায্য করিতেন। একদা এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ পুত্রের উপনয়নার্থ তাঁহার নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করেন, দাতা তাঁহাকে দুটি টাকা দান করিবার ইচ্ছা করিয়া ভৃত্যকে বাক্স আনিতে বলেন; বাক্সটি সে দিন অগণিত রজতমুদ্রায় পূর্ণ ছিল, তালা খুলিয়া দাতা তন্মধ্য হইতে দুটি টাকা তুলিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিতে গেলেন, একটি টাকা হস্তভ্রষ্ট হইয়া সেই বাক্সের টাকাগুলির উপর পড়িয়া যায়, একটি টাকা তাঁহার হস্তে থাকে। এই ঘটনা যখন হয়, বাড়ীর দেওয়ানজী এবং পুরোহিত তখন সেইখানে বসিয়াছিলেন।

দান করিবার টাকা বাক্সের টাকার সহিত মিশাইয়া গেল, কি করা কর্ত্তব্য, কর্ত্তা তদ্বিষয়ে তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। পুরোহিত বলিলেন, "একটা পড়িয়াছে, দুইটা দিলেই ঠিক হইবে।" দেওয়ানজী বলিলেন, "উপরের একমুষ্টি তুলিয়া দিলেই দোষ খণ্ডিবে।"

মস্তক সঞ্চালন করিয়া কর্ত্তা কহিলেন, "না, তাহা হইতে পারে না, টাকাটি যদি গড়াইয়া বাক্সের তলায় গিয়া পড়িয়া থাকে, তবে ত আমাকে দত্তধন অপহরণ পাপে লিপ্ত হইতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি যাচক ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "কাপড় পাতো।" ব্রাহ্মণ কাপড় পাতিলেন, দাতা সেই বাক্সের সমস্ত টাকা সেই কাপড়ে ঢালিয়া দিলেন।

ধর্ম্মভয় জনিত ঔদার্য্যের চমৎকার উদাহরণ। আমাদের দেশে এখন বিপুল ধনশালী ব্যক্তির নিতান্ত অভাব নাই, এরূপ স্থলে পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মানুরাগী দাতালোকের অভাব থাকে, কথাটা ভাবিলেও প্রাণে আঘাত লাগে। সৌভাগ্যক্রমে যাঁহারা কমলার কৃপাপাত্র, তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্ববৎ দাতালোকের অভ্যুত্থান দর্শন করিতে আমরা অভিলাষী।

ভিক্ষুক ও মুমূর্ষু।

প্রতিবাদ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী দেবব্রত।

গত ৬ষ্ঠ সংখ্যায় "জন্মভূমি" পত্রিকায় "ভিক্ষুক ও মুমূর্ষু" প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে, "ভিক্ষাবৃত্তি যার পর-নাই নীচ বৃত্তি। মহাজন বাক্যেও আছে, "বাণিজ্যে লক্ষীর বাস, কৃষিকার্য্যে তাহার অর্দ্ধেক, রাজসেবায় তাহারও অর্দ্ধেক, ভিক্ষায় নৈব নৈবচ।"

আমরা বলিতেছি, কে না ভিক্ষুক, জগতময় ভিক্ষুক—সকলেই ভিক্ষার দাস। যাঁহারা ধনবান, ঐশ্বর্য্যবান, সম্পত্তিবান, তাঁহাদেরই কথা মানব-সমাজে আলো-

ড়িত হয়; কিন্তু দীন দুঃখী জগতের এককোণে পড়িয়া থাকে, তাহাদের কথা লইয়া কেহই আলোচনা করে না। জন্মভূমিতে ভিক্ষুকের ভিক্ষা নীচবৃত্তি পরিপূর্ণ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও মর্ম্মাহত হইলাম। আমরা নিজে দীন, নিজে দুঃখী, তাই আজ আপনাদিগকে দীন-দুঃখীর কথা শুনাইব। আর দেখাইব, ভিক্ষুকের ভিক্ষালব্ধ জিনিষ আছে কিনা? আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব—ভিক্ষালব্ধ জিনিষে ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারে কি না? জগতের নিকট চিরদিনই ভিক্ষুকশ্রেণী উপেক্ষিত, পদদলিত ও ঘৃণিত, কিন্তু তাহা হইলেও তাহার যে সম্পত্তি, যে ঐশ্বর্য্য, যে ধনরাশি আছে, সেই সম্পত্তির সেই ঐশ্বর্য্যের, সেই ধনরাশির ধনে ধনী হইতে পারিলে, কুবেরের ধনভাণ্ডারকে অতি তুচ্ছ—অতি কদর্য্য ও হেয় বলিয়া শতদুরে নিক্ষেপ করিবে। আপনারা মনে করিয়াছেন, ভিক্ষা কদর্য্যকার্য্য। তাহাতে আপনাদিগের দোষ দিতে পারি না। কারণ জগতের লোকই ভিক্ষুককে কদর্য্যের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—

"ভিক্ষা কদর্য্য কার্য্য, ভিক্ষা কেবল অলসতাপূর্ণ। সেই ভিখারী যে উদর পরিপূরণার্থে "মা চারিটী ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও" বলিয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইতেছে, কোথাও গালি, কোথাও বা দুমুটি জুটিতেছে, যে সম্প্রদায় অলসতাপুর্ণ, দেহভার লইয়া সমাজকে কলুষিত করিতেছে, সেই ভিখারীর আবার সম্পত্তি কি?"

এটী আশ্চর্য্যের কথা বটে। ইহা ভাবিবার এবং এই বৃত্তিকে নীচবৃত্তি বলিবার একটী প্রধান কারণ পরিলক্ষিত হয়, সেটী আর কিছুই না—আমি যে কি, কি করিতেছি—আমার করণীয় কার্য্যের গতিবিধি কি? এটী চিন্তা না করিয়া দেখা। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ভিক্ষুকের ভিক্ষালব্ধ ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই। ধনী, মহাজন, ঐশ্বর্য্যবান, ধনবান, রাজা, মহারাজা, মহোদয়গণ! বৃথা ধনমদে প্রমত্ত হইয়া, ভিক্ষুকের ভিক্ষালব্ধ বস্তু এবং ভিক্ষুককে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছেন? তোমরা কি ভিক্ষুক নও? তোমরা কি কোন দিন ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হও না। আমরা বলিতেছি, তোমরাও ভিক্ষুক, তোমরাও ভিক্ষা করিয়া থাক। জগতের সকলেই ভিক্ষালব্ধ ঐশ্বর্য্যভোগী ভিক্ষুক। সামান্য ভিক্ষুক দুটী অন্নের ভিক্ষুক, আর তোমরা মহাভিক্ষুক।

এ জগতে সকলেই ভিখারী। কেমন নাম ভেদে—ব্যবসাভেদে, কার্য্যভেদে, পৃথকভূত। সকলের উপজীবিকাই ভিক্ষা। কেহ পেটের ভিক্ষা, কেহ অর্থের ভিক্ষা,

কেহ ভালবাসা ভিক্ষা, কেহ পরার্থপরায়ণতার ভিক্ষা, কেহ ভগবৎ প্রেম ভিক্ষা প্রভৃতি ভিক্ষাভেদে নানা লোক নানাপ্রকার ভিক্ষায় প্রবৃত্ত। কি ধনী, কি নির্ধন, কি মুর্খ, কি পণ্ডিত,কি রাজা, কি মহারাজ, আচণ্ডাল, আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলেই ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া জগতের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছ। কেহ বা ধনীর দ্বারে কেহ বা বারাঙ্গনা পদতলে আপনাপন অভীষ্ট ভিক্ষা চাহিয়া লইতেছে।

ভিন্ন ভিন্ন লোকের ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিক্ষাপ্রবৃত্তিও ভিন্ন। যে নিরন্ন সে অন্ন চায়, যার অন্ন আছে, সে স্ত্রীর ভাল কাপড় কি গহনা চায়। যার ঘরে ধনদৌলত বর্ত্তমান, সে সম্মান চায়।

রাজা মহারাজা হইতে, মহারাজা পৃথিবীপতি হইতে, পৃথিবীপতি ইন্দ্রত্ব, ইন্দ্র বিষ্ণুত্ব, বিষ্ণু ব্রহ্মত্ব পাইতে ভিক্ষা করেন।

অভাবগ্রস্থ সকলেই—সকলেই অভাব পরিপূরণে ভিক্ষুক! কেবল ভিক্ষা-ভেদে ভিক্ষুকের তারতম্য ইতরবিশেষ। যিনি অভাবগ্রস্থ তিনিই ভিক্ষুক। এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নগণ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকলেই অভাব-গ্রস্থ—সকলেই ভিক্ষুক। একজন অপরের কাছে চাহিতেছে, সে আবার অন্যের নিকট চাহিয়া থাকে।

এখন বোধ হয়, আপনাদের চক্ষে কেবল উদর পরিপূরণকারী, দ্বারে দ্বারে বিচরণকারী, মলিন ছিন্নবস্ত্র পরিহিত ভিক্ষুক কেবল ভিক্ষুক নয় বলিয়া জ্ঞান জন্মিয়াছে। যখন জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই ভিক্ষুক, তখন এস ভাই যা পাইলে চিরদিনের জন্য মনপ্রাণ কার্য্যসাগরের অতল জলে ডুবিবে, যাহাকে পাইলে এ ভব-বন্ধন চির-দিনের জন্য ছিন্ন হইবে, যিনি একমাত্র ভিক্ষাদান কর্ত্তা তাঁহার কাছে ভিক্ষা-প্রার্থনা করি। যেমন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মায়ের নিকট আদ্যা-শক্তি ব্রহ্মস্বরূপিণী জগন্মাতার নিকট চাহিয়াছিলেন, "মা! এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমি পাপপুণ্য কিছুই চাই না, আমাকে শুদ্ধ ভক্তি দাও। এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমি জ্ঞানাজ্ঞান কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধ ভক্তি দাও, মা, এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধ ভক্তি দাও; এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধ ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধ ভক্তি দাও।"

কবে তাঁহার কার্য্য এরূপ আত্মার করে, জগতের সকলেই ভিক্ষুকজ্ঞানে জ্ঞানী

হয়ে, সর্ব্বজীবে ভিক্ষুকের ইতর বিশেষ বোধে তাঁহার পদে আশা ভরসা, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি, শুচি অশুচি অর্পণ করে প্রাণমন শীতল কর্‌বো, আর বল্‌বো, এস ভাই—আচণ্ডাল আমরা সকলেই ভিক্ষুক।

যে যেভাবে তাঁহার প্রেমভিক্ষা করে, তিনি সেই ভাবেই তাহার কামনা পরিপূর্ণ করেন। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্তানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

গীতা ৪র্থ অধ্যায় ১২ শ্লোক।

হে পার্থ! যে, যেভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেইভাবে অনুগ্রহ করিয়া থাকি। মনুষ্য যেভাবেই ভজনা করুক না কেন, সকলেই আমারই ভজনামার্গ অবলম্বন করিয়া থাকে।

কেহ ধনরূপে, কেহ পুত্ররূপে, কেহ সুন্দরীরূপে, কেহ বিদ্যারূপে, কেহ যশঃ রূপে, কেহবা ঐশ্বর্য্য রূপে তাঁহাকে চায়। যে, যেভাবে চাক্ না কেন, তিনি তাহাকে তাহাই প্রদান করেন। যিনি প্রকৃত ভিক্ষুক, তিনি কি চান—তিনি কেবল তাঁহাকেই চান। তিনি নিশিদিন তাঁহার প্রেমেই মত্ত থাকিতে ভালবাসেন, তাঁহার আর বাহির জগতের ভিক্ষার কথা মনে থাকে না, বাহির জগতের ভিক্ষার ঝুলি খসিয়া যায়।

সাধক ধ্রুবের ভিক্ষা দেখ, ভগবান ধ্রুবকে বর দিতে গিয়াছিলেন, তখন ধ্রুব কি চাহিয়াছিলেন, "কেবল তোমাকেই চাই, ধন ঐশ্বর্য্য কিছুই চাই না, যখন ইচ্ছা করি, যেন তোমাকে দেখ্‌তে পাই।" আবার বর দিতে গেলে প্রহ্লাদ কি বলিয়াছিলেন, "প্রভু আমি বণিক নয় যে, তপস্যায় বিনিময় তোমার নিকট বর চাহিব। বাহিরের সুখ দুঃখ তোমার নিকট কিছুই চাই না, সিদ্ধি চাই না, শুদ্ধি চাই না, কোন উত্তম লোকে বাস করিতে চাই না। তবে যদি দয়া করিয়া কিছু দিতে চাও, তবে তোমার গুপ্ত ভাণ্ডারের যাহা অমূল্য তাহাই দাও। এমন বস্তু দাও, যা পাইলে জীবন জুড়াইয়া যায়। এ দীনহীন কাঙ্গাল যাহা পাইলে কৃতার্থ হইয়া যায়, তাহাই দাও। তুমি স্বহস্তে যাহা দিবে, তাহা পাইলে কৃতকৃতার্থ হইব। আমি আর কি চাহিব।"

প্রহ্লাদ চাহিতে শিখিয়াছিলেন, চাহিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, তাই চাহিবার বস্তু, ভিক্ষার বস্তু, সাধনার বস্তু, তাহার উপর অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন;

তাই প্রহ্লাদের জীবন মধুময় হইয়া গিয়াছিল। আর আমাদের মত ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা দিতে আসিলে, আমরা আর কি যাচিতাম, আমরা চাহিতাম, থানকতক ঢাকাই, কি সিম্লার ধুতি, থানকতক নভেল, থানকতক মহারাজ কি বকুল সাবান, ভাল ভাল চিত্রবিচিত্র, কারুকার্য্য পরিশোভিত থানকতক রুমাল ও কিছু সুগন্ধি আতর। আমাদের মনে তখন কি ধ্রুবের ভিক্ষা, প্রহ্লাদের ভিক্ষা, ভগবান রামকৃষ্ণদেবের ভিক্ষা,ভিক্ষা বলিয়া বোধ থাকিত। তখন আমরা পাশ্চাত্য আলোকে আলোকিত হইয়া সামান্য ভিক্ষুককে ভিক্ষুক বলিয়া মনে করিতাম। আমাদের যদি সেরূপও না হইত, তা হলে আপনাদের হয় ত অন্নদামঙ্গলের পাটনীর মত ভিক্ষা আসিয়া পড়িত।

"আহ্লাদে পাটনী তবে বলে যোড়হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে॥"

দুধভাত চাহিয়া বসিল, কারণ তার দৌড় ঐ পর্য্যন্তই। আমাদেরও সেই দশা, আজকাল আমাদের দৌড় আধুনিক বিলাসিতার দিকে এই আমরা ভিক্ষুক শ্রেণীকেই নীচ প্রবৃত্তি বলিয়া অভিবাদন করিয়া থাকি—দেখি না, বুঝি না যে, আমরা মহাভিক্ষুক।

এস ভাই এরূপ প্রবৃত্তি ত্যাগ কর। এস, কল্পতরুমূলে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া লই। আমাদের জীবন স্বর্গীয় অমৃত রাশিতে পরিপূর্ণ করি। মা মা বলে, প্রাণসখা বলে, জগৎপ্রভু বলে, প্রাণমন ভরিয়া স্নেহ, ভালবাসা, অনুরাগ দিয়া আত্ম মনপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া জীবনের সাধ মিটাইয়া লই। জগৎ পরিবৃতা জগন্ময়ীর প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া, মায়ের ভুবনমোহিনী রূপমাধুরী জ্যোতিভরা নয়নতারা দেখিয়া সাধ মিটাইয়া লই। বাহিরের দর্শনীয় ভিতরে লইয়া পদ্মাসনে তাঁহারই রূপরাশি প্রস্ফুটিত করি। এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ থাকিতে থাকিতে এই দেহে দেহী থাকিতে থাকিতেই ভিক্ষা চাহিয়া লই। পশুদেহে গিয়া যেন ভিক্ষা চাহিতে না হয়, পশুদেহে গিয়া ভিক্ষা করিলে পশুরই খাদ্য জুটিবে। এস ভাই, সময় থাকিতে সাবধান হই। ছোট বেলা হইতে বড় হইতেছি, আর ভাবিতেছি, এখনও সময় হয় নাই—কিন্তু সময় যে ক্রমশঃ সংক্ষেপ হইতেছে, তাহা কি ভাবিতেছ? এস পবিত্র প্রেমপূর্ণ সাদরে প্রেমময়ীর কাছে চিরদিনের জন্য প্রেমভিক্ষা করিয়া লই।

তাঁহার প্রেমভিক্ষা যে কি গৌরবের, কি সোহাগের, কি আনন্দের তাহা

যিনি ভিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই তাহার মধুময় স্বাদ আস্বাদন করিতে পারিয়াছেন। ভিক্ষুকের দিকেই ভগবানের কৃপাকটাক্ষ পতিত হয়—হীনতা দীনতাই ভগবানের কৃপা আকর্ষণ করে। ভিখারী হওয়া ও তাহার নিকট ভিক্ষা চাওয়া, বড় সৌভাগ্যের কথা—বহু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সাধনার ফল। দুর্দ্দশার কথা, কি ঘৃণার কথা নয়; প্রকৃত ভিক্ষুক হওয়াও দুঃসাধ্য। প্রকৃত ভিক্ষুকের অভিমান কোথায়, কোন গিরিগুহায় লুকাইয়াছে; অহঙ্কার চূর্ণীকৃত হইয়াছে—মানসম্ভ্রম লইয়া ব্যস্ত জীব কখন কি প্রকৃত ভিক্ষুক হইতে পারে? তাহার "ভিক্ষুক ও মুমূর্ষু" প্রবাদের ব্রাহ্মণের মতই হইবে? যেখানে অভিমান ভরপুর, সেখানে কি দীনতা, হীনতা স্থান পাইবে? তৃণ অপেক্ষা অবনত হইয়া মূল হইতেও সহিষ্ণু হইয়া ভগবানের সেবা করিতে হয়। এইখানেই দেখুন যখন পঞ্চপাণ্ডবকে বকরূপী ধর্ম্মরাজ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "তৃণ অপেক্ষা লঘু কে?"

"ভীমার্জ্জুন, নকুল, সহদেব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই, জলস্পর্শ করিবা মাত্র পঞ্চত্ব পাইয়াছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দান করিয়া ঐ প্রশ্নের উত্তর দেন যে, "যাহারা ভিখারী, তাহারা তৃণ অপেক্ষা লঘু।" বলি যে, ব্রাহ্মণের ঘন ঘন নিশ্বাস বহিল, বাক্‌রোধ হইল, সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মধারা ঝরিতে লাগিল, তাহার কি মান অভিমান ছিল না? যদি বলেন ছিল, তাহা হইলে সে ভিক্ষুক কখনই হইতে পারে না। কারণ ভিক্ষুকের মান, অপমান, অহঙ্কার কিছুই থাকিতে পারে না। আর যদি বলেন ছিল না—তবে এরূপ হইতে পারে না। আর যাহার ভিক্ষা চাহিতে মুখে কথা ফুটে না—সে কি ভিক্ষুক! তখন নিশ্চয়ই তাহার অহঙ্কার হইয়াছিল যে, আমি ব্রাহ্মণ হইয়া বা কোনদিন ধনী ছিলাম, আজ অদৃষ্টচক্রে পড়িয়া রাজার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি? ব্রাহ্মণ কখনই প্রকৃত ভিক্ষুক পদবাচ্য নহে, উদর পরিপূর্ণকারী পাপজীবিকা নির্ব্বাহক বলা যাইতে পারে।

যখন জীব বলে, "হে জগৎপতি! আমি কিছুই না—আমি কর্ত্তা নই, হে প্রভু তুমি কর্ত্তা, তুমি ভর্ত্তা, আমি দাস। তখন নিস্তার—তখন তাহার অহং চলিয়া গিয়াছে। তখন সে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবার উপযোগী। বালক সিদ্ধার্থের ভিক্ষা দেখুন—রাজ্যসুখৈশ্বর্য্য—পরমাসুন্দরী রূপবতী স্ত্রী ও সুকুমার শিশু পুত্র ত্যাগ করিয়া, কাঙ্গালের বেশে—দীন ভিখারীর বেশে,—তাঁহার

নামে ভিক্ষুক সাজিতে পারিয়াছিলেন। তবে সে ব্রাহ্মণ পারিবে না কেন? পারিল না, —অহং পরিপূর্ণ বলিয়া। অহং নাশের উপায় ভগমান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন যে, "আমিতে সংসার করে, কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত করে, সেই আমিই খারাপ। জীব ও আমার প্রভেদ হইয়াছে, এই আমি মাঝখানে থাকে। জলের উপর যদি একখানি লাঠি ফেলিয়া দেওয়া যায়, তা হলে দু ভাগ দেখায়; বস্তুতঃ একই জল লাঠির দরুণ দুটো দেখাচ্ছে। এবং এই লাঠি তুলে লও, সেই এক জলই থাক্‌বে।" আরও বল্‌তেন, "যদি আমি একেবারে না যাবে—তবে থাক্‌—দাস আমি হয়ে। হে ঈশ্বর! তুমি প্রভু, আমি দাস, আমি দাস, আমি তা এরূপ আমিতে দোষ নাই! এরূপ আমিতে ভিক্ষা করা যাইতে পারে, এরূপ আমিতে ভিক্ষুক সেজে ভিক্ষালব্ধ ধনকে ধন বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

এখন ত দেখিলে ভাই, সকলেই আমরা ভিক্ষুক। আর প্রকৃত ভিক্ষুক হওয়া কি সাধনার কার্য্য তাহা ত দেখিয়াছ। আমরা সকলেই ভিক্ষুক, এ জগতে আমরা ভিক্ষা কর্‌তেই আসিয়াছি, এমন ভিক্ষা করি, যাহাতে কোন দিন অভাব অভিযোগ আর না থাকে; ভিক্ষার অমৃতময় ধারাপ্রবাহে যাহাতে চিরদিন মনপ্রাণ শীতল হয়, সেই পণ ধরি। এস ভিক্ষুকগণ যাহাতে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, স্ব স্ব রূপ বুঝিতে পারি, ভাবভক্তি ও প্রেমের উদয় হয়, এবং ভগববানের সেই বিশ্বমোহন রূপ হৃদয়-পদ্মে সদাসর্ব্বদাই জাগরূক হয়, এস সেই পথে যাই। যখন সকলেই ভিক্ষুক, তখন আত্মাভিমান সলিলে ডুবায়ে সকলে প্রকৃত ভিক্ষুকের পথ অবলম্বন কর, দেখিবে সেই সমস্তই ঝুলি পূর্ণ হইয়া যাইবে। তখন হৃদয়াকাশে চিদানন্দ চিৎঘন পূর্ণজ্যোতি পূর্ণরূপে অনন্তসাগরের অমৃতময় শীতল জলে সাঁতার দিতে থাকিবে। তোমার অভাব, ব্যাকুলতা, সুখ দুঃখ মান, অভিমান, সকলই তাঁহাকে অর্পণ করিতে পারিবে। তখন তোমার ভিক্ষুক নাম সার্থক হইবে। ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হইবে।

আন্তর্জাতিক ভেদ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গুপ্ত।

মহারাজ বল্লালসেনের সময় হইতেই আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতির অন্তর্গত গুণগত একটী ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ বল্লাল সেনের সময় এই প্রত্যেক জাতির অন্তর্গত গুণগত ভেদ কি আকারে বিদ্যমান ছিল এবং সেই ভেদের উদ্দেশ্যই বা কি ছিল, তাহা বিশেষভাবে জানিবার কোন উপায় নাই, সেইরূপ কোন ইতিহাস আমরা প্রাপ্ত হইতেছি না। দেশের সম্মানিত ও রাজভক্তব্যক্তিবর্গকে রাজপ্রসাদে গৌরবান্বিত করা সকল রাজার অধিকার কালেই আমরা দেখিতে পাই। মুসলমানের শাসনকালে রাজভক্ত এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে খাঁ, মাইতি, মজুমদার, লস্কর, বক্সী, রায়, মুন্সী প্রভৃতি উপাধি প্রদান করা হইত। ইংরাজ শাসনকালেও রায় বাহাদুর, রায় সাহেব প্রভৃতি উপাধি প্রদান করা হইতেছে। মহারাজ বল্লাল সেনও দেশের সম্মানিত সদাচারী, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণকে রাজগৌরবে গৌরবান্বিত করিবার জন্যই বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী, সেন, দাস প্রভৃতি উপাধি দান করিয়াছিলেন। কৌলিক গ্রন্থের মুল,—"আচারো বিনয়ো বিদ্যা" প্রভৃতি শ্লোকের আলোচনা করিলে এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। বিশেষত্ব এই যে, হিন্দু ও মুসলমান শাসনকালে যেরূপ উপাধি প্রদান করা হইত, তাহা প্রায় বংশ পরম্পরাগত। কিন্তু ইংরাজ শাসনকালে সেরূপ দেখা যায় না; আজকালকার উপাধি ব্যক্তিগত। যেমন মজুমদারের পুত্র মজুমদার, বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সেইরূপ রায়বাহাদুরের পুত্র রায়বাহাদুর হয় না। ইংরাজদিগের বংশপরম্পরাগত উপাধি একেবারেই নাই তাহা নহে; কিন্তু যাহা আছে, তাহা গুণগত নহে। বস্তুত গুণগত উপাধি বংশপরম্পরাগত হওয়া উচিত নহে। পণ্ডিতের পুত্র কি মূর্খ হয় না? আর তর্কবাগীশের পুত্র কি গণ্ডমূর্খ হয় না? সুতরাং গুণগৌরব বংশগত হওয়া, দুষণীয়। আবার উহা সমাজ সামাজিকতায় জড়িত হওয়া অত্যন্ত দুষণীয়। এই জন্যই সমাজনিয়ন্তা শাস্ত্রকারগণ সমাজের মানদণ্ডকে অবিপর্য্যস্ত ভাবে রক্ষা করিবার জন্য মানবদিগের মধ্যে ব্যবসাভেদে শ্রেণীভেদ করিয়াছেন। যেমন যজন, যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রভৃতি ব্রাহ্মণের ব্যবসায় অর্থাৎ যাহারা এই সকল ব্যবসায় করিয়া থাকেন, তাহারাই ব্রাহ্মণ। এইরূপ ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধনীতি ইত্যাদি। এইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃ-

তির ন্যায় জাতি বা শ্রেণীভেদ সকল দেশেই কোন না কোন আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের উপাধি শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের উপাধি বর্ম্মা, বৈশ্যের উপাধি গুপ্ত এবং শূদ্রের উপাধি দাস। শাস্ত্রকার ঋষিগণ জাতি বা শ্রেণীভেদ বিষয়ে এতদতিরিক্ত আর কিছুই করেন নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতিভেদে যে সনাতন এবং নির্দ্দোষ তাহা বলা আমার অভিপ্রেত নহে। সামাজিক কোন কার্য্যই সকল সময়ে এবং সকল অবস্থায় নির্দ্দোষ হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাসও নাই। কিন্তু শাস্ত্রাদিতে এই জাতিভেদদ্বারা সুশৃঙ্খলীয় সমাজগঠন হইতে পারে। আন্তর্জাতিক ভেদ সে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে অনুকূল নহে। বর্ত্তমান সময় আমাদের দেশে প্রত্যেক সমাজে নানা প্রকার দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে, পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, ঘৃণার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার মূল কি, অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ভেদজ্ঞানই ইহার প্রধান কারণ।

তন্ত্রে মন্ত্রে, আচারে, ব্যবহারে, অশনে, বসনে, ভোজনে সর্ব্বত্রই ভেদজ্ঞান বিদ্যমান। যে দেশে ভেদজ্ঞানের প্রভাব এত প্রবল—সে দেশে ভেদজ্ঞান মানবের মজ্জাগত, সে দেশে আবার সুশৃঙ্খলার সম্ভাবনা কোথায়? আন্তর্জাতিক ভেদ যে কেবল সুশৃঙ্খলার বিরোধী, তাহা নহে, ইহা সমাজের বিশেষতঃ জাতির অবনতির প্রধান কারণ। এই কৌলিন্য প্রথার প্রভাবেই এখনও অনেক নৈকুষ্য কুলিনের গৃহে কন্যার বিবাহ হইতেছে না। কুলীনগণ মূর্খ কুলীনের নিকট কন্যাদান করিতে প্রস্তুত, কন্যার বিবাহদোষ খণ্ডন করিবার জন্য অন্তিম দশায় উপস্থিত বৃদ্ধের নিকট কন্যাসম্প্রদান করিয়া বংশের মুখ উজ্জল করিতে প্রস্তুত, তথাপি জ্ঞানবান স্বজাতি অথবা অকুলীন পাত্রে কন্যাদান করিতে প্রস্তুত নহে। তাহাতে কুলমর্য্যাদার হানি হয়। এদিকে অকুলীনগণ কুলীন মূর্খ এবং জীর্ণ বৃদ্ধের নিকট কন্যাদান করিয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন, কিন্তু তুল্য গৃহে ও সৎপাত্রে কন্যাটী দান করিতে প্রস্তুত হইবেন না। ইহা কি সামাজিক জীবনে জাতীয় উন্নতির মর্ম্মভেদী কণ্টক বলিয়া মনে হয় না? ইহাদ্বারা দেশের কিম্বা সমাজের কি যে, হিতসাধন হইতেছে, তাহা ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য কুলীন মূর্খপাত্রে অথবা জীর্ণ বৃদ্ধের নিকট কন্যাদান করিলে, বংশের কি যে উজ্জল হইল, কোন্ অন্ধকার যে আলোকপ্রভায় প্রদীপিত তাহা এ ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। আজকাল দেশে একটু সুবাতাস বহিতেছে। অকুলীনগণ কুলীনের সহিত অসমানভাবে

আদানপ্রদান করিতে প্রস্তুত নহে। কুলীনগণের মধ্যেও অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই কৌলিন্য প্রথার দোষ দর্শন করিয়া, অকুলীনের সহিত সমানভাবে ক্রিয়া করিতেছেন। এই সুস্নিগ্ধ মলয়পবন আর একটু বেগে প্রবাহিত হইলেই, উচ্ছৃ-ঙ্খল ও জ্বালাময় সমাজে সম্পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হইতে পারে, বস্তুত কালে যে, এই প্রথা সমাজ হইতে বহিস্কৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা ততদূর করিব কেন? ব্যক্তিগত উন্নতি, সমাজের উন্নতি, সমাজের সুখশান্তি বৃদ্ধি করিতে আমরা আবার সময়ের অপেক্ষা করিব কেন? বিশেষতঃ কৌলিন্য প্রথাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা "একটা মনে করা মাত্র।" ইহাতে না আছে অর্থ-ব্যয়, না আছে পরিশ্রম, অথবা না আছে সময়ের অপব্যয়। কুলীন, অকুলীন সকলেই যদি মনে করেন যে, ব্রাহ্মণ জাতি পরস্পর সমান, ইত্যাদি, তাহা হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে। ব্রাহ্মণজাতি তাহাদের উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টো-পাধ্যায়, প্রভৃতি উঠাইয়া কেবল শর্ম্মা, এবং বৈদ্যজাতি তাহাদের উপাধি সেন, দাস প্রভৃতি উঠাইয়া দিয়া কেবল গুপ্ত বলিয়া যথাশাস্ত্র জাতীয় পরিচয় প্রদান করিলেই দেশ এবং সমাজের অমঙ্গলের নিদান এই কৌলিন্য প্রথা নির্ব্বাসিত হইতে পারে। যাহারা এই জাতিগত সামান্য ভেদ তুলিয়া দিয়া পরস্পর এক হইতে অসমর্থ, তাহাদের শক্তিই বা কি সামর্থ্যই বা কি? তাহারা কোন কালেও সামাজিক গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন।

এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা মুখে কৌলিন্য প্রথার দোষ স্বীকার করিতেছেন কিন্তু কার্য্যত তাহা প্রতিপালন করিতে পারিতেছেন না। ইচ্ছা সত্ত্বেও কার্য্যত প্রতিপালন করিতে অক্ষম হইলে, তাঁহাদের একটী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত। "আমি এই কার্য্য করিব, নতুবা আমি সমাজাধীন নহি।" আমরা অনেক সময় এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া স্বধর্ম্মানুকুল কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করি-তেছি। এক্ষেত্রেও যদি দুর্ব্বলতা আসিয়া আমাদিগকে সিদ্ধিমার্গ হইতে পদচ্যুত করে, তজ্জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত। ব্রাহ্মণগণ অনেকবার এই অহিতকর কৌলিন্য প্রথাকে সমাজ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণই সমা-জের নেতা ছিলেন, সমাজপ্রবর্ত্তক ছিলেন। তাঁহারা সমাজে যে নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতেন, যাহা বিধান করিতেন, সমাজ অবনতমস্তকে তাহাই গ্রহণ করিতেন। এখন আর তাঁহাদের সে প্রভাব, সে বীর্য্য, সে শক্তি নাই। তাঁহারা সমাজ

হইতে কৌলিন্য প্রথা দুরীভূত করিতে পারেন নাই। বৈদ্যজাতি কিম্বা কায়স্থজাতি তাহা করিবেন কি? আমাদের ধারণা এই যে কোন এক বর্ণের মধ্য হইতে কৌলিন্য প্রথা দুরীভূত হইলেই সকল জাতির মধ্য হইতেই বিলুপ্ত হইবে, সামাজিক শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, সমাজ, কার্য্যকরী ক্ষমতা, ভ্রাতৃভাব এবং সহৃদয়তা, আনয়ন করিবে। সামাজিক বিরোধের মূল ছিন্ন হইবে।

এই কার্য্য করিতে হইলে, ব্রাহ্মণগণ শর্ম্মা, বৈদ্যগণ গুপ্ত এবং কায়স্থগণ আপনাপন উপাধি বলিয়া যথাশাস্ত্র আত্মপরিচয় প্রদান করিবেন। দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধনার্থ কুলীনদিগকে একটু স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। আর অকুলীন কুলীনের সহিত অসমানভাবে ক্রিয়া করিয়া বংশের মুখোজ্জ্বল করিতে বিরত হইবেন।

মহাপুরুষের মহাযাত্রা।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী।

ভারতের আর একটী নক্ষত্র খসিল। দীনের বন্ধু, অনাথের শরণ, আতুরের সহায় মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন আর ইহজগতে নাই। হৃদয়ের সমুদয় উচ্ছ্বাস রুদ্ধ করিয়া আজ লেখনীধারণ করিয়াছি। হৃদ্গত শোণিত-তর্পণের অশ্রুধারাকে সংযত করিয়া আজ পাঠকগণের নিকট উপস্থিত হইলাম। আজ উপস্থিত হইলাম, সেই বিষয় শুনাইতে যাহা শুনিতে প্রত্যেক হিন্দুর প্রাণ সর্ব্বদা উৎসুক; যাহা শুনিয়া প্রত্যেক হিন্দু আপনার গন্তব্যপথ স্থির করিয়া লয়, যাহা শুনিলে প্রত্যেক হিন্দুর প্রাণ মৃত্যুশোক ভুলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়, আজ আমি সেই বার্ত্তা শুনাইতে উপস্থিত হইয়াছি। গুরুর কৃপায় মহাপুরুষের মহাযাত্রা দর্শনে হৃদয়ের শোক এবং অবসাদ দূর হইয়াছে।

হিন্দু যখন ভীষ্মের মৃত্যুকাহিনী শ্রবণ করে, তখন তাহারা কেহ অশ্রুবিসর্জ্জন করে কি? করে না। তাহারা চায়, এরূপ মৃত্যুবিজয় করিতে; কর্ম্ম সমাপ্ত

করিয়া এইরূপ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে। আমি আজ সেইরূপ একটী চরিত্রেরই কথা বলিব, যাহা শুনিয়া প্রত্যেক হিন্দু এইরূপ শ্লাঘনীয় মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করিবে। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন একপ্রকার চিররোগীই ছিলেন। অকালে বার্দ্ধক্যের জরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। কর্ম্মবীর মহাপুরুষ বিজয়রত্ন এইরূপ জরাগ্রস্ত শরীর লইয়া যেরূপ পরিশ্রম করিতেন, তাহা অনেক যুবকেরও ঈর্ষাস্থল ছিল। এই অকাল বার্দ্ধক্যের উপর গত দুই বৎসর হইতে শোথরোগে তাঁহার শরীর বড়ই অপটু হইয়া পড়িয়াছিল। এইজন্য তিনি ছয় মাসের অধিককাল পুরীতে গিয়া বাস করেন। পুরীতে বাসকালে সেখানে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। পুরীতেই মহাসমারোহে স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর আগুশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। তৎপর শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আবার চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। রুগ্নশরীরে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইত, ইহার উপর কলিকাতায় একটী আয়ুর্ব্বেদ সভা স্থাপন করিবার জন্য তাঁহাকে সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। বৈষয়িকশ্রম, তদুপরি এই সভার জন্য নানাবিধ চিন্তায় তাঁহার স্বাস্থ্য আবার ভাঙ্গিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর কেন, ভারতবাসীর কপাল ভাঙ্গিবার পথও পরিষ্কার হইতে চলিল।

স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয় এই অবস্থায় জলবায়ু পরিবর্ত্তনের আবশ্যক উপলব্ধি করিয়া দেবগৃহ যাত্রা করেন। দেওঘরে যাইয়া দুই একদিন ভালই ছিলেন। সেখানে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট বোধ হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও হইল। তাঁহার এই পীড়ার অবস্থা শুনিয়া কলিকাতা হইতে দুইজন চিকিৎসক সেখানে গিয়াছিলেন। চিকিৎসকদের চিকিৎসার ফলে একটু আরোগ্য-লাভ করিলেন। চিকিৎসকগণ ওখানে অন্ততঃ তিনমাস থাকিবার উপদেশ দিয়া চলিয়া আসেন। এইভাবে ৪।৫ দিন কাটিয়া গেলে পীড়া আবার দেখা দিল। তখন মহাপুরুষ পুত্রদিগকে বলিলেন, "হয় আমাকে কাশী লইয়া যাও, না হয় কলিকাতায় লইয়া চল, আমি এখানে কিছুতেই থাকিব না ; রোগের অবস্থা ভাল বুঝিতেছি না, এ সময় গঙ্গা ছাড়িয়া থাকিব না।" পুত্রগণ পিতার ঐকান্তিকতায় বাধা না দিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিল। কলিকাতায় আসিলে নানা-রূপ চিকিৎসা চলিতে লাগিল, কিন্তু কোনটাই ফলপ্রদ হইল না। ৩রা আশ্বিন বুধবার রাত্রিতে অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটসঙ্কুল হইল। চিকিৎসকগণ প্রতিমুহূর্ত্তেই রোগীর জীবনের সঙ্কট ভাবিতেছিলেন। রাত্রি তিনটা বাজিল। চিকিৎসকগণ

রোগীকে আর চিকিৎসাধীনে রাখা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। এই অবস্থায় কর্ম্মবীর মহাপুরুষ মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন বলিলেন, "আর কেন বৃথা চেষ্টা, যাহাতে আমি ৺গঙ্গার গর্ভে যাইয়া এ দেহ ত্যাগ করিতে পারি, তাহার চেষ্টা দেখ। শোকার্ত্ত পরিবারের মর্ম্মান্তক ক্রন্দনধ্বনি একবার তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল; এই শব্দে বীরের হৃদয় বিচলিত হইল না। কেবল একবার বলিলেন, "কেন আমায় ত্যক্ত কর,কেহ আমার ইষ্টনামে বাধা জন্মাইও না।" এইরূপে ৫টা বাজিল, তখনও কোন কোন চিকিৎসক বলিতেছিলেন, "যাবৎ শ্বাস তাবৎ আশ, আরও চিকিৎসা করিয়া দেখা যাক্।" কিন্তু মহাপুরুষ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন তিনি নিজের হাত নিজে দেখিয়া বলিলেন, "না আর না! আমার অধিক সময় বাকী নাই! আমায় ৺গঙ্গায় নিয়া চল।" চিকিৎসক-বন্ধুবর্গকে বলিলেন, "আপনারা আমার বন্ধুর কার্য্য করুন। যাহাতে আমার ইষ্টনাম জপ করিতে কোন বাধা না হয়, তাহা করুন।" পুত্রদিগকে বলিলেন, "আমার গরদের জোড় আনিয়া দাও।" গরদের জোড় পরিয়া মহাপুরুষ ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিলেন। এই সময় স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের একজন বন্ধু হাত দেখিবার জন্য অশীতিপর বৃদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়কে আনিতে লোক পাঠাইলেন। কবিরাজ মহাশয় আসিলেন, ভাগিনেয়র কক্ষে গিয়া তাহাকে একবার দেখিলেন। মাতুলকে দেখিয়া ভাগিনেয় পদধূলি চাহিলেন। মাতুলের পদধূলি লইয়া যুক্তকরে বলিলেন "মামা আমার সময় হইয়াছে, এখন ৺গঙ্গায় যাইতে অনুমতি করুন।" মাতুল ভাগিনেয়র বীরচরিত্র দেখিয়া শোক সম্বরণ করিয়া তাঁহাকে ৺গঙ্গায় লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। বেলা ৭৷৷০ টার সময় কবিরাজ মহাশয় ৺গঙ্গাতীরে আনীত হইলেন। রাজার ঘাটে বারান্দায় তাঁহার আসন স্থাপিত হইল। ৺গঙ্গার সুনির্ম্মল, সুশীতল হিল্লোলে মুমূর্ষুর জীবনীশক্তি একটু ফিরিয়া আসিল। স্বর্গীয় মহাত্মা গঙ্গাস্তবের কতকটা উচ্চারণ করিলেন। গঙ্গাজল পান করিয়া ইষ্টচিত্তে ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিলেন। আর কোন দিকে মন নাই, চরণপ্রান্তে রোরুদ্যমান কন্যা পুত্রগণ তাহদের প্রতি দৃষ্টি নাই, মূর্চ্ছিতপ্রায়া ভার্য্যার কাতর দৃষ্টির প্রতি সকরুণ লক্ষ্য নাই। একমনে কেবল ইষ্টনাম জপ করিতেছিলেন; আর মধ্যে মধ্যে রোগের যন্ত্রণা জন্য অব্যক্ত শব্দ করিতেছিলেন। বেলা ৮৷০ টায় একবার পুত্রদিগকে বলিলেন, "আমার অনেক চিকিৎসক বন্ধুকে আমি সংবাদ দিতে পারি নাই। সময় বড়ই

অল্প, তাঁহারা যেন আমাকে ক্ষমা করেন।” সৌজন্যের প্রতিমূর্ত্তি বিজয়রত্নের সদৃশ বাক্যই মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল। এইরূপে মহাযাত্রার সময় ক্রমে সংক্ষেপ হইতে চলিল। এই অবস্থায় মহাপুরুষকে যে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, রোগে সেই চিরপ্রফুল্ল মুখখানিকে ম্লান করিতে পারে নাই। প্রিয়গণের সেই ক্রন্দন-ধ্বনি বীর হৃদয়কে কাতর করিতে সমর্থ হয় নাই। ঘাটে লোকারণ্য কবিরাজ মহাশয়ের বহু বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। এই অবস্থায় কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, “ইঁহাদের বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দাও।”

বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে তিনি বলিলেন, “বেলা অনেক হইয়াছে, বোধ হয় ১০॥ টা হইবে, আপনারা কেন এত কষ্ট করিবেন, আমার এখনও বিলম্ব আছে, খেয়ে আসুন গিয়ে সহৃদয়তার আধার বিজয়রত্ন বন্ধুদিগকে এই কথা বলিয়া নিজেকে ঘরে লইয়া যাইতে বলিলেন।” তাঁহাকে ঘরে আনা হইল। এই অবস্থায়ও তিনি ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন। তারপর অবস্থা ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল। ১১টা ৫ মিনিটের সময় তাঁহার অবস্থা খারাপ দেখিয়া ৺গঙ্গা-গর্ভে নীত হইল। গঙ্গার গর্ভে ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে মহাপুরুষ বিজয়রত্নের মর্ত্ত্যদেহ জীবনশূন্য হইল। এই দৃশ্য যে দেখিয়াছে, সেই মজিয়াছে এবং বুঝিয়াছে, আদর্শ-চরিত্র মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন হিন্দুর কিরূপ মরিতে হয়, তাহারও একটা আদর্শ দেখাইয়াছেন।

বকুলকুমারী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল,

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত মন্ত্রণা।

এক মাস অতীত। এক একদিন মাখনলালের কথা তুলিয়া তাঁহার চরিত্র চর্য্যার পর্য্যালোচনা হইয়া থাকে; কর্ত্তা গৃহিণীতেও হয়, পিতা পুত্রীতেও হয়,

মাতা পুত্রীতেও হয়। তফাতে দাঁড়াইয়া সৌদামিনী কাণ পাতিয়া শুনে, মুখখানি শুকাইয়া আইসে, বিরসবদনে সরিয়া যায়; তাহা দেখিয়া দেখিয়া মোক্ষদা এক একদিন মুখ ফিরাইয়া মৃদু মৃদু হাসে।

এই রকমে দিন যায়। একদিন রাত্রিকালে শয়নকক্ষে বসিয়া, মুখখানি ভারী করিয়া সৌদামিনী মোক্ষদাকে বলিল, হ্যাঁলা দিদি, আমায় দেখে দেখে তুই টিপে টিপে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিস্, রকমখানা কি? আমার কষ্টে কি তোর আহ্লাদ হয়?

মোক্ষ। কেবল আহ্লাদেই কি হাসি আসে? কত লোক কষ্টের সময়েও হাসে। তোমার কষ্টে আমার আহ্লাদ হয় বোলচো, আগাগোড়া ভেবে দেখ দেখি, তোমার কষ্টে আমি কত কষ্ট পেয়েছি, কষ্ট নিবারণের জন্য কি না আমি কোরেছি?

সৌদা। (লজ্জা পাইয়া নীরব)

মোক্ষ। আচ্ছা দিদি, আজকাল যেমন তোমায় সর্ব্বক্ষণ বিরস-বদন দেখি, আগে তো এমন ছিল না। এখন অত তুমি কি ভাবো?

সৌদা। আমি যে কি ভাবি, তোকে আর তা কি বোলবো!

মোক্ষ। যেদিন থেকে সেই বাবুটী চোলে গিয়েছেন, সেই দিন থেকেই তোমার ভাবনাটী বেশী হয়েছে দেখ্‌চি।

সৌদা। আমার স্বভাব ঐ রকম। যাকে আমি কিছু বেশী দেখি, তাকে দেখ্‌তে না পেলে আমার মন বড় কাতর হয়। আমার বাপের বাড়ীতে একটী টিয়ে পাখী ছিল, অনেক দিন ছিল, —জানিস্ তুই; সেই পাখীটী যে দিন শিকল কেটে উড়ে গেল, সেই দিন থেকে আমি তিন দিন খাইনি, ঘুমুইনি, হাসিনি, কেবল কেঁদেছি। জীবজন্তুর উপর যখন আমার এত মায়া, তখন মানুষের জন্য মায়া হবে, সেটা কি বড় আশ্চর্য্য কথা?

মোক্ষ। আচ্ছা, যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল, তার জন্য তো এত ভাবনি, তখন তো এমন বিরস বদন দেখ্‌তে পেতেম না।

সৌদা। সে কথা আলাদা, একদিন দেখা বই তো নয়, ততটা মায়া বসেনি। তা বোলে যে একেবারে ভাব্‌তেম না তাও নয়, মনে মনে গুম্‌রে গুম্‌রে থাক্‌তেম।

মোক্ষ। (চিন্তা করিয়া) এক একদিন সেই বাবুটীর সঙ্গে তুমি দেখা কোর্ত্তে,

অবশ্য অনেক রকম কথা হোতো, সেই সব কথা এখন বুঝি তোমার মনে হয়?

সৌদা। হয় বই কি! (মৃদু হাসিয়া) তার সঙ্গে দেখা কোত্তে এখনও এক এক-বার আমার ইচ্ছা।

মোক্ষ। ঠিক কথা। যে বরটীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল, এক রাত্রের দেখা হোলেও তার চেহারাটী আমার একটু একটু মনে পড়ে। সেই চেহারার সঙ্গে, ঐ বাবুটীর চেহারার যেন কিছু কিছু মিলন আছে, এই রকম আমার বোধ হতো। কেমন, তাই নয়?

সৌদা। (আরক্ত মুখী হইয়া) আর জ্বালাস্‌নি পদি, জ্বালাস্‌নি; কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিস্‌ নি; তুই ঘুমো, রাত অনেক হয়েছে, আমারও ঘুম পাচ্ছে, (শয়ন)

মনে মনে হাসিয়া পদ্মাবতী শয়ন করিল, সে রাত্রে আর অন্য কথা কিছুই হইল না। আরো দুই দিন গেল; একদিন বৈকালে রামজীবন বাবুর অন্দর-মহলে একটী স্ত্রীলোক আসিল, গৃহিণীর সঙ্গে দেখা করিয়া সেই স্ত্রীলোকটী জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের জামাই বাবু এই বাড়ীতে থাকতেন, তিনি কোথায় গেলেন?"

গৃহিণী। তুমি কে গা?

স্ত্রীলোক। আমি গৌরীবাবুর বাড়ীতে থাকি। দিদি বাবু যে বাড়ীতে থাকেন, সেই বাড়ীর কাজকর্ম্ম করি, আমার নাম মোক্ষদা।

গৃহিণী। তোমাদের জামাইবাবু এই বাড়ীতে থাক্‌তেন, তোমরা কি রকমে জান্‌লে?

দাসী। তা আর জানা যায় না? পাড়ার ভিতর,—লোকের মুখে শুনেছি।

গৃহিণী। তিনি এখান থেকে চোলে গিয়েছেন, সে খবর কে দিলে?

দাসী। খবর কেউ দেয়নি, অনুমানে জান্‌তে পেরেছি।

গৃহিণী। কিরূপ অনুমান!

দাসী। জামাইবাবু যখন আফিস থেকে আস্‌তেন, আমাদের বাড়ীর ধার দিয়েই রাস্তা কি না,—দিদিবাবু তখন এক একদিন ছাদের উপর থেকে দেখ্‌তে পেতেন, এখন আর দেখ্‌তে পান না; তাই।

গৃহিণী। তোমাদের জামাই বাবু তীর্থবাসে চোলে গিয়েছেন।

পাঠকমহাশয় বুঝিতে পারিলেন, ঐ স্ত্রীলোকটী বকুলকুমারীর বাড়ীর চাক্‌রাণী। গৃহিণীর সহিত চাক্‌রাণীর যখন ঐ সকল কথা হয়, সৌদামিনী ও মোক্ষদা সেই সময় পাশের ঘরের জানালার আড়ালে দাঁড়াইয়াছিল, কথাগুলি তাহারা শুনিয়াছিল; কথা শেষ হইলে চাক্‌রাণী যখন ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করে, সৌদামিনী তখন চক্ষু ঠারিয়া মোক্ষদাকে বলিল, "ওলো পদি, ঐ মেয়েমানুষটীর সঙ্গে তুই একবার সেই বাড়ীতে যেতে পারিস্? যা না একবার,—দেখেই আয় না, ভাবভক্তি বুঝেই আয় না। বাড়ীখানি কেমন, দিদিবাবুর চেহারাখানি কেমন, দেখে শুনে দিদিবাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কোরে আয় না।"

পদ্মাবতী বাহির হইল; বকুলকুমারীর দাসী বাড়ী হইতে বাহির হইতেছে, সেই সময় তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া দাসী একটু স্তম্ভিতা হইল। হাসিয়া হাসিয়া পদ্মাবতী বলিল, "চম্‌কালে কেন গা? তোমার নাম মোক্ষদা, আমারও নাম মোক্ষদা; তুমি আমার সই হোলে, চল না তোমাদের বাড়ীখানি একবার দেখে আসি।"

সই বলিল, "তুমি কি এই বাড়ীতে থাকো?" পদ্মা উত্তর করিল, "বরাবর থাকি না, সম্প্রতি এসেছি, বাবুদের কাজকর্ম্ম করি। কেন আমায় কি নিয়ে যাবে না?"

সই বলিল, "তাতে আর দোষ কি? এসো না।"

উভয়ে একসঙ্গে চলিল, বকুলকুমারীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। পদ্মাবতী বকুলকুমারীকে দেখিল, সম্ভবমত প্রশ্নোত্তরে দুটী পাঁচটী কথা হইল। বেশী কথা কহা বকুলকুমারীর স্বভাব নয়, দুই মোক্ষদাকে একত্র রাখিয়া বকুলকুমারী গৃহান্তরে প্রবেশ করিল। দুটী সইতে অল্পক্ষণ ফাঁকা ফাঁকা আলাপ হইল; পদ্মাবতী বিদায় হইয়া আসিল। পদ্মাবতী বাড়ীতে আসিলে, সৌদামিনী তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি লো, কেমন দেখ্‌লি?"

মোক্ষ। বাড়ীখানি ছোট, কিন্তু দিব্য পরিপাটি; ভিতর মহলে শোবার ঘরটী বেশ সাজানো, খুব সুন্দর সুন্দর খাট, বিছানা, দেওয়ালে হরেক রকম বিলাতী ছবি, জোড়া জোড়া দেয়ালগিরি, মাঝখানে টানা পাখা, ঘরের মেজেতে কারপেট মোড়া।

সৌদা। ঘরের চেহারা ত শুন্‌লেম, দিদিমণির রূপ কেমন?

মোক্ষ। বেশ চক্‌চোকে, মোটাসোটা, গোলগাল, চোক দুটী বড় বড়, নাক্‌টী মোটা মোটা, খুব মোটা একছড়া সোনার হার, দু হাতে ৮গাছি হীরেকাটা বালা, নাকে নোলক, দুকানে দুটী হীরের দুল ; একঢাল চুল, খোঁপা বাঁধা ছিল না।

সৌদা। আমার চেয়ে দেখ্‌তে খুব ভালো ?

মোক্ষ। বাবুর মেয়ে, তোয়াজে থাকে, তাতেই ভাল দেখায়। তুমি যদি সেই রকম তোয়াজে থাক্‌তে পেতে, তা হলে সে দিদিমণি তোমার রূপের কাছে দাঁড়াতে পাত্তো না।

সৌদা। তার সঙ্গে তোর কি কি কথা হলো ?

মোক্ষ। (নাক তুলিয়া মুখ বাঁকাইয়া) আমার মত লোকের সঙ্গে সে রকম মেয়েদের কি বেশী কথা হয় ? আপনার গরবেই আপনিই মত্ত ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে মিটিয়ে মিটিয়ে দুটী একটী কথা বোল্‌লে ; এই বাড়ীতেই আমি থাকি, সে কথাও শুন্‌লে, জামাইবাবু কোথায় গেলেন, সে কথাও জিজ্ঞাসা কোল্লে ; যতটুকু আমি জানি, সেই রকম উত্তর দিলেম, তাহা শুনে গরবিনী অমনি থর্ থর্ কোরে অন্য ঘরে চোলে গেলো, আমিও আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলেম।

সুকুমারীর বদন গম্ভীর হইল, আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। এই সময় নিতম্বিনী সেই ঘরে প্রবেশ করিল। পূর্ব্ব কথা চাপা পড়িয়া গেল। নিতম্বিনী প্রথমেই পদ্মাকে জিজ্ঞাসা করিল "কিরে মোক্ষদা ! সেই যে নূতন মোক্ষদা এসেছিল. তার সঙ্গে সঙ্গে তুই গেলি, কি রকম দেখে এলি ?

মোক্ষদা বলিল দেখ্‌লেম ভাল ; বাড়ীখানি বেশ, বাড়ীর গিন্নীটীও বেশ ; দিব্বি খোস্ পোষাকী।"

নিতম্বিনী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এই বাড়ীতে তুই থাকিস্, গিন্নী সেটা জান্‌তে পাল্লে ?"

মোক্ষদা বলিল, "আমি জানিয়ে দিলেম ; আরো দুটো পাঁচটা ছাড়া ছাড়া কথা হোলো, গিন্নি সোরে গেল, আমিও সোরে পোড়্‌লুম।

এই ঘটনার পর আরো দশদিন অতীত। রাত্রিকালে সৌদামিনীতে মোক্ষদাতে চুপি চুপি কথা। সৌদামনী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা পদ্ম, বাবুটী গেল কোথা ? যাবার সময় আমায় একটী কথাও বোলে গেল না ?"

মোক্ষ। গেলো কোথা, তা তো তুমি শুনেছ। কর্ত্তার নামে চিঠি লিখে রেখে গিয়েছে, বৃন্দাবন যাবে, মথুরায় যাবে, পৈরাগে যাবে, কাশী যাবে, তারপর কি জায়গায় ভাল—বিন্দা—বিন্দা—

সৌদা। বিন্ধ্যাচল।

মোক্ষ। হ্যাঁ হ্যাঁ, বিন্দাচল। শুনেছ তো সব - তবে আর জিজ্ঞাসা কর কেন? যাবার সময় তোমায় কিছু বোলে যায়নি, সেটা তার অন্যায় হয়েছে।

সৌদা। (বক্রনয়নে চাহিয়া) আবার ঠাট্টা আরম্ভ কল্লি? একবার বোলেছিলি, কল্‌কেতার হাওয়া লেগে আমার স্বভাব বোদ্‌লে গিয়েছে, আজ আবার ঠেস্ দিয়ে দিয়ে কথা কচ্চিস্?

মোক্ষ। ঠেস্ আবার কি হোলো? সেদিন আমি সেই দিদিমণির বাড়ীতে গিয়েছিলেম, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার কথা আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলে, পরিচয় শুনে মুখখানি ভারী হয়েছিল;—কেন গো? সেই দিদিমনি তোমার সতীন নাকি?

সৌদা। (মুখ ফুলাইয়া) মুখে আগুন তোমার! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল ঐ রকম কথা!

মোক্ষ। কেন গা, ঐ রকম কথা কি তোমার ভাল লাগে না?

সৌদা। ভাল লাগুক, মন্দ লাগুক, তোর ওসব কথা আমি আর শুনবো না। তুই আমার হিত কামনা করিস্ তা আমি বেশ জানি, ওসব কথা ছেড়ে চুপি চুপি আমি একটা কথা বলি, শোন্।

মোক্ষ। শুন্‌চি, বলনা বলনা কি কথা।

সৌদা। আমার ইচ্ছা হোচ্চে, আমি একবার বিন্ধ্যাচলে যাই।

মোক্ষ। (মৃদু হাসিয়া) বিন্ধ্যাচলে?—কেন, জামাইবাবুকে খুঁজতে নাকি? তার জন্যে কি তোমার প্রাণ কেমন কোচ্চে,—কেন গো? এত উতলা কেন?

সৌদা। (কিঞ্চিৎ উগ্রস্বরে) দূর!

মোক্ষ। (হাস্য করিয়া) আর দূর! সব আমি জানি।

সৌদা। (হঠাৎ চমকিয়া) কি তুই জানিস্?

মোক্ষ। শুন্‌বে? যে রাত্রে প্রথমে আমি তোমাকে বৈঠকখানায় রেখে বেরিয়ে আসি, তখন বাড়ীর ভিতর আসিনি, জানলার ধারে ধারে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেম; ঘরের ভিতর তাতে তোমাতে যে সব কথা হয়, আড়াল থেকে

সব আমি শুনেছি।

সৌদা। কি তুই শুনেছিস্?

মোক্ষ। সেই মাখনবাবুই তোমার বরণকরা বর। পেটের কথা এতদিন পেটে পেটেই চেপে রেখেছিলেম, কি খেলা তোমরা খেলো. তাই জান্‌বার জন্য চেষ্টা কচ্ছিলেম, আজ সুযোগ পেয়ে প্রকাশ কোরে দিলেম।

সৌদা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তবে তুই সব জান্‌তে পেরেছিস্; আর কেন তবে তোর কাছে কথা লুকাবো? প্রথম রাত্রে তুই আমায় বৈঠকখানায় রেখে এলি তার পর এক এক রাত্রে তুই যখন ঘুমুতিস্, তখন আমি টিপি টিপি উঠে তার সঙ্গে দেখা কোত্তে যেতেম, তার পেটের কথা অনেক আমি বারকোরে নিয়েছি, ঠিক ঠিক মিলেছে, আমার পেটের কথা কিন্তু সে একটাও জান্‌তে পারেনি। আমার উপর তার নজর পোড়েছে, অনুরাগ পড়েছে, মুখ ফুটেও একরকম প্রকাশ কোরেছে, আমি তাকে ভালবাস্‌তে পার্‌বো, লজ্জা খেয়ে সে কথাও বলেছি। এখনকার পরামর্শ কি? আমি মনে কোরেছি. বিন্ধ্যাচলে যাব। তুই যাবি? হাঁ আর এক কথা— সে যে আমার বর, কোন সূত্রে নিতম্বিনীও তা জেনেছে, নিতম্বিনীর মুখেই প্রথমে আমি সেই কথা শুনি, তার পর তোকে আমি তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে বলি। বুঝ্‌লি আমার মনের কথা? তুই এখন আমার সঙ্গে বিন্ধ্যাচলে যাবি?

মোক্ষ। সত্যি সত্যি যদি তুমি যাও, তা হোলে আমি যেতে রাজী আছি, কিন্তু কি কোরে যাবো? বাড়ীতে না বোলেই কি পালাবো?

সৌদা। তাই তো ভাব্‌ছি; না বোলে পালানো ভাল কথা নয়, কি বোলেই বা অনুমতি চাইবো?

মোক্ষ। বোল্‌বার পন্থা আছে; নিতম্বিনী যখন জানে, তখন তার কাছেই আগে কথা তোলো, সে তখন অবিশ্যি তার মায়ের কাছে বোল্‌বে, কর্ত্তা অবিশ্যি জান্‌তে পার্‌বেন, তা হলেই গোলমাল চুকে যাবে।

সেই পরামর্শই ভাল।

গীত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মিত্র।

ঝাঁপতাল।

কি দোষে হে যীশু তুমি, ক্রুশে হারাইলে প্রাণ।
দুর্ল্লভ মানব তুমি, তোমায় দিলে বলিদান॥
পতিত জনে তারিতে, শত্রুকে ভালবাসিতে,
পাপের ভার বহিতে, ছেড়েছিলে অমরধাম;
সেই অপরাধে কি হে, তারা বধিল তোমার প্রাণ॥
(আহা) বিলাইতে বিভুর নাম, কতো সহিলে অপমান,
কত নির্য্যাতনে তুমি প্রচারিলে প্রেমের বিধান॥
তোমার দুঃখ ভাবি যখন, কত আশা পাই তখন,
তোমার মতন আমার জীবন, হয় হে জীবন সমাধান॥

সমালোচনা।

মিষ্টান্নপাক।—শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দেড়টাকা।

পাকপ্রণালী প্রণেতা বিপ্রদাস বাবু বঙ্গের রন্ধনগৃহের অনেক উপকার করিয়াছেন, বর্ত্তমান পুস্তকে বিবিধ মিষ্টান্নপাকের প্রণালী আছে। দুগ্ধজাত ও ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কিরূপ বিশুদ্ধ ধারা, তাহা তিনি ইহাতে বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিয়াছেন। ক্ষীর, সন্দেশ, মিঠাই, লুচি, কচুরি, মিঠারুটী, পাউরুটী, ইত্যাদি যাহা যাহা সচরাচর লোকে জানে, তাহার অতিরিক্ত কয়েকটি নূতন জিনিষেরও প্রস্তুতপ্রণালী এই পুস্তকে আছে। ঘৃত শর্করাদির পরিমাণ এবং কত লোকের জন্য কত বস্তুর আয়োজন আবশ্যক, বিপ্রদাস বাবু তাহারও হিসাব দেখাইয়া দিয়াছেন। সর্ব্বাংশেই ভাল, কিন্তু নিতান্ত দুঃসময়ে এ পুস্তক প্রচারিত হইল। ঘৃত দুগ্ধের দুর্দ্দশা দেখিয়াই আমাদের ভয় করে। দয়াময় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি এ দেশের খাদ্য সামগ্রীর ভেজাল বন্ধ করিতে পারেন, তাহা হইলে এই পুস্তকখানি বঙ্গবাসীগণের বিশেষ উপকার হইতে পারে। পুস্তকখানি প্রত্যেক কুলকামিনীগণের হস্তে শোভা পাইলে আমরা সুখী হইব।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৯শ বর্ষ। } ১৩১৮ সাল, পৌষ। { ৯ম সংখ্যা।

ভারতেশ্বরী ও ভারতসম্রাট

পূর্ব্বাভাষ।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পৌত্র ভারতেশ্বর নব-সম্রাট মহামান্য পঞ্চম জর্জ্জ সস্ত্রীক ভারতে শুভাগমন করিয়াছেন। পলাশীযুদ্ধের পর এই দেড়শত বৎসরে ইংলণ্ডের সিংহাসনাধিষ্ঠিত কোন রাজা অথবা রাণী ভারতে আগমন করেন নাই, ভারত-সম্রাটের ভারতে পদার্পণ এই প্রথম। এই অবসরে আমরা সাধারণ ভারতবাসীর হৃদয়ে পূর্ণাংশে রাজভক্তি পরিস্ফুট করিবার বাসনায় এই রাজবংশ-বৃত্তান্ত প্রচার করিলাম। চির রাজভক্ত ভারতবাসী পাঠকবর্গের তৃপ্তিসাধনার্থ

প্রথমে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনী, তৎপরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের জীবনী, পরিশেষে বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের জীবনীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল।

হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ—"মহতী দেবতা রাজাঃ নররূপেণ তিষ্ঠতি।" দেবতা নর-রূপ ধারণ করিয়া নরপতিরূপে পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত থাকেন, এই ভক্তিমূলক বিশ্বাস ভারতের আর্য্য-সন্তানের প্রাণতন্ত্রীতে নিরন্তর গাঁথা। পলাশীযুদ্ধের ৬২ বৎসর পরে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জন্ম, ১৯বৎসর বয়সে তাঁহার রাজ্যাভিষেক, ১৮৫৮ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে রাজ্যভার গ্রহণ। ১৮৭৭ অব্দে ভারতেশ্বরী মহারাণী (Empress of India) উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২২এ জানুয়ারী পর্য্যন্ত বাষট্টি বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যৈষ্ঠপুত্র যুবরাজ আলবার্ট এড্‌ওয়ার্ড সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনারূঢ় হন; ১৯১০ অব্দের ৯ই মে পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্বকাল। এক্ষণে সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের উপযুক্ত পুত্র প্রিন্স জর্জ্জ পঞ্চম জর্জ্জ উপাধি ধারণপূর্ব্বক রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া পিতামহী ও পিতার পথানুসরণপূর্ব্বক রাজত্ব পরিচালন করিতেছেন। তাঁহার পিতামহী ভারত-সাম্রাজ্য পালনে যে পথে চলিয়াছিলেন, তাঁহার পিতাও সেই সুগম পথ অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন; বর্ত্তমান সম্রাট নিজেও সেই পথানুসরণ করিয়া চলিতেছেন; চির-রাজভক্ত ভারতবাসীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা সুখের ও সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

১৮৩৮ অব্দের পরবর্ত্তী সময়ে ভারতে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্মরণার্থ, অন্তরে রাজভক্তির বিকাশার্থ এই দেবসৌরভ বিশিষ্ট পুষ্পমাল্য আমরা গ্রন্থন করিয়াছি। এক্ষণে ইংলণ্ডেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ আমাদের বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট, তাঁহার মহিষী ইংলণ্ডেশ্বরী শ্রীমতী রাজ্ঞী মেরী আমাদের ভারতেশ্বরী মহারাণী। এই প্রস্তাবে শতবর্ষের রাজবংশ পরিচয় বিবৃত হইল।

ভারতেশ্বরী ও ভারত-সম্রাট।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কুমারী ভিক্টোরিয়া।

জন্ম ও কৈশোরাবস্থা।

লণ্ডন নগরের কেনসিংটন পল্লীতে লতাবৃক্ষ-পরিশোভিত মনোরম উদ্যানমধ্যে সুবিখ্যাত কেনসিংটন রাজপ্রাসাদ (Kensington Palace.)। সেই প্রাসাদে ডিউক অব কেণ্ট সস্ত্রীক বাস করিতেন। ডিউকের প্রকৃত নাম এড্ওয়ার্ড, তিনি রাজা তৃতীয় জর্জ্জের চতুর্থ পুত্র; তিনিই তখন ইংলণ্ডের অধীশ্বর। মহিষীর নাম মেরী লুইসা; ডিউকের পত্নী বলিয়া তাঁহার উপাধি ছিল ডাচেস্ অব কেণ্ট। তাঁহার পিতা ছিলেন জর্ম্মণীর অন্তঃপাতী স্যাক্সকোবার্গের সেফিল্ডের ডিউক, তদীয় পুত্র ছিলেন প্রিন্স লিওপোল্ড; তিনি মহিষী মেরী লুইসার সহোদর।

ডিউক অব কেণ্টের সহিত বিবাহ হইবার পূর্ব্বে মেরী লুইসার একবার বিবাহ হইয়াছিল; স্বামির নাম চার্লস এমিক। সে বিবাহের ফল একটি পুত্র ও একটি কন্যা।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে চার্লস এমিক প্রাণত্যাগ করেন, একবিংশতি বৎসর বয়সে মেরী লুইসা বিধবা হন, চারি বৎসরকাল তিনি বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন; ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ডিউক অব কেণ্টের সহিত তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়, এক বৎসর পরে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে তারিখে তিনি একটী কন্যারত্ন প্রসব করেন; সেই কন্যারত্নই আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের পিতামহী স্বর্গীয়া রাজরাজেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া। জন্মকালে তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল আলেকজেন্দ্রিনা ভিক্টোরিয়া।

নবজাতা কন্যাটির শরীর যাহাতে নিরাপদে সুস্থ থাকে, সেই উদ্দেশে তাঁহার মাতাপিতা কেনসিংটন প্রাসাদ হইতে তাঁহাকে লইয়া সিড্মাউথ পল্লীতে গিয়া বাস করেন। সেই সময় হঠাৎ এক দুর্ঘটনা হয়। ভিক্টোরিয়ার ধাত্রী তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া একটি কক্ষে বসিয়া ছিল, হঠাৎ একজন শীকারীর গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বাতায়নপথ দিয়া সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে, গুলীটা রাজকুমারীর মস্তকের নিকট দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, জগদীশ্বরের কৃপায় জগৎ গৌরবিনী রাজকুমারীর অঙ্গে কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই।

অল্পদিন পরে আর এক দুর্ঘটনা। ডিউক অব কেণ্ট একদিন মৃগয়াবেশে

গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলেন, পথিমধ্যে একটি ক্ষীণতোয়া নদীপার হইবার সময় তাঁহার পরিহিত বস্ত্রাদি সিক্ত হইয়া যায়, সেই আর্দ্রবস্ত্রে তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, বস্ত্রপরিবর্ত্তনের অগ্রেই প্রগাঢ় স্নেহবশে ধাত্রীর ক্রোড় হইতে স্নেহময়ী ভিক্টোরিয়াকে কোলে করিয়া লন; আর্দ্রবস্ত্রে বহুক্ষণ থাকাতে সেই দিনেই তাঁহার ভয়ানক সর্দ্দী হয়, সর্দ্দীর প্রভাবে তিনি জ্বরাক্রান্ত হন, সেই জ্বরেই তাঁহার প্রাণান্ত হইয়াছিল; শিশুকালেই রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া পিতৃহীনা হইয়াছিলেন; তখন তাঁহার বয়স নয় মাস মাত্র।

পতি-বিয়োগ-বিধুরা মহিষী মেরী লুইসা সেই শোক-সমাচার লিপিবদ্ধ করিয়া জর্ম্মণীতে স্বীয় ভ্রাতা প্রিন্স লিওপোল্ডের নিকটে প্রেরণ করেন; প্রিন্স-লিওপোল্ড সিড্‌মাউথে আগমন করিলে মহিষী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্নেহময়ী কন্যাটির সহিত পুনরায় কেন্‌সিংটন প্রাসাদে ফিরিয়া আইসেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে জানুয়ারী তারিখে চতুর্থ জর্জ্জ রাজ্যাভিষিক্ত হন; সেই অভিষেক দিবসেই কন্যাসহ মেরী লুইসা কেন্‌সিংটনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিধবা রাজমহিষী মেরী লুইসাকে সান্ত্বনা প্রদানার্থ কুমারী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠতাত ডিউক অব ইয়র্ক তৎকালে কেনসিংটন প্রাসাদে আসিয়াছিলেন; ডিউক অব কেণ্টের মুখের সহিত ডিউক অব ইয়র্কের মুখের এতদূর অবিকল সৌসাদৃশ ছিল যে, জ্যেষ্ঠতাতকে দেখিবামাত্র কুমারী ভিক্টোরিয়া "পাপা পাপা!" বলিয়া তাঁহার কোলে যাইবার জন্য সুকোমল করপল্লব দুখানি সম্মুখভাগে প্রসারণ করিয়াছিলেন। ডিউক অব ইয়র্ক সেই ক্ষুদ্র বালিকার তাদৃশী স্নেহ-ক্রীড়া দর্শনে স্নেহার্দ্রচিত্তে গদ্‌গদ কণ্ঠে কুমারীকে বলিয়াছিলেন, "প্রাণাধিকে! আজি হইতে তুমি আমার নিকটে পিতৃস্নেহ প্রাপ্ত হইবে।" ক্রোড়ে যাইবার জন্য কুমারীর আকিঞ্চন এবং জ্যেষ্ঠতাতের ঐরূপ স্নেহোক্তি, উভয়ই করুণ-রসের উদ্দীপক।

রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার চতুর্থ বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে ইংলণ্ডেশ্বর চতুর্থ জর্জ্জ স্বর্ণমণ্ডিত মহামূল্য মর্ম্মর প্রস্তরে খোদিত তাঁহার নিজের একখানি প্রতিকৃতি ঐ ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে স্নেহোপহার প্রদান করিয়াছিলেন। ভ্রাতুষ্কন্যার প্রতি রাজার স্নেহপ্রদর্শনের আর একটি নিদর্শন প্রকাশ পাইয়াছিল। তৎপর বৎসরে পার্লামেণ্ট সভার অনুমোদনে তিনি রাজকুমারীর বিদ্যাশিক্ষার্থে বার্ষিক ছয় সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

ডচেস্ অব কেণ্ট পরম স্নেহ যত্নে কুমারী ভিক্টোরিয়ার লালন পালন করিতে লাগিলেন। জননী-স্নেহের বিশেষ গৌরব বর্ণনা করাই বাহুল্য; কন্যাটির বিদ্যা-শিক্ষার সুচারু-প্রণালী অবলম্বনের জন্য জননী আন্তরিক যত্নবতী হইয়াছিলেন। শিক্ষাদানের নিমিত্ত লর্ড ক্লাইবের ভগ্নী ব্যারণেস্ লেজেনকে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। শিক্ষয়িত্রীর যত্নে বুদ্ধিমতী ভিক্টোরিয়া ক্রমশঃ বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে লাগিলেন।

বাল্যকালে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার ক্রীড়াবস্তু ছিল একটি কুকুর আর তাঁহার স্বহস্ত-রোপিত ফুলগাছগুলি; কুমারী স্বহস্তে প্রতিদিন সেই ফুলগাছগুলিতে জলসিঞ্চন করিতেন।

কৈশোরে কুমারী ভিক্টোরিয়া সর্ব্বজনের আদরের পাত্রী ছিলেন। বিনীত স্বভাবা মধুর-ভাষিণী রাজকুমারী সর্ব্বদা সহাস্যবদনে সকলের সহিত প্রিয় সম্ভাষণ করিতেন, রাজকন্যা বলিয়া কিছুমাত্র অভিমান রাখিতেন না; অবকাশকালে দরিদ্রের কুটীরে গমন করিয়া তিনি তাহাদের দুঃখমোচনের উপায় করিয়া দিতেন। অল্প বয়সেই সুশীলা বালিকা বহুগুণে গুণবতী হইয়াছিলেন।

রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের "রাণী" হইবেন, এই সময় হইতেই তাহার পূর্ব্বসূচনা হইয়াছিল। চতুর্থ উইলিয়ম যখন ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি নিঃসন্তান ছিলেন; সুতরাং তাঁহার জীবনান্তে রাজ-কুমারী ভিক্টোরিয়াই রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী হইবেন, রাজ-সভাসদ্‌বর্গ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখেন, রাজাও সেই সিদ্ধান্তে অনুমোদন করেন। মহিষী এডিলেডের সন্তান হইবার বয়স তখনও অতীত হয় নাই, তথাপি রাজা উইলিয়ম ভ্রাতৃকন্যা ভিক্টোরিয়াকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী বলিয়া প্রকাশ্য সভায় স্বীকার করেন, রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ভবিষ্যতে রাজরাজেশ্বরী হইবেন, অতএব এই সময় হইতে তদুপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত তিনি তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়াতিরিক্ত বার্ষিক আরও দশ সহস্র মুদ্রা বৃত্তি অবধারণ করিয়া দেন।

রাজকুমারীর সপ্তদশ বার্ষিক জন্মোৎসবে সমধিক সমারোহ হইয়াছিল। রাজা, রাজামাত্য এবং প্রধান প্রধান পদস্থ ব্যক্তিগণ সেই উৎসব-সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুমারীকে ধর্ম্ম-উপদেশ দিবার সময় প্রধান ধর্ম্মযাজক আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বৎসে! তুমি ইংলণ্ডের ভাবী অধীশ্বরী; ধর্ম্মে মতি রাখিও, অনন্ত বিশ্বের অধীশ্বর পরমেশ্বরের উপর আত্মনির্ভর করিও।"

ধর্ম্মযাজকের আশীর্ব্বাদসূচক এই কয়েকটী বাক্য শ্রবণ করিয়া করুণহৃদয়া রাজকুমারীর নয়নযুগলে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল, তাঁহার জননীও অশ্রুপূর্ণ লোচনে তনয়াকে আলিঙ্গন করিলেন, রাজা উইলিয়মও অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছিলেন, তাদৃশ করুণ দৃশ্য তৎপূর্ব্বে আর কথনও তাঁহাদের নয়নগোচর হয় নাই।

ঐ জন্মোৎসবের এক বৎসর পরে রাজা চতুর্থ উইলিয়মের অন্তিমকাল উপস্থিত হয়; মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া কুমারী ভিক্টোরিয়াকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক তিনি সস্নেহ বচনে বলিলেন, "চিকিৎসকেরা বলিয়াছেন, আর একদিন মাত্র আমি বাঁচিব। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। ঈশ্বরে ভক্তি রাখিয়া আমি রাজধর্ম্ম পালন করিয়াছি, এই বাক্যে বিশ্বাস রাখিও; তুমিও ভক্তিমতী হইয়া পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিও।" পিতৃব্যের অন্তিম বাক্য শ্রবণে স্নেহবতী রাজকুমারী নীরবে নতবদনে অশ্রুপাত করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া।

রাজ্যাভিষেক।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২০এ জুন রাত্রি সার্দ্ধ দ্বিতীয় ঘটিকার সময়ে রাজা চতুর্থ উইলিয়ম ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। শূন্য সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী রহিলেন ঊনবিংশতি বর্ষীয়া রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া।

ঊষাকালে ক্যাণ্টারবরীর আর্চ্চবিশপ, প্রধান রাজমন্ত্রী এবং লর্ড চেম্বারলেন কেন্‌সিংটন রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া অবিলম্বে কুমারী ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ বিজ্ঞাপন করিলেন, প্রাসাদের একজন পরিচারিকা তাঁহাদিগকে বলিল, "রাজকুমারীর এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই।" চেম্বারলেন বলিলেন, "শীঘ্র জাগাও।"

রাজকুমারী তখন জননীর শয়নকক্ষে নিদ্রা যাইতেছিলেন; জননীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, পরিচারিকার মুখে বৃত্তান্ত শুনিয়া কুমারীকে তিনি জাগাইলেন, বিশেষ প্রয়োজনে যাঁহারা সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের নাম বলিলেন।



রাজমুকুট ধারণ।

অভ্যাগতেরা তখন অভ্যর্থনা-গৃহে উপবেশন করিয়াছিলেন। অনতিবিলম্বে মৃদুমন্থর গতিতে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া সেই গৃহে দর্শন দিলেন।

পরিধানে নৈশবাস, তাহার উপর একখানি মোটা চাদর, পায়ে চটি জুতা ; নিদ্রা-ঘোরে অলসে দুটি চক্ষু রক্তবর্ণ, কপোলে আরক্তরাগ, কর্ণের উভয়পার্শ্বে অলকা-বলী অযত্নে বিশৃঙ্খল ; যেন বিবশা উদাসিনী মূর্ত্তি।

অভ্যাগত মহোদয়েরা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নতমস্তকে অভিবাদন করিলেন ; বিশেষ শিষ্টাচারে রাজকুমারীও প্রত্যভিবাদন করিলেন। অতঃপর লর্ড চেম্বারলেন বলিতে আরম্ভ করিলেন, "মহা গৌরবিণী রাজ্ঞি —!"

"রাজ্ঞী" সম্বোধন শ্রবণ করিয়াই রাজ্ঞীর সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল, নেত্রপুট অশ্রু-পূর্ণ হইয়া আসিল ; মনে মনে তিনি যে আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহাই সত্য স্থির করিয়া, শোকাবেগে অতিশয় কাতরা হইলেন।

বিলম্ব করিবার সময় নাই, সুতরাং লর্ড চেম্বারলেন ধীরে ধীরে মৃদুভাবে উপস্থিত নির্ঘাত সংবাদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

পিতৃব্যের মৃত্যুসংবাদে স্নেহময়ী রাজকুমারীর নয়নে দরদর ধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল, মুখে একটিও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

"আপনার মস্তকে ইংলণ্ডের রাজমুকুট শোভা পাইবে, অদ্য আপনাকে রাজ-সভায় উপস্থিত হইতে হইবে।" এইরূপ আমন্ত্রণ করিয়া ধর্ম্মযাজক ও রাজপুরুষদ্বয় পুনরভিবাদনপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যথাসময়ে রাজসভায় প্রবেশ করিয়া বিধি-বিহিত কর্ত্তব্য-কার্য্য সমাধা করিলেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২১এ জুন বেলা একাদশ ঘটিকা ; সেই দিন সেই সময় সভাগৃহে মন্ত্রীসভার প্রথম অধিবেশন। রাজ্যের সমস্ত প্রধান পদস্থ লোক, অমাত্যবর্গ, যাজকবর্গ, মহিলাবর্গ এবং প্রধান প্রধান প্রজাবর্গ সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। যথোচিত সমারোহে ঘোষণাপাঠ ও সময়োচিত অনুষ্ঠানসমূহ সমাপ্ত হইল।

সেইদিন অবধি রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া কেন্‌সিংটন প্রাসাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক জননীর সহিত বকিংহাম প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। এক বৎসর পরে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৮এ জুন ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবি নামক ধর্ম্মমন্দিরে রাজ্ঞী ভিক্টো-রিয়ার অভিষেক কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। প্রভাতে পঞ্চম ঘটিকার সময় ধর্ম্মমন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়, সহস্র সহস্র সম্ভ্রান্ত নর নারী সমবেত হইয়াছিলেন। কেণ্টার-বরীর আর্চ্চবিশপ যথাপদ্ধতি ঈশ্বর-স্তোত্র পাঠ করিয়া নবরাজ্ঞীর মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন। ইতিপূর্ব্বে ৩৩ জন রাজা ও রাণী যে সিংহাসনে উপবেশন করিয়

ছিলেন, উনবিংশতি বর্ষীয়া রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া সেই সিংহাসন উজ্জ্বল করিলেন। সহস্র সহস্র বদনে জয়ধ্বনি হইল, জয় জয় নবরাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জয়!

অভিষেকের পর হইতে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া মাসিক সাড়ে চারি লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা বৃত্তি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। প্রজারঞ্জনে তিনি অন্তরের সহিত যত্নবতী হইলেন। সমস্ত লোকের মুখে তাঁহার প্রশংসা পরিকীর্ত্তিত হইতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিণীতা রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া।

শুভ-বিবাহ,—সন্তানসন্ততি, রাজকার্য্য।



নবদম্পতি।

পূর্ব্বেই প্রকাশ হইয়াছে, স্যাক্সকোবর্গের প্রিন্স লিওপোল্ড রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মাতুল; সেই মাতুলের এক ভ্রাতা ছিলেন, ডিউক অব স্যাক্সকোবার্গ; তাঁহার দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ প্রিন্স আল্‌বার্ট। রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্ব হইতেই সেই মাতুলপুত্রের সহিত ভিক্টোরিয়ার শুভবিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাঁহারই সহিত বিবাহ হইবে, ইহাই স্থির হয়। রাজ্ঞীর রাজসিংহাসন প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই বিবাহ হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু ধৈর্য্যশীলা রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তত শীঘ্র পরিণয়ে সম্মতি না দিয়া দুই বৎসর অপেক্ষা করিতে বলেন, তদনুসারে দুই বৎসর পরে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের দশম দিবসে সেণ্টজেম্‌স ধর্ম্মমন্দিরে প্রিন্স আল্‌বার্টের সহিত ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হয়। পার্লামেণ্ট মহাসভার সদস্য মহাশয়েরা সেই সময় হইতে প্রিন্স এলবার্টের জন্য মাসিক ত্রিশ হাজার পাউণ্ড বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের একবিংশ দিবসে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া একটি কন্যারত্ন প্রসব করেন। কন্যার নাম ভিক্টোরিয়া এডিলেড মেরী লুইসা, প্রিন্সেস্ রয়েল। কন্যাটির বয়ঃক্রম এক বৎসর পূর্ণ হইলে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের নবম দিবসে রাজ্ঞীর প্রথম পুত্রের জন্ম; সেই পুত্রের নাম আল্‌বার্ট এড্‌ওয়ার্ড; তিনিই প্রিন্স অব ওয়েল্‌স হইলেন। পুত্রের জন্মের দশমাস পূর্ব্বে ঐ বৎসর জানুয়ারী মাসের ষড়বিংশ দিবসে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া মহাসভা পার্লামেণ্টের অধিবেশনে অধিষ্ঠাত্রীরূপে প্রথম বরিতা হন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসের একবিংশ দিবসে নব রাজ্ঞীর খুল্লতাত ডিউক অব সসেক্সের লোকান্তর প্রাপ্তি হয়; ইংলণ্ডের রাজমুকুট ধারণ করিয়া রাজ্ঞী এই প্রথম শোকের আঘাত প্রাপ্ত হন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসের পঞ্চদশ দিবসে রাজ্ঞীর দ্বিতীয়া কন্যার জন্ম; কন্যার নাম প্রিন্সেস এলিস মড মেরী। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ষষ্ঠ দিবসে রাজ্ঞীর দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, নাম প্রিন্স আল্‌ফ্রেড আর্ণেষ্ট আল্‌বার্ট, ডিউক অব এডিনবরা।

১৮৪৬ অব্দের মে মাসের ষড়বিংশ দিবসে রাজ্ঞীর তৃতীয়া কন্যা প্রিন্সেস হেলেনা আগষ্টার জন্ম। ১৮৪৮ অব্দের মার্চ্চ মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে চতুর্থ কন্যা প্রিন্সেস লুইসা কারোলাইন আল্‌বার্টার জন্ম; ১৮৫০ অব্দের মে মাসের প্রথম দিবসে রাজ্ঞীর তৃতীয় পুত্রের জন্ম; নাম প্রিন্স উইলিয়ম আর্থর প্যাট্রিক, ডিউক

অব কনট।

১৮৫৩ অব্দের এপ্রেল মাসের সপ্তম দিবসে রাজ্ঞীর চতুর্থ পুত্রের জন্ম; নাম প্রিন্স লিওপোল্ড, ডিউক অব আল্‌বানী।

১৮৫৭ অব্দের এপ্রেল মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে রাজ্ঞীর পঞ্চম কন্যা (সর্ব্বকনিষ্ঠা) প্রিন্সেস্ বিট্রাইস্ ভিক্টোরিয়ার জন্ম হয়।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার চারিটি পুত্র ও পাঁচটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের শেষে ভারতবর্ষে শিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়, দেড় বৎসর ব্যাপী মহাবিদ্রোহে বহু প্রাণী ক্ষয় হইয়াছিল। লর্ড ক্যানিং বাহাদুর তৎকালে ভারতের গবর্ণর জেনারেল ছিলেন, তাঁহার ধৈর্য্য ও সুনীতি-প্রভাবে বিদ্রোহের শান্তি; তদুপলক্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইজারার অবসান; রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ভারত রাজ্য খাস করিয়া ১৮৫৮ অব্দের ১লা নবেম্বরে সর্ব্বসন্তোষ-দায়িনী ঘোষণাপত্র প্রচার করেন।

ঘোষণাপত্রখানি অতিশয় দীর্ঘ, এস্থলে তাহার গর্ভস্থ সমস্ত বাক্য উদ্ধৃত করিবার স্থানাভাব; সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, কোমল-হৃদয়া মহারাণী পদে পদে অক্ষরে অক্ষরে প্রজাবৃন্দের মঙ্গল কামনা করিয়াছেন। এদেশে যাঁহারা আভ্যন্তরীণ-কল্যাণাভিলাষী, মহারাণীর ঐ ঘোষণাপত্র পাঠ করিয়া তাঁহারা কৃতজ্ঞতা-সহকারে, মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "ঐ খানি আমাদের ভারতবর্ষের ম্যাগনা চার্টা।"

আমরা ভারতবাসী, ভারতের প্রতি মহারাণীর কিরূপ কৃপা ছিল, তাহাই আমরা সগৌরবে স্বীকার করিতেছি। মহারাণীর শান্তিদায়িনী ঘোষণাপত্রিকা ভারতের সর্ব্বত্র পঠিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার উদারতা, নীতিজ্ঞতা ও নিরপেক্ষতার সমুচ্চ মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে। ঘোষণাপত্রে লিখিত আছে:—

"ভারত-রাজ্য-শাসনে আমি প্রজালোকের শ্বেত-কৃষ্ণাদি বর্ণভেদ এবং কোন প্রকার ধর্ম্মভেদ রাখিব না; ধর্ম্মাধিকরণে সকলেই সমভাবে সুবিচার প্রাপ্ত হইবে; কোন শ্রেণীর ধর্ম্মানুগত ব্যবহারে আমি হস্তক্ষেপ করিব না; প্রজাগণ স্বাধীনভাবে সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মসম্মত আচার ব্যবহার পালন করিতে পারিবে; রাজকার্য্য সম্পাদনের উপযুক্ত সুশিক্ষা প্রাপ্ত

হইলে আমার ভারতবাসী প্রজাগণ জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে রাজ কার্য্যালয়ে উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন; প্রজাপুঞ্জের স্বাস্থ্যবিধান, অর্থবৃদ্ধি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ প্রভৃতির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে; গৃহস্থের চিরবৈরী দস্যু-তস্কর দমনের নিমিত্ত সর্ব্বত্র শান্তিরক্ষার সুবন্দোবস্ত করা হইবে; কেহ কাহারও ন্যায্য স্বত্ব অপহরণ করিবার চেষ্টা করিলে রাজ্যের শান্তিরক্ষক ও স্বত্বরক্ষক বিচারপতি-গণ জাতীয় ব্যবস্থানুসারে তৎপক্ষে সুবিচার বিতরণ করিবেন; রাজ্যবৃদ্ধি করি-বার নিমিত্ত ভারতবর্ষে নূতন যুদ্ধ বিগ্রহের অবতারণা করিতে আমার অভিলাষ নাই; সকলেই সমপরিমাণে স্ব স্ব স্বত্বে অধিকারী থাকিয়া নিরন্তর শান্তি উপ-ভোগ করেন, ইহাই আমার একান্ত বাসনা।" লর্ড ক্যানিং বাহাদুর ভারতের প্রথম ভাইসরয় অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান রাজপ্রতিনিধির পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পতিহীনা রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া।

সাংসারিক ঘটনা।

১৮৬১ অব্দে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া উপর্য্যুপরি দুটি মহাশোক প্রাপ্ত হন। সেই বৎসর মার্চ্চমাসের পঞ্চদশ দিবসে তাঁহার স্নেহময়ী গর্ভধারিণী ডচেস্ অব কেণ্ট ৭৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। রাজ্ঞীর দ্বিতীয় শোক আরও অধিকতর ভয়-ঙ্কর। যাঁহাকে পাণিদান করিয়া তিনি রাজ্যসুখ অপেক্ষা অধিকতর সুখের অধিকারিণী হইয়াছিলেন, যাঁহার রূপগুণ ও সাধু ব্যবহারে ইংলণ্ডের যাবতীয় লোক বিমুগ্ধ হইয়াছিল, রাজ্ঞী যাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভাল-বাসিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বগুণাকর সতী সাধ্বীর একমাত্র হৃদয়দেবতা প্রিন্স আলবার্ট সেই বৎসর ডিসেম্বর মাসের ত্রয়োদশ দিবসে পতিব্রতা সতীর হৃদয়-সিংহাসন শূন্য করিয়া অকালে ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া গেলেন! তাঁহার ৪২ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল। পতিশোকে পতিপ্রাণা রাজ্ঞী যার-পর-নাই কাতরা হইয়াছিলেন। রাজকার্য্যে ও সাংসারিক কার্য্যে তাঁহার আন্তরিক ঔদাস্য জন্মিয়াছিল, সংসারে সুখ বিলাসে আর তাঁহার কিছুমাত্র অভিলাষ ছিল না, এক বর্ষকাল তিনি হাস্ত



রাজ্ঞীর বৈধব্য বেশ।

কৌতুক পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বাস করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সংসারে কত কষ্টে সতী নারী বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করেন, সতী সাধ্বী রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন।

সংসার চিরদিন সুখ-দুঃখ বিজড়িত। প্রবল শোকোচ্ছ্বাসের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি সাংসারিক সুখ-সংবাদ এই স্থলে লিপিবদ্ধ হইল।

১৮৫৮ অব্দের জানুয়ারী মাসের পঞ্চবিংশ দিবসে জর্ম্মণ সম্রাট ফ্রেডারিক উইলিয়মের সহিত রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়; এই বিবাহে ৪০ হাজার পাউণ্ড যৌতুক প্রদত্ত হইয়াছিল। রাজ্ঞীর সেই কন্যাটিই বর্ত্তমান জর্ম্মণ-সম্রাটের মাতা ছিলেন।

১৮৬২ অব্দের জুলাই মাসের প্রথম দিবসে হেসী ডার্ম্মষ্টডের প্রিন্স লুইয়ের

সহিত রাজ্ঞীর দ্বিতীয়া কন্যা এলিসের বিবাহ হয়। ১৮৬৩ অব্দের মার্চ্চ মাসের দশম দিবসে রাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্‌স আল্‌বার্ট এডওয়ার্ড ডেনমার্কের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজকুমারী আলেকজান্দ্রার সহিত শুভ-পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৮৬৪ অব্দের জানুয়ারী মাসের অষ্টম দিবসে প্রিন্সেস আলেকজান্দ্রার গর্ভে প্রিন্স অব ওয়েলেসের জ্যেষ্ঠপুত্র আলবার্ট ভিক্টর জন্মগ্রহণ করেন; রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া প্রথম পৌত্রমুখ সন্দর্শনে দারুণ পতিশোক হৃদয়ে গুপ্ত রাখিয়া বিমলানন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন; রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী নবকুমারের জন্মোৎসবে সমগ্র বৃটনভূমি আনন্দ-উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল।

১৮৬৬ অব্দের জুলাই মাসের পঞ্চম দিবসে সিলেস উইগহল্‌সষ্টিনের রাজকুমার ক্রিশ্চিয়ানের সহিত রাজ্ঞীর তৃতীয়া কন্যা প্রিন্সেস হেলেনার বিবাহ হয়।

১৮৭১ অব্দের মার্চ্চ মাসের একবিংশ দিবসে মার্কুইস অব লোরেণের সহিত রাজ্ঞীর চতুর্থ কন্যা প্রিন্সেস লুইসার বিবাহ হয়।

১৮৭৫ অব্দের মে মাসের চতুর্ব্বিংশ দিবসে রাজ্ঞীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবরা রুষিয়ার সম্রাটকুমারী আলেকজান্দ্রা ভণার পাণিগ্রহণ করেন।

১৮৭৯ অব্দের মার্চ্চ মাসের সপ্তদশ দিবসে রাজ্ঞীর তৃতীয়পুত্র ডিউক অব কনট প্রুসিয়ার রাজকুমারী লুই মারগারেটের সহিত পরিণীত হন।

১৮৮২ অব্দের এপ্রেল মাসের দ্বিতীয় দিবসে রাজ্ঞীর চতুর্থপুত্র ডিউক অব আল্‌বানীর বিবাহ হয়। বিষম পরিতাপের বিষয়, বিবাহের পর দুই বৎসর পূর্ণ হইবার অগ্রেই ১৮৮৪ অব্দের মার্চ্চ মাসের অষ্টবিংশ দিবসে নবযৌবনে ডিউক অব আলবানী ইহ-লীলা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন! বিয়োগ-বিধুরা বিধবা রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার হৃদয়ে এই পুত্রশোক-শেল প্রবল হইয়া বাজিয়াছিল!

১৮৮৫ অব্দের জুলাই মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে ব্যাটনবর্গের প্রিন্স হেন্‌রি মরিশের সহিত রাজ্ঞীর কনিষ্ঠা কন্যা প্রিন্সেস বিট্রাইসের বিবাহ হয়।

রাজপরিবারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপাততঃ এই পর্য্যন্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মহারণী ভিক্টোরিয়া।



EMPRESS OF INDIA.

ভারত-রাজ্য খাস হইবার প্রায় বিংশতি বৎসর পরে লর্ড লিটন বাহাদুর যখন ভারতের গবর্ণর জেনারেল, সেই সময় (১৮৭৭ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে) মহাসমারোহপূর্ণ দিল্লী দরবারে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী মহারাণী (Empress of India.) উপাধি প্রাপ্ত হন; সেই দরবারে ভারতের ও বিভিন্ন প্রদেশের করদ ও মিত্র রাজগণ সমবেত হইয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারত-সম্রাজ্ঞী বলিয়া স্বীকার করেন।

ইংলণ্ডের রাজপরিবারে একটি পদ্ধতি আছে, কোন রাজা অথবা রাণীর পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব পূর্ণ হইলে এক একটি জুবিলী হয়। আধুনিক ইতিহাস বলিয়া দিতেছে, মহারাণীর পিতামহ রাজা তৃতীয় জর্জ্জের পঞ্চাশ বৎসর রাজ্যভোগে একটি জুবিলী হইয়াছিল; তৎপরে কোন রাজার অথবা রাণীর তত দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ হয় নাই, সুতরাং জুবিলীর অভাব; কেবল আমাদের মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া সে বিষয়ে পরম ভাগ্যবতী; পঞ্চাশ বৎসর রাজত্বকালে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম জুবিলী হইয়াছিল, তাহার দশ বৎসর পরে ষষ্টিবর্ষ রাজ্যভোগে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় জুবিলী হয়; দ্বিতীয় জুবিলীর নাম হীরক জুবিলী। যত-দূর স্মরণ করিতে পারা যায়, তাহাতে গৌরব করিয়া বলা যাইতে পারে, পুণ্যবতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার তুল্য এত দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ ইংলণ্ডের কোন রাজা অথবা রাণীর ভাগ্যে ঘটে নাই; অতএব "হীরক জুবিলী" শব্দটি প্রায়ই শোনা যায় না। ভাগ্যবতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বগৌরবে ৬২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে যতগুলি প্রধান প্রধান ঘটনা হইয়াছিল, তন্মধ্যে অবশ্যজ্ঞাতব্য কয়েকটী প্রধান প্রধান ঘটনার বিবরণ এইস্থলে লিপিবদ্ধ হইল।

ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তন। ১৮৩৭ খৃঃ (আবিষ্কারক হোয়েটস্পেন ও কুকব্লাকওয়াল রেলওয়েতে প্রথম ব্যবহার।) চর্টিষ্ট বিদ্রোহ ১৮৩৮ খৃঃ।

ইংলণ্ড হইতে আমেরিকার নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত বাষ্পীয়পোতের প্রথম যাত্রা। ১৮৩৯ খৃঃ।

পেনি পোষ্ট প্রচার। ১৮৩৯ খৃঃ।

কাবুলে ইংরাজ সৈন্যের ভয়ানক হত্যাকাণ্ড। ১৮৪০ খৃঃ।

বিলাতে ইন্‌কম টেক্স প্রবর্ত্তন। ১৮৪২ খৃঃ।

আয়রলণ্ডে গোলআলু বিনাশন ব্যাধির উপদ্রব। (মহামারী) ১৮৪৫ খৃঃ।

ভারতে শিখ-সংগ্রাম। ১৮৪৫ খৃঃ।

পঞ্জাব অধিকার। ১৮৪৯ খৃঃ।

কালিফর্ণীয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণখনি আবিষ্কার। ১৮৫১ খৃঃ।

হাইড পার্কে মহাপ্রদর্শনী। ১৮৫১ খৃঃ।

ইংলিশ ভলন্টিয়ার দলের নিয়োগ। ১৮৫২ খৃঃ।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ। (শিবাষ্টপোল অধিকার, যুদ্ধের অবসান ও সন্ধি) ১৮৫৫খৃঃ।

লর্ড ডালহাউসির দ্বারা অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ বন্দী হইয়া কলিকাতার মুচিখোলায় আনীত। ১৮৫৫ খৃঃ।

ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ। (কানপুরে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড।) ১৮৫৭ খৃঃ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারত রাজ্যের শাসনভার রাজ্ঞীর স্বকরে গ্রহণ, প্রকাশ্য ঘোষণা প্রচার। ১লা নবেম্বর, ১৮৫৮ খৃঃ।

কলিকাতায় বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ১৮৫৮ খৃঃ।

সেনাদলে ভলন্টিয়ার প্রবেশ। ১৮৫৮ খৃঃ।

আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ। ১৮৬১ খৃঃ।

কলিকাতায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা। ১৮৬২ খৃঃ।

ফ্রান্স প্রুসীও সংগ্রাম। ১৮৭০খৃঃ। ভারতে ইন্‌কমটেক্স প্রবর্ত্তন। ১৮৬০ খৃঃ।

সুয়েজ যোজক সুয়েজ খালে পরিণত। ১৮৬৪ খৃঃ।

আফগানস্থান ও আফ্রিকার যুদ্ধাদি। ১৮৬৭ খৃঃ হইতে ১৮৮৬ খৃঃ।

রাজ্ঞীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবরার ভারতবর্ষে আগমন। ১৮৭০ খৃঃ।

গ্লাডষ্টোনের হোমরুল। ১৮৮৬ খৃঃ।

ভারতবর্ষ ও উপনিবেশ সমূহের মহাপ্রদর্শনী। ১৮৮৬ খৃঃ।

গ্লাডষ্টোনের মৃত্যু। ১৮৯৮ খৃঃ।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সুদীর্ঘ রাজত্বকালে আরও বহুবিধ ঘটনা হইয়াছিল,

তৎসমস্তের নির্ঘণ্টের স্থানাভাব।

যে কয়েকটী বড় বড় যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করা গেল :—

কানাড়া বিদ্রোহ। ১৮৩৭ হইতে ১৮৪৩ খৃঃ।

প্রথম আফগান যুদ্ধ। ১৮৩৮ হইতে ১৮৪২ খৃঃ।

লর্ড ডফারিণের দ্বারা ব্রহ্মদেশ অধিকার। ১৮৮৮ খৃঃ।

মহারাণীর রাজত্বকালে যাঁহারা প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম :—

১। লর্ড মেলবোর্ণ বা উইলিয়ম ল্যাম্ব। (জন্ম ১৭৭৯, মৃত্যু ১৮৬৮ খৃঃ) ২। স্যার রবার্ট পীল। ১৮৪১ খৃঃ। (জন্ম ১৭৮৮, মৃত্যু ১৮৫০ খৃঃ) ৩। লর্ড জন রসেল ১৮৪৬ খৃঃ। (জন্ম ১৭৯২, মৃত্যু ১৮৭৮ খৃঃ) ৪। লর্ড ডার্ব্বী ১৮৫২ খৃঃ (জন্ম ১৭৯৯, মৃত্যু ১৮৭৯ খৃঃ) লর্ড জর্জ্জ হ্যামিল্টন গর্ডন লর্ড এবার্ডিন ১৮৫২ খৃঃ (জন্ম ১৭৮৪, মৃত্যু ১৮৬০ খৃঃ) ৬। লর্ড পামর্সটোন ১৮৫৫ (জন্ম ১৭৮৪, মৃত্যু ১৮৬৫ খৃঃ) ৭। লর্ড ডার্ব্বী (দ্বিতীয়বার) ১৮৫৮ খৃঃ। ৮। লর্ড পামর্সটোন (দ্বিতীয় বার) ১৮৫৯ খৃঃ। ৯। আর্‌ল জন রসেল (দ্বিতীয় বার) ১৮৬৫ খৃঃ। ১০। লর্ড ডার্ব্বী (তৃতীয়বার) ১৮৬৬ খৃঃ। ১১। মিষ্টার ডিস্‌রেলী বেঞ্জামিন ডিস্‌রেলী পরে লর্ড বীকন্স ফীল্ড। ১৮৬৮ খৃঃ (জন্ম ১৮০৫, মৃত্যু ১৮৮১ খৃঃ। ১২। মিষ্টার গ্লাডষ্টোন (উইলিয়ম ইওয়ার্ট গ্লাডষ্টোন।) ১৮৬৮ খৃঃ জন্ম ২৯শে ডিসেম্বর ১৮০৯ খৃঃ মৃত্যু ১৯০০ খৃঃ) ১৩। মিঃ ডিস্‌রেলী (দ্বিতীয়বার) ১৮৭৪ খৃঃ। ১৪। মিঃ গ্লাডষ্টোন (দ্বিতীয়বার) ১৮৮৪ খৃঃ। ১৫। লর্ড সেলিসবরী (রবার্ট আর্থার ট্যালবট গ্যাসকইন সিসিল, মার্কুইস অব সেলিসবরী) ১৮৮৫ খৃঃ (জন্ম ১৮৩০ খৃঃ এক্ষণে বর্ত্তমান) ১৬। মিঃ গ্লাডষ্টোন (তৃতীয়বার) ১৮৮৫ খৃঃ ১৭। লর্ড সেলিসবরী (দ্বিতীয়বার ১৮৮৬ খৃঃ। ১৮। মিঃ গ্লাডষ্টোন (৪র্থ বার) ১৮৮২ খৃঃ। ১৯। লর্ড রোজবরী (আরচিবল্ড ফিলিপ প্রিমরোজ আর্‌ল রোজবরী) ১৮৯৪ খৃঃ (জন্ম ১৮৪৭ খৃঃ এক্ষণে ইনি বর্ত্তমান) ২০। লর্ড সেলিসবরী (তৃতীয়বার) ১৮৯৬ খৃঃ (ইনিই মহারাণীর আমলের শেষ মন্ত্রী)।

মহারাণীর রাজত্বকালে জলপথের গতিবিধির ও দেশ বিদেশীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সুয়েজের খাল বিস্তৃত হওয়াতে বাণিজ্য-দ্রব্যের আমদানী রপ্তানীর যথেষ্ট প্রাচুর্য্য হইয়াছে। বৃহৎ বৃহৎ বাষ্পীয় তরণীর আয়তন

ও সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাণিজ্যপোতের প্রসারণ এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে যে, একখানা জাহাজে সম্ভবতঃ ৭৫ লক্ষ, ৩০ হাজার মন মাল বোঝাই হইতে পারে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব সময়ে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের বহু বিস্তার হইয়াছে। তাঁহার সিংহাসনারোহনের ৮ বৎসর পুর্ব্বে বিজ্ঞানবিশারদ জর্জ্জ ষ্টিভেন্সন সাহেব ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বাষ্পীয়শকটের প্রথম পত্তন করেন, লোকমটিব ও বাষ্পীয় এঞ্জিনের আবিষ্কার হয়; লিভারপুল হইতে ম্যাঞ্চেষ্টার পর্য্যন্ত বাষ্পীয়শকট চলে। সেই বৎসর সেই রেলপথে ৫৯ কোটি ৪৩ লক্ষ মুদ্রার বাণিজ্য হইয়াছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে ২৩ হাজার ৯ শত ৬০ মাইল রেল বসিয়াছিল; এক্ষণে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত স্থান লৌহবর্ম্মে শোভিত হইয়াছে।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে টেলিগ্রাফের আবিষ্কার। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৫ হাজার মাইল এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ৯ লক্ষ ৩৩ হাজার মাইল পথে বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহ বিদ্যুৎ-গতিতে দৈত্যকার্য্য করিয়াছে। ১৮৫০ অব্দে সমুদ্রের জলের ভিতর দিয়া ২৫ মাইল চপলা-তার পত্তন হইয়াছিল, ১৮৯৮ অব্দে সেইরূপ তারযোগে সমুদ্র পথে স্বর্গীয় সৌদামিনী ১ লক্ষ ৬৮ হাজার মাইল গতিবিধি করিয়াছে।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ১২১৪ কোটি ৭০ লক্ষ মুদ্রার বাণিজ্য হইয়াছিল, ১৮৯৮ অব্দে বাণিজ্য মুদ্রা সমষ্টি ৫৯৭৪ কোটি ৫০ লক্ষ।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পুর্ব্বে যত স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়াছিল, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সমস্ত পৃথিবীতে তাহার পাঁচগুণ স্বর্ণ বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীতে ২২৭ কোটি ৯২ লক্ষ মন লৌহ উৎপন্ন হইয়াছিল, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের উৎপন্ন লৌহ ৭০৮ কোটি মন।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সাহেবেরা গণনা করিয়াছেন, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র পৃথিবীতে ১০৭ কোটি ৫০ লক্ষ লোক বাস করিত, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের গণনার ফল ১৫০ কোটি।

মহারাণীর রাজত্বকালে প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ :—

(১) ডিউক অব ওয়েলিংটন্। (২) লর্ড হার্ডিঞ্জ। (৩) ডিউক অব কেম্ব্রিজ। (৪) লর্ড ওয়েলেস্‌লি। (৫) লর্ড রবার্টস্। (৬) সার জর্জ্জ হোয়াইট। (৭) লর্ড কিচেনার।

অর্ণবযানের সংখ্যাও বর্ষে বর্ষে বৃদ্ধি হইতেছে। রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্ব সময়ে ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে সামুদ্রিক পোতের সংখ্যা ছিল ৫৭০ খানি, রাজা চতুর্থ জর্জ্জের রাজত্বকালে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল ১০৩৭৫ খানি; মহারাণী

ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব সময়ে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ২২ হাজার ১ শত ৩৬ খানি হইয়াছিল।

সামরিক মহাযজ্ঞে ইয়োরোপ খণ্ডের চারিটি প্রধান রাজ্যে যতগুলি রণ-তরির চালনা হইয়াছিল. এবং অস্ত্রাদি রণ-সরঞ্জাম ও রণ-নিপুণ মানব যত ছিল ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সামরিক বিভাগের কর্ত্তারা তাহার এক হিসাব দিয়াছেন, গ্রেটবৃটনে ৪৫৫ খানি রণতরি, ৬৬৩১টি কামান, ৯৪৫৬৩ জন নৌসেনানী ও নাবিক। ফরাসীরাজ্যে ২৮০ খানি রণতরি, ১৫৮৩টী কামান, ৭০৫৬০ জন নৌসেনানী ও নাবিক। ইটালীতে ১৬৩ খানি রণতরি, ৫৩১টি কামান, ২৩০০০ নৌসেনানী ও নাবিক; রুষিয়াতে ২২১ খানি রণতরি, ৫৮৬টি কামান, ৩১০০ নৌসেনানী ও নাবিক;

ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞ।—

লর্ড পামরষ্টোন, মিষ্টার গ্লাডষ্টোন, ডিস্‌রেলী এবং লর্ড সেলিসবরী প্রভৃতি।

কবি।—ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থ, টেনিসন, স্থইন বরণ, এবং লংফেলো প্রভৃতি।

মহারাণীর রাজত্বকালে আমাদের এই বঙ্গদেশে একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনি মহাত্মা পরমহংস ভগবান রামকৃষ্ণদেব। চারিশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব যেরূপ হরিভক্তি বিতরণে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন, আমাদের সনাতন-ধর্ম্মের মহিমা প্রচারে এই পরমহংসদেব সেইরূপ প্রসিদ্ধ। তাঁহার অন্যতম উপাসক স্বনাম-ধন্য বিবেকানন্দ স্বামী তাঁহারই উপদিষ্ট মহৎ-ধর্ম্ম প্রচারে উৎসাহিত হইয়া সমুদ্রপারস্থ আমেরিকা ও ইয়োরোপ পর্য্যন্ত আর্য্য-ধর্ম্মভাবে বিমুগ্ধ করিয়া আসিয়াছিলেন।

রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে ইংলণ্ডে সরস্বতিদেবীর আরাধনার কল্প আরম্ভ হয়, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে কাব্য, সাহিত্য, বিজ্ঞানের বাঞ্ছিত অভ্যুদয়ে অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক, কবি, গ্রন্থকার ও নাট্যকার প্রভৃতির উত্থান হইয়াছিল। বিলাতে যাঁহারা জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ; বঙ্গদেশে যাঁহারা বাগীশ্বরী দেবীর সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন মহানুভবের নাম এই স্থলে উল্লিখিত হইল ঃ—

রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু

কৃষ্ণদাস পাল, রাজা ঈশ্বরনারায়ণ সিংহ, বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত, কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বঙ্গীয়-নাট্যাচার্য্য বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ পঞ্জাব, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানেও অনেকগুলি পণ্ডিতের অভ্যুদয় হইয়াছিল।

সার সার কতিপয় জ্ঞাতব্যবিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইল; বাস্তবিক মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সুদীর্ঘকাল রাজত্বে দেশের বহুবিধ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। মহারাণীর মহাগৌরব চিরস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মহারাণীর লীলাসম্বরণ।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের দ্বাবিংশ দিবসে ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতবর্ষের সর্ব্বেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া ৮১ বৎসর বয়ঃক্রমে স্বর্গবাসিনী হইয়াছেন। যেমন দীর্ঘজীবন, তদনুরূপ পুণ্য অর্জ্জন, সাম্যভাবে প্রজারঞ্জন, শান্তিকামনায় সন্ধিস্থাপন এবং তদনুরূপ ঔদার্য্যসহকারে ইয়োরোপখণ্ডের সর্ব্বজনগণের মনোরঞ্জন করিয়া মহারাণী অতুল যশোস্বিনী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গারোহনে রাজ্যবাসী সমস্ত প্রজা মাতৃহারা হইয়াছে। বাস্তবিক তিনি মাতৃরূপিণী হইয়া পুত্রবৎ প্রজা পালন করিয়াছেন।

নশ্বর সংসারে নির্ব্বিঘ্ন সুখ-শান্তিভোগ দুর্লভ। সুদীর্ঘ জীবনে গৌরবিনী মহারাণী অনেকগুলি দুর্জ্জয় শোক-শেলাঘাত সহ করিয়াছিলেন। প্রথমে মাতৃশোক ও পতিশোক; তৎপরে মাতুলশোক, দুইটি পুত্রশোক, পৌত্রশোক, কন্যাশোক এবং পিতৃব্যশোক।

১৮৬৫ অব্দে রাজ্ঞীর মাতুল প্রিন্স লিওপোল্ডের মৃত্যু। ১৮৭৮ অব্দের ডিসেম্বর মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে রাজকুমারী এলিস পূর্ণযৌবনে প্রাণত্যাগ করেন। সেই



প্রাচীনা মূর্ত্তি।

কন্যাটী সর্ব্বকন্যা অপেক্ষা মাতাপিতার অধিক স্নেহপাত্রী ছিলেন; পিতার মৃত্যুশয্যার নিকটে অনুক্ষণ উপস্থিত থাকিয়া স্নেহবতী এলিস পরমযত্নে পিতৃসেবা করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ অব্দে চতুর্থ পুত্র ডিউক অব আলবানী অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। ১৮৯২ অব্দের ১৪ই জানুয়ারী মহারাণীর পৌত্র আলবার্ট ভিক্টরের মৃত্যু। মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবরা ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে পরলোকে প্রস্থান করেন; অনন্তর মহারাণীর অন্যতম পিতৃব্য ডিউক অব সসেক্সের

মৃত্যু এই সকল শোকে মহারাণীর দেহ ও মন দুর্ব্বল হইয়াছিল, মৃত্যুক্রোড়ে শান্তি লাভ হইয়াছে। মহারাণী স্বর্গবাসিনী হইয়াছেন, কিন্তু পৃথিবীতে তাঁহার যশো-গৌরব অমর।

যশস্বিনী গৌরবিনী মহারাণী স্বর্গে শান্তিময়ের রাজ্যে শান্তিলাভ করুন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। রাজধানীর দুর্গচত্বরে তাঁহার স্মৃতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইতেছে, ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ নগরেও তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি সংরক্ষিত হইতেছে, পাষাণময়ী, রজতময়ী, সুবর্ণময়ী যেখানে যত প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হউক, আমাদের হৃদয়-মন্দিরে যে শান্তিময়ী দেবীমূর্ত্তি দিবারাত্রি বিরাজ করিতেছে, তাহার নিকটে কোন ধাতুময়ী প্রতিমূর্ত্তি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিবে না।

জয় জয় ভিক্টোরিয়া, ইংলণ্ড ঈশ্বরী,
সুরপুর নিবাসিনী, প্রকৃতি-রঞ্জিকা—
মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত-ঈশ্বরী।
স্বর্গে আছ, স্বর্গে থাক। ভারত-সন্তান—
(চির রাজভক্ত প্রজা বিখ্যাত জগতে।)
সঁপিছে উদ্দেশে তব প্রেম-ভক্তি-হার,
পর গলে মহারাজ্ঞি! এই আকিঞ্চন।
ভুলিবে না তব নাম, জীবে যতদিন—
কৃতজ্ঞ তেত্রিশ কোটি ভারতের প্রজা।
পুণ্যময়ি, পুণ্যবলে গেছ পুণ্যধামে,
দেবীরূপে চাহ মা গো, সন্তানের পানে।
এসো হে ভারতবাসি, সবে সমস্বরে—
মুক্তকণ্ঠে গাই আজি ভারত-মঙ্গল।
গাও গাও, জয় জয়, ভিক্টোরিয়া জয়,
গাও গাও, জয় জয়, সম্রাটের জয়!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড।



রাজমূর্ত্তি।

মহারাণীর স্বর্গারোহণের পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স আল্‌বার্ট এড্‌ওয়ার্ড "সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড" উপাধি ধারণপূর্ব্বক ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট তারিখে ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার আবি নামক ধর্ম্মমন্দিরে মহাসমারোহে তাঁহার অভিষেক হয়। তৎপূর্ব্বে ২৪এ জুন তারিখে অভিষেকের দিন ধার্য্য হইয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ পাকস্থলীতে বিষস্ফোটক হওয়াতে তাঁহার

উত্থানশক্তি রহিত হয়; বহুকষ্টে অস্ত্রপ্রয়োগে আরোগ্যলাভে বিলম্ব ঘটিয়াছিল, সেইকারণে অবধারিত দিনটি স্থগিত রাখা হয়; আরোগ্যলাভের পর প্রায় দেড় মাস পরে অভিষেকোৎসব হইয়াছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বরে তাঁহার জন্ম-গণনায় ষষ্ঠি বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি রাজা হন।

জন্মোৎসব।—কুমারের জন্ম-দিবসের প্রাতঃকালে ডিউক অব ওয়েলিংটন সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া মহাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র হইল কি?" ধাত্রী উত্তর করিলেন, "হাঁ মাই লর্ড! রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন।"

শুভ সংবাদ শ্রবণে ডিউক মহাশয় মহানন্দে প্রফুল্ল হইলেন। বহু সংখ্যক নরনারী ও গণনীয় চিকিৎসকাদি সম্ভ্রান্ত পদস্থ ব্যক্তিবর্গ সূতিকাগৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সকলের হৃদয়েই আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল। মুখে মুখে শুভ-বার্ত্তা বিঘোষিত হইলে আনন্দ-নির্ঘোষে ঘন ঘন কামান গর্জ্জিয়া উঠিল, সমবেত বাদ্যযন্ত্রে তালে তালে আনন্দ-বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল, সহস্র সহস্র মুখে আনন্দ-ধ্বনি হইতে লাগিল. নগরে নগরে ও পল্লীতে পল্লীতে রাজ্যের ভাবী উত্তরাধি-কারির শুভ জন্মবার্ত্তা ঘোষণা করিবার নিমিত্ত বেগগামী অশ্বারোহী দূতেরা দিকে দিকে ধাবিত হইল, সমগ্র লণ্ডন নগর মহানন্দে পরিপূর্ণ।

পুত্রমুখ দর্শনে পিতামাতার অতুলানন্দ, প্রকৃতিপুঞ্জেরও পরমানন্দ। তৃতীয় দিবসে গ্রেটবৃটন ও আয়রলণ্ডের শতাধিক নগরপালকে লইয়া লণ্ডন নগরের মেয়র মহানন্দে রাজকুমারের মুখদর্শন করিলেন।

কুমারের জন্মোৎসবে মহারাণীর আদেশে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের কারাগার সমূহে লঘুতর অপরাধে অপরাধি যে সকল বন্দী কারাগার মধ্যে শিষ্টাচার ও সদ্ব্যবহার দেখাইয়াছে, তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

অনাথ, দরিদ্র নরনারীগণকে বস্ত্রদান, অর্থদান ও আহার দান করিয়া পরি-তুষ্ট করা হইল, তাহারা মুক্তকণ্ঠে রাজকুমারের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া আশী-র্ব্বাদ করিয়া গেল।

রাজকুমারের বয়ঃক্রম একমাস পূর্ণ হইলে তাঁহার কটিদেশে কটিবন্ধ পরাইয়া সেই কটিবন্ধে স্বর্ণকোষাবৃত তরবারি বাঁধিয়া দেওয়া হইল; মস্তকে স্বর্ণমুকুট, কণ্ঠে রত্নহার, হস্তে রাজদণ্ড এবং অঙ্গুলিতে রত্নাঙ্গুরী শোভিত করা হইল; মহা-রাণী তাঁহাকে "প্রিন্স অব ওয়েলস্ এবং আরল্ অব চেষ্টার" উপাধি দান করিলেন।

জীবনের সফলতা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ,

সাগর-তরঙ্গের ন্যায় অশেষ জীবস্রোত নয়নগোচর করিলে এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে হয় যে, সংসারের অনন্ত দুর্গতির মধ্যে যাহারা জীবন-যাপন করিতেছে, তাহারা জীবনান্তে দেহধারণের সফলতা লাভ করিতেছে কি না?

এই সাধারণ প্রশ্নের সহিত আমারও নিজ জীবনের সফলতার প্রশ্ন লিপ্ত রহিয়াছে। কারণ বিশেষ সাধারণের অন্তর্গত।

জীবন বলিলেই যদি বালুকার রেখার মত, সরিতের তরঙ্গের মত, জলের উপর রেখার মত, জীবনের মানে কাল-সমুদ্রের উপর ক্ষুদ্র বা বৃহৎ একটা রেখাকেই বুঝায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, সকল জীবনই সার্থক। এক হিসাবে প্রত্যেক জীবনকেই সার্থক বলা যাইতে পারে,—কারণ যে অজ্ঞেয়, অদৃষ্ট, অদৃশ্য, বচন মনের অতীত, অদ্ভুত, অনন্ত শক্তি হইতে এই সকল পরিদৃশ্যমান জীবগণের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই শক্তি অচেতন নহেন, সচেতন,—বুদ্ধিহীন নহেন, বুদ্ধিমান,—উদ্দেশ্যহীন নহেন, লক্ষ্যবান। সেই অনন্তজ্ঞানবান, চৈতন্য-সাগরের ইচ্ছারূপ তরঙ্গাঘাতে সঞ্জাত ফেনকণার ন্যায়, এই সমুদয় অশেষ জীবকণা অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীন ভাবে সেই সৃষ্টিশক্তিকর্ত্তৃক এই অপূর্ব্ব কৌশলময় বিশ্বধামে প্রেরিত হয় নাই। অণু হইতে ব্রহ্মাণ্ড, এবং বালুকণা হইতে জ্যোতিষ্কমণ্ডল সকলেই সেই নয়নমনের অতীত, নিত্যজাগ্রত-নয়নবিশ্বচক্ষুর অনিদ্র অবলোকনে নিত্য অবস্থিত রহিয়াছে। সেই "সংসারবন্ধনস্থিতিমোক্ষহেতু" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।১৬।) অনাদি কারণের অভিভাবকতায় সর্ব্বজীবের, সর্ব্বপদার্থের, সর্ব্ব অবস্থার, শুভাশুভ, মঙ্গলামঙ্গল সংঘটিত হইতেছে।

সেই একশক্তি এই বিশ্বরাজ্যের প্রতিঘটে অব্যক্ত থাকিয়া, কি এক অপূর্ব্ব নিত্যলীলা অভিনয় করিতেছেন, সন্দর্শন করিলে, তাঁহাকে নটরাজ, নটনারায়ণ বলিয়া স্বভাবতই অবনত মস্তকে করযোড় করিতে হয় এবং নিজের সম্পূর্ণ আলস্যতা ভুলিয়া বলিতে হয়, "সফল জীবন মোর" এবং পুরাণের মধুর, কোমলকান্ত পদাবলীতে বলিতে হয়, "কৃতার্থোঽস্মি। বরং ন যাচে।"

প্রতিঘটে সেই অনন্ত চৈতন্যশক্তির জীবলীলা দর্শন করিয়া কে না জীবনের সফলতা উপলব্ধি করিবে?

ভক্ত হিন্দুগণ বলেন,—"রথস্থ বামনকে দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না।" সেই জন্যই প্রতি বৎসর অসংখ্য হিন্দু সন্তান অশেষ বাধাবিঘ্ন, দুঃখ, ক্লেশ অতিক্রম করিয়া, পুরীধামে জগন্নাথদেবের রথ দর্শন করিতে গমন করেন।

আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে, রথারূঢ় জগন্নাথকে দর্শন করিলে জীবন সফল হয়; অতএব পুনরায় মানবজীবনরূপ পাঠ অভ্যাস করিবার জন্য পুনরায় এ মরলোকে জীবলীলা করিতে আর আসিবার প্রয়োজন থাকে না।

আমার এই দেহতেই ভগবল্লীলা হইতেছে, এই স্থায়ী জ্ঞান জন্মিলে আর বাকী রহিল কি? এই আত্মাই রথী, শরীরই রথ, ইহাই উপনিষদ্‌বাক্য। (কঠোপনিষৎ ৩।৫।)এই চৈতন্যময় দেহ-রথে চৈতন্যস্বরূপকে আরূঢ় দেখিতে পারাই প্রকৃত রথদর্শন। তাহা হইলে, প্রতি পদবিক্ষেপে নারায়ণের রথরজ্জু আকর্ষণ করিবার যে অনন্ত সুখ ভক্ত হিন্দুগণ অনুভব করেন, সকলেই সেই সুখ আস্বাদন করিতে পারেন।

আমার দেহে কেবল আমি লীলা করি না; 'বাহিরে যেমন, আমার ছায়া সর্ব্বদাই আমার অনুগমন করিতেছে, আমার ভিতরেও হৃদয়-মনের অন্তরতম পর্দ্দার অভ্যন্তরে, সেই চৈতন্যময় দেবতার বরণীয় ছায়া নিত্য আমার জীবনের অবলম্বন হইয়া রহিয়াছে, ইহা জানিতে পারিলে আর জীবলীলার উদ্দেশ্যের সফলতার বাকী কি রহিল?

প্রতি কুসুমে, প্রতি নয়নে, প্রতি খদ্যোতে, প্রতি জ্যোতিষ্কে, প্রতি প্রিয়তমের মুখারবৃন্দে, যদি সেই চৈতন্যের বরণীয় রূপজ্যোতি তরঙ্গায়িত হয়, তবে আমার এই চক্ষু সফল হইল মনে করিব বৈ কি! চক্ষু যদি চক্ষুর চক্ষু যিনি, তাঁহার ঈসারা বুঝিতে না পারিল,—শ্রবণ যদি শ্রোতের শ্রোত্র যিনি, তাঁহার কণ্ঠধ্বনি চিনিতে না পারিল, মন যদি মনের মনকে বুঝিয়া উঠিতে না পারিল, বচন যদি সেই বাক্যের বাক্যকে ব্যক্ত করিতে না পারিল, প্রাণ যদি প্রাণের ভিতর প্রাণনাথকে জড়াইয়া ধরিতে না পারিল, তবে এই জড়দেহ ধারণ করিয়া, কেবল ভূতের বোঝা বহন করাই হইল মাত্র। তাহা না হইলে জীবচৈতন্যের মধ্যে অব্যক্ত নিত্য চৈতন্যের লীলা সন্দর্শন করিয়া, চৈতন্যদেবের ন্যায় কি করিয়া বলিব,—

"কানু পরশমণি-হার আমার!
নয়ন ভূষণ সে রূপ দরশন;
কর্ণের ভূষণ সে নাম শ্রবণ;

বদন ভূষণ সে গুণ কীর্ত্তন ;
হস্তের ভূষণ সে পাদ সেবন।
আমার ভূষণের কি আর বাকী আছে ?
কাণু পরশমণি-হার প'রেছি গলে।"

অনেক ভক্তের এই প্রকার কথা শুনা যায় যে, ধ্যানস্থ হইয়া পূজা করিতে করিতে নিজেরই মাথায় ফুল, বিল্বদল দিয়াছেন। কেহবা জীবদেহের ব্যক্ত চৈতন্যের মধ্যে অব্যক্ত চৈতন্যের লীলা পরিদর্শন করিয়া, নিজের বা অন্য জীবের মুখে দেবতার ভোগের সামগ্রী অর্পণ করিয়াছেন। কোন কোন সাধক ব্রহ্মাগ্নি ব্রহ্মহবি বলিতে বলিতে, স্বীয় মুখে অন্ন অর্পণ করেন। ক্ষুধা ও পিপাসার ভিতর দিয়াও ব্রহ্ম উপলব্ধি করিবার কথা উপনিষদের মধ্যে রহিয়াছে। মুসলমান উপাসকগণ উপাসনাকালে কর্ণে হস্ত আচ্ছাদন করিয়া, সম্ভবতঃ দেহাভ্যন্তরে শোণিত-সঞ্চালনের গুর্ গুর্ শব্দ মধ্যে ব্রহ্মনাদের প্রতিধ্বনি শ্রবণ করেন। উপনিষদেও এই ভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত আছে। সেই এক নিত্য অব্যক্ত চৈতন্য সর্ব্বঘটে ব্যক্ত হইয়া লীলা করিতেছেন। আমরা কেহ ইহা দেখিয়াও দেখি না,—শুনিয়াও শুনি না,—বুঝিয়াও বুঝি না,—মনে করিয়াও রাখি না। কেবল ব্রহ্ম-কোলাহল করি ও হরি-বোল বলি। কি মোহ।

ঈশোপনিষদ্ বলিতেছেন, "একো মোহঃ, কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।" ৭।

সেই চৈতন্যময় আমার সঙ্গে যুক্ত হইয়া লীলা করিতেছেন,—আমার জীবনের প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে তিনিই, সুখ দুঃখের মধ্যে, ভাল মন্দর মধ্যে, হাসি কান্নার মধ্যে, ঐশ্বর্য্য ও দারিদ্র্যের মধ্যে,—সম্পদে ও বিপদে, জীবনে ও মরণে, ইহলোকে পরলোকে, তিনি ও আমি, এক হইয়া লীলা করিতেছি, ভাবিলে, আমার এই ক্ষণ-ভঙ্গুর তরঙ্গময় জীবন সেই অনন্ত লহরীলীলার অন্তর্গত হইয়া উঠে, আমার নশ্বরত্ব অমরত্ব লাভ করে,—আমার বার্দ্ধক্য-সম্ভাবনা নিত্য-যৌবনে পরিণত হয়,—তখন আমি দুঃখের ভিতরে সুখ,—রোগের ভিতর আরোগ্য,—দুর্ব্বলতার মধ্যে বল,—দারিদ্র্যের মধ্যে ঐশ্বর্য্য,—অন্ধকারের মধ্যে আলোক,—মৃত্যুর মধ্যে অমৃত এবং অসত্যের মধ্যে সত্য লাভ করি। তখন আমি দেখি যে, ব্যক্তে ও অব্যক্তে এক অবিভক্ত, অনন্ত সরল রেখা হইয়া, বিশ্বে বিশ্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। অন্তরে বাহিরে, নিকটে দূরে, উর্দ্ধে অধোতে, সকলেরই মধ্যে তিনি এবং তাঁহারই মধ্যে সকলি। আমার জীবনে তিনি ও তাহাতে আমার জীবন! তবে আর এ

জীবনের সফলতার অভাব সম্ভাবনা কোথায়?

তাঁহার জ্ঞান ও স্মৃতিতে জীবনের সফলতা। অতএব, বিস্মৃতি ও অজ্ঞানই জীবনের বিফলতা। সেই জন্যই মহাপ্রাণ নানক বলিয়াছেন,—"আঁখা জীবা। বিসরে মর্‌জানা।"

আমরা কখন কেমন, হঠাৎ বিদ্যুৎ-প্রকাশের মত, সেই অব্যক্ত, অখণ্ড, অনন্ত, সৎ, চিৎ, এবং আনন্দময়-সাগরের সুদূরশ্রুত লহরী-নির্ঘোষ শ্রবণ করি।

কেঠোপনিষদ্ বলিতেছেন, "সেই ব্রহ্মের প্রকাশ এই যে, বিদ্যুৎপ্রকাশ তাহারই ন্যায়; দেবতাদের সমীপে ব্রহ্মের এই প্রকাশ চক্ষুর নিমিষের ন্যায়।"২১।

আমাদের মন সংস্কারের ইন্দ্রিয়সুখে অত্যন্ত লিপ্ত এবং বিত্তোপার্জ্জনের মোহে সম্মোহিত,—

"ন সাম্পরায় প্রতিভাতি বালম্।
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্॥
অয়ং লোক নাস্তি পর ইতি মানী।
পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতেমে।"—কঠোপনিষৎ ২।৬।

যম নচিকেতাকে বলিতেছেন যে, "চিত্তহীন ও ধনমোহে আচ্ছন্ন অবিবেকীর নিকট পরলোকের প্রয়োজনীয় উপায় প্রকাশ হয় না। কেবল এই লোকই আছে, পরলোকই নাই, এই প্রকার ভাবিয়া সে পুনঃ পুনঃ আমার (যমের) অধীন হয়।" আমরা চিত্তের সংযম করিতে না পারিলেই, মোহ আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করে এবং যম আমাদের জীবনকে অধিকার করে। যমের উপরোক্ত উপদেশের মধ্যে যমের হাত এড়াইবার উপায়, দর্শিত হইতেছে, কারণ যে প্রকার ভাবে জীবনযাপন করিলে, যমের অধীন হইতে হয়, তাহার ঠিক বিপরীত পথে চলিলেই যমের হাত এড়ান যায়।

যমের অধীন হওয়াই জীবনের চূড়ান্ত বিফলতা। যাঁহার জীবন সফল, তিনি মৃত্যুঞ্জয়! তিনি শিবত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনি মদনকে ভস্ম করিয়া ও রিপুরূপ হলাহলকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া, সে "মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, যার কাছেতে যম ঘেঁসে না।" সেই খানে বসিয়া, বিশ্বময় একই চৈতন্যের লীলাক্ষেত্র বুঝিয়া, মহাদেবের ন্যায় "বম্, বম্" করিয়া, নীরবে শেয়ান হাসি হাসিতে থাকেন। রামপ্রসাদের মত তিনি বলিতে পারেন, "তোরে ডরাই না শমন।"

ভয় জীবনের বিফলতার চিহ্ন। অভয় সিদ্ধি ও সফলতার চিহ্ন। যে জীবনে

সিদ্ধি ও সফলতা আছে, সেখানে ভয় কোথায়? যে জীবনে ভয় আছে, সে জীবনে সিদ্ধি ও সফলতা কোথায়?

মানুষ চার-ঘোড়ার গাড়ীতেই চড়ুক বা পদব্রজেই পৃথিবীকে ধূধায় ধূসরিত করুক, বিদ্যাবুদ্ধিতে গৌরবান্বিতই হউক বা নিরক্ষর নীরেট মূর্খই হউক,—বাহ্যিক জীবনে মানবের যতই বিভিন্নতা দেখা যাউক, কোনপ্রকার বাহ্যিক লক্ষণের দ্বারাই জীবনের সফলতা ও বিফলতা নির্দ্ধারণ করা যায় না, যতক্ষণ না জানা যায় যে বাহ্য জীবনের চঞ্চলতার মধ্যে, অন্তর্গত জীবনের ভিতরে, সে একটী নিরাপদ অভয়পদ লাভ করিয়াছে কি না?

চিন্তাহীন ব্যক্তিগণ বাহ্যজীবনের চাকচিক্য, শোভা দেখিয়া—উচ্চহাস্য শ্রবণ করিয়া, মনে করে যে, এইখানেই বুঝি জীবনের সফলতা!

হায়! হায়! কি ভ্রম! কি মোহ! আমরা সংসারমোহের মধ্যে থাকিয়া, সর্ব্বদাই ভুলিয়া যাই যে, "যাহা চক্ চক্ করে, তাহাই সুবর্ণ নহে।" মানব-জীবনের সফলতার পরিমাণ করিতে হইলে, দেখিতে হইবে যে, জীবনের মূলাধারে সুষুপ্ত, অনন্তকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া, তিনি অভয়ধামের কতটা অধিকারী হইয়াছেন। যে ব্যক্তির মনের মধ্যে ভয়, সন্দেহ ও মোহ রহিয়াছে, তাহা জীবনের সফলতা কোথায়? যতক্ষণ না আত্মা নিজের চিরবিশ্রাম স্থান খুঁজিয়া পায়, ততক্ষণ, সুখ, শান্তি, সম্পদ, সিদ্ধি ও সফলতা কোথায়? পরমপূজ্য, প্রিয় ও স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের "শান্তিনিকেতন ছাড়ি কোথা শান্তি পাবে বল?" যিনি যে অবস্থাতেই থাকুন, তাহাতে কিছু যায় আসে না, কেবলমাত্র জীবনের মূল সত্যটী বুঝিলেই হইল।

কবি ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল এই সত্যটীর আভাস পাইয়া চিরজীবী হইয়াছেন। তিনি গাহিয়াছেন, "আমি জানি না, চিনি না, বুঝি না তোমারে, তথাপি তোমারে চাই; আমি সজ্ঞানে অজ্ঞানে, পরাণের টানে,—তোমা পানে ছুটে যাই।"

ধর্ম্ম সাধনই কর, পরোপকার ব্রতাচরণ কর,—আর বিদ্যা, যশ, ধন যতই উপার্জ্জন কর না কেন, জীবনের মূলতত্ত্বে উপনীত হইয়া, মরণের মিথ্যা বিভীষিকাময় মুখোস খুলিয়া ফেলিতে না পারিলে, জীবলীলার সফলতা হয় না,—সিদ্ধি ও অভয়-লাভ করা যায় না, অসত্যের "মুণ্ডমালার দাঁত খিঁচুনির" ভিতরে সত্যময়ী অভয়ার তিমিরহারিণী, দন্তরুচিকৌমুদীর আভাস লাভ করিতে না পারিলে জীবনের সফলতা হয় না।

তখনই, আমার জীবন সফল, যখন আমার জীবন তাঁহার হইয়াছে এবং তাঁহার জীবন আমার হইয়াছে, এবং আমাদের উভয়ের জীবন এক হইয়াছে,—যখন, তিনি অনন্ত আমি হইয়া, আমির ভিতরে লীলা করিতেছেন,—আমার সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া চলিতেছেন, ফিরিতেছেন, নাচিতেছেন, গাহিতেছেন এবং কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতেছেন। যখন তিনি আমার জীবনের অংশীদার এবং আমি তাঁহার জীবনের অংশীদার, যখন আমি তাঁহার বিশ্বরাজ্যের অনন্ত সুখ এবং ঐশ্বর্য্যের অংশীদার ও উত্তরাধিকারী, তখন আমার চক্ষে সার্থ পরার্থ এবং পরার্থ স্বার্থ এক, তখন দেখি যে, বহু একেতে এবং এক বহুতে পরিণত,—না হিন্দু, না মুসলমান, না বৌদ্ধ না খ্রীষ্টান ; যাহা কিছু আছে, সকলই তাঁহাতে এবং তিনিই সকলেতে,—যাহা কিছু হইয়াছে, সেই একই তিনিরূপ উপকরণ হইতে নির্ম্মিত, ভেদ:কেবল নামে ও রূপে। যেমন এক মৃত্তিকা হইতে অশেষ মৃণ্ময়পাত্র হইতে পারে, কিন্তু সকলেই সেই মৃত্তিকা,—একই ধাতু হইতে নানা অলঙ্কার হইতে পারে, কিন্তু ধাতু এক—উপকরণ এক।

জীবন সফলতার নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে, দুঃখ ও সুখে,—বিষ্ঠা ও চন্দনে, প্রজা ও রাজায়, চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণে, কোনই পার্থক্য বোধ হয় না।

সীতার বিবাহ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়।

(১)

ঋষিকোপানলে পতিত হইবার ভয়ে বিশ্বামিত্রের করে শ্রীরামলক্ষ্মণকে সঁপিয়া দিয়া এদিকে নৃপতিশ্রেষ্ঠ দশরথ চিন্তাক্লিষ্ট মনে কালযাপন করিতেছেন, ওদিকে ঋষিরা তপোবলে দুরন্ত তাড়কারাক্ষসী কুমারদিগের পরাক্রমে সমূলে বিনষ্ট হইল।

তাড়কার ভয়ে বনবাসী তপস্বিগণ সে কালে বড়ই বিব্রত ছিলেন। তাহার উৎপাতে তাঁহারা কোনও মাঙ্গলিক কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন না।

যখনই উচ্চ সুমধুর মন্ত্রধ্বনির সহিত তাঁহাদের হোমশিখা বিমান স্পর্শ করিত, তখনই সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী চারিদিক কম্পিত করিয়া আসিয়া লক্ লক্ জিহ্বা প্রসারণপূর্ব্বক সানুচর তাঁহাদিগের সম্মুখে দাঁড়াইত ও এক হুঙ্কারে সব পণ্ড করিয়া দিত, দেবতার বরে ঋষিদের কোপানল তাহাকে স্পর্শও করিতে পারিত না, যজ্ঞাদির দ্বারা তপস্বিগণ তাহার কোনরূপ অনিষ্ট করিবেন, তাহার সে আশঙ্কাও ছিল না; কারণ সে কখনও কাহাকেও যজ্ঞানুষ্ঠানের কিছুমাত্র সুবিধা দিত না। এই সব কারণে ঋষিদের লাঞ্ছনার একশেষ হইয়াছিল। আজ এ হেন শত্রুর নিপাতে তপস্বিসমাজে এক মহা আনন্দ রোল উঠিল।

রাক্ষস নিধনান্তর রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন বনের ঋষিগণ আসিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকে প্রাণখুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সে দিন কাননের পশুপক্ষীরাও নানাবিধ আনন্দধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। ঋষিগণ স্ব স্ব আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলে, বিশ্বামিত্র কুমারযুগলকে পূত বারি সিক্ত করিয়া এক অপূর্ব্ব রক্ষামন্ত্র প্রদান করিলেন, সেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কুমারযুগল নবজীবন অনুভব করিলেন, তাঁহাদের রণশ্রম ও কায়িক ব্যথা বেদনা এক মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া গেল। কোথা হইতে অপূর্ব্ব বল ও দুর্দ্দমনীয় শক্তিরাশি আসিয়া যেন তাঁহাদিগকে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তেজোদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল।

কুমারযুগল সেই দিবস-রাত্রি মহর্ষির আশ্রমেই অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে ঋষিবরের চরণবন্দনা করিলে মহর্ষি কহিলেন, "বৎস তোমাদিগকে যে জন্য আনয়ন করিয়াছিলাম, সে কার্য্য তো সম্পন্ন হইল; সম্প্রতি আর এক ব্যাপার উপস্থিত। মিথিলাতে রাজর্ষি জনক এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই যজ্ঞান্তে সমবেত ব্যক্তিবর্গ এক অপূর্ব্ব ধনু ভঙ্গ করিবার জন্য আহূত হইবেন। রাজর্ষি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যিনি সেই ধনু ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তিনি তাঁহার করে তাঁহার অপূর্ব্ব রূপগুণ সম্পন্না কন্যা সীতাকে সমর্পণ করিবেন। আমার ইচ্ছা তোমাদিগকে লইয়া একবার মিথিলার সেই ব্যাপার খানা দেখিয়া আসি। শুনিয়াছি—পৃথিবীর বীরাগ্রগণ্য রাজগণও ধনু ভঙ্গ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন; ভঙ্গ করা দূরে থাক্, তাহাতে জ্যারোপনও করিতে পারেন নাই। তাদৃশ ধনুতে শক্তি পরীক্ষা করা তোমাদের ন্যায় ক্ষত্রিয় যুবকের কর্ত্তব্য কার্য্য। যদি অভিমত হয়, আমার সঙ্গে অদ্যই তথায় গমন করিতে পার।"

ঋষিবরের কথা শুনিয়া কুমার দ্বয় বিনীতভাবে তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ঋষিবর সেই দিনই তাঁহাদিগকে লইয়া মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহাদিগকে নানা সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখাইয়া নানা গল্প বলিতে লাগিলেন। কত দেশ, কত নদনদী, কত গিরিশৃঙ্গ ও প্রান্তরাদি অতিক্রান্ত হইতে লাগিল। কত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প তাহাদিগের সঙ্গে একত্র গাঁথা—সে সব দেখাইয়া তিনি তাঁহাদিগকে কত বৃত্তান্ত বিদিত করিতে লাগিলেন, শুনিয়া কুমার-যুগল আর একটুও পথের কষ্ট অনুভব করিবার অবকাশ পাইলেন না। যথা-সময়ে তাঁহারা রাজর্ষি জনকের রাজধানীতে উপনীত হইলেন।

(২)

জনকরাজপুরে আজ মহা-আনন্দধ্বনি উঠিয়াছে। চারিদিকে মঙ্গল বাদ্য, চারিদিকে নহবত ও চারিদিকে সানাই, কাঁসর প্রভৃতি বাজিতেছে। মিথিলার গৃহে গৃহে আজ পুষ্পচন্দন ও সুদৃশ্য বৃক্ষ পল্লবের শোভা! মঙ্গল শঙ্খের নিনাদে আকাশ পাতাল প্রতিধ্বনিত হইতেছে। রাজর্ষির যজ্ঞক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে, এইবার স্বয়ম্বর সভার অধিবেশন—লোকের মনে আর আনন্দের সীমা নাই। সীতার পরিণয় সম্ভাবনায় আজ মিথিলার লোক আনন্দোন্মত্ত।

রাজর্ষি জনক নিঃসন্তান ছিলেন। একদা ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে দেবতার কৃপায় হঠাৎ যজ্ঞভূমিতে এক কন্যারত্ন প্রাপ্ত হন। নিঃসন্তান ঋষি-হৃদয়ের সঞ্চিত সমস্ত অপত্যস্নেহ দিয়া সেই কন্যাকে পালন করেন—সেই কন্যাই সীতা। সীতার পরে রাজর্ষির পত্নী এক কন্যারত্ন প্রসব করেন, তাঁহার নাম উর্ম্মিলা। কিন্তু ঔরসজাতা উর্ম্মিলাকে লাভ করিয়াও জনক ঋষি সীতাকে ভুলিতে পারিলেন না। একে নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাপ্তা, তাহাতে আবার সীতার রূপ গুণ ও স্বভাবের তুলনা নাই—রাজর্ষি দিবারাত্রি কেবল সীতার শুভাশুভই চিন্তা করিতেন। এই অতিরিক্ত চিন্তার ফলে রাজর্ষি আপনাকে এক বড় মহাবিপদে জড়িত করিলেন।

রাজর্ষি ভাবিয়াছিলেন, সীতাকে এমন কোনও পাত্রে সমর্পণ করিবেন, যাঁহার তুল্য বীর পৃথিবীতে আর আবির্ভূত হন নাই। তেমন বীরকে পরীক্ষা করিয়া বাহির করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। এজন্য রাজর্ষি মনে মনে এক অপূর্ব্ব কৌশলও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পুরাকালে পরশুরাম একখানা অপূর্ব্ব শক্তি-সম্পন্ন হরদত্ত ধনু তাঁহাকে প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। সে ধনুখানি

এমন বিশাল যে, দেবগণও সহজে উহা উত্তোলন করিতে পারিতেন না। রাজর্ষি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যিনি এই ধনুখানি ভগ্ন করিতে পারিবেন—তাহাকেই তিনি সীতা সমর্পণ করিবেন—অপর কাহাকেও নহে। কিন্তু মহর্ষির এই প্রতিজ্ঞায় আজ এক মহাশঙ্কটের সূত্রপাত হইয়াছে। নানারূপ চেষ্টা উদ্যোগ ও ঘোষণাপ্রেরণাদি দ্বারাও সেরূপ বীর কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। সীতার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য ও গুণাবলীর কথা শুনিয়া নানাদেশ হইতে নানালোক বীরত্বের পরীক্ষা দিতে আসিতেছেন বটে, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতেছেন না। দেখিয়া শুনিয়া রাজর্ষি এবার এক নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন।

যজ্ঞাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে নানাদেশ হইতে নানা মহৎ মহৎ ব্যক্তির আগমন হয়, রাজর্ষি তাই বুদ্ধি করিয়া আজ এই বিরাট যজ্ঞকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। রাজর্ষির মনের ভাব—এই বিরাট জনতার মধ্যে কেহ না কেহ অবশ্যই হরধনুখানি ভঙ্গ করিতে পারিবেন। সেই উদ্দেশ্যে যজ্ঞ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আজ জনক ঋষি সসম্ভ্রমে সকলকে আহ্বান করিয়া সয়ম্বর সভায় লইয়া গেলেন। কত দেশ হইতে কত রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র সেনাপতি, সেনাধ্যক্ষ আসিয়াছেন। রাজকুমারীর রূপের ব্যাখ্যা সকলেই শুনিয়াছেন, সকলেই অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য আজ প্রস্তুত! রাজর্ষির অনুরোধে তাঁহারা একে একে সয়ম্বর সভায় গমন করিতে লাগিলেন।

রাজবাড়ীর অনতি দূরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বৃহৎ সয়ম্বর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার সুবিশাল চূড়া শত সহস্র পতাকাদি বিভূষিত হইয়া অত্যুচ্চে গগনপটে ন্যস্ত হইয়াছে। সেই পতাকাগুলি সমীরণ ভরে পৎ পৎ করিয়া উড়িতেছে—যেন নীল জলধি বক্ষে আলস্য ত্যাগান্তে মস্তক উত্তোলন করিয়া নাগশ্রেষ্ঠ সহস্র ফণা বিস্তারপূর্ব্বক গর্জ্জিতেছে।

গৃহমধ্যে সভার অঙ্গনে শত সহস্র আসন-মালা। সেই আসন গুলিও চারিদিকের নানা কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভরাজি বেষ্টন করিয়া অসংখ্য সুরভি পুষ্পমাল্য ইতস্ততঃ দুলিতেছে। গৃহপ্রাঙ্গন অপূর্ব্ব রজতাস্তরণে মণ্ডিত, সেই রজতাস্তরণ অগুরু চন্দন এবং কুঙ্কুমে সিক্ত ও রঞ্জিত হইয়াছে।

নিমন্ত্রিত আগন্তুকগণ একে একে যাইয়া সেই সভাগৃহে আসনগ্রহণ পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। রাজর্ষির পৌরজনবর্গ পাদ্যার্ঘ দ্বারা দ্বারদেশে তাঁহাদিগের

অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাদের গলদেশেও অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব কুসুমহার ন্যস্ত হইতে লাগিল।

সভাগৃহের একপার্শ্বে দর্শকগণের জন্যও একটী প্রশস্ত স্থান রক্ষিত হইয়াছিল। মিথিলাবাসী কৌতুক দর্শনার্থীগণ এবং ঋষিসমাজ যাইয়া সেই স্থান অধিকার করিলেন। রাজপুরীর পরিচারিকাবৃন্দ এবং মিথিলার নাগরিক পত্নীগণও সেই অংশেই একটী স্বতন্ত্র রক্ষিত স্থানে আসন পাইলেন। সভার মধ্যস্থলে একটী বৃত্তাকৃতি চিহ্নিত অংশে সেই বিশাল হরধনু শোভা পাইতে লাগিল।

সমবেত আগন্তুকগণের দৃষ্টি সেই হরধনুর দিকে;—সকলেই বিস্মিত হইয়া সেই বিশাল ধনুখানির প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। আশঙ্কায় ও উদ্বেগে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহাদের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। কি বিশাল ধনু। একদিকে অপার সৌভাগ্য ও অপরদিকে অপার লাঞ্ছনার কারণ— এই ধনুখানির মধ্যে লিপ্ত আছে। কে জানে কাহার ভাগ্যে কি উঠিবে? দুদণ্ড পরেই যার যার ভাগ্যাভাগ্য পরীক্ষিত হইবে! বীরগণ অধর দংশন পূর্ব্বক অধীরভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ তোরণমঞ্চে নহবৎ বিপুল গর্জ্জনে বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডপ মধ্যে বিশাল ঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হইল। দূরে রাজপুরী হইতেও সেই সময় উচ্চ হুলুধ্বনি উঠিল। একখানি পট্টবস্ত্র ও কাষায় অঙ্গাবরণ পরিধান করিয়া রাজর্ষি জনক ধীর গম্ভীরভাবে মণ্ডপদ্বার হইতে সেইসময়ে বৃত্তাঙ্কিত অংশে ধনুখানির নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন।

নানা আনন্দধ্বনি ও অঙ্গসঞ্চালনে মুখরিত সভাখানি হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

বকুলকুমারী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল,

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

তীর্থযাত্রা।

ঐ পরামর্শের পর তিন সপ্তাহ অতিবাহিত। একদিন বৈকালে পাড়ার পাঁচটী স্ত্রীলোক রামজীবন বাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে আসিলেন; কথায় কথায় তাঁহারা বলিলেন, অমাবস্যার পর শুক্লপক্ষে একটী শুভদিন দেখিয়া তাঁহারা বৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। গৃহিণী বলিলেন, "তীর্থ-দর্শনে যাবে, শুভ কর্ম্ম, ইহা তো আহ্লাদের কথা।"

প্রতিবাসিনীদের সঙ্গে গৃহিণীর যখন ঐ কথা হয়, অন্তরালে থাকিয়া সুকুমারী ও পদ্মাবতী তাহা শুনিয়াছিল; সুকুমারী ভাবিয়াছিল, উত্তম সুযোগ; এই-সুযোগেই তাহার মনোবাসনা সিদ্ধ হইতে পারিবে। প্রতিবাসিনীরা চলিয়া যাইবার পর রাত্রিকালে গৃহিণীর নিকটে গমন করিয়া, আগ্রহ জানাইয়া, সুকুমারী বলিল, "মা, বৃন্দাবন দেখ্‌তে আমার বড় সাধ; ওঁরা সব যাবেন, সেই সঙ্গে আমারও যাবার ইচ্ছা।"

চিন্তা করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "এ বছর নয়, এ বছর অকাল, অকালে তীর্থ যাত্রার ফল হয় না; আর বছর আমরা সব যাবো, সেই সঙ্গে তুমিও যাবে।"

মুখখানি কাঁচুমাচু করিয়া সুকুমারী বলিল, "আমার তো সে রকম যাওয়া নয়, তীর্থের কোন কাজও আমায় কোত্তে হবে না, কেবল ঠাকুরগুলি দেখে আস্‌বো; তাতে আর কালাকাল কি? তোমার পায়ে পড়ি মা,—বাবাকে বোলে তুমি আমার ঐ সঙ্গে পাঠিয়ে দাও!"

কথা যখন হয়, নিতম্বিনী হঠাৎ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত। সুকুমারীর শেষ কথাগুলি নিতম্বিনী শুনিতে পাইয়াছিল, মনে মনে হাসিয়াছিল; জননীর ও সুকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া নিতম্বিনী বলিল, "সদু বৃন্দাবন যাবে, মনে হয়েছে, যেতে চাচ্ছে, তাতে আর বাধা দিতে নাই। দেখ মা, তুমি বাধা দিও না, সৎকার্য্যে বাধা দিলে পাপ হয়। পাঁচ জনের সঙ্গে যাবে, পাঁচ জনের সঙ্গে চোলে আস্‌বে, তাতে আর ভয় কি?"

উল্লাসিত নয়নে সৌদামিনী আড়ে আড়ে নিতম্বিনীর মুখপানে চাহিল; সে দৃষ্টিপাতের অর্থ নিতম্বিনী বুঝিল, আরো অধিক ব্যগ্রতা জানাইয়া জিদ্‌ করিয়া,

জননীর অনুমতি চাহিয়া লইল, সৌদামিনীর আনন্দের আর সীমা রহিল না।

সৌদামিনীর বৃন্দাবন যাত্রার অভিলাষ গৃহিণীর মুখে রামজীবন বাবু শুনিলেন, অনেক তর্কবিতর্কের পর ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে অনুমতি প্রদান করিলেন। পরদিন জননীর মুখে সেই কথা শুনিয়া নিতম্বিনীর আহ্লাদ হইল, সৌদামিনীর মুখে আর হাসি ধরিল না।

নিশাযোগে সুকুমারীর সঙ্গে পদ্মাবতীর পরামর্শ। নিতম্বিনীর সহায়তা, কর্ত্তার অনুমতি, সমস্তই অনুকূল। সৌদামিনী বলিল, "পদ্মা! এখন তো সব ঠিক্ ঠাক্, দিনও নিকট হ'য়ে এলো, সত্য সত্য তুই আমার সঙ্গে যাবি কি?

পদ্মা। তোমার সঙ্গে ঘর ছেড়ে এসেছি, তোমার সঙ্গে পরের বাড়ীতে রয়েছি, তোমার দুঃখে অনেক দুঃখ ভোগ করেছি, তোমার সুখের সম্ভাবনায় আমিও সুখী হব, বুকের ভিতর সে আশাও ধরেছি, কেন যাব না? কখনই আমি তোমার সঙ্গ ছাড়্‌বো না, অচেনা লোকের সঙ্গে একলাও তোমায় ছেড়ে দিব না, অবিশ্যি যাব; কিন্তু ভাই, তোমার মুখে তীর্থযাত্রার কথা শুনে অবধি আমি একটা ভাব্‌ছি।

সৌদা। কি ভাব্‌না আবার?

পদ্মা। (হাসিয়া) ভাব্‌চি এই যে, তুমি তো যাচ্ছ তোমার বরের সঙ্গে মিলন কোত্তে, আমি যাবো কি সুখের আশায়?

সৌদা। (হাসিয়া করতালি দিয়া) ঠিক্ ঠিক্ ঠিক! বেশ বোলেচিস্! একটা সুখের আশা চাই বটে! তা তোরও আশা বিফল হবে না।

পদ্মাবতীর গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িয়া সৌদামিনীসুন্দরী হাসিয়া আকুল। পদ্মাবতীও খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিতে লাগিল। হাস্যের অবসানে ভিন্ন ভিন্ন শয্যায় উভয়ে নিদ্রাগত, সুখনিদ্রায় সুখযামিনী সুপ্রভাত।

তীর্থযাত্রার দিন নিকট হইয়া আসিল, যাত্রীরা শুভ-যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল, সৌদামিনীও প্রস্তুত। এইখানে বলা উচিত, কোন্নগর হইতে আসিয়া সৌদামিনী বেহালে ছিল, গৃহিণীর অনুরোধে রামজীবন বাবু তাহাকে একছড়া হার আর দুগাছি বালা গড়াইয়া দিয়াছিলেন; তীর্থস্থানে পায়ে পায়ে চোর ফেরে, কে কোথা দিয়া চুরি করিয়া লইবে, সেই আশঙ্কার ছল করিয়া সৌদামিনী সেই দুখানি গহনা গৃহিণীর নিকটে গচ্ছিত রাখিল; প্রফুল্লবদনে বলিল, "যখন ফিরে আস্‌বো, তখন আবার দিও।"

যাত্রার দিন সমাগত। সৌদামিনীর ও মোক্ষদার পাথেয় বলিয়া রামজীবন বাবু পঞ্চাশটী টাকা দিলেন, প্রতিবেশিনীগণের সহিত সৌদামিনী ও মোক্ষদার বৃন্দাবনধামে যাত্রা করিল। বিদায়ের সময় গৃহিণী, নিতম্বিনী ও সৌদামিনীর চক্ষে জল পড়িল।

গীত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মিত্র।

বাউলের সুর।

ও ভোলা মন কর্‌না তুই হরি নাম সার।
আর কিছুতেই ঘুচবেনা তোর ভবের হাহাকার॥
প্রেমিক ভক্তগণে বসালে এই নামের হাটবাজার,
যদি এই বাজারের নিতে পারিস কেনাবেচার ভার;
ঘুচে যাবে তোর পোড়া দশা, কাঁদ্‌তে হবেনা আর॥
এই নামেতে নদের গোরা, কেঁদে কেঁদে হত সারা,
প্রহার খেয়ে প্রেম বিলাত, জগাই মাধাই কর্‌ত হাহাকার;
আবার সোণার অঙ্গ লুটাইত ধূলায় অনিবার,
সে আপনি মেতে লোক মাতাত, সবাই দেখে হত চমৎকার॥
দেখ ভক্ত যীশু তরালে কত, এই নামেতে পাপী দুরাচার,
সে ক্রুশোপরি প্রাণ ত্যজিল, লয়ে বিষম ভার;
নামের ভেলায় চোড়ে রে তুই তোল ভক্তির পাল,
প্রেমের জুয়ার হান্‌লে পরে, সুখে হবি পার॥

রামপ্রসাদী সুর।

বল্ মা তোরে কে জান্‌তে পারে।
যে কাতর প্রাণে ডাকে তোরে, তুই কি থাক্‌তে পারিস ছেড়ে তারে।
সে দীনের দীন হয়ে পায়ে ধরে, সব গেলেও ছাড়ে না তোরে॥
বিষয় মদে মত্ত যারা, ঘোরে সদাই ভবঘোরে;
তারা বিষের জ্বালায় জ্বলে মরে দেখ্‌তে পায় না মা তোমারে॥
অনন্তরূপিণী তুমি, কে তোমারে জান্‌তে পারে;
সরল শিশুর মতন, ডাকে, যে জন, তুমি কোলে তুলে নাও মা তারে॥
সংসার যার শ্মশান হয়েছে, ভাই বন্ধু সবাই গিয়েছে,
সে হতাশ হয়ে কাঁদ্‌লে পরে, আয় আয় বলে ডাকিস্ তারে॥

সমালোচনা।

ভক্তের জয়।—দ্বিতীয় উল্লাস শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বিরচিত, মূল্য এক টাকা।

প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয় একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, "ভক্তের জয়—ভক্তের জয়,—ভক্ত বড়—ভক্ত বড়।" সেই ভূমিকার এই ধুয়া। ভক্তের ভক্তি, ভক্তির ভগবান, ইহাই ভূমিকার উপসংহার। পুস্তক পাঠের অগ্রে ভূমিকাটি পাঠ করিলেই ভক্তিরসে হৃদয় দ্রবীভূত হয়। ভক্ত বড়, ইহা নূতন কথা নহে, ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমার অপেক্ষা আমার ভক্ত বড়; যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাহারাই আমার অধিক প্রিয়।" পণ্ডিত বলাইচাঁদ গোস্বামী এই তত্ত্বটি বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতেই মধুরতা বৃদ্ধি হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ভক্তি-তত্ত্বপ্রবর্ত্তক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া আমাদের ভক্তিভাজন হইয়াছেন। এই দ্বিতীয় উল্লাসে একা-

দশটি ভক্তের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। গৌরচন্দ্র, জগবন্ধুমহাপাত্র, গোবিন্দদাস, গীতাপণ্ডা, শান্তোবা জগন্নাথ দাস, গঙ্গাধর দাস, মণিদাস, রামবেহারা, নারায়ণ দাস এবং বালিগ্রাম দাস।

এই উল্লাসের প্রথম ভক্ত গৌরচন্দ্র, আমাদের মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নহেন, ইনি একটি ধর্ম্মশীল রাজার ভগ্নীপুত্র। গল্পটি এইরূপ যে, সেতবন্ধ রামেশ্বরে ধর্ম্মরাজ নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন। তাঁহার একটি মাত্র পুত্র; সেই পুত্রের নাম রামেশ্বর। রাজা ধর্ম্মরাজ লোক-সংসারে সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকার্য্যে ব্রতী ছিলেন, তিনি রামেশ্বরদেবের পরম ভক্ত। একদা রামেশ্বর দর্শনার্থ বহুসংখ্যক সাধু সন্ন্যাসী মন্দির সমীপে সমুপস্থিত হন, জনতা নিবারণার্থে মন্দিরের প্রহরিরা তাঁহাদিগকে বেত্রাঘাত করে, সেই বেত্রাঘাতে একজন রুগ্ন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর মৃত্যু হয়। তৎক্ষণাৎ মন্দিরের দ্বাররুদ্ধ হইয়া যায়; পূজা ভোগ সমস্তই বন্ধ। সেই রাত্রে রাজা ধর্ম্মরাজ স্বপ্ন দেখেন, রামেশ্বরদেব তাঁহাকে বলিতেছেন, তুমি রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখ না, তোমার দোষে তোমার নির্দ্দয় শান্তিরক্ষকেরা একজন সন্ন্যাসীর প্রাণবধ করিয়াছে। তুমি যদি তোমার মন্দির সম্মুখে তোমার পুত্রকে শূলে চড়াইয়া বধ করিতে পার, তবেই এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে; নতুবা তোমার শান্তি থাকিবে না, তোমার বংশে আর কেহ রাজা হইতে পারিবে না।” রাজা জাগরিত হইয়া মহিষীকে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত বলেন, পতি পত্নী উভয়েই সর্ব্বনাশ গণিয়া রোদন করিতে থাকেন, সেই সময় রাজার এক ভগ্নী সেইখানে আসিয়া, বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজাকে প্রবোধ দিয়া বলেন, সংসার অনিত্য, সমস্তই মায়া; সে মায়া ত্যাগ করিয়া রামেশ্বর দেবের প্রত্যাদেশ পালন করা তোমার কর্ত্তব্য। নিজের পুত্রকে শূলে দিতে যদি তুমি কাতর হও, আমার পুত্র গৌরচন্দ্র, তাহাকেই শূলে চাপাইয়া দেবতার প্রিয়কার্য্য সাধন কর।

গৌরচন্দ্র জননীর সঙ্গেই আসিয়াছিলেন, ভক্তিভাবে গদগদ হইয়া তিনি সহাস্যবদনে শূলে চাপিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। ভগবান রামেশ্বর তাঁহাকে বাঁচাইয়া ধর্ম্মরাজের সিংহাসনে আরোপিত করিলেন, ধর্ম্মরাজ হৃষ্টচিত্তে গৌরচন্দ্রের আজ্ঞাবহ হইয়া রহিলেন। পরিণামে তাঁহাদের সকলেরই বিষ্ণুলোকে গতি হইল।

অপর দশটি ভক্তের ভক্তিরও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বৈচিত্র আছে। গীতাপণ্ডার ভক্তির বিশেষ বৈচিত্র পাঠ করিতে করিতে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়। তিনি উৎকলের একজন ভিক্ষাজীবী দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ভগবদ্গীতার প্রীতি তাঁহার অকপট

ভক্তি ছিল, সুস্বরে ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় প্রত্যহ কীর্ত্তন না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। একদিন কোথাও ভিক্ষা মিলে নাই, স্ত্রী ও পুত্রকন্যা উপবাসী, তিনি কিন্তু ভগবদ্গীতার সরাস্বাদনে উন্মত্ত। তাঁহার পত্নী সাশ্রুনয়নে নিকটে গিয়া বলিলেন, "গীতা পড়িয়া কি হইবে, ক্ষুধায় কাতর হইয়া পুত্রকন্যা কাঁদিতেছে, অন্ন সংগ্রহের চেষ্টা কর।"

গীতাভক্ত বলিয়া লোকে সেই ব্রাহ্মণকে গীতাপণ্ডা বলিত। পত্নীর কথা শুনিয়া তিনি গীতার পুঁথি হইতে ভগবানের মহিমাসূচক একটি শ্লোক পড়াইয়া শুনাইলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন, "ওসব মিথ্যা কথা। অন্যযুগে ও সব ছিল, কলি যুগে নাই।" গীতাপণ্ডা বলিলেন, "যদি মিথ্যা বলিয়া বুঝিয়াছ, তবে এই গীতার পাতাটা ছিঁড়িয়া ফেলিতে পার?" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "তালপাতার পুঁথি ছিঁড়িয়া ফেলিতে কতক্ষণ?" এই বলিয়া তিনি একখণ্ড লৌহ শলাকা দ্বারা সেই শ্লোকের তিনটি স্থান ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

অল্পক্ষণ পরে একটি পরমসুন্দর গোপবালক একভার খাদ্যসামগ্রী ও বিবিধ রত্ন আনয়ন করিয়া ব্রাহ্মণীকে দিল। আশ্চর্য্যজ্ঞান করিয়া সেই গোপবালককে কিছু আহার করিতে বলিলেন, বালক বলিল, "আমার রসনা ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, আহার করিবার সাধ্য নাই।"

বালক চলিয়া গেল; ব্রাহ্মণীর মুখে বৃত্তান্ত শুনিয়া, গীতাপণ্ডা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে (স্ত্রীকে) সঙ্গে লইয়া জগন্নাথদেবের মন্দিরে ধাবিত হইলেন; মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, ভগবানের শ্রীমুখ হইতে ত্রিধারা রক্তপাত হইতেছে। আকুলকণ্ঠে গীতাপণ্ডা ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "তুমি গীতার শ্লোকের তিনটি স্থান ছিঁড়িয়াছিলে, সেইজন্য ভগবানের বদনে রুধিরধারা।" বলিতে বলিতে পতি-পত্নী সেই স্থানে লুণ্ঠিত হইয়া স্বরোদনে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, ঠাকুরের মুখের রুধিরধারা অদৃশ্য হইল।

এইরূপ বিচিত্র ভক্তির উদাহরণে এই গ্রন্থখানি সুসজ্জিত হইয়াছে। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর ভাষা অমৃতবর্ষিণী, সেই অমৃত রসের সহিত ভক্তিরসের লহরী সংযোগে ইহা আরও উপাদেয় হইয়াছে। উদাহরণগুলি ভক্তিপিপাসু পাঠকবৃন্দের হৃদয়স্পর্শী হইবে, সন্দেহ নাই। এতৎপাঠে আমরা পরমপ্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি। তৃতীয় উল্লাস দর্শনাশায় আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৯শ বর্ষ। | ১৩১৮ সাল, মাঘ। | ১০ম সংখ্যা।

আয়ুর্ব্বেদে বৈশ্যের স্থান।

লেখক, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস,

প্রকৃত বৈশ্য যিনি, তিনি শাস্ত্রমতে বৈশ্য পিতা এবং বৈশ্য-মাতা হইতে সমুদ্ভূত, এবং বাণিজ্য, কৃষি, পশুপালন, কুসীদাদি ইহার বৃত্তি; ভূতির্দত্ত, গুপ্ত, বসু কিম্বা ধনবাচক যে কোন শব্দ ইহার উপাধি।

মনু বলিয়াছেন, "মণিমুক্তা, প্রবাল, লৌহ, বস্ত্র, কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য, লবণাদি রস প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যের ভালমন্দ, গুণাগুণ এবং কোন্ কোন্ দেশে কোন্ সময়ে তাহাদিগের মূল্যের উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ থাকে, এ সমস্ত সংবাদ তাঁহার পরিজ্ঞাত হওয়া চাই।

মণিমুক্তা প্রবালানাঃ লোহানাংতান্তবস্য চ।
গন্ধনাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদ্যাদর্ঘ বলাবলম্॥

মেধাতিথি বলেন, "লৌহ বলিতে এখানে তাম্র, লৌহ, কাংসাদি মনে করিতে হইবে।

লোহ শব্দেন তাম্রায়স্কাংস্যাগ্যাহ।

কল্লুকভট্ট বলেন, মণি প্রভৃতির অর্থ মণিমুক্তা বিক্রম লৌহ, তান্তব শব্দের অর্থ বস্ত্র, গন্ধ শব্দের অর্থ কর্পূরাদি, রসশব্দের অর্থ লবণাদি আর বিদ্যাদর্ঘ বলাবল শব্দের অর্থ এই সকল দ্রব্যের গুণাগুণ এবং কোন্ কোন্ দেশে কখন কিরূপ অধিক বা অল্প দরে ইহার ক্রয় বিক্রয় হইতেছে, তাহারও সংবাদ রাখা বৈশ্যের উচিত।

সুতরাং বলিতে হইবে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ীর যাহা করা উচিত বৈশ্যের পক্ষে তাহাই করণীয়।

এ ছাড়া আমরা মনুসংহিতা হইতে ইহাদিগের সমাচরিত বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের আর একটি কথা জানিতে পারি, যাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে, আপৎকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইহাদিগের জন্য পূর্ব্বোক্ত নিরূপিত বৃত্তির মধ্যে কোন ব্যবসায় গ্রহণ করিলেও, তন্তুনির্ম্মিত পট্ট বস্ত্র, শন নির্ম্মিত বস্ত্র, পশমী বা রেশমী বস্ত্র, এবং ফলমূল বা গুড়ূচ্যাদি ওষধির ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। এ ব্যবসায় বৈশ্যদিগের "একচেটিয়া"।

ইদন্তু বৃত্তি বৈকল্যাত্ত্যজতো ধর্ম্মনৈপুণম্।
বিটপণ্যমুদ্ধৃতো দ্বারং বিক্রেয়ং বিত্তবর্দ্ধনম্॥
সর্ব্বান্রসানপোহিত কৃতান্নঞ্চ তিলৈঃ সহ।
অশ্মনো লবণঞ্চৈ পশবোযে চ মনুষ্যাঃ॥
সর্ব্বঞ্চ তান্তবং রক্তং শাণক্ষৌমাবিকানিবা।
অপি চেৎস্যুর রক্তানি ফলমূলে তথৌষধীঃ॥

কল্লুকভট্ট ওষধি শব্দের অর্থ করিয়াছেন, গুরুচ্যাদি।

বৈশ্যগন উল্লিখিত বস্ত্রাদি ছাড়া ওষধিও বিক্রয় করিতেন, এবং কেবল যে স্বদেশে তাঁহাদিগের ক্রয়ালয় ছিল, তাহা নহে, মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ে ৯০ শ্লোকধৃত বণিকপথম্ শব্দের ব্যাখ্যায় কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন, "বণিক পথং স্থলজলাদিনা বাণিজ্যম।" তাহা হইতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি, বৈশ্য বণিকগণ তাঁহাদের বৃত্তিনির্দ্দিষ্ট দ্রব্যাদি লইয়া স্থলপথে এবং সমুদ্রপথে বহু দূর ব্যাপিয়া

দেশ বিদেশে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন।

মনুসংহিতায় ৮ম অধ্যায় ১৫৯ শ্লোকে "সমুদ্রযানকুশলাঃ" শব্দটি তাঁহাদিগের সমুদ্রপথে ব্যবসায়ের পরিচায়ক।

ঔষধাদির ব্যবসায় তাঁহাদের একচেটিয়া ছিল, সুতরাং কেহ কেহ মনে করেন, "মহর্ষি পুনর্ব্বসু বৃত্ত্যর্থং বৈশ্যৈঃ" এই উপদেশের অর্থ বৃত্ত্যর্থং ঔষধাদি বিক্রয় রূপ ব্যবসায়। ইহার অর্থ চিকিৎসা নহে, অর্থাৎ আধুনিক গন্ধবণিকদের মত তাঁহারা ঔষধাদি উপকরণ গুড়ূচ্যাদি উদ্ভিজ্জ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে আপন আপন ক্রয়ালয়ে কেহ কেহ যেমন বিক্রয় করিতেন, তেমনি বিদেশেও এই সকল ঔষধ লইয়া গিয়া (সমুদ্রপথেই হউক বা স্থলপথেই হউক,) তাহা বিক্রয় করিয়া আসিতেন। প্রাচীন মিশর, প্রাচীন গ্রীশ প্রভৃতি দেশে যে ভারতবর্ষীয় ঔষধ সকল চিকিৎসার্থ ব্যবহৃত হইত, আমাদের মনে হয়, একমাত্র এই বৈশ্যজাতির নিকট তাঁহারা এ বিষয়ে ঋণী।

গীত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মিত্র।

খাম্বাজ—একতালা।

মা আমার আনন্দময়ী, কেন নিরানন্দ হইব।
মুখপানে চেয়ে আমি সকল ভার বহিব॥
ভবের বোঝা মাথায় লয়ে, মায়ের আজ্ঞাধীন হয়ে,
সকলপ্রকার দুঃখ আমি সহিব, দেখ্‌ব কে কি কোত্তে পারে।
মায়ের নামের ডঙ্কা মেরে, সকল শত্রু জয় করে,
প্রেমানন্দে হাসিব।
বেড়াব মায়ের আঁচল ধরে, নাচিব মায়ের নাম করে,
হেসে খেলে আমি বেড়াব অভয়পদ বুকে রেখে,
শ্রীমুখের হাসি হেরে, মা মা বলে মায়ের কোলে উঠিব॥

সরস্বতী।



পদ্মাসনা।

সারদে বরদে শুভে, দেবী সরস্বতি !
শুভ্র জ্যোতি, শুভ্র কান্তি, শুভ্র শতদল—
পাদপীঠ ; শুভ্র হংস চরণকমলে ;
শ্বেতাঙ্গিনী, সর্ব্বরূপা, সরোজ-বাসিনী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম, বামে হেলা চূড়া,
নীলাম্বরা, মণিমুক্তা-ভূষণ-ভূষিতা,
বীণাযন্ত্র করে ধরা, সহাস্য আননা,
নৃত্যগীত বিনোদিনী, দেবী বাগীশ্বরী।
বেদান্ত বেদাঙ্গবিদ্যা, শ্রীমুখপঙ্কে—
স্তরে স্তরে শোভা ধরি চিরবিরাজিতা।
মা তোমারে আরাধিতে মানসে বাসনা—
নিরন্তর ফুল্লমুখী ভক্তের হৃদয়ে,
কল্পনায় আসে রূপ, সেই রূপপ্রভা—
আলো করে দশদিশি, নিত্যানন্দময়ী।
শিশুকালে বাগ্‌দেবি, তুয়া কৃপাবলে,
ফুটে থাকে রসনায় আধ আধ বাণী ;
তুমি মা বচনেশ্বরী, প্রসাদে তোমার—
ত্রিলোকের বাকশক্তি বিখ্যাত ত্রিলোকে।
তব কৃপা না থাকিলে বিশ্বচরাচরে—
সবাই রহিত দেবি, স্তম্ভ সম মূক ;

কথা কহিবার শক্তি, বক্তৃতাকৌশল,
লেখাপড়া শিক্ষা হয় তোমারি কৃপায়।
গুরুস্থানে বাল্যাবধি পেয়ে উপদেশ,
হৃদয়ে পবিত্র রূপ নিয়ত নেহারি;
নিত্য নিত্য পূজা করি চিত্ত উপচারে,
ভক্তি পুষ্প, ভক্তিবারি, ভকতি-চন্দন—
আনন্দে শ্রীপদে নিত্য করি সমর্পণ;
আনন্দদায়িনী সদা, তুমি হরিপ্রিয়ে।
করি বটে নিত্যপূজা,—মানসমন্দিরে,
তথাপি সংসার-রীতি, বর্ষে একবার—
বাসন্তী-পঞ্চমী-তিথি এ বসন্তকালে,
(শ্রীপঞ্চমী নাম যার পণ্ডিতের মুখে।)
ভারতে তোমার পূজা হয়েছে প্রচার;
ভারতে ভারতী খ্যাতা তুমি মা ভারতি!
এই শ্রীপঞ্চমী দিনে তব পদাম্বুজে
সমর্পিব ভক্তিসহ কুসুম অঞ্জলি।
আহরিব যবশীর্ষ, রসাল, মুকুল,
বিকশিত পুষ্প সহ মিশাব আবির,
পড়িব তোমার স্তব, যতটুকু জ্ঞান—
লভিয়াছি দিনে দিনে শ্রীপদ প্রসাদে,
স্তবিয়া ও রাঙাপায় দিব পুষ্পাঞ্জলি।
নমঃস্তুতে নমঃস্তুতে দেবি সরস্বতি
নতশিরে তব পদে করি মা প্রণতি।

বঙ্গকুমারী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল,

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীবৃন্দাবন।

পূর্ব্বকথিত যাত্রিদল যথাসময়ে শ্রীবৃন্দাবনে পৌছিল, একজন ব্রজবাসীর সুপ্রশস্ত কুঞ্জে বাসা লইল। এক রাত্রি বাসের পর সেই ব্রজবাসীর সঙ্গে গিয়াতাহারা গিরিগোবর্দ্ধন, কেলিকুঞ্জ, বংশীবট, যমুনাতীরস্থ বিরামঘাট, কেশীঘাট,ধীরসমীর ঘাট, দানঘাট, নিধুবন, নিকুঞ্জবন, স্বর্ণতাল ও অপরাপর দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন করিল। বৃন্দাবন মধ্যে মদনমোহন, গোবিন্দজী ও গোপীনাথজী প্রধান বিগ্রহ, তদ্ভিন্ন কুঞ্জে কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিগ্রহ বিরাজমান; প্রায় সকলেরি এক একটি কুঞ্জ আছে। পাইকপাড়ার লালাবাবুর কুঞ্জ একটি শ্রেষ্ঠ কুঞ্জ বলিয়া বিখ্যাত; তথায় যাত্রীলোকের জন্য সদাব্রত আছে; বীরভূম জেলার হেতমপুরের রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর প্রতিষ্ঠিত "মুরলী কুঞ্জ" অপ্রসিদ্ধ নহে; যাত্রীরা একে একে সমস্ত কুঞ্জ দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইল।

যাঁহারা সমস্ত বন পরিভ্রমণ করিবেন, তাঁহাদের কিছু দীর্ঘকাল তথায় বাস করা আবশ্যক, সুকুমারী ততদিন সেখানে বাস করিবার ইচ্ছা করিল না, শীঘ্র শীঘ্র গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিবার জন্য তাহার মন চঞ্চল, গোপনে পদ্মাবতীর সহিত পরামর্শ।

দুই সপ্তাহ বাস করিয়া সুকুমারী পদ্মাকে বলিল, "বৃন্দাবনে যাহা দেখিবার, তাহা তো দেখা হইল, আর কেন এখানে বিলম্ব করা? যাহাদের সঙ্গে এসেছি, তাহারা তো মথুরা, পৈরাগ ও কাশী দর্শন করিয়া বাড়ীতে ফিরিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে থাকিতে আমার মন সরে না।"

পদ্মা বলিল, "মন সরে না বোল্‌চো, তা তো বুঝ্‌তে পাচ্চি, কিন্তু নিঃসঙ্গ হয়ে কেমন কোরেই বা চোলে যাই? পথ ঘাট চিনি না, দুজনেই আমরা নূতন, কি প্রকারে এ স্থান ত্যাগ করা যায়? বিশেষতঃ যাঁরা আমাদের সঙ্গিনী, তাঁদের না বোলে চোলে যাওয়া দোষের কথা, বোলতে গেলেই বা তাঁরা যেতে দিবেন কেন? আমি তো কিছুই সদুপায় দেখ্‌চি না।"

অন্যমনস্ক হইয়া সুকুমারী বলিল, "সে কথাও ঠিক বটে, আমার মন কিন্তু

কোন বাধা মান্‌তে চায় না; উপায় কি করি? দেখা যাক্, ভগবানের মনে কি আছে।

পরামর্শে পরামর্শে, চিন্তায় চিন্তায় আরো দুটী দিন দুটী রাত্রি গত হইয়া গেল, একটা সুবিধা হইল। তৃতীয় দিবসের অপরাহ্ণে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী যাত্রীর মধ্যে দুটী স্ত্রীলোক যমুনাতীরে বসিয়া কথা কহিতেছিলেন, বেড়াইতে বেড়াইতে পদ্মাবতীর সহিত সুকুমারী হঠাৎ সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল। যাঁহারা যুক্তি করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "আমি পূর্ব্বে আসিয়া দুইবার মথুরা, পৈরাগ দেখিয়া গিয়াছি, কাশী দেখা হয় নাই, আমাদের সঙ্গিনীরা মথুরা, পৈরাগ না দেখিয়া কোথাও যাইবে না, আমি কিন্তু অগ্রে কাশীধামে যেতে চাই।"

তাঁহার সঙ্গিনী বলিলেন, "আমারও সেই ইচ্ছা; মথুরা, পৈরাগ আমারও দেখা আছে, চল, তবে আমরা দুজনে কাশীতেই আগে যাই, অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর দর্শন কোরে অম্‌নি অম্‌নি দেশে ফিরে যাব।"

সুকুমারী সুযোগ পাইল; আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিল, "আমাদের দুজনকে নিয়ে যাবে? আমি কখনও কাশী দেখিনি, বিদেশে বেশী দিন থাকৃতেও আমার মন চায় না; তোমাদের সঙ্গে কাশী যেতে আমার ইচ্ছা হোচ্চে; নিয়ে যাবে কি? সেইখান থেকেই তোমাদের সঙ্গে কল্‌কেতায় ফিরে যাব, এই আমার মনের কথা।"

যাঁহারা কাশী যাইবার পরামর্শ করিতেছিলেন, সুকুমারীর প্রতি তাঁহাদের স্নেহ জন্মিয়াছিল; একজন বলিলেন, "তাতে আর আমাদের আপত্তি কি? আগে আমাদের পরামর্শ স্থির হোক্, যাবার দিন তোমরা আমাদের সঙ্গে যেতে পার্‌বে। তুমি বেশ শিষ্ট শান্ত মেয়ে, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে আমাদের কোন ভয় হবে না।

সুকুমারীর আনন্দ হইল। সেই দিন রাত্রিযোগে সেই পাঁচটী যাত্রী একসঙ্গে বসিয়া পরামর্শ করিলেন, যমুনাতীরে যে কথা হইয়াছিল, সেই কথা উঠিল। যে তিনটী যাত্রী বনপ্রদক্ষিণ করিবার অভিলাষিণী,—মথুরা, প্রয়াগ দর্শনে অনুরাগিনী, তাঁহারা আপাততঃ বৃন্দাবনে থাকিলেন, বাকী দুই জন আপনাদের সংকল্পানুসারে কাশীধামে যাইবেন, সর্ব্বসম্মতিতে ইহাই স্থির হইল; সুকুমারী ও পদ্মা কাশীযাত্রীদের সঙ্গিনী হইবে, তাহাও সর্ব্ববাদীসম্মত।

যে রাত্রের পরামর্শ তাহার তিন দিন পরে পূর্ব্বকথিত স্ত্রীলোক দুটীর সহিত সুকুমারী ও পদ্মাবতী কাশীধামে যাত্রা করিল।

কাশীতে উপস্থিত হইয়া চারিজনে এক সঙ্গেই রহিল। কাশীতে বাসাবাড়ী খুব সস্তা, চারিজনে স্বতন্ত্র একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিতে লাগিল। মণিকর্ণিকায় স্নান, অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর দর্শন, বেণীমাধবের ধ্বজা দর্শন, তাঁহাদের নিত্যকার্য্য হইল। বিশ্বেশ্বরধামে শিবলিঙ্গ অসংখ্য, অন্যান্য দেববিগ্রহও অসংখ্য। কোন্নগর ও কলিকাতার বাহিরে কি কি আছে, সুকুমারী তাহা জানিত না, বৃন্দাবনের ঠাকুরগুলি দর্শন করিয়া তাহার আশ্চর্য্য জ্ঞান হইয়াছিল, বারাণসী-ধামের দেবমূর্ত্তি সমাবেশের মহাঘটা,—বৃন্দাবন অপেক্ষা কাশী অধিক গুল্‌জার; পঞ্চক্রোশী কাশীপুরী দর্শন করিয়া সুকুমারীর আরো অধিক আশ্চর্য্য বোধ হইল।

অন্নপূর্ণারমন্দিরে, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ও বাঙ্গালিটোলার প্রত্যেক পল্লীতে প্রত্যেক গলিতে বিশ্বনাথের ষাঁড়ের অসম্ভব ভিড়; দীর্ঘ দীর্ঘ শৃঙ্গ বিশিষ্ট স্থূলা-কার বৃহৎ বৃহৎ ষাঁড়, দেখিলেই ভয় হয়; ষাঁড়েরা কিন্তু কাহাকেও কিছু বলে না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকবালিকারাও ষাঁড়ের পায়ের নীচে দিয়া গলিয়া যায়, শিং ধরিয়া খেলা করে, নির্ভয়ে ষাঁড়ের মুখে বিল্বপত্র তুলিয়া দেয়। এদিকে তো এই; পথে পথে ষাঁড়ের মেলা। ওদিকে দুর্গা-বাড়ীতে লক্ষ লক্ষ বানর; বানরেরা যাত্রী দেখিলে চমৎকার রঙ্গ করে; যাহারা পক্ক রম্ভা, ছোলাভাজা অথবা কচুরি ফুলুরি বিতরণ করে, বানরেরা তাহাদের কাছে বেশ পোষ মানিয়া থাকে, যাহারা কিছু খাইতে দেয় না, দাঁত খিঁচাইয়া তাহাদের তাড়া করে, আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া কাপড় ছিঁড়িয়া দেয়; সেই রঙ্গ দেখিয়া সুকুমারীর বড় কৌতুক হইয়াছিল, যত্নপূর্ব্বক ষাঁড়গুলিকে ও বানরগুলিকে আহার দিতে ভুলিত না। বৃন্দাবনের যমুনাজলে যেমন কচ্ছপের উপদ্রব, কাশীর গঙ্গায় সেরূপ কচ্ছপ নাই, কিন্তু স্থলপথে ষাঁড়-বানরের আধিপত্য।

কাশীপুরীতে ষাঁড়-বানরের মেলা, ভাগীরথীর পরপারে রামনগরে গাধার মেলা। সদ্য মোক্ষ দিবার সঙ্কল্পে বেদব্যাস ঐ রামনগরে নূতন কাশী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ধ্যানে বসিয়াছিলেন, গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন:—

"আমারে কাশীতে, না দিল রহিতে,
ভূতনাথ কাশীবাসী।
সেই অভিমানে, আমি এইখানে,
করিব দ্বিতীয় কাশী॥"

ব্যাসদেবের সংকল্প ছিল এইরূপ, কিন্তু অন্নপূর্ণার ছলনায় বিপরীত হইয়াছে। ভগবতীর পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া ব্যাসদেব নিজমুখে বলিয়াছিলেন, "গর্দ্দভ হইবে বুড়ী এখানে মরিলে।" সেই কারণেই ব্যাসকাশীতে গাধা বেশী।

সুকুমারী নিত্য নিত্য ঠাকুর দেখিয়া বেড়ায়, কিন্তু মন টানে অন্য দিকে। দশ দিন কাশীবাস করিয়া সুকুমারী একদিন পদ্মাকে বলিল, "আর কেন, বিশ্বনাথ মাথায় থাকুন, এখানে আর আমি বেশী দিন থাকিতে পারিব না; যেস্থানে যাইবার জন্য কলিকাতার আশ্রয় পরিত্যাগ, সন্ধান করিয়া সেইখানে যাই চল। বাসায় কিন্তু বলা হইবে না, অপর লোকের কাছে সন্ধান জানো, বিন্ধ্যাচল কোন্ দিকে কোন্ পথে যেতে হয় জিজ্ঞাসা কর।"

পদ্মাবতী গোপনে সন্ধান জানিয়া আসিল, একদিন ভোরে উঠিয়া অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া উভয়ে কাশী হইতে পলায়ন করিল।

---:o:---

পরমায়ুঃ পরমৌষধ।

লেখক—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

(১)

অনেকদিনের কথা—হাওড়া জেলার একটী মাত্র মহকুমা, তখন মহিষরাখাতে ছিল, উলুবেড়িয়ায় উঠিয়া আইসে নাই। শীতের শেষাশেষি, জেলার ও মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেটরা মফঃস্বলে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান, যে দিন যেখানে থাকেন, সেই দিন সেখানে মামলা-মোকর্দ্দমা করেন, এ নিয়ম ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভাবধিই চলিয়া আসিতেছে।

এক বৎসর গুড্ ফ্রাইডের ছুটিতে মহিষরাখার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রূপনারায়ণ নদীর তীরবর্ত্তী পাণিত্রাস গ্রামে যাইবার হুকুম জারি করিয়া তথায় যাত্রা করিয়াছেন, আমলারাও তথায় নৌকাযোগে রওনা হইয়াছেন, কেবল কোর্ট সব ইনস্পেক্টর নিজ প্রয়োজন বশতঃ তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারেন নাই; তিনি মহিষরাখার বাসায় আহারাদি করিয়া অপরাহ্নকালে একটী কনষ্টেবল সঙ্গে

কটকরোডের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে বাঘবান থানায় বসিয়া গল্পসল্প করিতে করিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল থানার সব ইনস্পেক্টর কোর্টবাবুকে রাত্রিতে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কাজের চাপ বলিয়া কোর্টবাবু সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না, তবে একটীমাত্র কনষ্টেবল সম্বলে কটকরোডের উপর দিয়া গ্রামান্তরে যাওয়া সর্ব্বতোভাবে নিরাপদ নহে ভাবিয়া, থানা হইতে দুইজন চৌকিদার লইয়া শ্রীদুর্গা স্মরণে তিনি থানা হইতে উঠিলেন। শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীর রাত্রি, প্রায় সমস্ত রাত্রিই জ্যোৎস্না,—গ্রাম, পল্লী, গাছপালা সমস্তই ধপ্ ধপ্ করিতেছে, দক্ষিণ দিক হইতে ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে, সেই বাতাসে গাছের পাতা কাঁপিতেছে, পুষ্করিণীর জলে ঢেউ খেলিতেছে, কটকরোডের উপর দিয়া যে দু'একখানি গরুর গাড়ী গতায়াত করিতেছে গাড়ীর চাকার শব্দ হইতেছে, কোন কোন গাড়োয়ান মোটা গলায় গান ধরিয়াছে, এক একবার হাতের ছড়িতে গরুকে পীড়া দিতেছে। কোর্টবাবু সেই পথে এক জন কনষ্টেবল ও দুইজন চৌকিদার সঙ্গে লইয়া পায়ে তেরিটি-বাজারেব জুতায় মশ্ মশ্ শব্দ তুলিয়া পশ্চিম মুখে চলিয়া যাইতেছেন,—কনষ্টেবল দেখিয়া গাড়োয়ানেরা গান বন্ধ করিতেছে। পথের অনতিদূরে একটী প্রাচীন পুষ্করিণী, পাড়ে দুই একটী বাবলাগাছ হীরকখণ্ডের ন্যায় খদ্যোতিকা শ্রেণীর মধ্যে কোনটা নিভিতেছে, কোনটা জ্বলিতেছে, কোর্টবাবুর দৃষ্টি সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যে আকৃষ্ট হইয়াছে; এমন সময় একটী অনতিউচ্চ শব্দ তাঁহার শ্রুতিস্পর্শ করিল, শব্দ শুনিয়া তাঁহার গতিরোধ হইল. তিনি স্থিরভাবে দুই এক মিনিট থাকিয়া আবার চলিতে লাগিলেন,—আবার দাঁড়াইলেন। সমভিব্যাহারী কনষ্টেবল হিন্দুস্থানী, সে বাঙ্গালীকে ভীরু বলিয়া বেশ জানে, মধ্যে মধ্যে তাহার গতিরোধ দেখিয়া বলিল, "ও কিছু নয়,—চলুন।"

কোর্ট। কি বল দেখি?

কন। একটা শব্দ শুন্‌চি বটে—পাখীটাখীর হবে।

কোর্ট। রাত্রিকালে পাখী?

কন। রাত্রিতে কি পাখী ডাকে না?

কোর্ট। ডাকিলেও এটা কিন্তু পাখীর শব্দ নয়, লোচন সিং! (কনষ্টেবলের নাম লোচন সিং)

কোর্টবাবু থামিয়া রহিলেন, তখন আবার শব্দ হইল, বেশ বুঝা গেল—

নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীর ভিতর হইতে সেই শব্দ আসিতেছে। সকলেই পুষ্করিণীর অনতি উচ্চ পাড়ে উঠিয়া দেখিতে পাইলেন,—একটা নরদেহ পড়িয়া রহিয়াছে; তাহার একটু দূরে দুইটা শৃগাল ছিল তাঁহাদিগকে দেখিয়া সরিয়া গেল।

কোর্টবাবু ভাবিলেন—মরা মানুষটা ভূতে পাইল না কি? লোচন সিংকে বলিলেন, "ব্যাপারটা কি বল দেখি লোচন? অনেকক্ষণ ত আর সেরূপ শব্দ শুনা যাচ্চে না।"

লোচন। সে সব কিছু নয়, শব্দটা অন্য কোথা হচ্ছিল।

কোট। এখন হয় না কেন? আমরা একটু দূরে গিয়া বসি চল।

লোচনসিং একটু বিরক্ত হইল, সে সমস্ত দিন চারিটী চানা চিবাইয়া কাটাইয়াছে, পাণিত্রাসে গিয়া কোন গৃহস্থ গৃহে পৌছিলে সে কিছু আহার না করিয়া থাকিতে পারিবে না, বিনাপয়সায় চাউল রুটী মিলিবে। যাহা হউক লোচন কোন উত্তর না করিয়া কোটবাবুর অনুবর্ত্তী হইল, তাহার কিছু দূরে বাবু একটী ঝোঁপের আড়ালে বসিলেন। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতে না থাকিতে শৃগাল দুইটা নাচিতে নাচিতে সেই নরদেহের অতি নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র পূর্ব্ববৎ শব্দ হইল। তখন কোর্ট সব ইনস্পেক্টর নলিনীবাবু বুঝিতে পারিলেন, পূর্ব্বোক্ত নরদেহে প্রাণ আছে, নিকটস্থ হইয়া তাহাই প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চৌকীদার দুজনকে হাঁক মারিতে বলিলেন—তাহারা দুজনে জোড়া হাঁক হাঁকিল। পল্লীগ্রামের চৌকিদারের জোড়াহাঁকে গ্রামে পুলিশাগমন সূচিত হয়, দুএকটা হাঁকেই নিকটস্থ গ্রামের চৌকিদারদের উত্তর মিলিল, অবিলম্বে তাহারা নিকটে আসিয়া জুটিল। দুই চারিজন করিয়া পনর ষোলজন লোক একত্র হইল, জনশূন্য নিস্তব্ধস্থান জন-সঙ্কুল হইল। নরদেহ উলঙ্গ কিন্তু নিকটে একখানি কালাপেড়ে কাপড় পড়িয়া ছিল, তাহা দেখিয়া ধরাতলশায়ী সেই দেহের সামাজিক অবস্থার উপলব্ধি হইল। সে ব্যক্তি ভদ্রসন্তান বলিয়া জানা গেল। নলিনীরঞ্জনের আজ্ঞামাত্র একখানি চারপাই প্রস্তুত হইল। পুষ্করিণীর জলে মুমূর্ষু যুবকের দেহ ধৌত করিয়া দেওয়া হইল। তাহার পরে দেখা গেল, যুবক জীবিত,—ধীরে ধীরে তাহাকে চারপায়ায় স্থাপিত করা হইল, নলিনী আপন উড়ানিখানি দিয়া তাঁহার লজ্জানিবারণের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, পকেট হইতে কাগজ ও পেন্সিল বাহির করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী একখানি গ্রামের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে লিখিয়া দিলেন, তিনি এই মুমূর্ষু যুবকের যত্ন লয়েন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। আর প্রভাতে

পাণিত্রাসের ক্যাম্পে তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া পাঠান। নলিনী ইহার বেশী কিছু করিতে পারিলেন না বলিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন, কি করিবেন—তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, না যাইলে তাহা সম্পন্ন হইবে না। অগত্যা মুমূর্ষু যুবককে চৌকিদারের হাতে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে পাণিত্রাস যাইতে হইল।

(২)

মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া গ্রামের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে বি, এন, রেলের সৃষ্টি হয় নাই, সুতরাং পাশ-কুড়ায় রেলওয়ে ষ্টেশনও ছিল না। তাহার নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীতে দেবী-প্রসাদ রায় নামে একজন ক্ষুদ্র জমীদার ছিলেন, তেজারতিতে তাহার অনেক টাকা খাটিত, চাসের জমিও অনেক ছিল, সে অঞ্চলে দেবীপ্রসাদের নামডাক খুববড়; পার্শ্ববর্ত্তী দশ বারখানি গ্রামের লোক তাঁহার বশীভূত—সংসারে তাঁহার একমাত্র পুত্র নকুলেশ্বর—আর তিনটী কন্যা। নকুলেশ্বরকে চাকরী করিতে হয়—এমন অবস্থা নয়, কিন্তু আজিকালিকার শিক্ষিত যুবকের চাকরী একটী ঐশ্বর্য্য,—মনুষ্যদেহ ধারণে যদি চাকরী না করা হয়, তবে যেন কিছুই হইল না, জীবনটাই ব্যর্থ বলিয়া তাঁহাদের মনে হয়, তাই নকুলেশ্বর কলিকাতার একটী আফিসে আশী টাকা বেতনে চাকরী করিতেন, চাকরীর টাকা বাড়ীতে আসিত না, কলিকাতার টাকা কলিকাতাতেই খরচ হইত, তবে কখন কখন দুই চারিখানি ছবি দুই চারি শিশি সুগন্ধি তৈল কিনিবার জন্য সংসারের খাতায় খরচ পড়িত না। নকুলেশ্বরের সবে মাত্র একটী পুত্র জন্মিয়াছে, তাহার অন্ন-প্রাশন দিবার সময় উপস্থিত, ছুটী না পাইলে নকুলেশ্বরের বাড়ী আসা ঘটে না, বলিয়া তাঁহার পিতা দেবীপ্রসাদ গুড ফ্রাইডের ছুটীর মধ্যে পৌত্রের অন্নপ্রাশনের দিন স্থির করিয়া পুত্রকে বাড়ী আসিতে পত্র লিখিয়াছেন; গুডফ্রাইডের দিন বেলা ১২টার সময় তাহার বাড়ী আসিবার কথা। তৎকালে পাঁশকুড়ার পথে রেল না বসিলেও কাটাখাল (কেনাল) দিয়া ষ্টীমার যাতায়াত করিত, পাঁশকুড়া অঞ্চলের লোকে কলিকাতা হইতে নৌকায় কিম্বা ষ্টীমারে আসিত যাইত। ষ্টীমার আসিবার সময় বুঝিয়া দেবীপ্রসাদ ষ্টীমার ঘাটে লোক পাঠাইয়াছিলেন, সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, নকুলেশ্বর আসেন নাই। পিতার মনে ভাবনা হইল—পুত্রের নিশ্চয় আসিবার কথা,—কলিকাতা হইতে নকুল অন্নপ্রাশনের জিনিষপত্র কিনিয়া পাঠাইয়াছেন, চৌধুরীদের পুণ্ডরীক তাহার প্রাণের বন্ধু, সে তাহার

সঙ্গে আসিবে,—সেও আসে নাই, পরদিন অন্নপ্রাশন। দেবীপ্রসাদ অবস্থাপন্ন, একমাত্র পুত্র নকুলেশ্বরের প্রথম পুত্রের অন্নপ্রাশন—দশখানা গ্রামের ছোট বড় আবাল বৃদ্ধ বনিতা, ভূরিভোজনে পরিতুষ্ট হইবে, তাহার আয়োজন হইতেছে, দূরদেশ হইতে কুলগুরু আসিয়াছেন, কুটম্ব সজ্জনে বাড়ী পূরিয়া গিয়াছে, আজি দুই দিন নহবং রোশনচৌকি বাজিতেছে। গরীব দুঃখীর আনন্দের সীমা নাই, দেবীপ্রসাদ প্রত্যেক কাঙ্গালীকে লুচিমণ্ডা পেট পূরিয়া খাওয়াইবেন, একখানি করিয়া বস্ত্র ও নগদ চারি আনা বিলাইবেন। শিশুর পিতা বাড়ী আসিলেন না, দেবীপ্রসাদের একমাত্র পুত্র বাড়ী আসিতেছেন না, ক্রমে একথা এ কাণ সে কাণ করিয়া গ্রামে গ্রামান্তরে পৌছিল। সকলেরই হরিষে বিষাদ জন্মিল। দেবীপ্রসাদ কলিকাতায় লোক পাঠাইলেন, উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় সমস্ত দিন গেল, নকুলেশ্বরের কোন খবর পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার পর গ্রামে কাণাঘুষা হইতে লাগিল,—নকুলেশ্বর কলিকাতার পথে আসিতে আসিতে বিসূচিকা রোগে মারা গিয়াছেন, তাঁহার বন্ধু পুণ্ডরীকাক্ষ চৌধুরী সঙ্গে ছিলেন, তিনি বাড়ী আসিয়া একথা প্রচার করিয়াছেন। পল্লীগ্রামে এরূপ সংবাদ সকলের কাণে উঠিতে বড় বেশী বিলম্ব হয় না। সহর মফঃস্বল কোথাও পরশুভদ্বেষীর অভাব নাই। কেহ কখন হয় ত দেবীপ্রসাদের নিকট ঋণের টাকার সুদ মহকুব পাইবার প্রার্থনা করিয়া পায় নাই, ভাল জমীগুলি হয় ত তিনি কাহাকেও কম খাজনায় জমা করিয়া দেন নাই, কেহ হয় ত অন্যায় মামলা মোকদ্দমা করিয়া, কোন অনুগত ব্যক্তিকে দিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইবার অনুরোধ করিয়া সফলকাম হইতে পারেন নাই, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি মনে মনে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিত, আজি তাঁহার এই বিপদবার্ত্তা শুনিতে পাইয়া গোপন রাখিবার জন্য কৃত্রিম অনুরোধ করিয়া সকলকেই সে কথা শুনাইতে শুনাইতে দুই এক কাণ হইতে হইতে সে কথা দেবীপ্রসাদের কাণে পৌঁছিল। দেবীপ্রসাদ লোকটা বড় চাপা, একমাত্র উপায়ক্ষম উপযুক্ত পুত্রের অকাল মৃত্যুর সংবাদে বড়ই ব্যথিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার ব্যথার ব্যথী বলিয়া যে দুই একজনকে জানিতেন, তাঁহারা বই আর কাহাকেও সে কথা জানিতে দিলেন না, বাহিরের স্ত্রীলোক যাহাতে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। সন্ধ্যা না হইতে হইতে অন্তঃপুরে ঘোর আর্ত্তনাদ উঠিল, কুলকামিনীগণ অস্থির হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, দেবীপ্রসাদের পত্নী আত্ম-

-হত্যার জন্য প্রস্তুত হইলেন কিন্তু আজি তাঁহার অন্তঃপুর আত্মীয় অন্তরঙ্গে পরিপূর্ণ—সকলের চেষ্টা যত্নে তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না বটে, কিন্তু মাথা ফুলাইয়া ফেলিলেন, বক্ষস্থল রক্তবর্ণ করিয়া তুলিলেন।

এই দুঃসংবাদ পৌঁছিবামাত্র দেবীপ্রসাদ পুণ্ডরীকাক্ষ চৌধুরীকে আনিতে পাঠাইলেন, পুণ্ডরীকাক্ষ আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কলিকাতার কদমতলার ঘাটে আসিয়া ষ্টীমার না পাওয়ায় আমরা দুইজনে একখানি নৌকা করিয়া উলুবেড়ে পৌঁছিতে যে বেলা হইল—তাহাতে নৌকায় আসিলে নিয়মিত সময় মধ্যে বাড়ী পোঁহুছান যাইবে না, বুঝিয়া হাঁটিয়া আসিতে ছিলাম। মহিষরাথায় আসিয়া নকুলের একবার দাস্ত হইল, তাহাতে কোন অসুখের লক্ষণ বুঝা গেল না, বাঘনান হইতে মাঠে পৌঁছিয়া আবার এক দাস্ত হইল, তাহাতেই তাহার চলিবার শক্তি গেল, দেখিতে দেখিতে ঘাম হইতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা হইয়া গেল, একটী ভদ্রলোক যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, কিছুতেই বাঁচাইতে পারা গেল না, নকুল মারা গেল।"

পুণ্ডরীকের মুখে এই দুঃসংবাদ পাইয়া দেবীপ্রসাদ কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, পুত্রের মৃত্যু, তাঁহার স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল, অতঃপর তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আপনার পত্নী ও আত্মীয় স্বজনকে সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, আপনার মনকে প্রবোধ দিতে হইল না, মন আপনার সান্ত্বনা আপনি করিয়া লইল। এই সংসারে সকল লোক সমান নহে, সকলের মনও সমান নহে, শত্রুপক্ষ বলিতে লাগিল—"লোকটা কি পাষণ্ড, একমাত্র উপযুক্ত পুত্র মারা গেল, চোখে এককোঁটা জল আসিল না, যাঁহারা আত্মীয়, তাঁহাকে বেশ চিনিত, জানিত এমন কি তাঁহার মনের ভাবও বুঝিত, তাঁহারা বলিল, ভগবানের কঠোর পরীক্ষা! লোকটা ঘোর সহিষ্ণু। দেবীপ্রসাদ শত্রুমিত্রের কথায় কাণ দিলেন না বটে, কিন্তু শোকের তীব্র কশাঘাতে, ঘোরতর অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতে লাগিলেন, বাহিরে কিছু প্রকাশ করিলেন না, কেবল মনে বুঝিলেন, মহামায়ার মায়াপাশ মানুষ কিছুতেই ছিঁড়িতে পারে না, পাঞ্চভৌতিক দেহ ও মনের সে শক্তি নাই,—থাকিলেও পারে না। এ যাতনা দেহীর সহ্য হয় না, যতদিন দেহ ও মন থাকে, ততদিন কষ্ট হয়।

রাত্রি প্রভাত হইবার অপেক্ষা সহিল না, কুটুম্ব-সজ্জনেরা কাঁদিতে কাঁদিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। উৎসবালয় অন্ধকার হইল। এরূপ দুর্ঘটনার

পরে যাহা কিছু কর্ত্তব্য, দেবীপ্রসাদ সমস্তই করিলেন, পত্নীকে অনেক বুঝাইলেন, স্ত্রীলোক দুই একদিনে বুঝিবার নহে, সুতরাং তাঁহার শোকাপনোদন সহজে হইল না।

দেবীপ্রসাদ হৃদয়বান পুরুষ—ধনবান হইলে যেরূপে ধনের সদ্ব্যবহার করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন, দুঃখীর দুঃখ দেখিলে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না, পরদুঃখকাতরা তাঁহার সহজাত এ জন্য তিনি অনেকগুলি অনাথ অনাশ্রয়ের আশ্রয়—দেশহিতকর কাজে অগ্রসর, এজন্য সহজেই তাঁহার আত্মপ্রসাদ জন্মিত, কিন্তু বহু সৎকার্য্য সত্ত্বেও তাঁহার এরূপ বিপৎপাতে তিনি চিন্তা করিলেন, তাঁহার অদৃষ্টে কেন এরূপ পুত্রশোক ঘটিল—সকল কাজেরই একটা হেতু আছে, কিন্তু তিনি আপনার জীবনে এমন কোন ঘটনা খুঁজিয়া পাইলেন না, যাহাতে তাঁহাকে এরূপ যাতনা ভোগ করিতে হয়। মনুষ্যমাত্রেরই ভ্রম সম্ভব, সংসারে কেহই অভ্রান্ত নহে, কিন্তু ভুল ভ্রান্তিতেই এরূপ বিষম কর্ম্মফলের কোন কজাই ভাবিয়া পাইলেন না—এরূপ স্থলে জন্মান্তরের অস্তিত্ব মনে না হইয়া থাকিতে পারে না, তাই ভাবিয়াই তিনি সান্ত্বনা পাইলেন। যখনই তাঁহার শোক হইত, পুত্রকে মনে পড়ে,—তখনই তিনি ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি মনে করিলে সব ভুলিয়া যান।

(৩)

কোর্ট সব ইন্‌স্পেক্টর নলিনীরঞ্জন বাঘনানের পথে যে মুমূর্ষু যুবককে নিকটবর্ত্তী গ্রামের কোন ভদ্রলোকের নিকট পাঠাইয়া দিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার পর তাঁহাকে পাণিত্রাস হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছিল বলিয়া কয়েক দিন তাহার সংবাদ লইতে পারেন নাই, সপ্তাহ পরে তাঁহার সদরে ফিরিবার দিন তিনি সেই পথে মহিষরাখা যাইতেছিলেন, কেনাল দিয়া যাইলে তাঁহাকে পথশ্রম সহ্য করিতে হইত না, কিন্তু তাহা হইলে সেই পরিত্যক্ত যুবকের সংবাদ লওয়া হয় না। নির্দ্দিষ্ট গ্রামে প্রবেশ করিতে হইলে অগ্রেই তাঁহার সেই পরিচিত ব্যক্তির বাটী—সেই বাটীর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র তিনি তাহার মধ্যে এক মহা কোলাহল শুনিতে পাইয়া কিয়ৎকাল স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, সেই জনকোলাহল মধ্যে বারম্বার তাঁহার আত্মনাম শুনিতে পাইয়া কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে তিনি বাড়ী প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—বাড়ীর ভিতর লোকে লোকারণ্য, বালক-বৃদ্ধ-বনিতায় বাড়ীটি পরিপূর্ণ, তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া গৃহস্বামী—"এই যে আপনাদের পুত্রের জীবন-

দাতাও উপস্থিত" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। চীৎকারমাত্র পাঁশকুড়ার সেই দেবীপ্রসাদ, তাঁহার পত্নী, পুত্রবধূ ও তাঁহাদের চারিপাঁচটী কুটুম্ব ও কুটুম্বিনী আসিয়া নলিনীরঞ্জনের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইলেন, রোগমুক্ত নকুলেশ্বর বসিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া সজলনয়নে তাঁহার পদযুগলকে অতি পবিত্রজ্ঞানে ধারণ করিলেন। নলিনীরঞ্জন স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধির ন্যায় কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে সমস্তই বুঝিতে পারিলেন,—গৃহস্বামী তাঁহার পুত্রসহ যে মুমূর্ষু যুবককে পাইয়া শুশ্রূষা দ্বারা জীবিত করিয়াছেন, তাঁহাকে দেখাইলেন; তাহার পর নকুলেশ্বর সুস্থ হইলে তাঁহার পিতা দেবীপ্রসাদকে সংবাদ লিখিয়া লোক পাঠাইলে তিনি সস্ত্রীক, পুত্রবধূ এবং তাঁহার উৎসঙ্গদেশে অন্নপ্রাশনপ্রয়াসী নকুলের শিশু পুত্রটীকে দেখাইলেন। নলিনীরঞ্জন দেখিয়া শুনিয়া আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিলেন। হরিপ্রসাদের সহিত এই গৃহস্বামীর পাঁচশত বিঘা জমি লইয়া বহুদিন হইতে মোকর্দ্দমা চলিতেছিল, দেবীপ্রসাদ আপনার ন্যায্যদাবি ত্যাগ করিয়া মোকর্দ্দমা মিটাইয়া লইলেন।

গৃহস্বামীর অনুরোধে নলিনীরঞ্জন এবং দেবীপ্রসাদ আমোদে আহ্লাদে রাত্রিযাপন করিয়া সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হরিপ্রসাদ বাড়ী ফিরিয়া মহা মহোৎসবে পৌত্রের অন্নপ্রাশন সমাধা করিলেন, পুত্রকে আর চাকরি করিতে দিলেন না।

গীত।

ইমণ,—তেওড়া।

কত ব্যথা পেয়েছি আমি, কত দুঃখ সহেছি হে!
ভগ্নহৃদয়ে কারেও না দেখে, কতই কেঁদেছি হে!
শূন্য ঘরে, শূন্য হৃদয়ে, ভেসে নয়নের জলে,
কোথায় আছ তুমি, কোথায় পাব আমি, বলে ডেকেছি হে!
তখনি তুমি মোরে দয়া করি, প্রকাশিলে তব রূপ;
পাইনু কত সুখ, ভুলিনু সব দুঃখ, হেরিনু তব মুখ,
কত ভালবাস, না কাঁদিলে কে জানিতে পারে;
শোক বিকারে, বিপদ,আঁধারে,হরি হে তোমারে জেনেছি হে!



রাণী মূর্ত্তি।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২৫এ জানুয়ারী মঙ্গলবার উইণ্ডসর প্রাসাদের সেণ্টজর্জ্জ ধর্ম্মমন্দিরে রাজকুমারের নামকরণ হইল; ক্যাণ্টারবরির প্রধান ধর্ম্মযাজক বহু পুরোহিত বেষ্টিত হইয়া জর্দ্দান নদের জলে রাজপুত্রকে স্নান করাইয়া তাঁহার নাম রাখিলেন আলবার্ট এড্ওয়ার্ড। প্রুসিয়ার রাজা প্রিন্স অব ওয়েলসের ধর্ম্মগুরু-পদে বরণীয় হইলেন। এই উৎসব উপলক্ষে সেণ্টজর্জ্জ ভজনালয় বিবিধ পত্রপুষ্পে-সুসজ্জিত করা হইয়াছিল, রাজপথে কুসুম-তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল, বর্ত্মে বর্ত্মে বিবিধ বর্ণের পতাকা সমুড্ডীন হইয়াছিল, রাজকুমারের চন্দ্রবদন দর্শনাভিলাষে

ধর্ম্ম মন্দিরের সমুখস্থ বর্ত্ম সমূহ জনাকীর্ণ হইয়াছিল, বহুমূল্য বসনভূষণালঙ্কৃত নরনারীগণে সেণ্টজর্জ্জমন্দির পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই নামকরণোৎসবে ত্রিশলক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল।

জনক-জননী আদর করিয়া কুমারের ডাকনাম রাখিয়াছিলেন "বার্টি।" শিশুর বয়স যখন দশমাস, সেই সময় একজন কাপ্তেন সাহেব জবদ্বীপের একটি ক্ষুদ্রতর অশ্ব মহারাণীকে উপহার দেন। অশ্বটির বয়স পাঁচ বৎসর, দিব্য সুন্দর, তাহার দেহের উচ্চতা দেড়হাত মাত্র; কাপ্তেন সাহেব সেটিকে বগলে করিয়া আনিয়াছিলেন। মহারাণী সেই উপহারপ্রাপ্ত অশ্বটি তাঁহার প্রিয়তম পুত্র বার্টিকে দান করিয়াছিলেন। অত্যল্প বয়সেই নবীন প্রিন্স অব ওয়েলস্ অশ্বারোহণে পটু হইয়াছিলেন, চিরদিন তাঁহার অশ্বারোহণে অসাধারণ অনুরাগ ও অতিশয় আমোদ ছিল।

লেডি লিটলটন নাম্নী এক গুণবতী মহিলা রাজকুমার ও রাজকুমারীগণের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, মহারাণী তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "যাহাতে কোনপ্রকার, বিলাস-লালসা তাঁহার পুত্রকন্যাগণের হৃদয়ে উদয় না হয়, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ উপদেশ দিবেন।"

শৈশব হইতেই যাহাতে কুমার-কুমারীগণের হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হয়, তাহার উপায় করিবার নিমিত্ত মহারাণী স্বামীর সহিত সন্তানসন্ততিগণকে লইয়া প্রতিদিন ঈশ্বরোপাসনা করিতেন।

প্রিন্স আলবার্ট পুত্রটিকে সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন; পশুশালায় লইয়া গিয়া পশুপক্ষী দেখাইতেন, জীবজন্তুর প্রতি শিশু হৃদয়ে দয়ার উদ্রেকের উপদেশ দিতেন, সমুদ্রকূলে লইয়া গিয়া প্রকৃতির ক্রীড়াতত্ত্ব বুঝাইতেন, তরণীতে আরোহণ করিয়া বাষ্পীয় যন্ত্রসমূহের বিবিধ কৌশল বুঝাইয়া দিতেন; স্থূল সূক্ষ্ম-কল্পে সর্ব্ববিধ জ্ঞানের বীজ বালকের হৃদয়ক্ষেত্রে বপন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না।

রাজকুমার একদা একাকী সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পান, একটি ধীবরপুত্র যত্নপূর্ব্বক শুক্তিসংগ্রহ করিতেছে; বালচাপল্য-বশে তিনি তাহার সংগৃহীত ঝিনুকের আধারটি সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করেন; ধীবরপুত্র কুপিত হইয়া তাঁহার চক্ষে এক মুষ্ট্যাঘাত করে, সেই আঘাতে কুমারের চক্ষে রক্তপাত হয়। প্রিন্স আলবার্ট সেই সংবাদ পাইয়া সমুদ্রতটে গিয়া পুত্রকে তিরস্কার করিয়াছিলেন।

প্রিন্স অব ওয়েলস্ সপ্তম বর্ষে উপনীত হইলে প্রিন্স আলবার্ট অসবরণ-প্রাসাদের নিকটে একটি রম্য আশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে উদ্যান প্রস্তুত করিলেন; ভিন্ন ভিন্ন বস্তু গঠনের জন্য তথায় একটি কারখানাও প্রস্তুত করিলেন। রাজকুমার ও রাজকুমারীগণ সেই উদ্যানে স্ব স্ব হস্তে ভূমিকর্ষণ, বৃক্ষ-রোপণ ও জলসিঞ্চন করিয়া বিবিধ ফল ফুল, শাকশব্জী উৎপাদন করিতে লাগিলেন। উদ্যানবাটিকায় গোশালা নির্ম্মিত হইয়াছিল; কুমার-কুমারীরা তথায় গোসেবা ও গাভী দোহন করিতেন, দুগ্ধ হইতে ক্ষীর, সর, নবনী প্রস্তুত করিতেন। প্রিন্স অব ওয়েলস স্বহস্তে ইষ্টক প্রস্তুত করিয়া গৃহনির্ম্মাণ করিতে এবং কাষ্ঠচ্ছেদন করিয়া চেয়ার টেবিল ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিলেন।

সেই সময় কুমারের প্রতিমূর্ত্তি গঠনার্থ একদিন একজন ভাস্কর রাজপ্রাসাদে আহূত হন; কুমার তখন কর্দ্দম লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন, ভাস্কর তন্নিকটে উপবিষ্ট হইবামাত্র কুমার এক তাল কাদা লইয়া তাঁহার মুখে নিক্ষেপ করেন; ঠিক সেই সময় মহারাণী হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া পুত্রের ঐ কাণ্ড দর্শনে পুত্রকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন; রাজকুমার অপ্রতিভ হন। রাজ্ঞী তাঁহাকে ভাস্করের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন; বিনীতভাবে মাতৃ আজ্ঞা পালন করিয়া কুমার তদবধি তাদৃশ ধৃষ্টতা পরিহার করিয়াছিলেন।

প্রাগুক্ত উদ্যানের একটি গৃহে ক্ষুদ্র চিত্রশালা স্থাপিত হইয়াছিল; তথায় জীব-দেহ, বিবিধ বর্ণের সুন্দর সুন্দর প্রস্তর ও নানাজাতি তরুলতা সজ্জিত থাকিত। প্রিন্স আলবার্ট পুত্রকন্যাগণকে সেই সকল বস্তু প্রদর্শন করিয়া, প্রাণিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা ও উদ্ভিজ্জতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন।

কুমারের উপন্যাসপুস্তক পাঠে প্রিন্স আলবার্টের সুদৃঢ় নিষেধ ছিল। প্রিন্স অব ওয়েলস্ একদিন সার ওয়াল্টার স্কটের একখানি উপন্যাস পাঠ করিতেছিলেন তদ্দর্শনে প্রিন্স আলবার্ট রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিস্তর তিরস্কার করেন; সেই দিন হইতে বিশেষ আদেশ হইয়াছিল যে, "রাজকুমারের নিকটে কেহ কোনপ্রকার উপন্যাস পুস্তক লইয়া যাইতে পারিবে না।"

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড হেন্‌রী বার্চ্চ রাজকুমারের শিক্ষক নিযুক্ত হন; তাঁহার সদুপদেশে রাজকুমার ধর্ম্মশিক্ষায় ও সুনীতি শিক্ষায় ব্যুৎপন্ন হইতে থাকিলেন; বায়ু-সূর্য্য-সংস্পর্শে বনস্পতিগণ যেমন দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, রেভারেণ্ড বার্চ্চের উপদেশে শিশু রাজকুমারের মনোবৃত্তি সেইরূপ দিন দিন

পরিস্ফুট হইতে লাগিল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বেভারেণ্ড বার্চ্চ শিক্ষকের পদ পরিত্যাগ করেন, মিঃ ফ্রেডারিক জিব্‌স্‌ এম, এ, তাঁহার স্থলে নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিন বৎসরের পরিচয়ে বেভারেণ্ড বার্চ্চ শিশু রাজকুমারের ভক্তিভাজন হইয়াছিলেন; তাঁহার পদত্যাগের সংবাদ শুনিয়া রাজকুমারের চক্ষে জল আসিয়াছিল। বার্চ্চ যে দিন বিদায় হন, রাজকুমার সেই দিন প্রীতিভক্তিপূর্ণ একখানি পত্র লিখিয়া কতকগুলি মূল্যবান উপঢৌকনের সহিত সেই পত্রখানি তাঁহার উপাধানের উপর রাখিয়াছিলেন; সেই পত্রখানি পাঠ করিয়া বেভারেণ্ড বার্চ্চের হৃদয় স্নেহরসে দ্রবীভূত হইয়াছিল। রাজকুমারের বয়স তখন দশ বৎসর মাত্র।

ভিন্ন ভিন্ন দেশ দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থজ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে, অতএব ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ষোড়শ বর্ষীয় রাজকুমারকে জর্ম্মণী ও সুইজরল্যাণ্ডে প্রেরণ করা হয়; জেনারেল গ্রে, কর্ণেল পল্‌সনবি, শিক্ষক জিব্‌স্‌ এবং ডাক্তার আরমষ্ট্রং তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। অক্টোবর মাসে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ফেরাডের নিকট রাজকুমার প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ক্যান্টারবরির আর্চ্চবিশপ যথানিয়মে রাজকুমারকে পবিত্র বারিসেকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। দীক্ষিত হইবার অব্যবহিত পরেই রাজকুমার আয়রলণ্ড দর্শনে যাত্রা করিলেন; তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি প্রগাঢ় অনুরাগে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। ১৮৫৯ অব্দে রাজকুমারের এডিনবরা যাত্রা। সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ ডাক্তার প্লেফেয়ারের নিকটে তিনি রসায়নশাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। তথাকার রসায়ন পরীক্ষার একটি কক্ষে একদা প্রজ্জ্বলিত অনলে একখানি কটাহে সীসক দ্রবীভূত হইতেছিল, ডাক্তার প্লেফেয়ার সেইখানে রাজকুমারকে লইয়া গিয়া আদেশ করিলেন, "এমোনিয়া জলে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া তুমি ঐ দ্রবীভূত উত্তপ্ত সীসকে হস্ত নিমজ্জিত কর।" অনুমতিশ্রবণে বিস্মিত হইয়া রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই কি আমাকে ঐ উত্তপ্ত তরল সীসকে হস্ত নিমজ্জন করিতে হইবে?" ডাক্তার বলিলেন, "সত্য।" রাজকুমার তখন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই তপ্ত সীসকে হস্ত নিমজ্জিত করিলেন। ডাক্তার প্লেফেয়ার ও এডিনবরাস্থ অপরাপর বৈজ্ঞানিক অধ্যাপকের নিকটে রাজকুমারের ইটালিক, জর্ম্মণ ও ফরাসী ভাষা, রসায়নশাস্ত্র, রোমের ইতিহাস ও

ব্যবহারশাস্ত্র শিক্ষা হয়। সেই বৎসর অক্টোবর মাসে রাজকুমার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। মিঃ হারবার্ট ফিসার সাহেবের নিকটে তথায় তাঁহার শিক্ষালাভ হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ক্রাইষ্টচার্চ্চ কলেজে ভর্ত্তি হন, তথাকার নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সম্ভ্রমের উপাধি লাভ করেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ট্রিনিটি কলেজে প্রবেশ করেন, সেই বৎসরের অক্টোবর মাসে তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই রাজকুমার অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাটিন, গ্রীক, ফরাসী, জর্ম্মণ প্রভৃতি ভাষা, ইতিহাস, রসায়ন শাস্ত্র ও প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়া সর্ব্বত্র যশস্বী হইয়াছিলেন।

১৮৬১ অব্দেই রাজকুমারের পিতৃবিয়োগ। পুত্রের বয়স বিংশতি বর্ষ, স্নেহাস্পদ পিতা প্রিন্স আলবার্ট তথাপি দু-একদিন তাঁহাকে না দেখিলে অতিশয় অস্থির হইতেন; রাজকুমার যখন কেম্ব্রিজ কলেজে অধ্যয়ন করেন, সেই সময় প্রিন্স আলবার্ট একদিন পুত্রমুখদর্শনে ব্যগ্র হইয়া কেম্ব্রিজে গিয়াছিলেন; ডিসেম্বর মাস, দারুণ শীত, তাহার উপর ঝড়বৃষ্টি; কেম্ব্রিজের পথে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল; তথা হইতে উইণ্ডসরে প্রত্যাগত হইয়া তিনি জ্বরাক্রান্ত হন; জ্বর দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল; ১২ ই ডিসেম্বর দেহের অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া দাঁড়াইল, চিকিৎসকেরা বলিলেন, "জীবনের আশা নাই।" ১৩ ই তারিখে রাজকুমারকে টেলিগ্রাফ করা হইল; স্পেসেল ট্রেনে তিনি অবিলম্বে উইণ্ডসরে আসিলেন; দেখিলেন, সত্যই শেষ অবস্থা। পরদিন সাংঘাতিক উপসর্গ পরিলক্ষিত হইল; সকলেই বুঝিতে পারিলেন, সে দিনের রজনী প্রভাত হইবার অগ্রেই প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে। রাজকুমার-রাজকুমারীরা শোকাভিভূত-হৃদয়ে পিতার করচুম্বন করিলেন, পিতা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না। মহারাণী সন্তপ্ত হৃদয়ে সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

অন্তিমকাল উপস্থিত। মহারাণী গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিয়া, মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া, নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; শয্যাতলে জানু পাতিয়া পুত্রকন্যাগণ করজোড়ে পরাৎপর পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর শনিবার রাত্রি ১০টা ৪৫ মিনিটের সময় মহানুভব প্রিন্স আলবার্ট চিরদিনের মত নয়ন মুদিত করিলেন, প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। সেন্টপল গির্জ্জার প্রকাণ্ড ঘণ্টা সেই রজনীতে ঘন ঘন ধ্বনিত হইয়া সেই ভীষণ শোকবার্ত্তা নগরময় ঘোষণা করিয়া দিল; যাহারা ঘুমাইয়া ছিল, শোক-ঘণ্টা-নিনাদে তাহারা জাগিয়া উঠিল। নগর স্তম্ভিত; উইণ্ডসর প্রাসাদ গভীর শোক-জলদে সমাচ্ছন্ন; সমস্তই নিস্তব্ধ।

মহারাণী ধরাশায়িনী; দেহ নিশ্চল, নিস্পন্দ, জীবনের অস্তিত্ব আছে কি না, চিকিৎসকেরা তাহা শীঘ্র নিরূপণ করিতে পারিলেন না; বহুক্ষণ শুশ্রূষার পর তাঁহার চৈতন্য সম্পাদিত হইল; সে রাত্রে তিনি একপ্রকার হতজ্ঞান হইয়াই সেই বাটীতে রহিলেন, পরদিন প্রভাতে ডাক্তারগণের নিতান্ত নির্ব্বন্ধে পুত্রকন্যাগুলিকে লইয়া তিনি উইণ্ডসর প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন। ২৩এ ডিসেম্বর যথানিয়মে প্রিন্স আলবার্টের সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল।

প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ শৈশবাবধি দেশভ্রমণে একান্ত অনুরাগী ছিলেন; ইয়োরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এসিয়াখণ্ডের বহুস্থান পরিদর্শন করিয়া ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে যাত্রা করেন; তথায় তাঁহার মহাসম্মান লাভ হইয়াছিল। তিনি ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠপুত্র, ইংলণ্ডের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী, সে অভিমান ত্যাগ করিয়া তথাকার ছোট বড় সকলের সহিত সখ্যভাবে আলাপ করিয়াছিলেন।

দেশভ্রমণে সর্ব্বত্রই যুবরাজের সুযশ ও রাজসম্মান লাভ হইয়াছিল। তিনি যখন আমেরিকায় গিয়াছিলেন, সেই সময় সংবাদপত্রে তারের খবর প্রকাশের প্রথার বহুল প্রচলন হয়। একদিন তিনি একটি সভায় বক্তৃতা করেন, সমাচার-পত্রের একজন প্রতিনিধি টেলিগ্রাফ আফিসে তখন ধর্ম্মপুস্তকের আদর্শ প্রেরণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে প্রিন্স অব ওয়েলসের বক্তৃতার প্রতিলিপি উপস্থিত হওয়াতে তিনি আরব্ধ কার্য্য বন্ধ রাখিয়া সর্ব্বাগ্রে সেই বক্তৃতার মর্ম্ম তারযোগে স্বকীয় সংবাদপত্র-কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দেন। অন্যান্য সংবাদ-দাতারা তদবধি শীঘ্র শীঘ্র টাট্‌কা টাট্‌কা খবর সংবাদপত্রের জন্য টেলিগ্রাফ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ কানাডায় গিয়া জগদ্বিখ্যাত নায়গারা জলপ্রপাত দর্শন করেন; ব্লণ্ডিন নামক একজন বাজীকর সেইদিন জলপ্রপাতের উপর রজ্জু লম্বিত করিয়া তদুপরি নৃত্য করিয়াছিল, সূক্ষ্ম রজ্জুর উপর দিয়া দূরব্যাপী প্রপাত পার

হইয়াছিল। তাহার সাহস ও কৌশল দর্শন করিয়া যুবরাজ বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাঁহার মুখে প্রশংসা লাভ করিয়া বাজীকর যথেষ্ট উৎসাহ পাইয়াছিল।

যুবরাজ যখন আমেরিকায় যাত্রা করেন, তাঁহার জননী তৎকালে তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন,—"রাজবেশে সংযুক্তরাজ্যে প্রবেশ করিও না, সাধারণ নগরবাসীর ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিও।" সেই উপদেশটি রাজকুমারের স্মরণ ছিল; নায়গারা হইতে সেণ্টলরেন্স নদী পার হইয়া তিনি নাগরিক-বেশে মার্কিণ সংযুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেন। রাজা তৃতীয় জর্জ্জের সময় আমেরিকার সংযুক্তরাজ্য ইংলণ্ডের অধীনতা হইতে বিমুক্ত হয়, সেই তৃতীয় জর্জ্জের পৌত্রীর পুত্র সেই সংযুক্তরাজ্যে প্রবেশ করিয়া অন্তরানন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"হীরো" জাহাজে আরোহণ করিয়া যুবরাজ আমেরিকায় গিয়াছিলেন। আমেরিকার রাজধানী নিউইয়র্ক; হীরো জাহাজ নিউইয়র্ক বন্দরে উপনীত হইলে যুবরাজ তীরে উত্তীর্ণ হইয়া রাজধানী দর্শন করেন। সেখানে তাঁহার যথোচিত সম্মানলাভ হইয়াছিল। সকলে শুনিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের যুবরাজ নাচ ভাল-বাসেন; অতএব তাঁহার সম্মানার্থ নৃত্যসভা আহূত হইয়াছিল; সভাস্থলে তিন সহস্র নরনারী উপস্থিত হইয়াছিলেন। নৃত্যকৌতুকে সকলে প্রমোদিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বহুলোকের পদভরে সভাগৃহের একাংশের ছাদ ভগ্ন হইয়া পড়ে; সৌভাগ্যক্রমে কাহারও প্রাণহানি হয় নাই।

এক পক্ষকাল নিউইয়র্কে অবস্থান করিয়া যুবরাজ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সমুদ্রের তুফান হওয়াতে হীরো জাহাজের কাণ্ডারিয়া দিকভ্রান্ত হইয়া অন্য দিকে গিয়া পড়ে, ইংলণ্ডে জাহাজ পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হয়। খাদ্যসামগ্রী ফুরাইয়া আইসে, যুবরাজ অগত্যা লোণা মাংস ভক্ষণ করিয়া কয়েক দিন যাপন করিয়াছিলেন। পুত্রের প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া রাজ্ঞী এদিকে উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার অন্বেষণার্থ আটলাণ্টিক মহাসাগরে কয়েকখানি রণতরি প্রস্তুত রাখিয়া-ছিলেন। বিপন্ন হীরো জাহাজ অবশেষে তিন সপ্তাহ পরে প্লিমাউথ বন্দরে আসিয়া নঙ্গর করে।

পিতৃবিয়োগের দুইমাস পরে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যুবরাজ স্বপারিষদ প্রভু যীশুখৃষ্টের জন্মস্থান জেরুজালেম তীর্থ দর্শনার্থ আগ-মন করিয়াছিলেন। ৩০এ মার্চ্চ তারিখে তিনি জেরুজালেম তীর্থে উপনীত হন। তীর্থস্থানে দেখিবার যোগ্য যাহা কিছু, তৎসমস্ত দর্শনান্তে যুবরাজ তথাকার

কয়েকজন প্রধান প্রধান লোকের সমাধি দর্শনে অভিলাষী হন। ইব্রাহিম, আইজাক ও সারাবিবির সমাধি-মন্দিরাভ্যন্তর কেবল মুসলমানেরাই দেখিতে পায়, অপর ধর্ম্মাবলম্বীগণকে দেখিতে দেওয়া হয় না, মন্দির অর্গলবদ্ধ থাকে। ইংলণ্ডের যুবরাজের পক্ষে সে নিয়ম পালিত হওয়া উচিত নহে, এই হেতু জেনারেল ব্রুসের অনুরোধে তুর্কির শাসনকর্ত্তার আদেশে ইব্রাহিমের সমাধি মন্দিরের দ্বার অর্গলমুক্ত হইয়াছিল; মন্দিরের প্রহরিরা বলিয়াছিল, "আমাদিগকে বধ না করিলে অপর ধর্ম্মাবলম্বী কেহই এ মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু ইংলণ্ডের রাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আমরা পথ ছাড়িয়া দিলাম।" আইজাকের সমাধি মন্দিরে যুবরাজ প্রবেশ করিতে পারেন নাই। কারণ এই যে, একজন প্রহরী বলিয়াছিল, "জীবদ্দশায় আইজাক বড় দুরন্ত লোক ছিলেন, তাঁহার প্রেতাত্মা ক্রুদ্ধ হইয়া এই নবীন যুবরাজের অনিষ্টসাধন করিতে পারে।" সারাবিবির সমাধিটিও যুবরাজের দর্শন করা হয় নাই। কেমনা, পর্দ্দানসীন স্ত্রীলোকের সমাধি-মন্দিরে পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই; সমাধিও সর্ব্বদা পর্দ্দাবৃত থাকে।

তীর্থ দর্শনান্তে সিরিয়া, স্মির্ণা, কনষ্টাণ্টিনোপল, এথেন্স, কেফালোনিয়া ও মাল্টাদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া ৪ঠা জুন তারিখে যুবরাজ ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অনন্তর যুবরাজের বিবাহপ্রসঙ্গ।—

রাজকুমারী আলেকজান্দ্রা।



কুমারীকালের প্রতিরূপ।



অবিবাহিত মূর্ত্তি ।

ডেন্‌মার্কের রাজকুমারী আলেকজান্দ্রার সহিত যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের বিবাহ সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়াছিল। রাজকুমার একদা কেম্ব্রিজের ডচেসের গৃহে একখানি মনোরম চিত্রপট দর্শন করেন, সে প্রতিমূর্ত্তি কাহার, তাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করেন নাই। কয়েক দিন পরে তাঁহার একজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে তিনি উক্ত ডচেসের বাড়ীতে প্রেরণ করিলেন, বলিয়া দিলেন, "ডচেসের নাচঘরে যে একখানি অপূর্ব্ব চিত্রপট আছে, অপরূপ সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি, সে ছবি কাহার, তাহা তুমি জানিয়া আইস।"

যথাসময়ে বন্ধু সেই চিত্র দর্শন করিয়া আসিয়া যুবরাজকে বলিলেন, "ডেন্‌মার্কের নরপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা আলেকজান্দ্রার সেই ছবি।"

চিত্রমূর্ত্তি দেখিয়াই রাজকুমার মোহিত হইয়াছিলেন, পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিবাহ করিবার অভিলাষে রাজকুমারীকে স্বচক্ষে দর্শন করিবার ইচ্ছা হইল ; কি প্রকারে দর্শন করা হয়, মনে মনে তিনি তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ঠিক সেই সময়ে রাইণ নদের কূলে জর্ম্মণ সৈন্যগণের কৃত্রিম যুদ্ধের আয়োজন হইতেছিল ; কৌতূহলবশে সেই যুদ্ধ দর্শনের অভিলাষে যুবরাজ জর্ম্মণীতে গমন করেন ; তথায় তিনি শুনিলেন, ওয়ার্ম্‌স নগরের গির্জ্জামন্দিরের সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার ; সেই গির্জ্জাটি দর্শন করিবার নিমিত্ত একদিন তিনি তথায় উপস্থিত হন ; মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহার শোভা দর্শন করিতে করিতে একটি অপরূপ সুন্দরী মূর্ত্তি তাঁহার নয়নগোচর হয় ; দেখিবামাত্র তিনি চিনিলেন, কেম্ব্রিজের ডচেসের গৃহের ছবিতে যে মূর্ত্তি তিনি দেখিয়াছিলেন, ঐ কামিনী তাহারই সজীব মূর্ত্তি।

ডেন্‌মার্কাধিপতি ক্রিশ্চিয়ান সেই দিন ঐ ধর্ম্মমন্দিরের শোভা দেখাইবার জন্য কুমারী আলেক্‌জান্দ্রাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন; অভাবনীয়রূপে ইংলণ্ডের প্রিন্স অব ওয়েলসের সহিত সেইস্থানে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; পরম সমাদরে যুবরাজকে আপ্যায়িত করিয়া তিনি আলেকজান্দ্রার সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দেন। প্রথম দর্শনেই উভয়ের মনে পরস্পর অনুরাগের সঞ্চার হয়। অতঃপর মহারাণী ভিক্টোরিয়া ডেন্‌মার্কে গমনপূর্ব্বক সেই কন্যাটিকে দর্শন করিয়া তাঁহার রূপগুণের পক্ষপাতিনী হন; রাজার সহিত কথাপ্রসঙ্গে তিনি আপন পুত্রের সহিত সেই কন্যার পরিণয় প্রস্তাব করেন; রাজা ক্রিশ্চিয়ান সানন্দে সম্মতিদান করিলেন; রাণীও পরম পরিতোষে সম্বন্ধস্থির করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রিন্স আলবার্টের শোচনীয় মৃত্যু, সুতরাং শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ হইতে পারিল না, এক বৎসর অতীত হইয়া গেল; ১৮৬৩ অব্দের ১০ই মার্চ্চ তারিখে শুভ বিবাহের দিন স্থির হইল।

বিবাহের সময় রাজকুমারগণের অতিরিক্ত বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের বিবাহের পূর্ব্বে পার্লামেণ্ট মহাসভা তাঁহার বার্ষিক ৬ ছয় লক্ষ পাউণ্ড বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিলেন; কর্ণওয়ালের জমিদারীতে যুবরাজের বার্ষিক ৯ নয় লক্ষ পাউণ্ড আয় ছিল, নূতন বৃত্তির সংযোগে ১৫ লক্ষ পাউণ্ড হইল।

১৮৬৩ অব্দের ৭ই মার্চ্চ তারিখে ডেন্‌মার্কের রাজা ও রাণী তাঁহাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা আলেকজান্দ্রাকে সমভিব্যহারে লইয়া লণ্ডন নগরে উপনীত হইলেন, কুমারী আলেক্‌জান্দ্রার ভ্রাতা-ভগ্নীগণকেও সেই সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তাঁহাদের তরণী সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইলে প্রিন্স অব ওয়েল্‌স স্বয়ং অগ্রবর্ত্তী হইয়া মহাসম্মানে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন।

রাজকুমারী আলেকজান্দ্রা পরমাসুন্দরী; এমন কি, সকলেই বলিয়াছিলেন, "এই কন্যাটি সমগ্র ইয়োরোপ খণ্ডের মধ্যে অতুল সুন্দরী; অতএব সেই অতুল সুন্দরীর রূপ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় লণ্ডনের রাজপথে নগরের নরনারীগণের মহাজনতা হইয়াছিল। অনুযাত্রী-বেষ্টিত রাজশকট সেই মহাজনতা ভেদ করিয়া সন্ধ্যার পর উইণ্ডসর প্রাসাদে উপনীত হইল। ডেন্‌মার্কের রাজপরিবার তিন দিবস সেই প্রাসাদেই বাস করিলেন। নগরবাসীগণ ডেন্‌মার্কের রাজকুমারীর গৌরবার্থ ৬ ছয় লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে লণ্ডন নগর সুসজ্জিত ও বিচিত্র আলোমালায় বিভূষিত করিয়াছিলেন।

১৮৬৩ অব্দের ১০ই মার্চ্চ তারিখে উইণ্ডসর প্রাসাদে সেণ্টজর্জ্জ ধর্ম্মমন্দিরে রাজকুমারী আলেক্‌জান্দ্রার সহিত রাজকুমার প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের শুভপরিণয় সুসম্পন্ন হইল। ধর্ম্মমন্দিরে সমারোহের সীমা ছিল না; সকলেই পরমানন্দে উৎফুল্ল, কেবল পতিবিয়োগ-বিধুরা রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া প্রগাঢ় শোকবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সজল নয়নে ভজনালয়ে উপস্থিত ছিলেন। এই বিবাহে রাজকুমারী আলেক্‌জান্দ্রা দেশবিদেশীয় সম্ভ্রান্তজনগণের নিকট ৩০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সুন্দর সুন্দর নানা দ্রব্য যৌতুক পাইয়াছিলেন, লণ্ডনের অধিবাসীবর্গ দেড়লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের হীরক-হার রাজ্যেশ্বরীর নববধূকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন।

১৮৬৪ অব্দে যুবরাজ স্বগৌরবে জি, সি, আই, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সার্ জন্ হেজেল উডের উপদেশে ও সুশিক্ষাগুণে তিনি সামরিক বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; তরণীপরিচালন ও ক্রিকেট খেলায় তাঁহার দক্ষতা জন্মিয়াছিল।

১৮৬৪ অব্দের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের প্রথম পুত্রের জন্ম হয়, নাম আল্‌বার্ট ভিক্টর; ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩ রা জুন তারিখে দ্বিতীয় পুত্র (ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান অধীশ্বর) জর্জ্জ ফ্রেডারিক আর্নেষ্ট আলবার্ট, ডিউক অব ইয়র্কের জন্ম।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২০এ ফেব্রুয়ারী যুবরাজের প্রথমা কন্যার জন্ম; * নাম লুইসা ভিক্টোরিয়া আলেক্‌জান্দ্রা ডলমার। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই দ্বিতীয়া কন্যার জন্ম; নাম ভিক্টোরিয়া আলেক্‌জান্দ্রা অলগা মেরী। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তৃতীয়া কন্যার জন্ম; নাম মড কারলট মেরী ভিক্টোরিয়া। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রেল যুবরাজের আর একটি পুত্র হইয়াছিল, নাম আলেকজাণ্ডার জন আল্‌বার্ট; দুর্ভাগ্যক্রমে জন্মের পরদিন সেই শিশুটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কন্যাত্রয়ের মধ্যে ডিউক অব ফাইফের সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়, নরওয়ের রাজার সহিত দ্বিতীয়া কন্যার ও ডেন্‌মার্কের রাজপুত্রের সহিত তৃতীয়া কন্যার বিবাহ হয়।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে যুবরাজ সস্ত্রীক দেশভ্রমণে বহির্গত হন, প্রথম ফরাসী রাজধানী পারিস নগরে, তৎপরে ডেন্‌মার্করাজ্যে ও বার্লিন নগরে যথোচিত সম্মান প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহারা আফ্রিকার আলেকজেন্দ্রিয়া নগরে গমন করেন মিশরের পাশা তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন

-সুসজ্জিত রমণীয় নিকেতনে তাঁহাদের বিরাম স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; কনকাসনে উপবেশন, স্বর্ণপাত্রে পানভোজন এবং রজত খট্টায় শয়ন করিয়া তাঁহারা অনুপম আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। এক এক দিন যুবরাজ-দম্পতি সুসজ্জিতা তরণী আরোহণে নীল নদের বক্ষে পরিভ্রমণ করিয়া তৎতীরবর্ত্তি প্রাচীন নগর সমূহের শোভাসৌন্দর্য্য দেখিয়া আসিতেন। আলেকজেন্দ্রিয়া হইতে তাঁহারা তুর্কির রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলে যাত্রা করেন। তুর্কির সুলতান তাঁহাদের অভ্যর্থনায় সবিশেষ বদান্যতা ও অতুল্য উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পরিচর্য্যের নিমিত্ত দুইশত কিঙ্করী ও একশত দেহরক্ষী প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছিল। যুবরাজ-দম্পতি যখন নগর দর্শনে বহির্গত হইতেন, তৎকালে তাঁহাদের শকটের অগ্রপশ্চাতে সহস্র সহস্র অস্ত্রধারী অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমন করিত। নিত্য নিত্য বহু সৈন্য বেষ্টিত হইয়া মহার্ঘ্য যানবাহনে ভ্রমণ করাতে যুবরাজের মনে বিরক্তির উদয় হয়, অতএব একদিন তিনি পত্নী সমভিব্যাহারে পদব্রজে স্বর্ণপুরী আখ্যাত স্তম্বল সহরের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়াছিলেন। এই স্থলে দুইটি নূতন বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। সুলতান তৎপূর্ব্বে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী কোন অভ্যাগতের সহিত একত্রে ভোজন করেন নাই, কিন্তু ইংলণ্ডের রাজ্ঞীপুত্রের সহিত সেই চিরন্তন রীতির মর্য্যাদা না রাখিয়া তিনি তাঁহার সহিত একত্র পানভোজনে গৌরব জ্ঞান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিষয়টী এই যে, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিনী কোন রমণী সুলতানের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারেন না; কিন্তু সুলতান মহা-গৌরবে ইংলণ্ডেশ্বরীর পুত্রবধূকে নিজে খাসমহলে ও বেগম-মহলে লইয়া গিয়াছিলেন।

কনষ্টান্টিনোপল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে যুবরাজদম্পতি ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র দর্শন করিয়া গ্রীসের রাজধানী এথেন্স নগরে গমন করেন; গ্রীসের রাজা জর্জ্জ রাজকুমারী আলেকজান্দ্রার সহোদর; তিনি পরম সমাদরে ভগ্নী ও ভগ্নীপতির অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এথেন্স হইতেই তাঁহাদিগের স্বদেশে প্রত্যাগমন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে জননীর অনুমতিক্রমে যুবরাজ "সিরাপিস রণতরী আরোহণে ভারতবর্ষ দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। ৯ই নবেম্বর তাঁহার বোম্বাই নগরে পদার্পণ; লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে দর্শন করিয়া পুলকিতচিত্তে জয়ধ্বনি করিয়াছিল। নগর দর্শনান্তে সুপ্রসিদ্ধ এলিফাণ্টা গিরিগুহা দর্শন করিয়া তিনি বরদারাজ্যে গমন করেন; মহারাজ গুঁইকুমার মহাসমাদরে তাঁহার

অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। মহারাজের পালিত এক সুবৃহৎ মাতঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক যুবরাজ বরদা নগর পরিদর্শন করেন; নগরের সৌন্দর্য্য পরিদর্শনে তাঁহার অতুল-আনন্দ জন্মিয়াছিল। বরদা হইতে মান্দ্রাজ যাত্রা। সেখানেও রাজসম্মানের কিছুমাত্র অঙ্গহীন হয় নাই।

মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় আগমন। ভারতবর্ষের রাজধানীতে রাজকুমারের যেরূপ সাদর অভ্যর্থনা হওয়া উচিত, নগরবাসী সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। নগর অপূর্ব্ব দীপমালায় সমুজ্জ্বল হইয়াছিল, গড়ের মাঠে আতসবাজীক্রীড়া সমাগত সমস্ত লোককে চমৎকৃত করিয়াছিল।



মহারাজ যতীন্দ্রমোহন।

সেই অভ্যর্থনা উপলক্ষে আমাদের মাননীয় মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর যে একটী সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিয়া রাজকুমারকে উপহার দিয়াছিলেন, মহারাজের চিত্রসহ সেই গীতটি এইস্থলে প্রদত্ত হইল।

উপহার গীতিকা।

রাগিণী ভূপ কল্যাণ,—তাল ঝাঁপতাল।

"এসহে ভামিনীসহ এস যুবরাজ।
মঙ্গল আহ্বান গান করে সবে আজ॥
পুলকে পূরিত অঙ্গ, বরিছে তোমারে বঙ্গ,
ভাবী অধিপতি তার ভাবী মহারাজ॥
দীন বঙ্গবাসীগণ, কি করিবে আবাহন,
বিনায়ে বিনয় বাণী হয় কি সে কাজ।
জিনিয়া বঙ্গতপন, রাজভক্তি-দীপ্ত মন,
উপহার দিল তাই বঙ্গের সমাজ॥"

কলিকাতা হইতে যুবরাজ লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, আগ্রা, লাহোর, জয়পুর, যোধপুর, ঢোলপুর, গোয়ালিয়ার, মিবার, ইন্দোর, হায়দরাবাদ, মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুররাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া কাশ্মীরে গমন করেন। কাশ্মীরের মহারাজ তাঁহাকে শ্রীনগর রাজধানীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বহুমুদ্রা ব্যয়ে ত্রিশ মাইল নূতন বর্ম্ম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কুরাধিপতি ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের রাজন্যবর্গ যুবরাজের অভ্যর্থনার্থ বিলাত হইতে সাড়ে সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকার দুর্লভ বস্তু আনয়ন করিয়াছিলেন। একজন রাজা যুবরাজকে একলক্ষ আশি হাজার টাকা মূল্যের রত্ন-খচিত একখানি তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। যুবরাজের প্রাপ্ত উপঢৌকন সামগ্রীর মূল্য সমষ্টি ৭৫ লক্ষ টাকার। স্বদেশে প্রতিগমন কালে তিনি সেই সকল উপঢৌকন দ্রব্য, পাঁচশত পশুপক্ষী এবং চারিটি কৃষ্ণসার মৃগ-যোজিত একখানি মনোহর শকট সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে তারিখে যুবরাজ ইংলণ্ডে উপস্থিত হন। পার্লামেণ্টের সভ্য মহোদয়গণ তাঁহার ভারত ভ্রমণের আর্থিক নিদর্শন দর্শনে পরমানন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যুবরাজ একরাত্রে একটি বহুজনপূর্ণ সভাস্থলে এক বক্তৃতা

করিয়া ভারতবাসীগণের রাজভক্তির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

যুবরাজ শৈশবাবধি অনেকবার প্রাণসঙ্কট বিপদে পড়িয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি ভয়ানক বিপদের উল্লেখ করা গেল। কুমারের বয়স যখন সাত বৎসর, সেই সময় উইণ্ডসর প্রাসাদের উদ্যান-বাটিকায় তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া একটি পক্ষী উড়িয়া যাইতেছিল, কর্ণেল গ্রে কুমারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, লর্ড ক্যানিং সেই আকাশগামী পক্ষীকে মারিবার জন্য গুলী করেন, গুলীটা নিম্নগামী হইয়া যুবরাজের মাথায় পড়িতেছিল, কর্ণেল গ্রে কুমারকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহাকে পশ্চাতে ঠেলিয়া স্বয়ং সম্মুখে দাঁড়াইলেন, গুলীটা তাঁহারই বক্ষে বিদ্ধ হইল, যুবরাজ রক্ষা পাইলেন। গুলীর আঘাতে কর্ণেল গ্রে মরেন নাই, কিন্তু অনেক দিন কষ্ট পাইয়াছিলেন। যুবরাজের দ্বিতীয় বিপদ—১৬ বৎসর বয়সে তিনি এক হ্রদের তীরবর্ত্তি পাহাড়ে উঠিতেছিলেন, মধ্যস্থল হইতে স্খলিতপদ হইয়া ৭০হস্ত নিম্নস্থ এক গহ্বরে পড়িয়া যান; তাঁহার শিক্ষক ও মধ্যম ভ্রাতা ডিউক অব এডিনবরা সঙ্গে ছিলেন, নিকটে গিয়া তাঁহারা দেখিলেন, দেহ রক্তাক্ত, কিন্তু প্রাণের আশঙ্কা নাই; ভগবান রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রিন্সের তৃতীয় বিপদ—দ্বিতীয় পুত্র প্রসব করিয়া রাজকুমারী আলেকজান্দ্রা যখন সূতিকাগারে ছিলেন, সেই সময় প্রাসাদে আগুন লাগিয়াছিল, পত্নীকে ও পুত্র দুটিকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিয়া যুবরাজ স্বয়ং দমকল চালকদিগের সহিত উপরের ছাদ হইতে দমকল চালাইতেছিলেন, অগ্নি-গ্রাসে ছাদ ভস্ম হইলে তিনি পড়িয়া যাইতে ছিলেন, প্রত্যুৎপন্নমতিপ্রভাবে তিনি একটা লোহার কড়ি ধরিয়া ঝুলিয়াছিলেন, লোকেরা সন্তর্পণে তাঁহাকে নামাইয়া আনিয়াছিল। জগদীশ রক্ষাকর্ত্তা। চতুর্থ বিপদ—বেলজিয়মের রাজধানী ব্রসেল নগরের রেলওয়ে ষ্টেসনে সিপিডো নামক এক বালক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী মারিয়াছিল, লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়। রাজ্যেশ্বর হইবার জন্য যাঁহার জন্ম, ফল ফলিবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রাণবিয়োগ জগদীশ্বরের ইচ্ছা নহে, তাহাতেই রক্ষা।

কয়েকটি শোকশল্য যুবরাজের হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছিল। প্রথম পিতৃশোক, দ্বিতীয় পুত্রশোক। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আলবার্ট ভিক্টর ১৮৯২ অব্দের ১৪ই জানুয়ারী অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন; সেই শোক যুবরাজের হৃদয়ে বজ্রসম বাজিয়াছিল। ভারতবাসীগণও কুমার আলবার্ট ভিক্টরকে দেখিয়াছেন। ১৮৯১ অব্দে তিনি ভারতে আগমন করিয়াছিলেন; প্রায় এক বৎসর পরেই ২৭ বৎসর

বয়সে তাঁহার অকাল মৃত্যু। তৃতীয়—মধ্যম ভ্রাতা ডিউক অব এডিনবরা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডিউক অব আলবানির বিয়োগ। চতুর্থ—জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা ভগ্নীর বৈধব্য; অপর ভগ্নী স্নেহবতী এলিসের হঠাৎ মৃত্যু; তৎপরে মাতৃবিয়োগ।

সৈনিক প্রিন্স।



গুরখা সেনানী বেশ।

ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ মধ্যে মধ্যে সৈনিক ও নাবিকাদি নানা বেশ ধারণ করিতেন, গুরখা সৈনিক বেশ পরিধানপূর্ব্বক একবার গুরখা সৈন্যদলকে তিনি গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। গুরখা সেনানী বেশ পরিহিত একখানি চিত্র এইস্থলে সন্নিবেশিত হইল।—

১৯০১ অব্দের ২২এ জানুয়ারী মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বর্গবাসিনী হন, বৎসরান্তে যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস এডওয়ার্ড আলবার্ট সপ্তম এডওয়ার্ড উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্যাভিষিক্ত হন।



রাজার্চ্চন।

শুভমস্তু! শুভদিনে অন্তর-উল্লাসে—
করিলা ভারতবাসী সম্রাট অর্চ্চনা।
সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ, রাজেশ্বরী মেরী—
করিলা ভারতভূমে পূত পদার্পণ;
ডিসেম্বরে দ্বাদশাহে হস্তিনানগরে—
রাজসূয় যজ্ঞসভা বিচিত্র ব্যাপার।
ভারতী রাজন্যবর্গ দিব্য পটাবৃত—

লক্ষ লক্ষ গণ্যমান্য ভারতের প্রজা—
রাজসিংহাসনতলে শির নোয়াইয়া,
অকপটে সঁপিলেন ভক্তি-উপহার।
(ভারতে প্রচার নাম দিল্লী-দরবার।)
দরবারে অনুষ্ঠান বিবিধ প্রকার,
লৌহের লেখনী তাহা বর্ণিবারে নারে।
রাজকার্য্য সমাপিয়া সিংহাসন হ'তে—
ভূপসিংহ সভাতলে নামিবার কালে—
প্রচার করিলা দুটি নূতন আদেশ।
বিষাদ কালিমা মাখা বঙ্গ অঙ্গচ্ছেদ,
(কর্জ্জন-স্থাপিত-কীর্ত্তি অঙ্কিত নিশান)
স্মরিয়া বিষণ্ণমুখে বঙ্গবাসীগণে—
ছয় বর্ষ করেছিলা মহা আন্দোলন ;
হায় হায়! কি অনর্থ ঘটেছিল তাহে,
অশান্তি ব্যাপিয়াছিল সমগ্র ভারতে ;
মহাশয় মহামতি নবীন সম্রাট—
হরিলেন সে কলঙ্ক খণ্ডিয়া সে পাপ।
দুই বঙ্গ এক হ'ল, আনন্দ অপার,
অঙ্গচ্ছেদনের ক্ষত হল নিরাময় ;
পূর্ব্বমত ভিন্নভাবে রহিল আসাম,
কমিশনারের তাঁবে বঙ্গের অধীন।
বিহার উৎকল আর ছোটনাগপুর,
একত্রে গঠিত হল নবীন প্রদেশ,
প্রাচীন পাটলীপুত্র হবে রাজধানী,
লেপ্টেন্যাণ্ট গবর্ণর বসিবেন তথা ;
বঙ্গে রহিবেন এক নব গবর্ণর,
উচ্চ পদে শোভিবেন বেলভিডিয়ারে।
দ্বিতীয় আদেশ কিছু জটিল বারতা,
(বিনা মেঘে বারি বৃষ্টি যথা মহীতলে।)

ইংরাজের অধিকারে বর্ষ দেড়শত—
রাজধানী কলিকাতা আছিল গৌরবে,
সেই রাজধানী এবে সম্রাট ইচ্ছায়,
হেথা হ'তে দিল্লীধামে চলিল উঠিয়া ;
ভারতের রাজধানী হইবে হস্তিনা।
কি ফল ফলিবে এই নব রাজপাটে,
কিছুই বলিতে নারি কার্য্য না দেখিলে।
সমাধিয়া রাজসূয় আনন্দে সম্রাট—
মৃগয়া করিতে গেলা নেপালের বনে,
সুরক্ষণে অগ্রবনে রহিলা মহিষী,—
বাঁকিপুরে পুনর্ব্বার হইল মিলন ;
চড়িয়া বাষ্পীয়রথে বাঁকিপুর হ'তে—
আসিলেন রাজারাণী কলিকাতাধামে।
নব বর্ষ প্রবেশের দুইদিন আগে,
রাজধানী কলিকাতা পবিত্র হইল ;
সে দিন যে কি আনন্দ কহনে না যায়,
লক্ষ লক্ষ মুখে সুখে জয় জয় রব ;
সহস্র সহস্র রক্ষী পদাতি সৈনিক—
মহোৎসবে সমারোহ প্রিন্সেপ ঘাটে ;
বাজিল মঙ্গলবাদ্য সুমধুর তানে,
দুর্গশিরে বজ্রনাদে গর্জ্জিল কামান ;
ধন্য ধন্য হর্ষধ্বনি জনতা ভেদিয়া—
উঠিল গগনপথে সহ প্রতিধ্বনি।
অভিনন্দনের পাঠ, রাজ অভ্যর্থনা,
মঙ্গলকামনা পূর্ণ রাজার উত্তর।
অনন্তর রাজারাণী সৈনিক বেষ্টিত—
চতুরাশ্ব সংযোজিত রমণীয় রথে—
প্রবেশিলা পূর্ণানন্দে রাজনিকেতনে।
স্বাধীন করদ মিত্র ভারতীয় রাজা,

কৌতূহল-পরিপ্লুত দেশবাসীগণ—
শত শত মহামান্য বিদেশী প্রবাসী—
রাজ-দরশন তরে তথা সমবেত ;
রাজপ্রতিনিধি শ্রেষ্ঠ হার্ডিঞ্জ ধীমান—
রহিলা বারাকপুরে সহ পরিবার ;
প্রাসাদে রহিলা সুখে সম্রাট-দম্পতি।
নব দিবা নব রাত্রি এ মহানগরে—
কত যে আনন্দস্রোত বহিল চৌদিকে,
একে একে বর্ণিবারে নাহিক শকতি।
হর্শ-রেস্, বোট্-রেস্, সেনাপ্রদর্শিনী
অশ্বপ্রদর্শিনী মেলা অপরূপ শোভা ;
পোলো খেলা, টাট্টু খেলা, ছাত্রপরিতোষ,
নৃত্য, ভোজ, মহোল্লাস, লেভি, দরবার,
আমন্ত্রণ, অভ্যর্থনা, সমাগত জনে ;
অপূর্ব্ব আতস-বাজী কেল্লার ময়দানে,
বিচিত্র আলোকমালা পরি কণ্ঠদেশে,
শোভিল নগরী যেন অমর-নগরী !
বিজলী, বাষ্পীয় আলো বিচিত্র বরণ,
তৈলগর্ভ দীপমালা একত্র মিশিয়া—
সমুদিত সুধাকরে দিল হারাইয়া।
সমস্ত নগরী শোভে দীপাবলী পরি,
ছোট বড় ভেদ নাই, সবারি আলয়—
নক্ষত্রমালাতে যেন হ'ল বিভূষিত।
কাঁপে হস্ত, লিখিবারে ঘটা জনতার ;
লক্ষ লক্ষ নরনারী স্বদেশী বিদেশী—
ঠাসাঠাসি, পেষাপেষী, এসেছিল যারা—
পদব্রজে, শোভা হেরি বিমোহিত তারা ;
স্তরে স্তরে শ্রেণীবদ্ধ অসংখ্য শকট,
অগণিত নরনারী তাহার ভিতরে ;

তাহাতেও অকুলান, স্থান না কুলায়,
বাধ্য হ'ল কত লোক বৃক্ষ আরোহণে :
এহেন জনতা পূর্ব্বে এ মহানগরে—
একস্থানে কোনকালে কেহ দেখে নাই!
কৃপালু সম্রাট্‌চূড়া অশ্বে আরোহিয়া,
সবারে দিলেন দেখা সহাস্য বদনে।
হেরিয়া সে রাজরূপ নয়ন ভরিয়া,
প্রাণভরা পরিতোষ সবার নয়নে—
হাসিমুখ শিশুসম করিয়াছে খেলা।
দু'হাত তুলিয়া সবে রাজভক্তিযোগে—
নমিয়াছে নৃপেন্দ্রেরে পরাণ খুলিয়া :
রাজাও তেমনি রাজা, কৃপার সাগর,
উদারতা-অবতার শূন্য-অভিমান :
হাসিয়া তুলিয়া হাত করি নতশির,
ফিরাইয়া দিয়াছেন সেলাম সবার।
ক্লান্তিবোধ হয় নাই ক্ষণেকের তরে,
সমাদরে সেলামিতে লক্ষ লক্ষ জনে ;
ইতিমধ্যে একদিন প্রশস্ত প্রান্তরে—
শোভাযাত্রা হয়েছিল পরম সুন্দর ;
গজ, বাজী, উষ্ট্র, নর, সাজি নানা বেশে,
একত্রে ভ্রমিয়াছিল অতি পারিপাটি ;
নহবৎ, বীণা, বাঁশী, ডঙ্কা বাজাইয়া,
গজারোহী হয়ারোহী উষ্ট্রারোহিগণে,
তুষেছে দর্শকবৃন্দে অদ্ভুত কৌতুকে।
আনন্দের সর্ব্ব অঙ্গ পূর্ণ সমভাবে—
পুলিশের প্রণালীর সুশৃঙ্খলাগুণে ;
তত জনতায় কিছু ঘটেনি প্রমাদ।
রবিবারে সহরের সঙ্গীত সমাজ—

উত্তর সাধক সার হ্যালিডে, ম্যাডক্;
সম্রাটের আগমনে মঙ্গল আচারে
মহাযত্নে করাইলা কাঙ্গালীভোজন।
বিংশতি সহস্র সংখ্য অনাথ অনাথা,
বালকবালিকাসহ চিত্তপরিতোষে,
ভোজন করিল সুখে খিচুড়ী মিঠাই;
ভোজনান্তে জনে জনে সরাপূর্ণ করি,
পাইল উত্তম লুচি মিঠাই সন্দেশ,
জনে জনে লভিলেক বিলাতী কম্বল।
পূর্ণানন্দ মহোৎসব দরিদ্রভোজনে।
বিংশতি সহস্র মুখে উচ্চ কলরবে—
উচ্চারিল জয় জয় সম্রাটের জয়,
জয় জয় রাজ্যেশ্বরী নিত্য দয়ানয়ী।
শুধু কাঙ্গালীরা নয়, সমগ্র ভারত—
মুক্তকণ্ঠে গাহিতেছে বিজয়ের গান;
রাজ্যেশ্বর রাজ্যেশ্বরী সুদীর্ঘ জীবনে—
লভুন বিমলা শান্তি সহ পরিবার,
ভারতে অক্ষয় হ'ক ব্রিটিশ প্রতাপ।
প্রভাতিলে জানুয়ারী সপ্তম রজনী,
অষ্টম দিনের সূর্য্য উদিলে আকাশে,
সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহিষী সংহতি—
বিদায় লইয়ে দোঁহে সবার নিকটে,
আরোহী বাষ্পীয় পোতে প্রিন্সেপ ঘাটে,
উত্তরিলা পরপারে বেলা দ্বিপ্রহরে;
আরোহী বাষ্পীয় রথে, তুষিয়া সবারে,
করিলা স্বদেশযাত্রা, গরজিল তোপ।
রাজদম্পতি ভারতের মঙ্গলের তরে,
করি গেলা কতগুলি শুভ অনুষ্ঠান;
সমাচার পত্রে তাহা দেখিবেন সবে।

শিল্পকার্য্যে শিক্ষাকার্য্যে বিধবা পালনে,
মুক্তহস্তে কত অর্থ করিলেন দান।
সে দানের বিনিময়ে শত ধন্যবাদ,
অর্পিতেছি ভক্তিভাবে সম্রাট-চরণে।
অহো! কি নির্ব্বেদ বাণী! সম্রাট বিদায়!
নব দিবা, নব রাত্রি কি আনন্দ ছিল,
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ সবার হৃদয়;
রাজধানী কলিকাতা হয়েছিল আলো,
সহসা হইল একি! দশম দিবসে—
অকস্মাৎ চারিদিক হেরি অন্ধকার!
নিরানন্দে কলিকাতা ম্রিয়মান যথা—
বিজয়া বিকালে বঙ্গ, দুর্গাবিসর্জ্জনে।

সমালোচন।

প্রতিধ্বনি।—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত, মূল্য বারো আনা।

এই পুস্তকে নানা বিষয়িণী অনেকগুলি কবিতার ধ্বনি আছে; একে একে সকলগুলি পাঠ করিয়া আমরা কাব্যপ্রেমে মধুকরের ন্যায় অমৃত পান করিলাম। নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ইহা যাঁহারা জানেন, বাঙ্গালা নাটকে কাব্য প্রবেশন ও কাব্যের আদর তাঁহারা নিশ্চয়ই অবগত হইয়াছেন। বাবু গিরিশচন্দ্রের কবিত্বশক্তির নূতন পরিচয় দিতে হইবে না, তৎপ্রণীত রসমাধুরীপূর্ণ কবিতা নেত্র সমীপে ধরিলে আমরা সেই সকল কবিতার ছত্রে ছত্রে যেন তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন করি। কবিতার কল্পনার প্রাধান্য কিন্তু এই প্রতিধ্বনির কবিতাগুলিতে সঙ্গীতার ছবি দেখিয়া কল্পনাদেবী কিছু সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমাবর্ণনে কবিবর যেরূপ সুকৌশলসম্পন্ন উচ্চভাব দেখাইয়াছেন, বহুদিন সেরূপ বিমলভাব দর্শন করি নাই। ঘোর ঘনাচ্ছন্ন অন্ধকার আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকে, ঘন ঘন ভাবণ নিনাদে বজ্রগর্জ্জন হয়; মানবমাত্রের হৃদয় কাঁপিয়া যায়, কিন্তু ক্ষুদ্র পক্ষী চাতক সেই ভীষণ বজ্রনাদের অপেক্ষা করিয়া মেঘের

নিকটে স্ফটিক জল চায়। প্রতিধ্বনিতে চাতকের চিত্র আছে, অধিক প্রশংসার বিষয় এই যে, এই পুস্তকের সমস্ত কবিতাতেই বঙ্গ চাতকের ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। দীন দাতাকর্ণ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করিয়া কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"বঙ্গ সম কোথা হেন তোমার অভাব,
কোথা হেন অন্ধ দীনগণ ?
কোথায় বিলাবে তব অতুল প্রভাব—
কাতরে কে ক'রেছে স্মরণ ?
× × ×
আজীবন পরহিতে আত্মসমর্পণ,
কারে দে'ছ মহাভার করিতে বহন ?
কারে দে'ছ দীনজনে, কারে দে'ছ ছাত্রগণে,"
× × ×

এই প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া যাইবে না। শুষ্কপ্রাণের বর্ণনাগুলি যেমন সান্ত্বনা দানে সমর্থ, তেমনি আবার তপ্তহৃদয়ের হোমকুণ্ডের পূর্ণাহুতি। সূক্ষ্ম সমালোচক বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার এই পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "ধ্বনি ক্ষণস্থায়ী, প্রতিধ্বনি আবহমানকাল স্থায়ী।" এ বাক্যের খণ্ডন নাই। আধুনিক অনেক কবির পদ্মফুল গিরিশচন্দ্রের ধুতরাফুলের নিকট পরাভব মানিয়াছে। আশা করি কবিবরের এই ধ্বনিগুলির প্রতিধ্বনি অনন্তকাল স্থায়ী হউক।

রত্নহারা বঙ্গ।

বঙ্গের আর একটি অমূল্য রত্ন অকস্মাৎ তিরোহিত হইল! বঙ্গ-নাট্যশালার জন্মদাতা ও নাট্যগুরু কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত ২৪এ মাঘ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১টা ২০ মিনিটের সময় অনিত্য নরকলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক লীলাময়ের অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার অগণিত বন্ধুবান্ধব সহসা বজ্রাহতের ন্যায় দারুণ শোকাহত হইয়াছেন। আগামী মাসের জন্মভূমি পত্রিকায় আমরা গিরিশচন্দ্রের স্মরণীয় জীবনী আলোচনা করিব; সময় ও স্থান উভয়ই এবারে সঙ্কীর্ণ।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৯শ বর্ষ। } ১৩১৮ সাল, ফাল্গুন। { ১১শ সংখ্যা।

অনাথ-সেবা।

লেখক—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ।

আমাদের হিতৈষিণী শ্রুতি বলিয়া গিয়াছেন, সৃষ্টি রজোগুণে। কি জীবনচরিত, কি ইতিহাস, কি কাব্য, কি নাটক, কি উপন্যাস সর্ব্বত্রই রজোগুণের তাণ্ডবনৃত্য। যে কোন জাতির মহীয়ান কার্য্য, যাঁহার সুখ্যাতিতে ইতিহাসের কত পৃষ্ঠা ব্যয়িত, কত জীবনচরিত প্রণীত হইয়াছে, লক্ষ্য কর, দেখিবে, সকলেরই উৎপত্তি রজোগুণে; সকলকার প্রাণই এই রজঃ। সভাসমিতি, বিদ্যালয়, ধর্ম্মাধিকরণ, উপাসনাস্থল, সর্ব্বত্রই আড়ম্বরতার কলুষচিত্র বিচিত্রিত; তথাকার জড় ভিত্তি ও স্তম্ভগাত্রে রজো রাগ যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের বিদ্যাশিক্ষা ও অধ্যাপনা, শুধু যশ, মান ও প্রতিষ্ঠার জন্য ; আমাদের অর্থদান, সংবাদপত্রে প্রশংসার বীণানিক্কণ, দেশব্যাপী খ্যাতির ভেরীধ্বনি, রাজ-পুরুষ দত্ত ধন্যবাদের পটহশব্দ শুনিবার জন্য। সৎকার্য্যে যশ আকাঙ্ক্ষা, উপাসনায় প্রতিষ্ঠালাভ, উপকার বিনিময়ে প্রভুত্ব স্থাপন করাই আমাদের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গৃহীত যষ্টিক অনন্যসহায় অন্ধকে তাড়াইয়া, গৃহাগত দীন ভিক্ষুককে প্রত্যাখান করিয়া চক্ষুর সম্মুখে পতিহীনা বিধবার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে উপেক্ষা দেখাইয়া আমরা সাম্যনীতি রক্ষা করি। অথচ কথায় কথায় চাঁদার খাতায় সহস্র সহস্র মুদ্রাদানে প্রতিশ্রুত হই ; নগরসংস্কার, স্মৃতিরক্ষা, আনন্দোৎসবের জন্য অকাতরে কত অর্থদান করিয়া থাকি।

নির্জ্জনে, শান্তিময় আশ্রমে—অকলুষ চিত্তে আমরা উপাসনা করি না, শমদম তিতিক্ষা জপ, তপ, ধ্যান ধারণার দিকে অগ্রসর হই না, সংযম ব্রহ্মচর্য্য দেবগুরু-ভক্তির অনুশীলনে মন দিই না। ভক্তিরসার্দ্র অন্তঃকরণে পরমপিতার শুভ আদেশ পালন করাই যে, আমাদের মনুষ্যত্ব, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। পটহ-ধ্বনিমুখর, সঙ্গীতরাগমুখরিত উপাসনা ক্ষেত্রে দলে দলে গমন করিলেই আমাদের তৃপ্তি ; শ্রোতার কর্ণভেদ করিয়া উচ্চকণ্ঠে সভা মাতাইতে পারিলেই আমাদের সুখ ; যথেচ্ছাচারিতার পথে বিচরণই আমাদের সাধনা ; সুখভোগের পঙ্কিল-প্রবাহে গা ভাসাইতে পারিলেই আমরা ধন্য হইয়া যাই। হায়! আমরা এতই অসার!

গীতার অনুবাদ বা ধর্ম্মপ্রবন্ধের গোটাকয়েক ছত্র পাঠ করিয়া আমরা নিষ্কাম ধর্ম্মের বড়াই করি ; সংসারজালে বদ্ধ জীব হইয়া জনক রাজার দৃষ্টান্ত দিতে লজ্জা বোধ করি না। প্রক্ষিপ্ত রূপক, অসঙ্কীর্ণতা, অসম্ভবতার দোহাই দিয়া সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ ও সর্ব্বত্যাগী ব্রাহ্মণগণকে অযথা নিন্দা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে কুণ্ঠিত হই না।

অশ্বহ্রেষিত গজবৃংহিত রণক্ষেত্রে সৈন্যকোলাহলের মধ্যে প্রাণবিসর্জ্জন দেওয়া সহজ, বাহ্যজগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করায়ও তাদৃশ পৌরুষ প্রকাশ হয় না। জলমজ্জনোন্মুখ অসহায়ব্যক্তির জীবনরক্ষা, উৎকট রোগাক্রান্ত রোগীর শুশ্রূষা, অনশন ক্লিষ্ট দরিদ্রকে অন্নদানই সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তম ধর্ম্ম। ধর্ম্ম কি ? ইহার উত্তরে বিপন্নবৎসল আর্য্যবংশীয়েরা বলিয়া গিয়াছেন "ভূতদয়া"। জীব-দুঃখকাতর ঋষিগণ,

যাহারা গৃহাগত অতিথিকে তাড়াইয়া দেয়, সেই পাপিষ্ঠগণের নরকবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আজকাল যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান দেখা যায়, অভিমান, যশ, প্রতিষ্ঠা ও উপাধি লাভেচ্ছাই তাহার প্রধানতম উদ্দেশ্য; তাই জীব হিতকর কার্য্যের মধ্যে কামনার ছায়া সুস্পষ্ট প্রতিফলিত দেখিতে পাই।

এই রজোরাগের তীব্র লোহিতবর্ণ দেখিয়া দেখিয়া চক্ষু ঝল্‌সিত হইয়া গিয়াছে; তাই দেখিতে চাই, সত্বগুণের শুভ্র নির্ম্মল প্রকাশ। পদ্মার ভীতিপ্রদ বিশাল আবর্ত্ত, অপরিসীম জলরাশি, কূলপরিপ্লাবি তটভূমি আর দেখিতে চাহি না; দেখিতে চাই—কুল-কুল-নাদিনী মৃদূর্ম্মিমালিনী স্বচ্ছতোয়া বননদীর মৃদু তরঙ্গ সম্পাত; সকামের আড়ম্বরতার মধ্যে নিষ্কামের শান্তিময়ী মূর্ত্তি বড়ই মনোহরা। পরার্থপরতার বারিধি-বক্ষে স্বার্থপরতাকে জলবিম্বের মত ডুবাইয়া দিতে না পারিলে মানুষ কখন মানুষ হইতে পারে না। এই নিঃস্বার্থপরতার মহত্বে যাহাদের কল্পনাশক্তি উত্তেজিত হয় না, তাহারাই গতানুগতিক পৃথিবীর ভার মাত্র।

"স ক্ষুদ্রাণ্য সর্ব্বদাবর্ত্তিনী ভূতানি ভবন্তি।"

এই জীবহিতৈষণার মত সদিচ্ছা আর নাই, এ কার্য্যের অপেক্ষা গরীয়ান আর কোন কর্ত্তব্য নাই। আর এই শুভকার্য্যে কোন বাধা বিঘ্নও নাই, কারণ বাধা শত্রুতা-বা নিন্দাবাদের মধ্য দিয়া রজোভাব ভালরূপ ফুটে না বটে, কিন্তু স্বপ্রকাশ সত্বগুণের প্রকাশে কোন বাধা নাই। সচ্চিদানন্দ চৈতন্যপথে কোন আবরণ নাই। তবে যদি এই ঐশীপ্রেরণাজাত সাত্বিকতার মধ্যে যশ মান প্রতিষ্ঠার আড়ম্বরতা প্রবেশ লাভ করে, তবে সেই আড়ম্বরাংশ বিঘ্নশূন্য হইবে না। অন্তর্জ্জগতের উপর বাহ্যভাব যে অংশে বা যে পরিমাণে আধিপত্য বিস্তার করিবে, সেই অংশ সেই পরিমাণে বিঘ্ন বহুল হইবে। নিজ নিজ কার্য্য সমাধা করিয়া যাও, যশ মান, প্রতিষ্ঠা হয় হউক, তাহার অপেক্ষা করিও না, তাহাতে বিহ্বল হইয়া পড়িও না, ঘৃণা উপেক্ষার ব্যর্থ আক্রোশে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলে চলিবে না। গীতোক্ত উপদেশে ভগবানে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া অনাসক্ত চিত্তে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিয়া যাও।

এই অনাথসেবা অপেক্ষা ধর্ম্মের আর উচ্চ আদর্শ নাই, ঋষিরা যথার্থই বুঝিয়াছিলেন, তজ্জন্যই বলিয়া গিয়াছেন, "যাহার গৃহ হইতে ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক ভিক্ষা না

পাইয়া, নিরাশ্রয় আশ্রয়লাভে বঞ্চিত হইয়া, রোগী সান্ত্বনা, সহানুভূতি শুশ্রূষালাভ না করিয়া ফিরিয়া যায়, সেই হতভাগ্যের গৃহে লক্ষ্মী থাকেন না, ধর্ম্ম থাকে না, সে গৃহ শ্মশানবৎ নিরানন্দ নির্জ্জীব।" হিতোপদেশেই উক্ত আছে, "অভ্যাগত ব্যক্তি সকলকার গুরু।"

বুদ্ধদেব বলেন, "যজ্ঞে বেদী সাজাইয়া, পশুবলী দিয়া ধর্ম্মযাজনা হয় না। ধর্ম্ম আত্মোৎকর্ষ সাধনে, পুণ্য দয়াবৃত্তির অনুশীলনে।" আর বেদান্তের আত্মজ্ঞানই ত সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, সর্ব্বজীবে এক চৈতন্যজ্ঞান।

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতাণি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানাং ততোন বিজিগুপ্সতে॥ কঠোপনিষৎ।

ভীমসেনের শরণাগত রক্ষা, দাতাকর্ণের পুত্রের শিরশ্ছেদন, শিবির নিজ মাংস কর্ত্তনই প্রকৃত উচ্চাঙ্গের ধর্ম্ম। হরিশ্চন্দ্রের পৃথিবীদান অপেক্ষা ইহাদের গৌরব অধিক।

শঙ্করাচার্য্য ভিক্ষার্থ যাইবার উপক্রম করিলে, তাঁহার শিষ্যেরা বলেন, "গুরুদেব! আমরা থাকিতে আপনি ভিক্ষায় কেন যাইবেন?" শঙ্করাচার্য্য উত্তর দেন, "আমার ভিক্ষায় যাইবার ত শক্তি আছে, আমার চলচ্ছক্তির ত অভাব নাই, আমি সহ্য করিতে অভ্যস্ত। যাহারা নিরাশ্রয়, ক্ষুধাপীড়িত, চলচ্ছক্তি হীন তাদের দেখিও, তাহা হইলে আমাকে দেখা হইল।"

"সবাকার হৃদে এক নারায়ণ।
হর্ষে সুখী দুঃখে দুঃখী সবাকার মন॥"

হে অনাথসেবক দেবকুমারগণ আজ যে কার্য্যে তোমরা অগ্রসর হইয়াছ, তাহা সার্ব্বভৌমিক উদারতার কার্য্য। ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা, তোমাদের এ মহত্ত্ব আরও বৰ্দ্ধিত, দেশব্যাপী ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার সহায় হউক, দেখিও যেন সাধারণ সঙ্কীর্ণতা স্থান না পায়, নরত্বের চিরন্তন কল্যাণের মধ্যে দুর্ব্বলতা জনিত ঔদাসীন্য না প্রকাশ পায়। তোমাদের ক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে বিস্তৃততম করিয়া লও, এ বিস্তার দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের মত নহে। সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ছড়াইয়া দয়াবৃত্তির এরূপ বিস্তার সাধন কর যাহাতে মনোবৃত্তি তাহার সীমাবদ্ধ প্রসারতা ত্যাগ করিয়া সার্ব্বভৌমিক সমতায় ডুবিয়া যাইতে পারে। মহা উদ্দেশ্যের তন্ময়তার গর্ভে সমস্ত বাহ্যকোলাহল ডুবিয়া যাউক, লজ্জা, সঙ্কোচ, অভিমান যেন ইহার বিরুদ্ধাচরণ না করে; দীন-

দরিদ্রের সমবেত আশীর্ব্বাদে তোমাদের শুভানুষ্ঠান সফল হউক, মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় শান্তি হউক।

গীত।

লেখক,—৺গিরীন্দ্রনাথ মিত্র।

কীর্ত্তনের সুর।

সংসার যবে আঁধার হয়ে যায়, আর কিছু লাগে না ভাল,
কে তুমি কোথা হতে এসে, কাঁদ্‌লে আমায় কোলে কর।
(কোথায় তুমি থাক হে)
কত কথা কও, কত আশা দাও, কতই ভালবাস,
তথাপি আমার প্রাণ, করে আন্‌চান, দেখিনা তব মুখ;—
(এমন কেনই বা হয় হে)
কত কাঁদি আমি, জান তুমি অন্তর্য্যামী, আর কতই কাঁদিব,
কেঁদে কেঁদে হই সারা, না থাকি তোমা ছাড়া, কেন কি বুঝিব।
কাঁদি যত অবোধের মত, কোলে কোরে লও তত, কত কথা বল।
কাঁদিস্‌না বাছা আর, বুক ফেটে যায় আমার, বল্ তোরে কি দিব;—
কত আনিয়াছি আমি তোরে দিবার তরে,
তুই যদি আমার হলি, আর কিছুই না চাহিলি,
কত সুখী তোরে করিব;—
মরিলে জীবন পাবি, অমর হইয়ে রবি,
কত সুধা আমি তোরে দিব;—
(তোর ভাবনা কিরে)



শিবচতুর্দ্দশী।

ধন্য তুমি ব্যাধের নন্দন!
তোমা হ'তে প্রচারিত শিবরাত্রি ব্রত।
ফাল্গুনী অসিতপক্ষ চতুর্দ্দশী যোগে,
প্রভাতে পশিয়াছিলে গহনকাননে—
মৃগয়ায়; অনাহারে ধনুর্ব্বাণ করে;
সারাদিন বনে বনে করিয়ে ভ্রমণ,
বধিলে হরিণ এক হৃষ্টপুষ্ট কায়।
প্রদোষে উঠিল ঝড়, আঁধারিয়া দিশি,
মুষলের ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল;
দিশেহারা হয়ে তুমি মৃগ লয়ে কোলে,
নিকটের বিল্ববৃক্ষে কৈলে আরোহণ।
অবিশ্রান্ত ঝড়বৃষ্টি সমস্ত রজনী,
ছিলে তুমি তরূপরে করি জাগরণ;

প্রভাতে আসিলে নামি মৃগ, ধমুচ্ছলে,
নেহারিলে বিল্বমূলে পার্ব্বতী-শঙ্কর,
তাহাতেই হয়েছিল তব ভাগ্যোদয়।
বিল্বমূলে বিরাজেন মহেশ-পার্ব্বতী,
জানিত না সে বারতা অজ্ঞান আকুটী;
শিহরিল কলেবর, নোয়াইয়া শির—
প্রণমিল হরগৌরী চরণকমলে।
বিধির নির্ব্বন্ধ লীলা অতি চমৎকার,
কার ভাগ্যে কিবা ফলে, কে বলিতে পারে?
দৈবযোগে বৃক্ষতলে চক্ষু পালটিতে,—
কাল সর্পাঘাতে তার হইল মরণ;
উপস্থিত যমদূত, লইতে তাহায়,
দর্পভরে নিবারিল আসি শিবদূত।
যমদূত কহে আমি ধর্ম্মের কিঙ্কর,
লইতে এসেছি এই দুরাচার ব্যাধে,
তুমি কে, কিসের বলে কর নিবারণ?
কহিলেন শিবদূত, শিবদূত আমি,
ছুঁইতে এ দেহ তুমি না পাইবে কভু।
দুরাচার বলিতেছ কোন্ অহঙ্কারে?
মহাপুণ্যবান এই ব্যাধের কুমার।
কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী পেয়ে প্রাক্তনের ফলে,
দিবারাত্রি জাগিয়াছে উপবাস করি,
কিসে যে কি ঘটিয়াছে, নাহি জানে কিছু,
ফলিয়াছে শুভ ফল, ভাগ্যে লেখা ছিল।
বৃষ্টিজলে বিল্বদলে বিনা-ভক্তিযোগে,
করিয়াছে শিবপূজা, (যদিও অজ্ঞান,)
যমের কি সাধ্য আছে স্পর্শিতে ইহারে?
শিবদূত বাণী শুনি যমের কিঙ্কর—
চক্ষু ঘুরাইয়া চাহে বিল্বতরুমূলে,

পাপচক্ষে নেহারিল শিবদুর্গা রূপ ;
আর কি সেখানে থাকে ? করে পলায়ন।
পবিত্র ব্যাধের আত্মা শিবব্রত ফলে—
পুণ্যময় শিবলোকে করিল প্রয়াণ।



দোলযাত্রা।

কুম্ভরাশিস্থিত ভানু, শুক্লা চতুর্দ্দশী,
দিবা অবসান প্রায় ; পশ্চিম গগনে—
ঝিকি মিকি করিতেছে রাঙা রবিছবি,
মৃদু মৃদু বহিতেছে দক্ষিণ অনিল,
মুকুলিত সহকার-পল্লবে লুকায়ে—
কুহরে পঞ্চমস্বরে বসন্তের পিক,
দূরে দূরে শ্রুত হয় কোকিলা-ঝঙ্কার,
শ্রবণে মধুর কণ্ঠ মুগ্ধ হয় প্রাণ।

অতি রমণীয় স্থান, রমণীয় কালে,
খেলিছেন গোষ্ঠমাঝে কৃষ্ণ-বলরাম।
অতি রমণীয় দৃশ্য বসন্ত প্রদোষে—
শোভিত হসিতাননা প্রকৃতিসুন্দরী।
এ হেন সুখদ স্থানে, এ হেন সময়ে,
তৃণকাষ্ঠ আহরিয়া কানাই বলাই—
কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘরষিয়া জ্বালি হুতাশন,
করিলেন বহ্ন্যুৎসব সানন্দ অন্তরে ;
আকাশে উঠিল চাঁদ পঞ্চদশ কলা,
আলোকিল গোষ্ঠভূমি উজলকিরণে ;
ভূতলে জ্বলিছে বহ্নি মিশি চন্দ্রকরে,
নভঃ পটে জ্বলিতেছে শুভ্র সুধাকর,
চৌদিকে নক্ষত্রমালা হাসিছে বেড়িয়া,
লক্ষ লক্ষ দীপাবলী চন্দ্রসোহাগিনী।
কভু চন্দ্রপানে দৃষ্টি, কভু ভূমিতলে—
দুটি ভাই কুতুহলী সে শোভা দর্শনে।
নাচিলা মুরলীধর বাজায়ে মুরলী,
নাচিলেন হলধর মত্ত সুধাপানে।
কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরীর রবে,
ছুটে আসে গোপীকারা, পুরাণে বর্ণনা,
কিন্তু এই ব্রজগোষ্ঠে বাজিল বাঁশরী,
কোন গোপী আসিল না অসম্ভব কথা।
কিছু অসম্ভব নয় সম্ভবে সকলি,
ব্রজধামে লীলাখেলা কৃষ্ণের ইচ্ছায় ;
যামিনীতে গোপীকারা ছিল অদর্শন,
মনোহরা অষ্টসখী ঊষা আগমনে,
হাসিমুখে দেখা দিল সংহতি শ্রীমতী ;
অপূর্ব্ব মাধুরীরাশি যত গোপবালা,

শোভিল অপ্সরা যথা গলে বনমালা,
বনমালা পরাইল বনমালী গলে,
কোথা গেলা বলরাম নাহি নিদর্শন।
লতাপাশে শাখে শাখে বাঁধিয়া হিন্দোল,
করতালি দিয়া নাচে গোপিনীমণ্ডলী।
প্রেমানন্দে রাধাসনে শ্রীনন্দদুলাল—
কৌতুকে যুগলরূপে দুলিলেন দোলে ;
এই দোল দেবদোল নামে অবিহিত,
পিচকারী বরষিল অষ্টসখী মিলি,
নাচিল মধুরতালে, বাজায়ে নূপুর,
গাহিল মঙ্গল-গীত, রাধাকৃষ্ণ দোল।
[illegible]ই দোল তদবধি প্রসিদ্ধ ভারতে,
আ[illegible] হইতেছে দোলের উৎসব।
হিন্দুস্থা[illegible]ব্রজবাসী আনন্দে মাতিয়া—
হোলী [illegible]দিয়া সবে হোলী খেলা করে।
দিনে দিনে এ উৎসবে ঘটেছে বিকার,
খোট্টার খেউড়গীতে কর্ণ ঝালাপালা।
বাঙ্গালি! আনন্দ কর পবিত্র উৎসবে,
পবিত্র সঙ্গীত গাও রাধাকৃষ্ণপ্রেমে,
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্মে করি প্রণিপাত,
কৃপাদৃষ্টি করিবেন প্রভু ব্রজনাথ।

———:o:———

কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ

স্বর্গধামে।



"একে একে নিবিছে দেউটী!" বঙ্গীয় সাহিত্য-মন্দিরের একটি সমুজ্জ্বল দেউটী নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল! বঙ্গের কবিরত্ন গিরিশচন্দ্র প্রতিভা নির্ব্বাপিত হইয়াছে! সে প্রতিভা যে, কতদিনে কোন দেশে পুনঃ প্রদীপ্ত হইবে, কালের অধিষ্ঠাত্রীদেবতাই তাহা জানেন।

আত্মা অবিনাশী; পাঞ্চভৌতিক দেহের ধ্বংস আছে, আত্মার ধ্বংস নাই; জলৌকার তৃণান্তর গ্রহণ এবং জীবের জীর্ণ বস্ত্র পরিহার পূর্ব্বক নববস্ত্র পরিধান, পূর্ব্বদেহ আর আত্মীয়-স্বজনের নয়নগোচর হয় না, ইহাই মৃত্যুনামে অভিহিত। এই মৃত্যু জনিতই বিয়োগ শোক। এই মূলতত্ত্বে যাঁহাদের অখণ্ড বিশ্বাস,—মায়ার ছলনাসত্ত্বেও তাঁহারা শোকে নিতান্ত অভিভূত হন না; এই বিশ্বাসেই

আমরা গিরিশচন্দ্রের পুত্রকে এবং সহোদরাদি আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণকে সান্ত্বনা দান করিতে প্রস্তুত। কেননা, আত্মাকে স্মরণ করিলেই জাগ্রতাবস্থায় অথবা নিদ্রিতাবস্থায় মুদিতনেত্রে অবিকল সজীব মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ইহ-জগতে নাই, অথচ যেন ধ্যানযোগে আমরা তাঁহার সেই প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি প্রত্যক্ষের ন্যায় দর্শন করি।

২৫এ মাঘ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১টা ২০ মিনিটের সময় কবিবর গিরিশচন্দ্রের আত্মা অনিত্য ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, উষাকাল আগত হইবার পূর্ব্বেই এই শোচনীয় বার্ত্তা এতন্নগরে ও নিকটবর্ত্তী উপনগর সমূহে প্রচারিত হয়, সূর্য্যদেব উদিত হইবার পূর্ব্বেই বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীগণ এবং উদ্বোধন কার্য্যালয়ের ভক্তগণ আকুলিত চিত্তে বাগবাজার বসুপাড়ার বাটীতে উপনীত হন; উপরতের পবিত্র দেহটি শুভ্রবসনে আবৃত করিয়া, কেবল মুখখানি অনাবৃত রাখিয়া, সুস্নিগ্ধ চন্দনরসে ললাটদেশে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" নাম লিখিয়া দেওয়া হয়; অনন্তর বেলা অষ্টম ঘটিকার সময় পুষ্পসজ্জিত খট্টায় দেহটি আরোপিত করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন ও হরিধ্বনি করিতে করিতে কাশীমিত্রের ঘাটে ভাগীরথীতীরে নীত হয়; দেখিতে দেখিতে নগরবাসী অসংখ্য বন্ধুবান্ধব অগণিত শকটারোহণে ভাগীরথীকূলে উপস্থিত হন, অতঃপর যথারীতি পবিত্র জলে দেহসিক্ত করিয়া নববস্ত্র ধারণ করাইয়া, গলদেশে পুষ্পমাল্য শোভিত করিয়া, "হরিনারায়ণ রামকৃষ্ণ" নামোচ্চারণে চন্দনকাষ্ঠ, অগুরু, কর্পূর ও ঘৃতাদি সংযোগে দাহ করা হয়, পুনঃ পুনঃ "রামকৃষ্ণ নারায়ণ হরি" নামানুকীর্ত্তন; বেলা অপরাহ্ণ তৃতীয় ঘটিকার সময় কবিবরের নিষ্কলঙ্কদেহ ভস্মীভূত হইয়া যায়।

পরদিন শনিবার উপরত নাট্যাচার্য্যের সম্মানার্থ সহরের বাঙ্গালীটোলার প্রকাশ্য থিয়েটারগুলিতে অভিনয় বন্ধ ছিল। সেই রাত্রেই সকলে বুঝিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র-বিরহে বঙ্গীয় নাট্যসংসার অন্ধকার হইয়া গেল।

১২৫০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে বাগবাজারের পৈতৃক ভদ্রাসনে গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতামাতা পরম স্নেহযত্নে তাঁহার লালনপালন করেন পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে স্থানীয় গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় তাঁহাকে মাতৃভাষা শিক্ষার্থ প্রেরণ করা হয়, দুই বৎসর পরে তাঁহার ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রবেশ; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোপযোগী পুস্তকগুলি অধীত হইয়াছিল; ঘটনাবিপর্য্যয়ে পরীক্ষা দিয়া উপাধিগ্রহণ করা হয় নাই; সেই মনস্তাপে গিরিশবাবু স্বীয় ভবনের

একটি নিভৃত কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিবারাত্রি সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিবিধ জ্ঞানগর্ভ পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন; কাব্য, নাটক, ইতিহাস, বিজ্ঞানশাস্ত্র ব্যবহার-শাস্ত্র ও সাহিত্যাঙ্গের সর্ব্বপ্রকার অভিজ্ঞতালাভ তাঁহার স্বকীয় অধ্যবসায় ও অনুশীলনের ফল।

গিরিশবাবুর যখন চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম, সেই সময় (১২৬৪ সালে) একরাত্রে বাগবাজারের ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীতে সেই হাফ্ আখড়াই গাহনা, কৌতূহলবশে কিশোর গিরিশচন্দ্র হাফ্ আখড়াই শুনিতে গিয়াছিলেন. মূল্যবান পরিচ্ছদধারী বহুতর সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সেই মজ্লিসে উপস্থিত ছিলেন, ইত্যবসরে সামান্য বসন পরিহিত একটি লোক তথায় উপস্থিত হন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র "এই এসেছেন, এই এসেছেন!" বলিয়া আনন্দপ্রকাশপূর্ব্বক সমবেত সমস্ত লোক গাত্রোত্থান করিয়া মহাসমাদরে সেই লোকটির অভ্যর্থনা করিলেন। কৌতুকবিভ্রান্ত হইয়া গিরিশবাবু স্বীয় পার্শ্বস্থ একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ লোকটি কে? ইঁহার এত আদর কি জন্য?" জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি উত্তর করিলেন, "ইনি সংবাদ প্রভাকর পত্রের সম্পাদক, ইহাঁরই নাম ঈশ্বর গুপ্ত, ইনি একজন প্রধান কবি; ইনি গীত বাঁধিয়া দিবেন, আসরে তাহাই গীত হইবে।"

কবির এত মান, ইহা অবগত হইয়া বালক গিরিশচন্দ্র চমৎকৃত হইলেন, তদবধি কবিতা রচনায় তাঁহার অনুরাগ জন্মিল, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া তিনি প্রভাকর পত্রে ছাপাইতে পাঠাইতেন, ঈশ্বরবাবু পরমাদরে সেই কবিতাগুলি সংশোধন করিয়া স্বীয় পত্রে স্থান দিতেন; উৎসাহ পাইয়া গিরিশচন্দ্র ক্রমে ক্রমে সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনায় সুনিপুণ হইতে লাগিলেন; সময়ে তিনি মহাকবি-পদবাচ্য হইয়াছিলেন, একথা বলাই বাহুল্য।

গিরিশচন্দ্রের পিতা বাবু নীলকমল ঘোষ তৎকালে আরজেন্টি সিনজী কোম্পানীর হাউসে বুক-কিপার ছিলেন; বিদ্যালয়ে ও গৃহ-চর্চ্চায় গিরিশচন্দ্রের অঙ্কশাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল, পিতার অনুরোধে তিনি বুককিপারী শিখিবার জন্য উক্ত কোম্পানীর আফিসে শিক্ষানবীশ হন, শিক্ষালাভ করিয়া কয়েক বৎসর তিনি ভিন্ন ভিন্ন সওদাগরী আফিসে বিশেষ দক্ষতার সহিত বুককিপারী করিয়াছিলেন। ক্রমাগত একবিধ কার্য্যে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া আইসে, নগরবাসী কোন কোন ধনবানের বাটীর গার্হস্থ্য-নাট্যশালায় নাট্যাভিনয় দর্শন করিয়া তৎবিষয়ে তিনি

আমোদিত ও অনুরক্ত হইয়া উঠেন ; ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী" প্রহসনের অভিনয়ে গিরিশবাবু স্বভাবসিদ্ধ পূর্ণসাহসে নিমচাঁদের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিমচাঁদের অভিনয়ে বিলাতের বড় বড় কবির রচিত পদাবলীর নজীর বিস্তর, গিরিশবাবু সেইগুলি অতুল যোগ্যতার সহিত অভিনয় করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন, পরদিনের সংবাদপত্র সমূহে সেই অভিনয়ের অত্যুচ্চ প্রশংসা পাঠ করিয়া গিরিশ বাবুর অঙ্গানুরাগ দ্বিগুণতর পরিবর্দ্ধিত হয় ; তদবধি তিনি সখের থিয়েটারে বিবিধ বিষয়ের অভিনয় করিয়া যথেষ্ট যশোলাভ করেন। যে সময়ে পাথুরিয়া ঘাটার সান্যালের বাড়ীতে নীল-দর্পণের অভিনয়, সেই সময় গিরিশবাবুর অভিনয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল, তদুপলক্ষে তাঁহার একজন বন্ধু মিষ্ট ভৎসনা করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "চিরকাল সখের থিয়েটারে ব্যাগার দিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া কি কীর্ত্তি রাখিবে ? নিজের থিয়েটার কর, টিকিট বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ কর, আহার ঔষধ দুই ফল লাভ হইবে।" বন্ধুর পরামর্শে গিরিশবাবু একে একে ন্যাশান্যাল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটার, এমারেল্ড থিয়েটার, ষ্টার থিয়েটার ইত্যাদি নাট্যশালা স্থাপন পূর্ব্বক অল্পমূল্যে টিকিট বিক্রয়ের সূত্রপাত করেন, অভিনয়ের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রঙ্গমন্দির নির্ম্মিত হয়। সুফল দর্শন করিয়া গিরিশবাবু তখন হইতে স্বয়ং নাটক-রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। তৎপ্রণীত নাটক, অপেরা প্রহসন এবং নক্সা প্রভৃতি গণনা করিলে শতাধিক সংখ্যা অতিক্রম করিবে সন্দেহ নাই। গিরিশবাবুর বুদ্ধদেব, বিল্বমঙ্গল, চৈতন্যলীলা, প্রফুল্ল ও পাণ্ডবগৌরব অতি উৎকৃষ্ট শ্রাব্যকাব্য। নাটকের মধ্যে কবিতাপ্রয়োগের তিনি এক নবপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন ; যদিও কতকাংশে সেক্সপীয়রের অনুকরণ, তথাপি মাতৃভাষায় যাহাতে অধিক মিষ্টতা রক্ষা হয়, নাট্যাঙ্গের কবিতায় তিনি তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিয়াছেন, ম্যাকবেথের অনুবাদে তাঁহার গুণপণার চূড়ান্ত পরিচয় হইয়াছে। ইংরাজী ভাব বজায় রাখিয়া বাঙ্গালার মধুরতা রক্ষা করণে কেহই তৎপূর্ব্বে সে রূপে সেক্স-পীয়রের মান রক্ষা করিতে পারেন নাই।

অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি বিডন ষ্ট্রীটে মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এই থিয়েটারে অভিনয়ের নিমিত্ত তিনি যে কয়েকখানি নূতন নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছে—জনা, শঙ্করাচার্য্য, তপোবল ও সামা-জিক কল্পে বলিদান। সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাশিমের রূপান্তর অবশ্য উল্লেখ-

যোগ্য। তাঁহার রচনার মাধুর্য্য করুণা, তেজস্বিতা ও প্রকৃতির মর্য্যাদা রক্ষা সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়।

নাট্যাচার্য্য কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গালয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা, পাশ্চাত্য প্রণালীতে রঙ্গালয় সমূহের নব নব অঙ্গরাগ বিধানের প্রবর্ত্তন কর্ত্তা, তিনি উত্তম উত্তম নাটক প্রণয়ন করিতেন, রাগ রাগিণী যুক্ত উত্তম উত্তম সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। রঙ্গালয় সম্বন্ধে উহাই তাঁহার গুণগ্রামের পর্য্যাপ্ত পরিচয় নহে, প্রধান প্রধান নাটকের প্রধান প্রধান চরিত্রের রূপধারণপূর্ব্বক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া তিনি স্বয়ং অতি চমৎকার অভিনয় করিতেন; তাঁহার অভিনয় দর্শনে দর্শকমণ্ডলী সর্ব্বপ্রকারে বিমুগ্ধ হইয়া যাইতেন; অভিনয়ের শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কারে তাঁহার সম্ভ্রমের উপাধি হইয়াছিল, "ইণ্ডিয়ান গ্যারিক।"

এই স্থলে সামাজিকতার পরিচয়। কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ সর্ব্বাংশে সামাজিকতার গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। তিনি যেরূপ মধুরভাষী, অমায়িক, মিতভাষী, পরদুঃখকাতর, পরোপকারী, নিরহঙ্কার, অক্রোধ ও শরণাগতপালক, তদ্‌স্বরূপ বন্ধুবৎসল ও সরলপ্রকৃতি ছিলেন। ভক্তি তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। এমারেল্ড থিয়েটার যখন ষ্টার থিয়েটার নামে পরিণত ছিল, সেইসময় একরাত্রে চৈতন্যলীলার অভিনয় হয়, ভগবান রামকৃষ্ণদেব সেই অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন; প্রথম সন্দর্শনে গিরিশবাবু তাঁহার প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন নাই, রামকৃষ্ণদেব চৈতন্যলীলার প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছিলেন মাত্র।

পরদিন প্রভাতে গিরিশবাবু দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর চরণে অবনত হন, তদবধি এই ত্রিশবৎসরকাল তিনি পরমহংসদেবের অকপট ভক্ত হইয়াছিলেন, রামকৃষ্ণ মন্ত্রে তাঁহার নূতন দীক্ষা হইয়াছিল। ভক্তিসাধনায় তিনি অন্তরে যোগী ও বাহিরে ভোগীপুরুষ ছিলেন। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহের চরিত্রবর্ণনে হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক মান্যবর কৃষ্ণদাস পাল লিখিয়াছিলেন, "Volcano Capped with snow." অর্থাৎ তুষারাবৃত আগ্নেয় গিরি। গিরিশ বাবুর প্রকৃতি সম্বন্ধেও আমরা সেই উপমাটি বিনিয়োগ করিতে পারি।

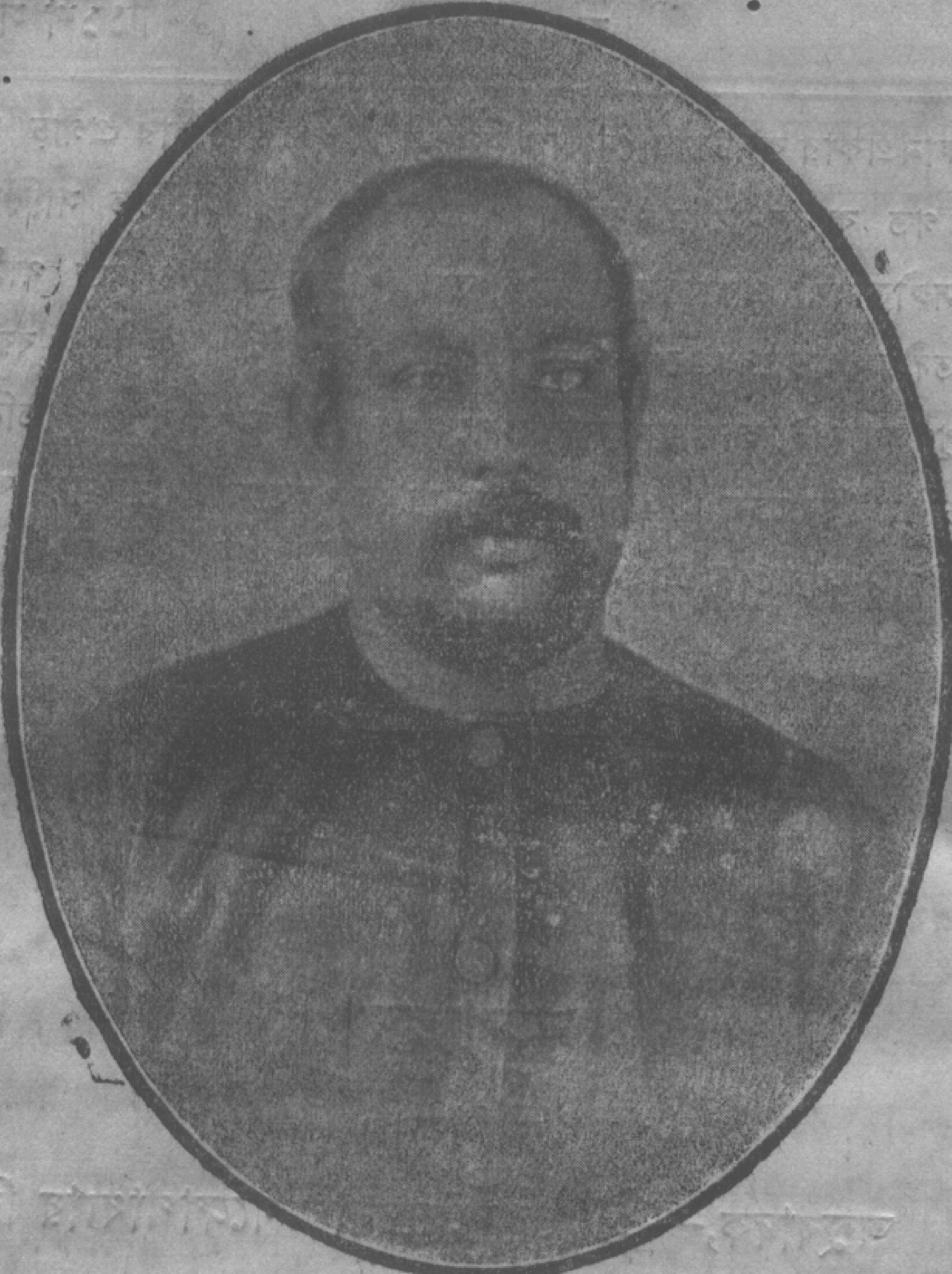
পরোপকার ব্রতে গিরিশবাবুর আন্তরিক যত্ন ছিল। অধ্যবসায় সহকারে তিনি রাশি রাশি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তদ্‌বিজ্ঞানে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে শত শত অনাথ রোগী তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইত, যত্নসহকারে তাহাদের রোগের বৃত্তান্ত শ্রবণ ও নাড়ী

পরীক্ষা করিয়া বিনামূল্যে তিনি তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত ঔষধ প্রদান করিতেন, উৎকট রোগগ্রস্ত বহুতর রোগী তাঁহার সুচিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

সর্ব্বগুণাধার কবিবর গিরিশচন্দ্রের গুণাবলী বর্ণনে ক্ষুদ্র লেখনী অক্ষম। মানব-সংসারে মনুষ্যত্ব বিচারে গিরিশবাবু একজন প্রকৃত মনুষ্য ছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ইহা স্বীকার করিবেন। গিরিশ-বাবু বিলাতে জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ মহাসমারোহে মহানুষ্ঠান হইত সন্দেহ নাই।

জন্মভূমি পত্রিকা তাঁহার কৃপাগুণে চিরকৃতজ্ঞ রহিল, অন্তরের প্রীতির সহিত ইহা আমরা চিরদিন স্মরণ করিব। জন্মভূমি পত্রিকার পরিচালন ও সম্পাদন ভার আমাদের হস্তে ন্যস্ত হওয়া অবধি ঊনবিংশতি বর্ষকাল তিনি ইহার প্রতি যথেষ্ট স্নেহদৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদের সহিত তিনি জন্মভূমির অঙ্গরাগ বৃদ্ধি করিতে যত্ন পাইতেন, তাঁহাকে হারাইয়া জন্মভূমি একটি প্রধান সহায় হারাইল।

মূর্ত্তিমান প্রতিভা কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ পূর্ণকালে কাল প্রাপ্ত হন নাই—অন্তঃকালে তাঁহার ৬৮ বৎসর মাত্র বয়স হইয়াছিল, এক্ষণে তিনি অনন্তদেবের ক্রোড়ে অনন্তশান্তি উপভোগ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ দীর্ঘজীবী হইয়া পিতৃগৌরব রক্ষা করিতে যত্নশীল থাকুন, জগৎপিতা তাঁহাকে এইরূপ শক্তি ও সুমতি দান করুন।



ধর্ম্মাত্মা গিরীন্দ্রনাথ মিত্র।

নিতান্ত পরিতপ্ত হৃদয়ে আমরা প্রকাশ করিতেছি, সিমুলিয়ার সুপ্রসিদ্ধ মিত্র-বংশীয় ধার্ম্মিকপ্রবর গিরীন্দ্রনাথ মিত্রমহাশয় ১৩১৮ সালের ১৪ই ফাল্গুন সোমবার ইহলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক পুণ্যধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। যদিও তিনি সাধারণ জনসমাজে তাদৃশ প্রসিদ্ধ ছিলেন না, যদিও তিনি কোনপ্রকার সভাসমিতিতে যোগদান করিতেন না, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি অতি নির্ম্মল এবং হৃদয় সনাতন ধর্ম্ম-ভাবে পরিপূর্ণ ছিল। কলিযুগে জনসমাজে চতুরতা দেখাইতে না পারিলে চতুর লোকেরা তাদৃশ ব্যক্তিকে "গো বেচারা ভাল মানুষ" বলিয়া একপ্রকার উপহাস করেন; বাবু গিরীন্দ্রনাথ তাঁহাদের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে পারেন, বাস্তবিক তাঁহার ভালমানুষীতে মনুষ্যত্বের দিব্য লক্ষণ বিদ্যমান ছিল, অন্তরে অথবা অনু-

ষ্ঠানে কোনপ্রকার কপটতার দোষাঙ্ক ছিল না। স্বধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় আনুরক্তি ছিল। গত কয়েকমাসের জন্মভূমি পত্রিকায় তাঁহার বিরচিত সাত্ত্বিক ভাবের যে ধর্ম্ম সঙ্গীতাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়াই সুবিজ্ঞ পাঠক মহাশয়েরা তদীয় ধর্ম্মভাবের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণকে কাঁদাইয়া অপূর্ণ সময়েই তিনি পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আত্মারামের পদতলে তদীয় আত্মা আশ্রয়লাভ করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

কান্তা।

স্ত্রীশিক্ষা।

অনুবাদক,—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ,

সরলা। স্ত্রীজাতির ভিতর যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে, উহা ভাল কি না?

কান্তা। পূর্ব্বে হিন্দুজাতির ভিতর স্ত্রীদিগের আদৌ অবরোধ প্রথা ছিল না। সীতা দময়ন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি মহারাণীরা সভামধ্যে অবগুণ্ঠন মুক্ত হইয়া উপস্থিত থাকিতেন, তাহা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে অনীতির আতিশয্য বশতঃ হিন্দুজাতির মধ্যে স্ত্রীলোকদিগকে অবরোধে রাখা প্রচলিত হইয়াছিল। পরদা যদি মর্য্যাদার হেতু হয়, যেমন "জালিদার বরুকা" দ্বারা বদনাবৃত করা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে একক স্বতন্ত্রভাবে বিচরণ না করা ইত্যাদি রীতি, তবে উহা মন্দ নহে। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীলোকেরা যে বাটীর অন্দরমহলে কয়েদ থাকে এবং উন্মুক্ত বায়ুসেবন ও স্বচ্ছ কিরণ সম্ভোগে বঞ্চিত ও স্বাভাবিক পদার্থাদির দর্শনে বিমুখ হইয়া থাকে, তাহা আমি পছন্দ করি না। মোটের উপর অবরোধ প্রথা থাকা না থাকা দেশ, কাল, সামাজিক স্থিতি ও ব্যবস্থাদির

উপর নির্ভর করে। অবশ্য হিন্দু স্ত্রীজাতির মধ্যে আত্মীয়-কুটুম্বের নিকট পরদা করা ও বাহিরের লোকদের কাছে কোন রকম পরদা না করা যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহার আমি প্রশংসা করিতে পারি না।

সরলা। আচ্ছা বেশ, "ভক্তমাল" পুস্তকে ভক্ত-পীপাজি সম্বন্ধে এরূপ কথিত আছে যে, তিনি সাধুদিগের সংকারের জন্য দ্রব্যাদির প্রয়োজন হওয়াতে মূল্যাভাবে নিজের স্ত্রীকে ব্যাপারীর সেবাকার্য্যে পাঠান। এবম্বিধ স্ত্রীকে পতিব্রতা বলা যায় কি না? এবং শাশুড়ী কুন্তীদেবী ও সভবিজয়ী অর্জ্জুনের কথামত দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর ভজনা করিয়াছিলেন, তথাপিও তিনি সতী বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন, ইহা সত্য কি না?

কান্তা। ভগ্নি, যিনি প্রকৃত পতি, তিনি এরূপ নীচ অনুজ্ঞা কখন করিতে পারেন না। যে স্ত্রী বা পুরুষের গোঁড়ায় গলদ, তাহার দ্বারাই এ প্রকার কার্য্য সম্ভব। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্ধ শূদ্রের ভিতর বা কোন গৃহস্থাশ্রমীর ভিতর এমন কেহই নাই যে, এরূপ কার্য্য নিজে করে বা কাহাকেও দিয়া করায়, ইহা নিশ্চয় জানিবে। তবুও কি বলিতে চাও, না বিশ্বাস কর যে কোন ঈশ্বরের ভক্ত বা রাজবংশোদ্ভূত বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের দ্বারা এরূপ কার্য্য সম্ভব কখনই না।

আসল কথা এই যে, "ভক্তমাল" চাটী নামক জনৈক সাম্প্রদায়িক (পন্থাবলম্বী) ডোমের রচিত। উহাতে কল্পিত অনেক গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝিতে পারিবে। গ্রন্থে "মীরা বাইয়ের" ভক্তিতে কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে। ইনি চিতোরের রাণা কুম্ভের রাণী ছিলেন না। রাজবংশোদ্ভূত রণসিংহ নামা রাজপুতের পত্নী ছিলেন। মূর্খ লোকেরা অনভিজ্ঞতাবশতঃ তাঁহাকে মহারাণা কুম্ভের স্ত্রী সাজাইয়া কতকগুলি মিথ্যা ভজন তাঁহার নামে আরোপিত করিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে তিনি মাড়য়ারী ভাষা ব্যতীত অপর কোন ভাষা জানিতেন না; অথচ তাঁহার নাম দিয়া হিন্দিতে ভজন রচিত হইল। এরূপ পুস্তকোক্ত "পীপা" ও "সীতা"র ব্যাপার কল্পিত গল্প মাত্র। এবম্বিধ অপরাপর বিস্তর গল্প উহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে এবং লোকে তাহাই সত্য বলিয়া শিক্ষা করিয়া আসিতেছে। অনেক পুরাণাদিতে এরূপ আছে যাহাতে যোগেশ্বর মহাদেব, মহাব্রহ্মর্ষি ব্রহ্মা, পুরুষোত্তম বিষ্ণু এবং ক্ষত্রিয়কুমার মহাপ্রতাপশালী শ্রীকৃষ্ণ ও মহিমান্বিতা মহারাণী দ্রৌপদীর সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা হইয়াছে, যাহা স্তুতি-

চ্ছলে নিন্দা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। এবং তাহা দ্বারা উহাঁদের চরিত্র কলুষিত করা হইয়াছে। এই প্রকার কথা কোন প্রকারে মান্যযোগ্য হইতে পারে না। "সত্যনারায়ণে"র যে কথা উপনিষদে আছে, তাহার পরিবর্ত্তে মিথ্যা কথা রচনা করা হইয়াছে এবং উহা জনসমাজে (হিন্দু) সত্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই সকল বিশেষ কারণ বশতঃ আমি এইমাত্র বুঝিতে পারিয়াছি ও বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়া থাকি যে, কেহ যেন এবম্বিধ মিথ্যা গ্রন্থ ও কথার নজীর দিয়া নিজের বুদ্ধিকে ভ্রষ্ট না করে বা মনকে কলুষিত না করে।

ভগ্নি! ভক্তমাল এবং এই প্রকার গ্রন্থ সকল কোন বিষয়ী, স্বার্থপর, ভিক্ষুক, অর্থলোলুপ মুর্খ সাধু বা ব্রাহ্মণ কিম্বা ভাটের দ্বারা লিখিত হইয়াছে, জানা গিয়াছে,—সেইজন্যই বলিতেছি যাহারা চায় তাহারা এই সকল কথা মানে মানুক, সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে করুক, পরন্তু তোমার উহাদের উপর বিশ্বাস রাখা যুক্তিসঙ্গত নহে। পরে তোমার যাহা ইচ্ছা।

সরলা। দুশ্চরিত্র স্বামী বিনাপরাধে যদি স্ত্রীকে প্রহার করে, তবে স্ত্রীর কর্ত্তব্য কি?

কান্তা। বিশেষ কারণবশতঃ বুদ্ধিবিপর্য্যয় ব্যতীত স্বামী যে অবলা অর্দ্ধাঙ্গিনীকে কষ্ট দেন ইহা সম্ভবপর নহে। স্ত্রীকে দুঃখ দিলে নিজের মনে দুঃখ পাইতে হয়, তথাপি ভুলভ্রান্তির জন্য যদি পতি কখনও তাড়না করেন, তজ্জন্য ক্রোধ করা সমীচীন নহে। কারণ তাহার ফলে ভবিষ্যতে সেরূপ ভুল আর হইবে না। দুষ্ট স্বভাবপ্রযুক্ত বিনাকারণে যে স্বামী তাড়না করে, সে পুরুষপদবাচ্য নহে। যিনি প্রকৃত পুরুষপদবাচ্য তিনি অবলার প্রতি হস্তপদাদি চালনা (প্রহার) করেন না। তাঁহার পক্ষে সাবধানতাসূচক ইঙ্গিতই যথেষ্ট। যিনি অমানুষ বা কাপুরুষ, তিনিই স্ত্রীকে প্রহার করেন। এরূপ স্থলে হতভাগিনী স্ত্রী নিজেকে বিধবা জানিয়া পরিতাপ করিতে বিরত থাকিবেন। এরূপ দুঃসময়ে স্ত্রীর শিক্ষাই তাঁহার সহায়। তাঁহার ক্ষমা, সন্তোষ এবং পাতিব্রত্যই তাঁহার হৃদয়ে বলদান করে এবং দুরপনেয় কষ্টেও তাঁহাকে ধৈর্য্যচ্যুতি ও কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখ করে না। মর্ম্মার্থ এই, যে স্ত্রীতে শীল, ক্ষমা, সন্তোষ, পাতিব্রত্য আছে, তাঁহার স্বামীতে যদি দুষ্টতা ও ক্রুরতা থাকে, তাহা অচিরেই নষ্ট হইয়া যায় এবং তজ্জন্য গুণবতী ভার্য্যার সে বিষয়ে চিন্তিত হইবার কারণ থাকে না।

সরলা। নিজ সন্তান যদি কুসন্তান হয়, তবে স্ত্রীলোকের বড় দুঃখ হয়— এ দুঃখ নিবারণের উপায় কি বলুন।

কান্তা। যাহাতে এ দুঃখ না হয়, তাহার উপায় পূর্ব্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য পূর্ব্বকথিত নিয়মমত বিদ্যা ও জ্ঞানলাভ ও তৎপ্রদর্শিত পথানুসরণ করা এবং সন্তানকে শৈশবাবধি তদনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া, এরূপ করিলে দুষ্টসন্তান উৎপন্ন হইবে না। যে স্ত্রী পুরুষ পূর্ব্বকথিত নিয়ম প্রতিপালন করিবেন না—নিজেদের জীবন তদনুরূপ গঠিত করিবেন না ও সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষাদানে উপেক্ষা করিবেন, তাঁহাদিগকে নিজ কর্ম্মফল স্বরূপ কুসন্তানরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। কর্ম্মফল ভোগ বিনা নাশ হয় না। এরূপ সন্তান যদি নিয়মপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস ও সৎসঙ্গ করে তাহা হইলে শুধরাইয়া যায় ও পিতামাতারও দুঃখ দূর হইয়া থাকে।

সরলা। যে স্ত্রীর সন্তানাদি হয় নাই, তাহার মন সদাই দুঃখিত থাকে—এই দুঃখ নিবারণের উপায় কি?

কান্তা। (১) বাল্যবিবাহ, (২) স্ত্রী বা পুরুষের জটিল রোগবশতঃ, (৩) মদ্য বা অহিফেন প্রভৃতি মাদকদ্রব্য অতিমাত্রায় সেবন বশতঃ, (৪) ব্যসনাসক্তি প্রযুক্ত, (৫) রোগাধিকারে কুপথ্য ও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘণবশতঃ হঠাৎ রোগাক্রান্ত হওয়া, (৬) আজন্ম পুরুষ বা স্ত্রী যে কেহ বন্ধ্যা হইলে, এই ছয়টী সন্তানাদি না হইবার কারণ এবং সেজন্য স্ত্রীজাতিকে নিঃসন্তান অবস্থায় দুঃখে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়।

তারার কাহিনী।

লেখক—শ্রীযুক্ত কালিনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল,

ছায়াপথ (The Milky-way.)।

গগনে যে প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্ক সৌম্য ধ্রুব হইতে যাম্য পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহার চলিত নাম ছায়াপথ। অভিধানে "ছায়াপথঃ

দেবপথঃ সোমধারা নভঃসরিৎ"। দেখিতে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের মেখলা বা ডোর সদৃশ। উহা আটহাত বহরের একখানি ধব্ ধবে সাদা কাপড়ের মত দেখায়। উহার স্থানে স্থানে ছেঁড়া, যাম্য ধ্রুবের নিকটে উহা দ্বিভাগ হইয়াছে। যেন ব্রহ্মাণ্ড দেব উত্তরীয়খানি যজ্ঞোপবীত রূপে ধারণ করিয়া আছেন, অথবা যেন নবপ্রসূত ব্রহ্মাণ্ডদেব আম্বনাড়ী ধারণ করিয়া আছেন। (১)

ছায়াপথের শাখাদ্বয় সৌম্যধ্রুব হইতে যাম্যধ্রুব অভিমুখে প্রসারিত আছে। পশ্চিম শাখা পরমপদ (The Polar circle) হইতে প্রসারিত হইয়া কাশ্যপীর মণ্ডল (The Constellation Cassiopeia) ব্রহ্মমণ্ডল (The Constellation Auriga) এবং মিথুন রাশি (Gemini) প্লাবিত করিয়া গভীর পদে উপনীত হইয়াছে। এই শাখায় মিত্রদেব অধিষ্ঠিত আছেন এবং পূর্ব্বশাখা পরমপদ হইতে বাহির হইয়া হংসমণ্ডল (Cygnus) গরুড় মণ্ডল (Aguila) এবং বৃশ্চিক রাশি (Scorpeo) ও নৌমণ্ডল (Argo Navis) প্লাবিত করিয়া গভীর পদে সমাগত হইয়াছে। এই শাখায় বরুণদেব অধিষ্ঠিত আছেন। উভয় শাখার প্রান্তভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাখা বিদ্যমান আছে। এজন্য শাখাদ্বয় দেখিতে অঙ্গুলিবিশিষ্ট বাহুদ্বয়ের মত।

পশ্চিমশাখার প্রান্তভাগের অদূরে অগস্ত্য তারা (Candpus) প্রদীপ্ত রহিয়াছে এবং পূর্ব্বশাখার প্রান্তভাগে বা পূর্ব্ববাহুর করপল্লবে কপিল তারা (Eta argus) সময়ে সময়ে প্রদীপ্ত হয়। বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে দর্শকগণ দেখিবেন যে ছায়াপথ একটি প্রকাণ্ড কলস আকৃতি। এই কলস বা কুম্ভ অধোমুখে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই বৈমানিক কুম্ভের মুখদেশে অগস্ত্য তারা এবং উহার উদর মধ্যে বশিষ্ঠ তারা (Vega) বিরাজমান আছে। মণ্ডলাকার শত তারক নক্ষত্র (শতভিষা) বা কুম্ভরাশির (Aquarius) অমৃত কুম্ভ এই প্রকাণ্ড কলসের ক্ষুদ্র নাক্ষত্রিক প্রতিমা। ঋক্ বেদের ১০।৩২।৯ মন্ত্রে এই সোমময় কলসের উল্লেখ আছে।

এই বৈমানিক কলসে জাত বলিয়া মহর্ষি অগস্ত্য কলস যোনি বা কুম্ভযোনি উপাধি এবং ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ কলসে জাত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। উভয়ে মিত্রা

(১) তুলনা কর :—উপনয়নকালে বিপ্রগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ ও দ্বিজ উপাধি লাভ করেন।

বরুণ দেবদ্বয়ের সন্তান। (২)

ছায়াপথের সুবিমল সুস্নিগ্ধ শুভ্রজ্যোতি সন্দর্শনে সভ্য, অসভ্য, প্রাচীন, ইদানীন্তন—আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেরই মন মুগ্ধ ও হৃদয় দ্রব হয়। ইহার সুকোমল কান্তিবিলোকনে তাপ-শোকদগ্ধ হৃদয়ে শান্তির সঞ্চার হয় এবং দৈনিক কর্ম্মবিপাকে ক্লান্ত হৃদয়ে সুশীতল শ্রান্তির উদয় হয়। সেই জন্যই ছায়াপথ প্রাচীন ঋষিগণের মনের পুতুল হইয়াছিল এবং সোমধারা সোমপবমান দেব নামে ঋক্ বেদের সমগ্র নবম মণ্ডল উপহার পাইয়াছেন। এমন অতুল্য আদর অন্য কোন দেব আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই বেদমন্ত্রে দিতি অদিতি, মিত্র-বরুণ, সুরা-সোম, পর্ব্বত সরস্বতী আদি বহু দেবদেবী ছায়াপথে প্রতিষ্ঠিত ও অর্চ্চিত হইয়াছেন।

এই অসীম মহান্ জ্যোতিষ্কের ক্রোড়ে আকাশের বৃহত্তম তারাগুলি অবস্থিত আছে। সুতরাং সহজেই উপলব্ধি হয় যে এই প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্ক হইতে নক্ষত্র, তারা, গ্রহ ও চন্দ্র ও সূর্য্য আদি প্রসূত হইয়াছে। এবং বুঝি বা সৃষ্টির কলকাটি ইহার স্তর মধ্যে নিহিত আছে।

এই ছায়াপথের গভীর মহিমা গানে উদার বেদমন্ত্রে ঋষিগণের যে সুমধুর কবিত্ব রস পুঞ্জে পুঞ্জে সঞ্চিত আছে। অদূরদর্শি ক্ষুদ্রহৃদয় ভাষ্যকারগণের নীরস ব্যাখ্যায় বেদাধ্যায়ী তাহার আস্বাদনে চিরবঞ্চিত হইয়াছেন। (৩)

বালুকাসদৃশ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকাপুঞ্জে এই ছায়াপথ গঠিত হইয়াছে। সার উইলিয়ম হর্শেল তাঁহার স্বনির্ম্মিত শক্তিশীল দূরবীক্ষণ যোগে অবধারণ করিয়াছেন যে, দুই কোটি তারকাবৃন্দে ছায়াপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যে সেমস্ (Samos) দ্বীপবাসী পিথা গোরস (খৃঃ পূঃ ৪৫০) ছায়াপথ তারক নির্ম্মিত বলিয়া অবধারণ করেন এবং রোমক কবি ওবিদ (Ovid) (খৃঃ পূঃ ৪৩) সেই তানে সুমধুর স্বরে গাহিলেন :—

স্থাপিত তারক স্তরে, স্বর্গের পদ্ধতি চলে

(২) ঋঃ বেঃ ৭।৩৩।১৩ দেখ। জ্যোতিষ্ক বৃত্তান্ত ঘটিত এই ঋকের অনুসরণে পৌরাণিকগণ কতই জল্পনা কল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩) দেশী, বিলাতী ভাষ্যকারগণের মতে সোম পবমান দেব ত্রিদশক স্থিত সোমলতার রসের ২।৪ ফোঁটা। সোমমত্ত ঋষিগণ তিলে তাল করিয়াছেন।

অশনি ধরের সদনে। (৪)

এবং জ্যোতিষিক কবি মার্কস মানিলিয়স (খৃঃ অঃ ১০০) ওবিদের সুর ধরিয়া গাহিলেন :—

বক্র সুবিশাল, বিশদ উজ্জ্বল,
ক্ষুদ্র তারকানিচয়ে—
যাদের আলোক, হয়ে সমবেত
এক জ্যোতিধারা বহে।

জ্ঞানবীর গেলিলিয় খৃঃ অঃ ১৫৬৪ যে অপূর্ব্ব আবিষ্কার ধনদানে ধরাধাম ধনী করিয়াছেন, সেই দূরবীক্ষণ পিথাগোরসের দিব্য অনুমান সপ্রমান করিল।

এই বালুকাকণা সদৃশ তারানিচয় হইতে বেবিলন নগরে (খৃঃ পূঃ ৩০০০) ছায়াপথ "ঊর্দ্ধ ধূলি মেঘ" (Dust cloud high) উপাধি উপহার পাইয়াছেন।

ঋক্ মন্ত্রে আমরা পাই :—

এই নক্ষত্রের ক্রোড়ে, সোম পরিমাণ
রয়েছে নিহিত দেখ বিদ্যমান।

অথো নক্ষত্রানাম্ এষাম্ উপস্থে সোম আহিতঃ।

সেই সুরে বিধুর কোকিল গাহিলেন :—

"তরুণ আদিত্য বর্ণ নক্ষত্র পথ সুপ্রভ"
তরুণ-আদিত্য বর্ণেন নক্ষত্র পথ বর্চ্চসা। (রামায়ণ ৩।৪৩।২২)

এবং দ্বীপ ভব মহাকবি গাহিলেন :—

বিপুল নক্ষত্র মার্গ, সুরবীসী নাম।
"নক্ষত্র মার্গম্ বিপুলম্ সুরবীসী ইতি বিশ্রুতম্"

প্রাচীন সভ্যজগতে সর্ব্বত্র ব্রহ্মাণ্ডের এই প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্ক বিমানের (ক)

(মহা ৩।৩৩।১২) (৫)

---

(৪) Its ground work is of stars through which the road Lies open to the Thunders abode (Ovid)

(ক) তু। এষঃ বৈ বিরজাঃ পন্থা
দৃশ্যতে দেব সঘণঃ। মৎস্যপুরাণ ৪২।১১

(৫) তু নক্ষত্রগণ অচল হইলেও বিশ্বকোষ মতে :—"নক্ষত্র পথ অর্থে যে পথে নক্ষত্র চলে।

পর্ব্বত, (খ) পথ, (গ) নদী বা খাল, (ঘ) সেতু, (ঙ) সর্প বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছিল। ভারতে অধিকন্তু ইহা দিতি দেবী, অদিতি দেবী, সুরা দেবী, সোমধারা, রেণুকা দেবী, ঋক্ষ রজঃ ইত্যাদি নাম উপহার পাইয়াছে।

প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ মাত্রেই একটী দিব্য পবিত্র পর্ব্বত (Tee Holy Hill of heaven) নির্দ্দিষ্ট আছে। এবং এই দিব্য পবিত্র পর্ব্বতের একটী আধিভৌতিক বা পার্থিব প্রতিমা পরিকল্পিত ও স্বীত হইয়াছে।

ঋক্‌বেদের (১।১২২।৩, ১৩২।৫, ৩।৫৩।৩, ৪।৫৫।৫, ৬।২২।৬, ৪৯।৪, ৩।৩৭।৮ ১০।১৫৮।৩ মন্ত্রে এই দিব্য পর্ব্বত দেবরূপে অর্চ্চিত ও আরাধিত হইয়াছে। প্রাচীন কালে সুমেরু পর্ব্বত উহার পার্থিব প্রতিমা এবং বর্ত্তমানে হিমাচল উহার জাগ্রত প্রতিমা বলিয়া পরিগণিত ছিল ও আছে।

ঋক্ মন্ত্রে (৬।২২।৬) এই দিব্য পর্ব্বত "মনঃ জুবা" অর্থাৎ দ্রুতগামী বলিয়া বর্ণিত আছে এবং ১০।১৫৮।৩ মন্ত্রে এই পর্ব্বতের উপাসনায় চক্ষুদান কর (৬) এই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

বেদমতে (ঋঃ ১।৯৩।৬) এই দিব্য পর্ব্বত হইতে গরুড় পক্ষী (Aquila) অমৃত আহরণ করিয়াছিল। (৭)

এবং এই দিব্যপর্ব্বতে বরুণদেব অমৃত রাখিয়াছিলেন। (ঋঃ ৫।৮৫।২) (৮)

এবং এই দিব্য পর্ব্বতের উপরে পর্জ্জন্যদেব সোমলতা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। এবং এইজন্য সোম পবমান দেব গিরিষ্ঠ উপাধি উপহার পাইয়াছেন। (ঋঃ ৩।৪৮।২)

এবং এই কারণে বেদে সোমধারা হৈমবতী নাম ধারণ করেন। (কেনোপনিষদ্)

বেদ মতে (ঋঃ ৫।৪৩।১১) এই দিব্য পর্ব্বতের উপরে দিব্য নদী সরস্বতী প্রবাহিত আছেন। (৯)

---

(৬) চক্ষু = সূর্য্য।

(৭) অযচ্ছৎ অন্ধমপরি শ্যেনঃ অদ্রেঃ।

(৮) বরুণঃ ... ... সোথম্ অদ্রৌ।

(৯) আ নঃ দিবঃ বৃহতঃ পর্ব্বতাৎ আসরস্বতী যজতা গন্ত যজ্ঞম।

ছয় হাজার বর্ষ পূর্ব্বে এই দিব্য পর্ব্বতের পশ্চিম শাখায় বৃষ ও মিথুন রাশির সন্ধিস্থলে মহাবিষুব সংক্রান্তি বিন্দু (The Vernal equinoctial point) এবং এই পর্ব্বতের পূর্ব্বশাখায় বৃশ্চিক ও ধনু রাশির সন্ধিস্থলে জল বিষুপ সংক্রান্তি বিন্দু (The autumnal Equinoctial point) অবস্থিত ছিল। তখন সুমেরু বাসী তারাদর্শক দেখিতেন যে, এই দিব্য পর্ব্বতের এক শাখায় ষন্মাস ব্যাপী দিবার প্রারম্ভে সূর্য্যের উদয় হয়। এই দিব্য পর্ব্বতের ঐ শাখা উদয়গিরি নাম উপহার পাইয়াছেন ; এবং এই দিব্য পর্ব্বতের যে শাখায় ষন্মাস ব্যাপী নিশার প্রারম্ভে সূর্য্য অস্তগমন করিতেন, ঐ শাখা অস্তগিরি নাম উপহার পাইয়াছিল।

অয়নাংশের ফলে মহাবিষুপ বিন্দু ও জল বিষুপবিন্দু এক্ষণে বহু দূর পশ্চাৎ গমন করিয়াছে। সুতরাং এখন এই দিব্য পর্ব্বতে সূর্য্যের উদয় অস্ত হয় না। কিন্তু "উদয় গিরি" "অস্তগিরি" ভারতের অন্তঃপুরেও জাগ্রত রহিয়াছে।

রামায়ণপাঠে (৬।১২০) আমরা দেখি যে, এই দিব্য পর্ব্বত মহোদয় -নাম ধারণ করে।

লক্ষ্মণের শক্তিশেলকালে মহাবীর মারুতি সঞ্জীবকরণী (বিশল্য করবী) ওষধি আহরণ জন্য এই মহোদয় পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ লঙ্কায় আনয়ন করেন (রামায়ণ ৬।১০২)।

স্বর্গারোহণকালে অগ্নিদেব (পূষন্‌দেব Auriga) গাণ্ডীব প্রতিগ্রহণে এই পর্ব্বতের উপরিস্থিত পথ পাণ্ডবগণকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। (মহা ১৭।১)

অবেস্তা মতে (ফারগড়ি ১৯।১১, ২২।৪) এই দিব্য পর্ব্বতে বসিয়া জরাথুস্ত্র অহুর মজ্‌দার নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন।

এই দিব্য পর্ব্বতের যে ভাগ পরম পদে অবস্থিত আছে, তাহা গ্রীস দেশে অলিম্পস (Olympos) (১০) নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং এই অলিম্পসে গ্রীকগণের জিউস (Zeus) দেব অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং থেশেলী প্রদেশের উত্তর সীমাস্থিত পর্ব্বতকে ভূস্বর্গ কল্পনা করিয়া তাহাকেও অলিম্পস নাম দেওয়া হইয়াছিল। অলিম্পসের অভ্রভেদী শৃঙ্গোপরে মানবের পরক্ষে মেঘের অন্তরালে বজ্র-

(১০) মহামতি মোক্ষমূলার বলেন,—"It is unfortunate that no etymology has yet been found & Olympos" আমরা নিবেদন করিতে চাহি যে সংস্কৃতে 'অলকস্ পদম্ বা অলীকম্ পদম্ পদে অলিম্পসের মূল সুরক্ষিত আছে।

ধারী জিউস (ক) সংস্কৃত জীবঃ) দেবের দরবার বসতি।

প্রাচীন বাইবেল মতে এই পবিত্র পর্ব্বত জিয়ন (Zion) নামে খ্যাত। জিয়ন পর্ব্বত ধ্রুবতারার পার্শ্বে অবস্থিত। এবং এই পর্ব্বতেই মহারাজের নগর স্থাপিত। (১১)

(Isaiah 14-13. Psalm 48. 2. 50. 2.) এবং ভূস্বর্গ সিনাই পর্ব্বতে ঈশ্বরের দরবার হয়। (১২) বেদ অবেস্তা ও বাইবেল আদি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের সদর্থ হইলে এই পবিত্র পর্ব্বত পরমপদে প্রতিষ্ঠিত আছে, একথা সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইবে এবং হিন্দুর হিমবান্, গ্রীকের অলিম্পস, য়িহুদির সিনাই এবং পারসীকের অলবর্জ্জ সহজাত কল্পনাপ্রসূত বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই সকল ভূস্বর্গ আধিদৈবিক মহামেরু অলিম্পস জিয়ম হুকৈর্য আদি দিব্য পর্ব্বতের পার্থিব প্রতিমা বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইবে।

এই আদি পর্ব্বত সোমধারার (১৫) নামান্তর মাত্র। সোমধারা হইতে জলরাশি বৃষ্টিরূপে ধরাপৃষ্ঠে পতিত হয় এবং চতুঃসাগর পূর্ণ হয় (ঋঃ বেঃ ৯।৩৩।৬) এবং এই দিব্য পর্ব্বত হইতে সরস্বতী আদি সপ্তনদী নিঃসৃত হইয়াছে। এজন্য এই পর্ব্বত ইতিহে দেবর্ষিও বিশ্রবা বা বিশ্বশ্রবা নামধারণ করিয়াছে।

বেদমতে (ঋঃ বেঃ ৬।৮৬।২০) ত্রিতদেব (১৩) [মঙ্গলগ্রহ বা তারা বৃশ্চিক পুচ্ছ] সোম পরমান দেবের পুত্র ; রামায়ণ মতে রাবণ (মঙ্গলগ্রহ বা তারা বৃশ্চিকপুচ্ছ দেবর্ষি পর্ব্বতের পুত্র। ঐ শুন মহাকবি বাল্মিকী বিশ্বশ্রবা পুত্র রাবণের মুখে গাহিতেছেন ;—

পর্ব্বতস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণঃ বাক্যম্ অব্রবীৎ
... ...
ত্বম্ মম আখ্যাহি ধর্ম্মজ্ঞ ! পিতা মে ত্বম্ হি ধর্ম্মতঃ ॥
(রাম ৭।২৬।১৮-২০)

(ক) Jupiter = বৃহস্পতি।

(১১) Beautiful for situation, the joy of the whole earth Mount Zion on the sides of the North, the city of the great King. (Psalms 48-2 সাম ৪৮।২)

(১২) Exodus 21—22.

(১৩) অবেস্তামতে Thrita ত্রিত সন্তান ত্রৈতনগণ (অবেস্তা মতে Thraitaona) গ্রীস দেশের টাইটন (Titanes) গণের প্রাতা।

অন্তার্থ

পর্ব্বতের বাক্য শুনি রাবণরাজা ভণে।
কে সে বল পিতা তুমি ধর্ম্মসাক্ষী জানে॥

ক্রমশঃ

কুমুদকামিনী।

লেখক—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

(১)

বৈশাখ মাসের বেলা—বারটা বাজিয়া গিয়াছে, রোদে কাঠ ফাটিতেছে—আকাশ তামার মূর্ত্তি ধরিয়াছে—মাঠে ময়দানে গরু চরে না—আকাশে পাখী উড়ে না, পথিক পথ চলে না। এমন সময় একজন বৃদ্ধ কলিকাতা হইতে কাঁকুড়-গাছীর পথে যাইতেছিল,—আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় এই পথের ধারে এত ঘেঁসাঘেঁসি বস্তী ছিল না, মধ্যে মধ্যে মাঠময়দান পড়াপতিত অনেক ছিল।

বৃদ্ধ এত অসমর্থ নহে যে, তাঁহাকে লাঠি ধরিয়া চলিতে হয়, তথাপি তাঁহার হাতে একগাছি ছড়ি ছিল, এইজন্য ছিল যে,—যদি দৈবাৎ পদস্খলন হয়, তাহা হইলে ছড়ি গাছটীর সাহায্যের অভাব হইবে না। আজি কালিকার যুবকদের সে আশঙ্কা না থাকিলেও যখন তাঁহাদের হাতে এক এক গাছি ছড়ি পোষাকের অঙ্গীভূত হইয়া থাকে, তখন সে কালের বৃদ্ধের হস্তে একগাছি ছড়ি থাকিবার কথা বলায় কোন দোষ হইতে পারে না। বৃদ্ধের পরিধানে একখানি সাদাপেড়ে ধুতি, গায়ে একটী পিরাণ, তাহার উপরের বোতামটী ছিল না, অন্যান্য বোতাম আঁটিয়া দিলেও খুলিয়া যায়; সুতরাং বুকটী ফাঁক—পিরাণটী ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে—তাহার উপর একখানি উড়ানি ছিল। রৌদ্রের তাপে বৃদ্ধ অতি কষ্টেই চলিয়া যাইতেছিলেন, পথ যেন আগুন, বাতাস আগুন, বাড়ী ঘরে আগুন না লাগিলেও যেন আগুন। পথের ধারে জনকতক বালক খেলা করিতেছিল।

ছেলেরা বুড়া দেখিলে বড় খুসী—যেন তাহারা তাঁহাকে খেলনা পায়। তাই কেহ নিকটে পাইলে তাহার গায়ে ধুলা দেয়, দূরে থাকিলে তাহাকে নানা কথায় বিরক্ত করে—ছেলেগুলা বৃদ্ধকে পাইয়া সেইরূপ ব্যবহারে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে ছাড়িল না, কেহ কেহ—

"ও বুড়ো তুই কোথায় যাবি,
পয়সা পেলে কলা খাবি ?"

এই বলিতে বলিতে তাঁহার পিছু পিছু ছুটিতে লাগিল। ছেলেদের তাড়া পাইয়া বৃদ্ধ কিছু বিব্রত হইলেন, বিব্রতির মাত্রা যখন বাড়িয়া উঠিল, তখন তিনি হোঁচট্ খাইয়া পথে পড়িয়া গেলেন, বলিতে লাগিলেন,—"কেন বাবা তোমরা আমায় জালাতন কর, আমিও একদিন তোমাদের মত ছিলাম, আমি বুড়ো দেখলে তো এমন কর্‌তাম না; তোমরাও বুড়া হ'লে বুঝ্‌বে।

দুষ্ট বালককে যাহা করিতে নিষেধ করা যায়—সে তাই করিতে থাকে। বালকের দল তাঁহাকে উত্যক্ত করিতেছে দেখিয়া একটী বালিকা নিকটবর্ত্তী একটী বটগাছের শীতল ছায়ায় বসিয়া মোজা বুনিতেছিল, তাড়াতাড়ি আসিয়া হাত ধরিয়া বৃদ্ধকে মাটী হইতে উঠাইল, বটতলায় লইয়া গেল, আপনার আসনখানিতে তাঁহাকে বসাইল, এবং শশব্যস্তে আপনাদের বাড়ী হইতে একঘটী জল আর-একখানি পাখা আনিল। সেই বটবৃক্ষের নিকটেই বালিকার বাড়ী। বালিকাটির নাম "কুমুদকামিনী," কুমুদ বড় লক্ষ্মী মেয়ে, বৃদ্ধের মুখে হাতে পায়ে জল দিয়া ধুইয়া দিল, আর পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

তাহা দেখিয়া দুষ্ট বালকগণ বড় লজ্জিত হইয়া পলাইয়া গেল। ছুটিতে ছুটিতে তাহাদের মধ্যে একজন মাটীতে আছাড় খাইল, অন্যান্য বালকেরা হো হো করিয়া হাঁসিয়া উঠিল। ভূতলশায়ী বালক উঠিয়া মনে করিল, কাহাকেও বিপন্ন দেখিলে হাসা ভাল নয়, যাহা হউক এখন যদি বুড়ার কিছু উপকার করিতে পাই, তবে ছাড়িব না। এই ভাবিয়া সে আসিয়া বটতলায় বসিল।

(২)

বৃদ্ধের কিছু ক্লান্তি দূর হইল দেখিয়া কুমুদকামিনী আবার আপনাদের বাড়ীতে গেল, সেখান হইতে একখানি রেকাবে করিয়া পাঁচ ছয়খানি ছোট ছোট লুচি, দুইটী সন্দেশ, খানকতক পেঁপে কুঁচান, চারিটী ভিজান মুগের ডাউল, ৪।৫ খানি

আকের টিকলি আর একটু চিনি আনিয়া বৃদ্ধকে দিল এবং তাহা খাইবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিল। বৃদ্ধ কিছুতেই খাইবেন না, কিন্তু শেষে সচ্চরিত্রা বালিকার জেদে পড়িয়া বলিলেন, "লুচিগুলি তুলিয়া লও. আর যা আছে, তাই খাবো।"

কুমুদকামিনী বৃদ্ধের গলায় পৈতা দেখিয়া পূর্ব্বেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিয়াছিল, তাই বলিল, "আমরাও বামুন, আপনি খান, তাহাতে দোষ নাই।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "যদিও আমি স্নানাহ্নিক সেরেছি কিন্তু এখনও অন্য কিছু আহার হয় নাই, আচ্ছা তোমার অনুরোধ রাখ্‌তেই হয়।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে সে গুলি উদরস্থ করিলেন, তাহার পর বট-গাছের আড়ালে সেই বালকটী শুইয়া আছে, দেখিয়া বলিলেন, "আহা ছেলেটি ওখানে শুয়ে আছে, দেখ্‌তে পাই নাই—ও'কে কিছু দিবারও নাই।"

কুমুদও তাহাকে দেখিতে পায় নাই। সে আবার বাড়ীতে গেল, চারিখানি লুচি, একটু চিনি, কিছু কিছু ফল পাকোড়ও বালকটিকে আনিয়া দিল এবং খাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিল।

বালক কুমুদকামিনীর ব্যবহারে গলিয়া গেল, মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে তাহার অনুরোধ রক্ষা করিল।

অতঃপর বৃদ্ধ কুমুদকে অশেষ আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় চাহিলেন। কুমুদ বলিল, "আপনাকে একা ছেড়ে দিব না, চলুন কিছুদূর পৌঁছিয়া দিয়ে আসি।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আমার বাড়ী ঐ দেখা যাচ্ছে, আর তোমাকে যেতে হবে না, আমার বেশ শ্রান্তি দূর হয়েছে, একাই যেতে পার্‌বো।

কুমুদ বলিল, "না—তা হবে না। আমি আপনাকে বাড়ী পৌঁছিয়া দিয়া আস্‌বো।"

কুমুদ আপনার সূতা, কাটি, কাঁচি ও বোনা মোজাটুকু ঘরে রাখিয়া আসিল, আসিয়া দেখিল, বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া আছেন। কুমুদকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ পথ ধরিলেন, কুমুদকামিনী তাঁহার হাত ধরিতে গেল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "না—আমাকে হাত ধরে নিয়ে যেতে হবে না।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে আপনার বাড়ীর দিকে চলিলেন, কুমুদকামিনী তাঁহার পাশে পাশে যাইতে লাগিল দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত বালকটীও তাঁহাদের অনুগমন করিল। পথে যাইতে যাইতে বৃদ্ধ কুমুদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মা-বাপ আছেন?"

কুমুদ। আজ্ঞে হাঁ—বাবা আপিশে গেছেন, আর আজ পাঁচদিন হলো বড়মামার একটী ছেলে হয়েছে, তাকেই দেখ্‌বার জন্য মা খেয়ে দেয়ে মামার বাড়ী গেছেন; সন্ধ্যাবেলায় ফিরে আস্‌বেন।

বৃদ্ধ। তোমার মামার বাড়ী কোথায়?

কুমুদ। শ্যামবাজারে—আপনার কে আছেন?

বৃদ্ধ। ওকথা আর কেন বল মা! আমার একটি ছেলে ছিল, চাক্‌রী বাক্‌রী করিত, বিবাহ দিয়াছিলাম; আজ চারি বৎসর হইল—সে মারা গিয়াছে। বৌমা আছেন, তাঁর দুটী পুত্রও আছে। তিনি বড়মানুষের মেয়ে, আমি কৃষিজীবী বোলেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, আমার খোজ-খবর লয়েন না, ছেলেদুটিও হয়ত আমাকে ভুলে গেছে। কয়েকদিন আগে আমার ব্রাহ্মণী স্বর্গবাস করেছেন।

কুমুদ। এমন নিষ্ঠুর মেয়ে তো দেখিনি—কি ক'রে আপনার চলে?

বৃদ্ধ। বাড়ীর ধারে কয়েক বিঘা ধানের জমি আছে, একটী বাগানও আছে। একজন চাকর রেখেছি, তারও কেউ নাই—সে জমিগুলির চাষ, আবাদ করে; বাগানে ফল পাকড়, তরকারীপত্র জন্মে, তাই বিক্রয় করে চলে। চাকরটী পাকের অনুষ্ঠান ক'রে দেয়, দুটী চাউল ফুটিয়ে দুজনেই খাই। দুটী গাই আছে, খুব দুধ দেয়, দুজনে খেয়ে ফুরাতে পারি না। ক্ষীর, ছানা, মাখন দই তৈয়ারী হয়; কখন বেচি, কখন বা খাবার জন্যে ঘরে রেখে দিই। কোন কষ্ট নাই, কিন্তু যখনই আমার ছেলেটিকে মনে পড়ে, তখনই যেন বুকের ভিতর একটা আগুণ জ্ব'লে উঠে—ভগবানের নাম স্মরণ কল্লেই আবার সব ভুলে যাই।

এইরূপ কথাবার্ত্তায় তাঁহারা কিয়দ্দূর অতিবাহিত করিলে, পথের ধারে একটা টেরিয়ার কুকুর পড়িয়া ঘুমাইতেছিল, তাঁহাদের পদশব্দে চমকিয়া উঠিয়া বৃদ্ধকে কামড়াইতে আসিল, হাঁ করিল—কাঁমড়ায় আর কি, এমন সময় পশ্চাতের বালটীর হাতে একগাছি ছড়ি ছিল সে ছড়িগাছটী কুকুরটার মুখের কাছে ধরিল, বাধা পাইয়া কুকুরটা হটিয়া গেল, পথের ধারে দাঁড়াইয়া চেঁচাইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই বৃদ্ধ আপনার বাড়ীতে পৌছিলেন।

---

(৩)

বৃদ্ধের ভৃত্য উদিত সিং পাকের অনুষ্ঠান করিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছিল—প্রভু গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিয়া আসিতে কেন বিলম্ব হইতেছে—পথে হয় ত কোন বিপদ ঘটিয়া থাকিবে, নতুবা আসিতে এত দেরি কেন।

দূর হইতে উদিত সিং প্রভুকে আসিতে দেখিয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসিল, "আজ এতো দেরী হলো কেন ?

উদিত হিন্দুস্থানী হইলেও বেশ বাঙ্গালা বলিতে পারিত। সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে তিনটী মোড়া বাহির করিয়া আনিল, তাঁহারা তিনজনে তাহাতে বসিলে সে বড় পাখা একখানি লইয়া তাঁহাদিগকে বাতাস করিতে লাগিল, একটু শ্রান্তি দূর হইলে বৃদ্ধ উঠিয়া পাকশালায় গমন করিলেন, ভাত চাপাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিলেন, আর উদিতকে বলিলেন, "ফলটল যাহা কিছু আছে বালক ও বালিকাটিকে খাইতে দাও। উদিত দুধ দুইয়া জাল দিয়া রাখিয়াছিল, দুবাটী দুধও আনিল, ঘরে সন্দেশ তৈয়ারী ছিল তাহাও দিল, বৃদ্ধ আসিয়া তাহাদিগকে নিজহাতে খাওয়াইয়া দিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন, তাহারা তাহাতে নারাজি জানাইয়া আপনারাই খাইতে লাগিল। আর বৃদ্ধ, উদিতসিংকে দুর্ঘটনার কথা এবং ছেলে দুটীর কথা একে একে বলিয়া শেষ করিলেন।

বৃদ্ধ উভয়কেই সমান আদর যত্ন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু বেটা ছেলেটিকে দেখিয়া অবধি তাঁহার মনে যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছিল; পুনঃ পুনঃ তাহার হাসি হাসি মুখখানির দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন—যতবার দেখেন, ততবারই দেখিবার ইচ্ছা হয়, যেন তাঁহার মনে কিছুতেই তৃপ্তি হয় না; আবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন—আবার যেন দেখিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। শেষে তিনি ছেলেটার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, বালক আহার করিতে করিতে এক একটীবার অনিমেষ নয়নে চাহিয়া বৃদ্ধকে দেখে—আবার যেন একটু লজ্জা আসে, তখন মাথাটী হেঁট করে। এইরূপে অনেকক্ষণ গেল, শেষে বৃদ্ধ বালকটিকে জিজ্ঞাসিলেন, "আচ্ছা তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি—বল্‌বে কি ?"

বালক। কেন বলবো না, কি কথা বলুন না কেন ?

বৃদ্ধ। তোমার নামটী ননিগোপাল কি না ?

বালক। আজ্ঞে হাঁ।

বৃদ্ধ। কোথায় থাক?

বালক। বৌবাজারে।

বৃদ্ধ। তোমার মা বাপ আছেন?

বালক। না, দুজনের কেহই নাই।

বৃদ্ধ। মা নাই?

বালক। আমার বাপ মারা যাবার পরেই মা মারা গেছেন।

বৃদ্ধ। আ—হা—হা মাও মারা গেছেন, এ কথাতো কই জানিতাম না।

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের অনুজ্জল চক্ষু দুইটী জলে ভরিয়া গেল। দুই তিন বিন্দু জল মাটীতে পড়িয়া মাটীতেই মিশিয়া গেল। চক্ষু মুছিয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসিলেন, "তবে তোমার আর কে আছে?"

বালক। আমার দিদিমা ও দাদামশায় আছেন।

বৃদ্ধ। আর কেহ নাই?

বালক। তাঁহাদেরি মুখে শুনেছি, আমার ঠাকুরদাদা ও ঠাকুরমা আছেন।

বৃদ্ধ। ঠাকুরমা?

বালক। হাঁ—ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা দুইই আছেন। আমি তাঁদের কাছে যাওয়া আসা করি না ব'লে তাঁরাও আমার খোজ খবর লন না।

বৃদ্ধ আর আত্মগোপনে সমর্থ হইলেন না—অধীর হইলেন, পাগলের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে ননীগোপালকে বক্ষে লইয়া অতিকষ্টে বলিলেন, "এতদিনে আমার পুত্রশোক কতকটা জুড়াইল।"

ননিগোপালও বুঝিয়াছিল; বৃদ্ধ তাহার পিতামহ, তাহারও চক্ষু দিয়া জলধারা বহিয়া বৃদ্ধের পৃষ্ঠদেশ ভাসাইয়া দিল।

বৃদ্ধ অনেকক্ষণের পর আবার চক্ষু মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার ছোট ভাইটী ভাল আছে?"

বালক। হাঁ—সে ভাল আছে।

বৃদ্ধ বলিলেন, "এ সকল কথা কাহাকেও বলিও না, তুমি মধ্যে মধ্যে আমার কাছে এসো। এখন কি পড়াশুনা করচো?"

বালক। এই বৎসর ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষা দিব।

বৃদ্ধ। বেশ বেশ, তোমরা দুটী ভাই দীর্ঘজীবী হ'য়ে থাকো, তাহাই আমার সান্ত্বনা।

ঐই ঘটনাব পর কুমুদকামিনী কখন তাহার পিতামাতার সঙ্গে কখনও বা একাকিনী বৃদ্ধের বাড়ীতে আসা যাওয়া করিত। ননীও আসিত, কুমুদকামিনীর সহিত এইখানেই তাহার দেখাশুনা হইত। যেদিন উভয়ে সাক্ষাৎ না হইত, সেদিন উভয়েই একটু বিমর্ষভাবে ফিরিয়া যাইত।

ননিগোপাল বালক হইলেও পিতামহের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিল, বৃদ্ধ যে তাহার পিতামহ, এ কথা সে কাহাকেও জানিতে দেয় নাই, তবে আরও কয়েক-বৎসর পরে যখন সে কৃতবিদ্য হইয়া কুমুদকামিনীকে বিবাহ করিল, সেদিন আর কাহার কিছু জানিতে বাকী রহিল না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বর্ষার জীবনে সুখের বকুল ফুল ফুটিল।

ভগবান দুঃখের বর্ষায় এমন সুখের ফুল সকলের ভাগ্যে ফুটান কই? তাহা হইলেও সার্থক বলিয়া মানি।

বকুলকুমারী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল,

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিন্ধ্যাচল।

বারাণসীর অনতিদূরে মির্জ্জাপুর; ঐ সহরের সন্নিকটে বিন্ধ্যাচল। পৌরাণিক প্রবাদে কথিত আছে, বিন্ধ্যগিরির শিখরদেশ ক্রমশঃ অত্যুচ্চ হইতেছিল, অগস্ত্য মুনি তাহা খর্ব্ব করিবার অভিলাষে একদা তথায় উপস্থিত হন, গিরিবর নতশিরে তাঁহাকে প্রণাম করেন, ঋষি বলেন, "যদবধি আমি প্রত্যাগত না হই, তদবধি তুমি এইরূপ প্রণত অবস্থাতেই থাক।" অগস্ত্য আর সে দিকে ফিরিলেন না, সুতরাং বিন্ধ্যাচল নতশৃঙ্গ হইয়াই রহিয়াছে।

এই পর্ব্বতটী বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শাস্ত্রকারেরা বলেন, এই পর্ব্বত ভারত-ভূমিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। বিন্ধ্যাচলের উত্তরাংশ আর্য্যাবর্ত্ত এবং

দক্ষিণাংশ দাক্ষিণাত্য নামে বিখ্যাত।

বিন্ধ্যাচলের শোভা অতি রমণীয়; নানাজাতি তরুলতা এই পর্ব্বতকে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে, শরৎ ও বসন্ত ঋতুতে নানাজাতি কুসুম বিকশিত হইয়া ইহার অপরূপ শোভা সম্পাদন করে; প্রকৃতিসুন্দরী যেন বিচিত্র বাস পরিধান করিয়া প্রফুল্ল আননে হাস্য করিতে থাকেন। পর্ব্বতের সানুদেশে ও তলভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর, সেই সকল কুটীরে সন্ন্যাসী বেশধারী সাধকেরা অবস্থান করেন; উপত্যকাভূমিতে পাণ্ডালোকের বাস। যাত্রীসমাগম হইলে তাহারা সম্ভবমত দর্শনী লইয়া দেবদেবী দর্শন করায়; যাত্রীগণের মুখে শোনা যায়, এক একটী তীর্থে যেমন অর্থলোভী পাণ্ডালোকেরা যাত্রীপীড়ন করিয়া পয়সাগ্রহণ করে, বিন্ধ্যাচলের পাণ্ডাদের তত্তদূর দৌরাত্ম্য নাই।

পর্ব্বতে আরোহণ করিবার প্রবেশ পথে একটী গহ্বর, সেই গহ্বরে চতুর্ভুজা কালীমূর্ত্তি; গহ্বরটী নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, দিবানিশি তথায় ঘৃতপ্রদীপ জ্বলে। গিরিশিখরে একটী ত্রিকোণমণ্ডল, একদিকে যোগমায়া, একদিকে ভোগ-মায়া; মধ্যস্থলে অষ্টভুজা বিন্ধ্যবাসিনী দেবী। যাত্রীগণ ভক্তিভাবে সেই ত্রিকোণমণ্ডল দর্শন করিয়া পূজা করিয়া থাকে।

চত্বরে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঠ ও ধর্ম্মশালা; পথিকলোকেরা সেই সকল ধর্ম্মশালায় বাসস্থান ও আহার প্রাপ্ত হয়। মঠধারীরা প্রসন্ন হইলে যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ এক একটী মঠে আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

একদিন দিবা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে দুটী ভৈরবী একটী মঠের সম্মুখভাগে দর্শন দিল; একটী নবীনা ও একটী বয়োধিকা। ভৈরবীরা গৈরিকবাস পরিহিতা, রুদ্রাক্ষ মাল্য ভূষিতা, আলুলায়িত কুন্তলা, নাসাগ্র হইতে ললাটের উর্দ্ধস্থল পর্য্যন্ত সিন্দূরমণ্ডিতা, উভয়ের বামহস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণহস্তে ত্রিশূল। নবীনা ভৈর-বীর বামহস্তে একগাছি লৌহ বলয়, তদুপরি রুদ্রাক্ষমালা; উভয়েরই প্রশান্ত বদন, উজ্জ্বল নেত্র, গঠন সুন্দর; উভয়ের মুখে গৈরিক রং মাখা। নবীনাটী দিব্য সুন্দরী। দুটীতে প্রভেদ বুঝাইবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা পরিগ্রহ করি-য়াছে; নবীনার আখ্যা ভৈরবী, দ্বিতীয়ার আখ্যা যোগিনী।

একটী মঠে তাঁহারা আশ্রয়প্রাপ্ত হইল; মঠের সন্ন্যাসী তাহাদিগকে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল। দুই তিনদিন মঠবাসিনী হইয়া যোগিনী সহচারিণী ভৈরবী প্রাতে ও সায়ংকালে মঠে মঠে ও ধর্ম্মশালার নিকটে নিকটে পরিভ্রমণ করিতে

আরম্ভ করিল; যুগলে এক একস্থানে দণ্ডায়মানা হইয়া এক একদিন এক একটী গীত * গায়, উর্দ্ধমুখে চাহিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর নামে স্তুতিপাঠ করে; মুখভঙ্গী বা অঙ্গভঙ্গী কিছুই দেখায় না।

এই রকমে একমাস অতীত। একদিন প্রাতঃকালে তাহারা একটী মঠের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সুমধুর-স্বরে ললিতরাগিণীতে ভজন গীত গাহিতেছে, তচ্ছ্রবণে মোহিত হইয়া একটী নবীন সন্ন্যাসী সেই মঠের ভিতর হইতে বাহির হইয়া ভৈরবীদের গীত শুনিতে লাগিল; দৃষ্টি এক একবার সেই নবীনা ভৈরবীর মুখের দিকে।

সঙ্গীতলহরী থামিল। যুবা সন্ন্যাসী কৌতূহলবশে দিব্য শিষ্টাচার দেখাইয়া গায়িকা দুটীকে বলিল, 'তোমাদের গীত অতি চমৎকার, এমন মধুরকণ্ঠ এই বিন্ধ্যাচল আসিয়া অবধি আমার শ্রবণকুহরে প্রবেশ করে নাই; তোমাদের যদি এখন অন্যত্র গমনের বিশেষ প্রয়োজন না থাকে, তবে আর একটী গীত শুনিতে আমার অতিশয় আগ্রহ হইতেছে।"

যোগিনীর হস্তে সে দিন ত্রিশূল-কমণ্ডলু ছিল না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করতাল সংযুক্ত খঞ্জনী ছিল; যোগিনী খঞ্জনী বাজাইতে আরম্ভ করিল, নবীনা ভৈরবী মধুর-কণ্ঠে গীত ধরিল। গীতের প্রথম চরণ সমাপ্ত হইবার পর যোগিনীও সেই সুরে সুর মিলাইয়া এক সঙ্গে যোগ দিল। গীতটী এই :—

খাম্বাজ,—কাওয়ালী।

"ইএ জগ দরশন্ কি মেলা হ্যায়।
যত্ আয়া ইহাতু কুছ্ দেখ্ ভাল্ চল্ ফের, মিল্ জুল্ হাস্ বোল বাতা।
লেখানি দেশ কারণ। ফেরা সবকৈ ঠাওর্ আপে আপ্ একেলা হ্যায়॥
ইস্ সন্দিল বিচ্ নিরক্ত, কেয়া রং বিরংকা মৌরং হ্যায়।
হরদেশ নিরখ্ পরক্ত, ইস্ মৌরৎ মে কেয়া সুবাং হ্যায়।
ধন্য ওস্ কারিগর কো কহতু কহতু দিলসেঁ আপ্‌নে হাত বানায়ে হ্যায়।
রং রূপ সব আধা যৌবনকে ইয়ে কি আপন ডেরা হ্যায়।
ইহা আপশোশকে দেখতু, হব এক শোয়া একা হ্যায় মাতা, কৈ বাপ বানায়া,

* বৃন্দাবন বাসের সময় সুকুমারী দিনে দিনে সাধু সন্ন্যাসীদের মুখে শুনিয়া শুনিয়া গুটিকতক গীত মুখস্থ করিয়াছিল, পদ্মাবতীকেও শিখাইয়া রাখিয়াছিল।

কৈ বেটা, কৈ চাচা ভাতিজা কৌলাৎ হ্যায়।
কৈ মিয়া আপ্‌নে জানে, কৈ দাস আপ্‌কো মানে।
কৈ পীর হ্যায়, কৈ মৌরৎ হ্যায়, আউর কৈ গুরু কৈ চেলা হ্যায়।
ইয়ে সব যাব আপনা আপনা, সব ইহাকো ইহা রথো যাওঙ্গে,
ইয়ে দোস্তি নিশিবৎ নাতা, উহাঁ রাস্তা গাহোয়া যাওঙ্গে।
ইয়ে বৌদি যায়সি, সব মৌজিসে উহিঁ মিল যাউঙ্গি।
ফের না ঢাণ্ডা না কাজিয়া, আউর ব্যাকরানা রামেলা হ্যায়।”

গীত শ্রবণ করিয়া যুবক সন্ন্যাসীর বদনমণ্ডল অকস্মাৎ একবার আরক্ত হইল; বোধ হয় তত্ত্বজ্ঞানের বহ্নি ক্ষণেকের জন্য তাহার মস্তকের ভিতর জ্বলিয়া উঠিল; পরক্ষণেই ভাবান্তর। কুটিল নয়নে কামিনীর বদন নিরীক্ষণ করা কিম্বা কামিনীর সহিত বাক্যালাপ করা সন্ন্যাসধর্ম্মের বিরোধী, সে কথা হয় ত সে তখন ভুলিয়া গেল; হরিভক্ত সন্ন্যাসী চৈতন্য-পারিষদ ছোট হরিদাস একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ করিয়াছিল, সেই অপরাধে শ্রীচৈতন্য গৌরাঙ্গদেব ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই নবীন সন্ন্যাসীর হয় ত চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করা ছিল না, কিম্বা সে তত্ত্বকথা স্মরণ ছিল না; সেই কারণে নবীনা ভৈরবীর সহিত বাক্যালাপ করিবার জন্য তাহার মনে কৌতূহলানল জ্বলিল।

নবীন সন্ন্যাসীর বয়স অল্প। লক্ষণে বোধ হয়, সন্ন্যাসগ্রহণও অল্পদিন; কেননা তাহার শ্মশ্রুগুম্ফ ও মস্তকের কেশ দীর্ঘতাপ্রাপ্ত হয় নাই; দীর্ঘকাল গঞ্জিধূম সেবনে সচরাচর সন্ন্যাসীদের নেত্রপুট যেমন রক্তবর্ণ থাকে, ইহার সেরূপ নহে।

নবীনা ভৈরবীকে সম্বোধন করিয়া নবীন সন্ন্যাসী সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, এ তীর্থে তোমরা কত দিন পদার্পণ করিয়াছ? কোন্ মঠে তোমাদের অধিষ্ঠান?

মৃদুবচনে ভৈরবী উত্তর করিল, “একমাস মাত্র; দক্ষিণ দিকের যে মঠাশ্রমের সম্মুখে দুটী মাধবী লতার কুঞ্জ, সেই মঠে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি; পর্ব্বতে দেবী দর্শন করি, উপাসনা করি, প্রার্থনা করি, আশ্রয়-মঠ ভিন্ন অন্য কোন মঠে আমরা প্রবেশ করি না, ইচ্ছা হইলে, পথে পথে ভজনগীত গাহিয়া বেড়াই। আমার এই সঙ্গিনীটী যোগিনী, নিশাকালে ইনি যোগসাধন করেন, আমার এখনো যোগাভ্যাস শিক্ষা হয় নাই।

ভৈরবীরা যখন গীতটী গায়, সেই সময় আরো পাঁচ সাতটী সন্ন্যাসী তথায়

জমা হইয়াছিল, আরো কতিপয় শ্রোতাও তখন সেইখানে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; নবীন সন্ন্যাসীর সহিত নবীনা ভৈরবীর ঐ কথোপকথন তাহারা শুনিল, সকলের মুখেই বিস্ময়ের লক্ষণ লক্ষিত হইল। সে দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যুবা-সন্ন্যাসী বিনম্রবচনে ভৈরবীকে বলিল, "দয়া করিয়া তোমরা যদি আমার আশ্রম মধ্যে পদার্পণ কর, তাহা হইলে আমার আশ্রম পবিত্র হয়।"

প্রশান্তবদনে ভৈরবী বলিল, "পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, আশ্রয় মঠ ব্যতীত অন্য কোন মঠে আমরা প্রবেশ করি না; তবে যদি তোমার একান্ত আকিঞ্চন হয়, তবে চলো।"

যুবা সন্ন্যাসীর সহিত ভৈরবীরা সম্মুখস্থ মঠে প্রবেশ করিল, সন্ন্যাসী তাহাদিগকে বসিবার নিমিত্ত দুইখানি মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া দিল, তিন জনেই উপবেশন করিল। বাহিরের শ্রোতারা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

কে অগ্রে কি বলিয়া কাহাকে সম্বোধন করিবে, তাহা চিন্তা করিতে প্রায় তিন মিনিট অতীত হইল, তাহার পর যুবা সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া নবীনা ভৈরবীকে বলিল, "তীর্থধামে নবাগত তীর্থবাসীগণের আশ্রয় মঠ নির্দ্দিষ্ট থাকে না, তোমাদের অঙ্গজ্যোতি দর্শনে ও সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে আমরা উদ্ভ্রান্ত চিত্ত বিমোহিত হইয়াছে, তোমরা যদি সদয় হইয়া আমার এই মঠে কিছু দিন অবস্থান কর তাহা হইলে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়।"

ভৈরবী। কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যে মঠে আমরা এখন আছি, সেই মঠের অধিকারীঠাকুর কৃপা করিয়া আমাদিগকে তথায় স্থানদান করিয়াছেন, তাঁহাকে কি বলিয়া আমরা সে আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে পারি?

সন্ন্যাসী। যাঁহারা নূতন আইসেন, অল্পদিন একমঠে অবস্থান করিয়া তাঁহারা ইচ্ছা মত অন্যত্র চলিয়া যান, মঠস্বামীরা কোন আপত্তি করেন না।

ভৈরবী। সে কথা স্বতন্ত্র। আমরা যদি বিন্ধ্যাচল পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাই, মঠস্বামী তাহাতে আপত্তি করিবেন না ইহা সত্য, কিন্তু এক স্থানের একটী মঠ ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় মঠে আশ্রয় লইলে আপত্তি না হউক, পূর্ব্ব মঠস্বামী অবশ্য ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন।

সন্ন্যাসী। (একটু চিন্তা করিয়া) তোমার এ যুক্তি খণ্ডন করা দুঃসাধ্য। আমি কিন্তু তোমাদের সহিত একত্র বাস করিতে একান্ত অভিলাষী; অনুভবে বুঝিতেছি, একত্র বাস করিলে তোমাদের সহিত ধর্ম্মকথা আলাপনে আমি

অনেক দূর জ্ঞানলাভ করিতে পারিব। তোমরা যদি সেই আশ্রম-পরিত্যাগ করিতে সঙ্কুচিত হও, তবে আমার ইচ্ছা, সেই মঠের অধিকারীর অনুমতি লইয়া আমি এই মঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই মঠে অবস্থান করিব।

যোগিনীর দিকে একটু বক্রভঙ্গীতে কটাক্ষপাত করিয়া ভৈরবী বলিল, "তাহা যদি পারো, তাহাতে আমার কোন আপত্তি হইতে পারে না।"

সেই যুক্তিই স্থির হইল। আর অল্পক্ষণ তথায় থাকিয়া ভৈরবীরা বাহির হইয়া আসিল। তিনদিন পরে পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী ঐ ভৈরবীদের আশ্রমমঠে আশ্রয় লইল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব।

১৩ই ফাল্গুন রবিবার ভাগীরথীকূলস্থ বেলুড়মঠে শ্রীশ্রীপরমহংশ রামকৃষ্ণদেবের ঊনাশীতিতম বার্ষিক জন্মোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। নানাস্থান হইতে দলে দলে সঙ্কীর্ত্তনসম্প্রদায় সমাগত হইয়া ভগবানের মহিমাকীর্ত্তনে সর্ব্বানন্দ প্রদান করিয়াছিল, আন্দুল হইতে একজন অধিকারী আসিয়াছিলেন, তাঁহার দলের করুণাপূর্ণ কীর্ত্তন শ্রবণে ভক্তবৃন্দের নয়নে করুণাশ্রু প্রবাহিত হইয়াছিল। মহা গৌরবের বিষয় এই যে, বর্ষে বর্ষে যাত্রীগণের সংখ্যা অসম্ভব পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে; এ বৎসরের সমাগত লোক সংখ্যা বিংশতি সহস্রেরও অধিক। কলিকাতা হইতে যাত্রীগণকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আহিরীটোলার ঘাট হইতে চারিখানা বাষ্পীয় তরণী প্রাতঃকালাবধি সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত অবিরত গতিবিধি করিয়াছিল; প্রত্যেক তরণীতে তিলমাত্র ধারণের স্থান ছিল না। রাজধানী ব্যতীত বহু দূর-দূরান্তর হইতে বহুলোক বাষ্পীয় শকট ও অপরাপর যানারোহণে এবং পদব্রজে বেলুড়ে আগমন করিয়াছিল। সমারোহদর্শনে অনেকেরই ধারণা হইয়াছে যে, গঙ্গার পশ্চিমকূলে বেলুড়মঠ একটী অভিনব তীর্থস্থান। সহস্র সহস্র লোক পরমানন্দে পরমহংসদেবের প্রসাদী খিচুড়ী উপভোগ করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছে। মঠের ভক্তমণ্ডলী যথোচিত বিনয়-সৌজন্যে যাত্রীগণের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের গৌরববৃদ্ধি পরিদর্শন করিয়া হিন্দু সন্তানেরা

বর্ষে বর্ষে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন; যাহারা মূঢ় ও অতি পাষণ্ড, এই নব তীর্থের ভক্তি-মহিমা ও সমারোহ সন্দর্শনে তাহাদের হৃদয়েও কতক পরিমাণে ভক্তির সঞ্চার হইতেছে, ইহা অপরিসীম আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই; ভক্তের মুখে অবিরাম জয়ধ্বনি জয় জয় রামকৃষ্ণদেব জয়তি।

সমালোচন।

কুললক্ষ্মী।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। হিন্দুরমণীগণ কিরূপ গুণ-বিশিষ্টা হইলে কুললক্ষ্মী হইতে পারেন, গ্রন্থকার তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তক পাঠাদি গুণকে একাংশে গুণ বলিয়া ও প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া স্বীকার করিতে তিনি সঙ্কুচিত হইয়াছেন, গৌরবর্ণা ও সুগঠিতা শ্যামবর্ণা রমণীগণকে সুন্দরী বলিয়াও প্রকৃত সুন্দরী বলিতে তাঁহার অনিচ্ছা জন্মিয়াছে। উপক্রমণিকাভাগে ঐরূপে যে যে বিচারের সূত্রপাত দৃষ্ট হইল, তাহার ঠিক ঠিক মীমাংসা বুঝিতে পারা গেল না। ফলতঃ লজ্জা, বিনয়, শীলতা, কোমলতা, স্নেহ, মমতা, এবং পতিভক্তি গুরুভক্তি প্রভৃতি গুণগুলিকে যে ভাবে গুণ বলিয়া গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমাদের অবশ্য অনুমোদিত; শাস্ত্রমতে হিন্দু-রমণীর সেই সকল গুণেরই অধিক আদর, রামায়ণ মহাভারতে ধর্ম্মনীতি পাঠ করিয়া হিন্দু রমণী সাধ্যমতে তদনুসারে চলেন, সর্ব্বদা গৃহকার্য্যে নিপুণা থাকেন, অকারণ ক্রোধ ও উগ্রতা পরিবর্জ্জন করেন, মৃদু ও মধুরভাষিণী হন, এই সকল গুণ থাকিলেও আমরা আমাদের রমণীগণকে কুললক্ষ্মী বলিয়া আদর করি। কুল-লক্ষ্মীগণের স্বধর্ম্মে বিশ্বাস ও স্বধর্ম্মাচরণ পরীক্ষাসিদ্ধ। বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায় বোধ হয়, আমাদের গুণবতী প্রাচীনা গৃহিণীগণকে দেখিয়া থাকিবেন, তাঁহারা চিঠি লিখিতে জানিতেন না, নভেল নাটকাদি গ্রন্থ পাঠ করিতে জানিতেন না, মোজা জুতা পায়ে দিয়া চেয়ারে বসিতেন না, অথচ আদর্শস্থলে তাঁহারাই আমাদের যথার্থ আদর্শ কুললক্ষ্মী ছিলেন. আধুনিক হিন্দুসংসারে আমরা সেইরূপ কুললক্ষ্মী দর্শন করিতে চাই। সুরেন্দ্রবাবুর সদুপদেশগুলি দর্শন করিয়া আমরা তুষ্ট হইলাম; পিত্রালয়ে ও শ্বশুরালয়ে রমণীগণ সেই সকল উপদেশ পালন করিতে শিখিলে অচীরে আমরা অনেকগুলি কুললক্ষ্মী দেখিতে পাইব।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৯শ বর্ষ। | ১৩১৮ সাল, চৈত্র। | ১২শ সংখ্যা।

সনাতনের দীক্ষা।

লেখক—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ।

সন্ধ্যা অতীত; সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত অবসন্ন পশুপক্ষিগণ নিজ নিজ আবাসে সুপ্তিমগ্ন, জীবচেষ্টা স্পন্দনময়ী প্রকৃতি নিশ্চলা, আশ্রমস্থ তরুদল ধূমধূপে শাখাকম্পিত করিয়া প্রত্যাগত ঋষিবালকগণের অভ্যর্থনা করিতেছে, শুকপক্ষীরা দেববিমোহন স্বরে বন্দনাগীতি গাহিতেছে, এমন সময়ে ছাত্রবৃন্দ একে একে আশ্রমগুরু ভূমানন্দ স্বামীর চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইতে লাগিল; আশ্রমের সর্ব্বত্রই একটি শান্ত নিস্তব্ধতা; সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গুরুদেব প্রশ্ন করিলেন, "বৎসগণ! প্রকৃতির নিকট আজ তোমরা কি শিক্ষালাভ করিয়া আসিলে?" সনা-

স্নন নামে এক বুদ্ধিমান ছাত্র নতশিরে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, "প্রভু! আজ আমরা তরঙ্গাভিঘাতমুখরা মালিনীতটে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, শ্যামল তৃণাসনে বসিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গের অশ্রান্ত গতি লক্ষ্য করিতেছিলাম; লক্ষ্য করিতে করিতে কিয়ৎক্ষণের জন্য এমত তন্ময় হইয়া, আপনহারা হইয়া গেলাম যে, তাহা ব্যক্ত করিবার নহে। অকস্মাৎ উর্ম্মিকলাবাহী বাতাসের মৃদুসঞ্চালনের সহিত একটি অস্ফুট অশ্রুতপূর্ব্ব স্বর কাণে কাণে বাজিয়া উঠিল; আমি উঠিলাম, নদীর জলের দিকে কাণ পাতিলাম; বোধ হইল যেন এ স্বর এ মর্ত্তের নহে, ব্রহ্মাণ্ডের অপর পার হইতে আসিতেছে। সে অপূর্ব্ব ধ্বনি আকাশের গায় মিলাইয়া যাইতেছে, আবার উত্থিত হইতেছে। ক্রমে ক্রমে তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইল; বেশ বুঝিলাম, আমাকেই আহ্বান করা এ ধ্বনির উদ্দেশ্য, আমাকে উদ্বোধিত করিবার জন্যই ইহার উৎপত্তি; সেই বিশ্বব্যাপিণী ধ্বনি এখনও আমার শ্রবণপথে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কি সুমিষ্ট স্বর! কিবা অপূর্ব্ব পবিত্রতাময়ী গভীরতা। অপ্সরা-সঙ্গীত অমৃতকণা বহন করিয়া মলয়ানিলের সহিত বহিয়া আসিলেও এত তৃপ্তিপ্রদ হইত কিনা সন্দেহ।

আমরা পার্থিব জীব, অল্প শক্তি, মায়াবিমূঢ়; আমাদের সাধ্য কি যে, সে শব্দ ইয়ত্তা করিতে পারি। ইহা বেশ বুঝিলাম যে, প্রকৃতির মত গায়িকা, প্রকৃতির মত শিক্ষয়িত্রী আর নাই; তাই কি প্রকৃতি আমাদের চিন্ময়ী-মাতা, জগৎপালিকা আদ্যাশক্তি? সকলে নিস্তব্ধ, ভূমানন্দ স্বামীও নীরব; তখন অপর শিষ্য সনৎকুমার বলিলেন, "তাহার পর গুরুদেব! আশ্রমে ফিরিবার জন্য সনাতনকে কত ডাক ডাকিলাম, সনাতন, সনাতন বলিয়া কাণের নিকট কত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলাম, কোন সাড়াশব্দ নাই; হাত ধরিয়া তুলিলে তবে চৈতন্য আসিল। এমনি ভাবে বিভোর।"

ভূমানন্দ স্বামী। (সনাতনের দিকে চাহিয়া) সনাতন! যদি স্পষ্টভাবে সে ধ্বনি বুঝিতে পারিতে, তাহার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে, তবে আর আমার নিকটে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইত না। বৎস, ধন্য তুমি, তোমার জন্ম সার্থক, সাধনা ফলোন্মুখী। সে শব্দ বাহ্য-প্রকৃতির সহিত অখণ্ড চৈতন্যের অধ্যাস সংঘর্ষ, সে ধ্বনি জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সহিত পরমাত্মার বিবর্ত্ত অভিঘাত। আজি যাহা শুনিলে, তাহা নূতন নহে, অনাদিকাল ধরিয়া ঐভাবে উত্থিত হইতেছে, অনন্তকাল পর্য্যন্ত স্থিতি। বিজ্ঞান ইহার তত্ত্ব

জানে না, দর্শনে ইহার সুমীমাংসা হয় নাই ; তবে তুমি যে শুনিতে পাইলে, তাহা তোমার অধ্যাত্ম জ্ঞানানুশীলনের পরিচায়ক, সাধনার সার্থক ফললাভ, মানবজাতির আকাঙ্ক্ষার শেষ পরিণতি। ভবিষ্যতে তুমি যে ধর্ম্ম-সঙ্গীতে সমস্ত পৃথিবী মাতাইয়া তুলিবে, যে স্বরলহরীধারায় পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত অধ্যাত্মরসে সিক্ত করিবে, সমস্ত জাতিকে এই অভিনব ভাবমাহাত্ম্যে ভাবময় করিয়া তুলিবে, ইহা সেই সঙ্গীতের রাগিণী। সে স্বরের প্রথমাভিঘাত, ইহা ভাব সাগরের প্রথম দৃষ্ট লহরী বৈ আর কিছুই নহে। বৎস! ভবিষ্যতের সূচনা বর্ত্তমানের আশ্বাস জানিয়া তাহার জন্য প্রস্তুত হও।

সনা। কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। এই জড়যন্ত্র সাহায্যে কি সঙ্গীত উঠাইবেন ? এই জড় দেহের দ্বারা কি মহাকার্য্য সাধন করিবেন ?

ভূমা। সে সঙ্গীত, সে মহাকার্য্য, কি আমি জানি না, যে মহাশক্তি তোমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া এই মহাকার্য্য করাইবে, আমি দূর হইতে তাহার অস্পষ্টপথ তোমাকে চিনাইয়া দিব মাত্র। সে শক্তির অধিকারী আমি নহি। এক্ষণে তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য, শম, দম, তিতিক্ষা, ধ্যানধারণা অভ্যাস, প্রাত্যহিক, আহুতি ইত্যাদি কর্ত্তব্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানে মন স্থির কর, প্রাণপণ বেদপাঠ ও স্তোত্রগানে আপনাকে নিযুক্ত রাখ, ভক্তি-আর্দ্র অন্তঃকরণে পরমেশ্বর তত্ত্ব অনুশীলনে রত থাক।

সনা। প্রভু! সতীর্থগণের উচ্চ আহ্বান কেন আমার শ্রবণে প্রবেশ করিল না ? আমি ত বধির নহি।

ভূমা। বৎস! শ্রবণক্রিয়া শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম ; প্রথমে শব্দগুলি শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের মধ্যস্থ সূক্ষ্ম পরদায় আঘাত করিয়া তাহার মধ্য দিয়া অন্তঃকরণের ভিতর প্রবেশ করে ; তাই কবি গাহিয়াছেন, "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।" সেই শ্রবণেন্দ্রিয় যখন আমাদের অন্তঃকরণের সহিত একতান হয়, তখনই শব্দ প্রত্যক্ষ জন্মে। যে সময়ে অন্তঃকরণ শ্রবণেন্দ্রিয় ভিন্ন অপর ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তখন শ্রবণ ব্যাপার ঘটে না।

সনা। আমি ত তখন অস্ফুট গর্জ্জনে স্রষ্টার পুণ্যকোমল আহ্বান শ্রবণ করিতেছিলাম, অন্তঃকরণ ত শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিল।

ভূমা। শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় ত ভিন্ন ভিন্ন ; যে বিষয়াবলম্বনে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত

মন ব্যাপৃত থাকিবে, অন্য বিষয়াবচ্ছেদে ঐ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত ত ব্যাপৃত হইতে পারে না। তুমি গৃহের মধ্যে আছ, এ কথায় কি তোমার সকল গৃহে অবস্থান, না একটি গৃহেই অবস্থান বুঝিবে? তোমার মন যে সময়ে শ্রবণেন্দ্রিয় সহ সঙ্গীত শ্রবণে ব্যাপৃত ছিল, সে সময়ে কেমন করিয়া ইহাদের বাক্য শুনিতে পাইবে? এই দুইটি বিষয়ই পৃথক্। আর একটি সিদ্ধান্ত শুন! দেখ, কোন শব্দ শ্রবণ করিবার সময়ে আমাদের অন্তঃকরণ শ্রবণ প্রণালীর পথ দিয়া তদ্দেশে যাইয়া থাকে, এবং তদ্বিষয়ের আকার ধারণ করে, তাহাতেই শ্রবণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। তোমার মন যে সময় তরঙ্গের অস্ফুট গর্জ্জন শুনিয়াছিল, তদ্দেশে গমন করিয়া তদাকার ধারণ করিয়াছিল, সে সময়ে কেমন করিয়া সতীর্থগণের আহ্বান শুনিবে? এই বিষম পথে গমন করিবার তখনও সম্ভাবনাই ছিল না। এই দুইপ্রকার মতের সিদ্ধান্ত একপ্রকার জানিও। এ সিদ্ধান্ত বেদান্তের। ইহার নাম বৃত্তি (বিষয়াকারেই সিদ্ধ) এই কারণেই চক্ষুকর্ণাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষের দ্বার কহে; প্রত্যক্ষ কার্য্যের ইহারা যন্ত্রমাত্র। বাস্তবিক চক্ষু দেখে না, কর্ণ শুনে না, ত্বক্ স্পর্শ অনুভব করে না। তবে উহাদেরই দ্বারা এই সকলের প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহারা প্রত্যক্ষের প্রতিকারণ।

সনা। এক্ষণে আপনার কথা শুনিতে পাইতেছি, আবার অন্য শব্দও যে শুনিতে পাইতেছি না, এমত নহে, ইহার কারণ কি?

ভূমা। সে প্রকার মনঃসংযোগ এ ক্ষেত্রে হয় নাই, ইহাই ইহার কারণ। সে ক্ষেত্রে তোমার মন সঙ্গীত বিষয়দেশে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ছিল, এক্ষণে বিচ্ছিন্ন ভাব; ইহাই পার্থক্যের কারণ। ঠিক এক সময়ে উভয় দেশে মনের গমন সম্ভব নহে, তবে মন অত্যন্ত দ্রুতসঞ্চারী, ব্যাপক বলিয়া এক বিপল সময়ের মধ্যে শতদেশে গমন করিতে পারে। ইহা ন্যায় মত। মন সূক্ষ্ম, পরিমাণে অণু; তজ্জন্য এক সময়ে দুইটি ইন্দ্রিয়ের উপর ব্যাপৃত থাকিতে পারে না, সম্ভবও নহে। তবে যে ভ্রান্তি হয়, এক সময়েই দুই প্রকার শ্রবণকার্য্য সাধিত হইতেছে, বা রূপ প্রত্যক্ষ শ্রবণ প্রত্যক্ষ জন্মিতেছে, তাহার হেতু মনের অত্যধিক সঞ্চরণ শক্তি। ইহা বেদান্ত মত। সূচিদ্বারা পুস্তক পৃষ্ঠা পর পরই বিদ্ধ হয়; বোধ হয় যেন একসময়েই বিদ্ধ হইতেছে।

"যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গং।"

বেদমতে মন ব্যাপক, ন্যায়মতে মন অণুপরিমাণ; উভয় মতেই বুঝিলে যে এক সময়ে এক ইন্দ্রিয়ের দুইটী কার্য্য হয় না, আবার দুইটি ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যও এক সময়ে হইতে পারে না। যে সময়ে দর্শন কর, সে সময়ে শ্রবণ কর না।

সনা। দর্শন কি এই প্রকারেই ঘটে?

ভূমা। একই প্রকার। (বেদান্ত মত) চক্ষুর সম্মুখে একটি পুষ্প রাখিলে সে পুষ্পটি প্রথমে চক্ষুগোলকে প্রতিবিম্বিত হয়, সেই প্রতিবিম্বিত আকার চক্ষুদ্বার দিয়া অন্তঃকরণ দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, তাহাতেই দর্শনজ্ঞান ঘটে। ইহারও ভিন্ন দিক আছে (ইহা ন্যায় মত)। প্রথমে ফলটি তোমার নয়নসম্মুখে স্থাপন করা হইলে তোমার অন্তঃকরণ চক্ষুদ্বার দিয়া পুষ্পের উপর নিপতিত হইয়া পুষ্পাকারধারণ করিল, তখনই তোমার পুষ্পবিষয়ক প্রত্যক্ষ জন্মিল।

সনা। অন্তঃকরণ পুষ্পাকার ধারণ করিল, ইহা যেন কেমন কেমন শুনায়।

ভূমা। কেমন কেমন কেন, অন্তঃকরণে যাইবে না কেন? অন্তঃকরণ ত সাকার নহে, গুরুভার দ্রব্যও নহে যে, যাইতে পারিবে না। বাতাস পাত্রমধ্যে পুরিলে যেমন বাতাস পাত্রের আকার ধারণ করে, ক্ষেত্রে জল ঢালিলে, যেমন সে জল আলবালে পড়িয়া আলবালের আকার ধারণ করে, তদ্রূপ অন্তঃকরণও সেই সেই বিষয়দেশে গমন করিয়া তত্তৎদেশের আকার ধারণ করিবে না কেন? এক বিপলের মধ্যে সহস্র যোজন দূরবর্ত্তী দেশের ছবি সুস্পষ্ট চক্ষুর উপর দেখিয়া লও, বহুদিনপূর্ব্বে প্রিয়জনের আলাপ যদি শুনিয়া থাক, তাহাতে ইহা বুঝিতে পার যে, মন যদি তৎক্ষণাৎ সেই সেই বিষয়দেশে গমন না করিত, তবে অত শীঘ্র ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষ হইত না। বুঝিলে?

সনা। বুঝিলাম। তবে দর্শনশ্রবণাদির কর্ত্তা কে? অন্তঃকরণ সাহায্যে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মেইহা বলিলেই বা ক্ষতি কি?

ভূমা। কোন্ কার্য্যের প্রতি যাহার প্রয়োজনীয়তা অত্যাধিক, যাহা খুব ঘনিষ্ঠভাবে অপেক্ষণীয়, তাহাই সে ক্ষেত্রে অবলম্বনীয়। এস্থলে মন ও ইন্দ্রিয় উভয়ই বীজাঙ্কুরের মত পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা করে। তবেই দেখিতে হইবে, কোন্‌টি ব্যাপক। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন যে ব্যাপক, তাহা সহজেই বুঝিতে পার। স্বপ্নে ইন্দ্রিয় স্বকার্য্য করে না, কিন্তু মন সে সময়ে জাগ্রত

থাকেই, ইহা ত উপলব্ধি কর। উপনিষদে "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।" গীতায় "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।" তবেই ইন্দ্রিয় সন্ধানে মনই দর্শনাদি করে, এ পক্ষ অবলম্বনীয়। তবেই দেখ, ইন্দ্রিয় সাহায্যে অন্তঃকরণই দর্শন শ্রবণ করিয়া থাকে। স্বপ্নে জাগ্রদবস্থা পরিচিত ইন্দ্রিয়-সাহায্যে, পরলোকে সূক্ষ্মেন্দ্রিয় সাহায্যে অন্তঃকরণ দর্শনাদি ব্যাপার সাধন করে বলিয়াই অন্তঃকরণ কর্ত্তা, ইন্দ্রিয় তাহার করণ বা দ্বার স্বরূপ।

সনা। মন যদি দর্শনাদির কর্ত্তা, তবে আত্মা স্বীকারের আবশ্যকতা কি? সাক্ষী-গোপালের মত সে আত্মা থাকিবারই বা কি প্রয়োজন?

ভূমা। মন ত জড়, দেহ যেমন জড়, এই ইন্দ্রিয় মন প্রাণ তদ্রূপ জড়। জীব চলিয়া যাইলে দেহ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, পুষ্প শুকাইয়া যাইলে গন্ধ থাকে না, তবে দেহ যেমন প্রত্যক্ষ ত জড়, মন তাদৃশ নহে, শত সহস্র দেহের পরিবর্ত্তন ঘটিলেও মন নাশপ্রাপ্ত হয় না, কেবল মুক্ত ব্যক্তিরই মন প্রাণে, প্রাণে ও আত্মায় লীন হয়। আত্মচৈতন্য আছে বলিয়া মন চিন্তা করিতে সমর্থ হয়, নতুবা যন্ত্রের মত পড়িয়া থাকিত। বালুকার দাহিকাশক্তি নাই কেবল সূর্য্যতেজে বালুকার তাপশক্তি জন্মে। চৈতন্যশক্তি দ্বারা নিয়মিত হইয়া সকলেই স্ব স্ব অধিকৃত স্থান ত্যাগ করে না, নতুবা প্রাণ মনের কার্য্য, মন শরীরের কার্য্য, শরীর ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিয়া বসিত।

শ্রুতি বলেন, "যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।" রাজমিস্ত্রী যেমন ইষ্টকাদি লইয়া বিশাল হর্ম্ম্য প্রস্তুত করে, তদ্রূপ চৈতন্যময়কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া মন প্রাণ ইন্দ্রিয় পরস্পর সংহত হইয়া এই কার্য্য কারণের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহারা যখন জড়, তখন একটি চেতন পদার্থের অপেক্ষা করিবেই করিবে, ইষ্টাদি কখনও আপনা আপনি হর্ম্ম্য হইতে পারে না। মনুষ্যেরা আপনাদের চিন্তাশক্তি যতদূরেই লইয়া যাউক না কেন, শেষে এমন একটি স্থানে আসিয়া পড়িবে, যে স্থান বায়ুশূন্য, আকাশশূন্য, যে স্থানের ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নাই, যে স্থলে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ বা অগ্নি আলোক প্রদান করে না, বুদ্ধি কল্পনা, অনুমানের গতি যেস্থানে সঙ্কোচপ্রাপ্ত, সেই অবাঙ্মনোগোচর চৈতন্য-ময় বস্তুর নিকট যাইয়া মনপ্রাণ, ইন্দ্রিয় বুদ্ধি, সকলই সত্তা হারাইয়া ফেলে। "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুংশক্যো ন চক্ষুষা।"

যাঁহার বর্ণনে শ্রুতি চকিত, দর্শন সঙ্কুচিত, বিজ্ঞান অপারগ, যাঁহার মায়া-

শক্তি এই বিশ্বপ্রপঞ্চ, যিনি সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে থাকিয়া এই বিশ্বকে হস্ত-চালিত যন্ত্রের মত যাহা ইচ্ছা করিতেছেন, তিনি না থাকিলে "পৃথিবী সিকতাবৎ বিশীর্য্যেত।" শূন্যে শূন্যে সংঘর্ষে ব্রহ্মাণ্ড নাশ পাইতে পারে, অন্ধকার আলোক একসঙ্গে থাকিতে পারে, তথাপি আত্মাহীন বস্তু হইতে পারে না।

সনা। আপনি বলিলেন, মনই ইন্দ্রিয় সাহায্যে দর্শনাদি ব্যাপার সাধন করে, তবে তাহা আত্মসাপেক্ষ। আমি বলি আত্মার সহিত মনের সংযোগ ঘটিতে দোষ কি? সে সংযোগে আত্মা ভোক্তা হইলেই বা ক্ষতি কি?

"আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তো ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।"

ভূমা। আত্মা নিরাকার, নিরবয়ব, তাহার আবার সংযোগ কি? সংযোগ ত দ্রব্যদ্বয়েরই হইয়া থাকে, আত্মা কি ঘট পটের মত সাবয়ব দ্রব্য? আত্মার সহিত মধ্যে মধ্যে মনের সংযোগ ঘটে, ইহা অস্বীকার করিলে, আত্মার স্বপ্রকাশতার বাধা জন্মে, আর কখন্ ভোক্তা, কখন্ অভোক্তা ইহার নিশ্চয়তা থাকে না। নিত্যসংযোগ বলিলে, এক সময়ে দর্শন, শ্রবণ, ভক্ষণ হয় না কেন? কেমন করিয়াই বা সংসার যুক্তি সিদ্ধ হয়? তবে "আত্মমনঃ সংযোগে জ্ঞান সামান্যের প্রতি কারণ" ইহা কি ভাবে বুঝিলে সরল হয়, তাহা পরে আপনিই বুঝিবে।

সনা। আপনি বলিলেন যে, আত্মা নিরবয়ব ও ঘটপটাদি দ্রব্যের মত সাবয়ব নহে, বলিয়াই সে আত্মার সহিত মনের সংযোগ ঘটিতে পারে না, ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি না। ঘটপটাদি সাবয়ব দ্রব্য, তাহার সহিত নিরবয়ব আকাশের সংযোগ সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। গীতাতে ত স্পষ্টই উল্লেখ আছে, "ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সংযোগাৎ।" ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজড়ের সংযোগে বিশ্বচরাচর সৃষ্ট হইয়াছে।

ভূমা। ঘটপটাদির সহিত নিরবয়ব আকাশের যে জাতীয় সংযোগ ঘটে, তাহাতে ত কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না, কিন্তু ক্ষেত্র ক্ষেত্রে জড়যোগে বিশ্বের উদ্ভব হয়। সেই প্রকার আত্মার সহিত মনের সংযোগ স্বীকার করিলেও সে সংযোগ কোন বস্তু সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ দ্রব্যদ্বয়ের সংযোগের মত মনে করিও না। সম্ সম্যক যোগমিলন। এ সংযোগ অধ্যাস সংযোগ। এই আত্মার অধ্যাস

সংযোগে মন চেতনবৎ কার্য্য করে, এই জ্যোতির সান্নিধ্যবশতঃ মন তমঃ স্বরূপ হইয়াও আলোকময়, এই শক্তিমানেরই শক্তি পাইয়া শক্তিমান হইয়া থাকে। বালুকার স্বতন্ত্র তাপশক্তি না থাকিলেও অগ্নিতেজে তাপশক্তি জন্মে। এই কারণেই আত্মাকে "মনসো মনো যৎ" বলা হইয়া থাকে। এই অধ্যাস সত্তায় জগতের সৃষ্টি, এই অধ্যাসের অভাবে জগতের ধ্বংস। যাহা ক্ষয়শীল তাহাই ক্ষেত্র। শরীর ক্ষেত্র, আবার শরীরের কারণ এই কার্য্যকারণোপাধি জড় জগত ও ক্ষেত্র। ক্ষেত্রাধিষ্ঠাতা পুরুষই ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মা। এই ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার সহিত ক্ষেত্রস্থানীয় আসক্ত বিশ্বের অধ্যাস সম্বন্ধ নিয়ত বর্ত্তমান। শ্রুতিও বলেন, "ভুতে ভুতে ব্যবস্থিতং।"

সনা। বিষয়টি কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া আসিতেছে।

ভুমা। তুমি কি চাও, নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপের মত সহজ অথচ সুকোমল হইবে, তাহা হয় না। তুমি উঠিবে দুরারোহ পর্ব্বতে, মকমলের আস্তরণ কোথায় পাইবে? গভীর বিষয়ের অবতারণা কখন কাব্যের মত হয় না। সরল উপদেশ সহজ বটে, কিন্তু যেস্থলে বিরুদ্ধবাদী বলবান, তর্ক বা যুক্তি সেস্থলে একমাত্র অবলম্বন। সন্দেহ যে ক্ষেত্রে মন বা বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন রাখে, নাস্তিকতা যেখানে আধিপত্য বিস্তার করে, সে সকল স্থলে সরল উপদেশে কোন কার্য্য হয় না। শ্রোতা ভক্তিপ্রবল শ্রদ্ধালু হইলে তর্ক বা যুক্তির প্রয়োজন তাদৃশ আবশ্যক হয় না। তুমি যদিও ভক্তিপ্রবল ও শ্রদ্ধালু—তথাপি তোমাকে যখন ভবিষ্যতে নাস্তিকের নাস্তিকতা, সন্দিগ্ধের সন্দেহ, তার্কিকের তর্ককণ্ডুয়ন নাশ করিতে হইবে, তখন তোমার সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নানাসম্প্রদায়ের ভ্রান্ত জ্ঞানকে এক মহাসত্য জ্ঞানে পরিণত করিতে হইবে। যে সকল মহাপুরুষ লোকশিক্ষা দিবার জন্য মনুষ্যসমাজে আগমন করেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্ববিষয়েই পারদর্শী হইতে হয়। বৎসগণ! রাত্রি অনেক হইয়াছে, আজ এই পর্য্যন্ত; শারীরধর্ম্ম পালনও পরিহার্য্য নহে।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।"

ভারতেশ্বরী ও ভারত-সম্রাট।

মহারাণীর মৃত্যুর পরদিন যুবরাজের সিংহাসনে আরোহণ; সেইদিন তিনি সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ্যরূপে বলিয়াছিলেন, "অদ্য আমার মস্তকে গুরুভার অর্পিত হইল; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, পুণ্যবতী পূজনীয়া জননীর পন্থার অনুসারী হইয়া আমি ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন ও প্রজা পালন করিব, কর্ত্তব্যপথ হইতে এক পদও বিচলিত হইব না। রাজকার্য্য নির্ব্বাহে জগদীশ্বর আমার সহায় থাকিবেন, রাজমন্ত্রীগণ সর্ব্বদা আমায় সৎপরামর্শ দিবেন, আমি সমভাবে সকলের সবা করিয়া চিরজীবন প্রাণপণ যত্নে প্রজারঞ্জন করিব।" সেই দিন পার্লামেণ্ট মহাসভার নিয়মিত প্রথানুসারে তাঁহার ধর্ম্মতঃ শপথগ্রহণ।

রজদম্পতি।



যুগলমূর্ত্তি।

সিংহাসনারোহণের দিন রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া অক্ষরে অক্ষরে তাহা পালন করিয়া আসিয়াছিলেন। সন্ধি-স্থাপন করা তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল; ইউরোপের সমস্ত পরাক্রমের সহিত তিনি সখ্যভাবে সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন। ফ্রান্স প্রুসিয়া ও জর্ম্মণীর সহিত ইংলণ্ডের যে মনোমালিন্য ছিল, সন্ধিসূত্রে চিরদিনের জন্য তিনি তাহা বিভঞ্জন করিয়া বৈরানল নির্ব্বাপণ করিয়াছিলেন; আমেরিকার সঙ্গেও নববিধানে দৃঢ়সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল সদ্গুণে তাঁহার আখ্যা হইয়াছিল—"সন্ধিসখা ও শান্তিবন্ধু সপ্তম এডওয়ার্ড।"



লর্ড কর্জ্জন।



লেডি কর্জ্জন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখের তদানীন্তন ভারতপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন বাহাদুরের উদ্‌যোগে সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক ভারতে ঘোষণা করণার্থ দিল্লী নগরীতে মহাসমারোহে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, রাজকীয় ঘোষণায় তাহার নাম দিল্লীর দরবার। মহারাণীর তৃতীয় পুত্র ডিউক অব্ কনাট সেই দরবারে উপস্থিত ছিলেন; ভারতীয় করদ মিত্র রাজন্যবর্গ এবং সম্ভ্রান্ত সম্ভ্রান্ত ভারতবাসীগণের সমাগমে সেই দরবার অলঙ্কৃত হইয়াছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটনের কর্তৃত্বে দিল্লীতে যে মহাদরবার হয়, যে দরবারে মহারাণী ভিক্টোরিয়া এম্প্রেস্ অব ইণ্ডিয়া উপাধি প্রাপ্ত হন, সেই দরবারটি দিল্লীর প্রথম দরবার, ১৯০৩ অব্দের দরবারটি দ্বিতীয় দরবার। এই দরবারে সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের আদেশে লর্ড কর্জ্জনের দ্বারা আনুসঙ্গিক কার্য্যাবলীর সহিত কয়েদী খালাস, লবণের শুল্ক হ্রাস এবং বার্ষিক পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত আয়-বান ব্যক্তিগণের ইন্‌কম্ ট্যাক্স ক্ষমা, ভারতের সর্ব্বত্রব্যাপী আলোকদান, আতস-বাজী, ছাত্রভোজ ও কাঙ্গালীভোজন ইত্যাদি নানা মহোৎসব হইয়াছিল।

মহারাণীর সমাধি ক্রিয়ার পরদিন নবরাজ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড ভারতবর্ষের রাজ-গণকে ও প্রজাসাধারণকে এইরূপ এক পত্র লিখিয়াছিলেন :—

"ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ ও প্রজাবর্গ

সমীপেষু।

"আমার পূজনীয়া জননীদেবীর স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়াছে, আমি তাঁহার অধিকৃত সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছি। আমার মাতৃদেবী ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম অধিশ্বরী; যথাসময়ে তিনি ভারতবর্ষের সাম্রাজ্ঞী (Empress of India.) উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের ও সাধারণ প্রজাবর্গের কল্যাণ কামনা করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতেছি।

"আমার স্বর্গীয়া জননী সুবিশাল রাজ্যের সমস্ত রাজকার্য্য স্বয়ং সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করিতেন, তাঁহার প্রতি ভারতের কোটি কোটি অধিবাসীর প্রগাঢ় রাজভক্তির পরিচয় আমি অবগত আছি; ইত্যগ্রে তাঁহারই অনুমতিক্রমে আমি ভারতবর্ষে গমন করিয়া ভারতীয় রাজগণের ও সাধারণ প্রজাগণের আন্তরিক রাজভক্তির নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি। রাজ্যেশ্বরীর লোকান্তর যাত্রার পূর্ব্ব বৎসরে দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রামসূত্রে সৈন্য সাহায্যকরণে ভারতবাসী রাজগণের ঔৎসুক্য প্রকাশে সেই রাজভক্তির উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। ভারতপরিদর্শনে ও রাজভক্তির নিদর্শনে তৎকালে আমার যে সংস্কার জন্মিয়াছিল, যাবজ্জীবন তাহা আমি বিস্মৃত হইব না। মাতৃদেবীর পন্থানুসরণে আমি এক্ষণে ভারতের প্রজাপালন ও ভারতবাসীর রাজভক্তিলাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্নবান থাকিব। ইতি—

উইণ্ডসর।	(স্বাক্ষর) এড্ওয়ার্ড,
৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯০১ খৃঃ।	রাজা ও সম্রাট।"

নবীন সম্রাটের মহৎ উদারতাপূর্ণ ঐ সকল আশাময় বাক্য শ্রবণে সমগ্র ভারতবাসী ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশায় ও আনন্দে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক কেবল আশামাত্র নহে, সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ড আপন অঙ্গীকার অনুসারে ভারত শাসনকল্পে সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। দুঃসহ বুয়ার যুদ্ধে বহুপ্রাণীর রুধিরধারায় রণক্ষেত্র পরিসিক্ত হইয়াছিল; ১৯০২ অব্দে ভীষণ যুদ্ধের অবসানে উদারহৃদয় সম্রাট এড্ওয়ার্ড সেই বুয়রগণকে ট্রান্সভালরাজ্যে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা সাধারণ মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ড জাপানের সহিত ইংলণ্ডের পূর্ব্ব সন্ধি দৃঢ়তর করিয়াছিলেন।

সিপাহী-বিদ্রোহের শান্তি হইলে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতরাজ্যের গুরুভার স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক যে সর্ব্বরঞ্জিনী ঘোষণার প্রচার করিয়াছিলেন, সেই ঘোষণাপত্রের মর্ম্মানুসারে সম্রাট এড্ওয়ার্ড এক নূতন ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া ভারতবাসীর হৃদয়ে

নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছিলেন। সেই সর্ব্বরঞ্জন অভিনব ঘোষণাপত্রের মর্ম্ম এই :—

১। এই বৎসর ভারতসম্রাজ্ঞীর পূর্ব্বোক্ত ঘোষণাপত্রের পঞ্চাশৎবার্ষিক উৎসব। এই শুভক্ষণে আমি সেই পবিত্র ঘোষণার প্রতিজ্ঞাপালনে একাগ্রমনে প্রতিজ্ঞা করিতেছি। ভারতবাসীগণ! এই পঞ্চাশ বৎসর আপনাদের জাতীয় ইতিবৃত্তের অত্যল্প অংশমাত্র। তথাপি পূর্ণ ইতিবৃত্তের ঘটনাবলীর মধ্যে এই অর্দ্ধ শতাব্দীকাল সুদৃঢ় অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মহারাণীর ঘোষণাপত্রের সময় হইতে ভারতরাজ্যের শাসনকার্য্য একতন্ত্রাধীন হইয়াছে; বহুধা বিভক্ত বহু সম্প্রদায়ভুক্ত ত্রিশকোটি ভারতবাসী অত্যুৎসাহে ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তির পরিবর্দ্ধনার্থ একত্র সম্মিলিত হইতেছে। এই অর্দ্ধ শতাব্দীকাল রাজেশ্বরীর আন্তরিক যত্নে ভারতের রাজকার্য্যের যতদূর নূতন অনুষ্ঠান হইয়াছে, অদ্য আমি তাহা পর্য্যালোচনা করিতেছি।

২। যুগযুগান্তরে বিস্তৃত রাজ্যশাসনে বিস্তর বাধাবিপত্তি ঘটিয়াছে, আমাদের রাজত্বেও ভারতে তাহার অভাব ছিল না, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সুদক্ষ প্রতিনিধিগণ যথাশক্তি যত্নে সেই সকল বাধাবিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন; ভারতে কোনপ্রকার অত্যাচার শ্রুত হইলে অবিলম্বে ইংলণ্ডে তাহার প্রতিবিধান হইয়াছে।

৩। প্লেগাদি উৎকট ব্যাধি এবং অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈব-দুর্ব্বিপাক সহজে বিদূরিত করা মানবের আয়ত্ত নহে, আমাদের রাজ্যের প্রতিনিধিগণ যথাশক্তি যত্নে সম্ভবমত তাহার প্রতিকার করিয়াছেন। ভারতে দীর্ঘকাল শান্তিবিরাজ করিতেছে,

৪। ১৮৫৮ অব্দের ঘোষণায় মহারাণীর যে সকল মঙ্গল অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে, তন্মধ্যে ভারতের শিল্পোন্নতি ও সাধারণ হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানের অঙ্গীকার অগ্রগণ্য; সাধ্যানুসারে তাঁহার সে অঙ্গীকার প্রতিপালিত হইয়াছে।

৫। আমাদের রক্ষণাধীন ভারতের করদ ও মিত্র রাজগণের স্বত্বাধিকার নিরাপদে আছে; প্রজাপুঞ্জের সামাজিকরীতি ও ধর্ম্মবিশ্বাস-সংক্রান্ত স্বাধীনতা সুরক্ষিত হইয়াছে, জাতিবর্ণভেদে আইনের পক্ষপাতিতা দূর করা হইয়াছে।

৬। ভারতের বহুকোটি লোকের পালনভার এক্ষণে আমার মস্তকে সমর্পিত, সুখশান্তির বিঘ্নকারী কুচক্রী বিদ্রোহিগণকে দমন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; রাজ্যের চিররাজভক্ত পরিণামদর্শী অধিবাসীগণ সেই সকল ষড়যন্ত্রকারীকে ঘৃণা করেন, ইহা আমার শ্লাঘার বিষয়।

৭। অপরাধবিশেষে অপরাধী বন্দিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করা আমার ইচ্ছা; ১৯০৩ অব্দে ভারতের দিল্লীনগরীতে আমার রাজ্যাভিষেকের দরবার উপলক্ষে কতকগুলি বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, অবসর উপস্থিত হইলে ভবিষ্যতেও সেইরূপ দয়ার কার্য্য প্রদর্শিত হইবে। যাহারা দয়া পাইবে, তাহারা আর অপরাধে লিপ্ত হইবে না, ইহাই আমার বিশ্বাস।

৮। শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দান করিলে জাতিধর্ম্মভেদ না রাখিয়া ভারতের যোগ্য যোগ্য ব্যক্তিগণকে রাজ্যের উচ্চ উচ্চ পদে নিয়োগ করা হইবে।

৯। প্রতিনিধি দ্বারা রাজশাসনের মূলনীতি পূর্ব্ব হইতেই ভারতে প্রচলিত হইয়াছে, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল ও মন্ত্রীসভার সহায়তায় সেই নীতির সম্প্রসারণে আমি যত্নবান। আপনাদের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর সুশিক্ষিত পুরুষেরা স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার ও স্বদেশের আইন প্রণয়নে অধিকতর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, আমি আপনাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে সম্মত আছি, তদ্দ্বারা বৃটিশ শক্তির ভিত্তি আরও বদ্ধমূল হইবে, আপনারাও দিন দিন উন্নতিলাভ করিতে পারিবেন, এইরূপ আমার বিশ্বাস।

১০। ভারতবর্ষের সামরিক বিভাগে ভারতীয় সেনাগণের দক্ষতা ও বিশ্বস্ততা আমি অবগত আছি; আগামী নব বর্ষের প্রথম দিবসে আমি তাহাদের সেই বিশ্বস্ততার পুরস্কার স্বরূপ যথোচিত নিদর্শন জ্ঞাপন করিব।

১১। ভারতের মঙ্গল আমার জননী মহারাণীর জীবনের চিরকামনা ছিল, আমিও ১৮৭৫ অব্দে ভারতভ্রমণ করিয়া আসিয়া অবধি ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গল চিন্তা করিতেছি। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আমি আমার প্রিয়পুত্র প্রিন্স জর্জ্জকে ভারতবর্ষ দর্শন করিতে প্রেরণ করিয়াছিলাম, স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া তিনি সেই দর্শন ফলের প্রশংসাকীর্ত্তনে ভারত-মঙ্গলে আন্তরিক অভিলাষী হইয়াছেন, তাঁহার বুদ্ধিমতী পত্নীও ভারত-কল্যাণে অনুরাগিণী। রাজপরিবারবর্গ এবং সমগ্র গ্রেটবৃটেন সেই অভিলাষে একসূত্রে বদ্ধ, ইহা আমার অসামান্য গৌরবের কথা।

১২। ভগবানের কৃপায় আমি এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছি, ভগবানের কৃপায় আমি যেন সেই কর্ত্তব্য পালনে ও সকলের সহিত সদ্ভাব-রক্ষণে সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারি, ইহাই আমার একান্ত কামনা।

সম্রাটের নূতন ঘোষণার এইরূপ উদার মর্ম্ম। আমরা তাঁহার শুভ কামনার

সুফল ভোগ করিয়া সুখী হইয়াছি।

সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ডের অধিকারকালে ভারতের কৃষি ও রেলওয়ে বিভাগে কতদুর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার উদাহরণ স্বরূপ আমরা এক জন ভারতের বিশেষ অবস্থাজ্ঞ বৈষয়িক পণ্ডিতের বাক্য এইস্থলে উদ্ধার করিতেছি। সর্ব্ববিষয়ে সুশিক্ষিত পঞ্জাব সিবিলিয়ান সার জেম্‌স উইল্‌সন্ আপন অভিজ্ঞতার ফলে লিখিয়াছেন, "উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে ৫৯ লক্ষ ১০ হাজার বিঘা জমিতে ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল, বিংশ অব্দের প্রথম দশ বৎসরে ৬৫ কোটি ৪০ লক্ষ বিঘা জমিতে চাষ হইয়াছে। খালখনন ও জলসেচনের ফলে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি, পরিমাণবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফসলেরও প্রাচুর্য্য হইয়াছে, নূতন নূতন খাল খনন করা হইয়াছে। ১৯০০ অব্দে ৯ কোটি বিঘা জমি খালের জল প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৯১০ অব্দে ১২ কোটি ৬০ লক্ষ বিঘা ভূমি খালের জল প্রাপ্ত হইয়াছে। সার জেম্‌স বলেন, খালের জল প্রাপ্ত হইলে ভূমিতে দ্বিগুণ ফসল উৎপন্ন হইবে। ইহার পর রেলওয়ের কথা। সার জেম্‌সের বাক্যপ্রমাণে ১৯০০ অব্দে ভারতীয় রেলওয়ের মূলধন ছিল ৩৪০ কোটি টাকা, ১৯০৯ অব্দে সেই মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়া ৪৫০ কোটি হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে নূতন নূতন রেলরোড বিস্তৃত হইতেছে, বর্ত্ম বিস্তারে বর্ষে বর্ষে ১৫ কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে, বিংশতি কোটি পর্য্যন্ত ব্যয় করা হইবে, এইরূপ প্রস্তাব চলিতেছে। ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে আয় বৃদ্ধি হইবে, ইহা নিশ্চয়। রেলওয়ের সাহায্যে ক্রমশঃই বাণিজ্য বিস্তার হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ডের বাল্য ও যৌবন জীবনে প্রকৃতিসিদ্ধ মধুরতার বিকাশ হইয়াছিল। ক্রোধ, অভিমান ও অহঙ্কার তাঁহার চরিত্রকে কলঙ্কিত করে নাই, কোন কারণে কাহাকেও তিনি রুক্ষবাক্য বলেন নাই; প্রকৃতি কোমল ছিল বলিয়া নগরের নরনারীগণ তাঁহাকে ভালবাসিতেন। দরিদ্রের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ দয়া ছিল; অনাথ দরিদ্রগণের নিমিত্ত অনাথ নিবাসস্থাপনের তিনি প্রবর্ত্তক ছিলেন। যৌবনে বিবিধ আমোদ-প্রমোদে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল; নৃত্যগীত, ঘোড়দৌড় ও স্ফূর্ত্তিখেলা প্রভৃতিতে তাঁহার অত্যন্ত আমোদ হইত। আমোদের পিপাসা যখন প্রশমিত হইয়া আসিল, তখন তিনি যত্নপূর্ব্বক পশুপক্ষী পালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গো, অশ্ব, মেষ, কুক্কুর, হরিণ ও শশক প্রভৃতি পশু এবং নানাজাতীয় পক্ষী সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার

গো-গৃহে বহু সংখ্যক দুগ্ধবতী গাভী ও বলশালী বৃষ উৎপাদিত হইত; তাঁহার পালিত গাভী ও বৃষগণ উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইত; একবার ৮টি বৃষের মূল্য হইয়াছিল বারো হাজার তিন শত চল্লিশ পাউণ্ড। পশুপক্ষী পালনের সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র মনুষ্যপালনের উপায় করিয়া দিতে তিনি বিস্মৃত হইতেন না। লণ্ডনের শ্রমজীবী লোকেরা একবার একটি প্রদর্শনী খুলিয়াছিল, তিনি ছদ্মবেশে সেই মেলার স্থলে প্রবেশ করিয়া উদ্‌যোগীগণকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে গরীবলোকের মেলায় বড় লোকেরা প্রায়ই গমন করিতেন না; ইংলণ্ডের যুবরাজ গরীবের মেলায় গমন করিয়াছিলেন, এই কথা রাষ্ট্র হওয়াতে তদবধি বড় বড় পদস্থ ধনবান লোকেরা গরীবদের মেলায় উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সম্রাট এড্‌ওয়ার্ডের স্বভাব যেমন মধুর, আকৃতির মধুরতাও তদ্রূপ সুন্দর ছিল; সর্ব্বক্ষণ তিনি প্রফুল্ল থাকিতেন, অপরাপর ব্যক্তিগণকেও প্রফুল্ল দেখিতে ভালবাসিতেন। সেই চিরপ্রফুল্ল রাজকুমারের বিবিধ কার্য্যের পর মহাগৌরবে রাজ্যপ্রাপ্তি। তাঁহার যখন অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম, মহারাণী সেই সময় তাঁহাকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, "বৎস! দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুত্রগণ মাতাপিতার শাসনে থাকে, অষ্টাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুজ্ঞার অধীনতা বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, ইহাই সামাজিক নিয়ম; তুমি এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছ, তোমার সে অধীনতা বন্ধন ছিন্ন হইল; সাবধান, কুসঙ্গে মিশিয়া, কুকার্য্যে রত হইয়া, বংশমর্য্যাদা খর্ব্ব করিও না; স্বীয় গৌরবে সর্ব্বদা সৎকার্য্যে নিরত থাকিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের হিতসাধনে তৎপর থাকিও।"

যৌবন-চাপল্য তিরোহিত হইলে যুবরাজ পদে পদে মাতৃআজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। ৫৯ বৎসর বয়সে সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন; ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, সন্ধিস্থাপন ও সর্ব্বজনের মনোরঞ্জন করিয়া তিনি ১৯১০ অব্দের ৬ই মে তারিখে পরলোকযাত্রা করিয়াছেন, তাঁহার ৬৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল; রাজ্যভোগের নবমবর্ষ পূর্ণ হইবার অগ্রেই দুরন্ত নিষ্ঠুর কাল তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে! রাজসংসারে তাঁহাকে অদ্বিতীয় কর্ম্মবীর বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়; মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত তিনি যথাসাধ্য পরিশ্রমে রাজকার্য্য সংক্রান্ত দলিলপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন; শেষ নিশ্বাস বহির্গত হইবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে চিকিৎসকগণের নিষেধবাক্যের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "কর্ম্ম আমি ত্যাগ করিব না, যতক্ষণ শ্বাস থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি কর্ম্ম করিব।" বাস্তবিক

তাহাই তিনি করিয়াছিলেন।

প্রকৃতই তিনি কর্ম্মবীর; সম্রাট এড্ওয়ার্ড প্রকৃত পক্ষে অন্তকাল পর্য্যন্ত বাক্য পালন করিয়া কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২০এ মে তারিখে ভারত-সম্রাটের মৃতদেহ মহাসমারোহে সমাহিত হইয়াছে। জর্ম্মণী, ডেন্মার্ক, নরওয়ে, স্পেন ও গ্রীস প্রভৃতি রাজ্যের নয়জন রাজা ও পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাজ্যের প্রতিনিধিগণ তদুপলক্ষে ইংলণ্ডে আসিয়া সমাধিক্ষেত্রে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

স্বামির পরলোকপ্রাপ্তির পর বিধবা রাজমহিষী আলেক্জান্দ্রা ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জকে যে একখানি করুণাপূর্ণ, শোকপূর্ণ ও প্রীতিপূর্ণ আশ্বাসসূচক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম :—

স্বামীহারা হইয়া আমি নিদারুণ শোকে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতেছি, আমার এই মহাশোকে বৃটিশসাম্রাজ্যের যাবতীয় সুহৃদ ও প্রকৃতিপুঞ্জ যথোচিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, ঈশ্বরের কৃপায় ভাগ্যক্রমে তাহাই আমার শান্তনা। আমার ভারত রাজ্যবাসী রাজভক্ত প্রজাবর্গকে প্রগাঢ় স্নেহানুরাগে আমি জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমার প্রিয় পুত্র পঞ্চমজর্জকে আমি তাঁহাদের যত্নের উপর সমর্পণ করিলাম, তাঁহারা আমার স্বামীর প্রতি যেরূপ অকপট ভক্তি প্রকাশ করিয়া তৎকৃত উপকারে কৃতজ্ঞ রহিয়াছেন, আমার প্রিয় পুত্র ও প্রিয়তমা পুত্রবধুর প্রতিও সেইরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিবেন, তাঁহারাও ভারতের কল্যাণে নিরত থাকিয়া তাঁহাদের স্নেহভক্তি আকর্ষণে যত্নশীল থাকিবেন।

নয় বৎসরকাল সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ডের রাজত্বে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজভক্ত প্রজাবৃন্দ অবিচ্ছেদে সুখশান্তি উপভোগ করিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগ-বার্ত্তা শ্রবণে বঙ্গের একজন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ হৃদয়গত রাজভক্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইংরাজ যদি মানবের পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস রাখিতেন, তাহা হইলে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ইংলণ্ডের রাজবংশে স্বর্গীয় সপ্তম এড্ওয়ার্ডের পুনরাবির্ভাব কামনা করিতাম।" আমরাও ঐ বাক্যে অন্তরের সহিতঅনুমোদন করি।

সাহিত্য-সম্মিলন।

অনেক দিনের কথা, যৎকালে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের "অনুসন্ধান" পত্রের প্রচার বন্ধ হয় নাই; তৎকালে শ্রদ্ধাস্পদ ঔপন্যাসিক ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত ও স্বয়ং শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় "অনুসন্ধান" কার্য্যালয়ে বসিয়া মনের খেয়ালে নানারূপ কল্পনাজল্পনা করিতে করিতে দুঃস্থ সাহিত্য সেবিদের অসচ্ছলতা নিবারণ জন্য কিছু করা আবশ্যক সিদ্ধান্ত করিয়া, "সাহিত্য সম্মিলন" নামে একটী সমিতি স্থাপন করেন। উক্ত ক্ষুদ্র সমিতির প্রার্থনামতে কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল পরম সুবিজ্ঞ সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাতে সম্মিলিত হইলেন, এবং ঔপন্যাসিক স্বর্গীয় দামোদর বাবুও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার সংস্রব গ্রহণ করিলেন, আর সভার অভিভাবক বা মুরুব্বি হইলেন স্বর্গীয় রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর। সেই হইল সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্ভব। তাহার পরে বর্ষে বর্ষে কলিকাতার নানাস্থানে দুই একটী করিয়া অধিবেশন হয় মাত্র, সভার উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী কোন অনুষ্ঠানই হইয়া উঠে নাই। কারণ তাহাতে বহু অর্থের প্রয়োজন, আজ পাঁচ বৎসর হইল কাশিমবাজারের সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর আপন রাজধানীতে সাহিত্য সম্মিলনের একটী অধিবেশনে বহু সাহিত্যসেবীকে সমবেত করেন। অনুসন্ধান কার্য্যালয়ে যে সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্ভব (নাম মাত্র বাদে) উহা নূতন রকমে গঠিত ও পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। নানাকারণে গত চারি বৎসর সাহিত্য-সম্মিলনে জুটিবার মিলিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই, এবার কলিকাতার নিকটবর্ত্তী চুঁচুড়া সহরে সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন—এখানে উপস্থিত হওয়া আয়াস বা অর্থসাধ্য নহে; কাজেই নিমন্ত্রণ পাইবামাত্র ১৯শে ফাল্গুন শনিবার সম্মিলনের প্রথম দিনে অনেক আশা, খুব উৎসাহ আগ্রহ বুকে ধরিয়া আমি চুঁচুড়ায় উপস্থিত হইলাম। এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় ও খাস-সম্মিলনের সভাপতি কাশিমবাজারের স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর। তিনদিনের উপর্য্যুপরি সম্মিলনে যাহা হইয়া গেল, সবই আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, স্বকর্ণে শুনিলাম। মফঃস্বল এবং সহরের সংবাদপত্র সমূহে আজি পর্য্যন্ত যে সব মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। সেই সকল বিষয়ের আলো-

চনা করিতে হইলে কিছু আড়ম্বর না করিলে চলে না ; ফলে তাহাতে প্রবৃত্তি নাই। তবে যে সব কথা না বলিলে প্রত্যবায় ঘটে, তাহা না বলিয়া কিরূপে থাকা যায়।

সম্মিলনের সার জিনিষ সভাপতি মহোদয়গণের অভিভাষণ, তাহাতে সকল কথাই সংক্ষেপে পাওয়া যায়। সর্ব্বাগ্রে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সরকার মহাশয়ের অভিভাষণের আলোচনা করিব। তাঁহার ২৪ পৃষ্ঠাপূর্ণ অভিভাষণে এই কয়টী বিষয় দেখিতে পাই ঃ—

১। অভিভাষকের দৈন্য—সে দৈন্যের সীমাসরহদ্দ নাই—অসীম। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের দৈন্যেরও বাড়া। ইহাই তাঁহার সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি।

২। চুঁচুড়ার "গত যত বৈভব"—মায় সাহিত্য স্বাস্থ্য, সুখ স্বচ্ছন্দতা, প্রাচীনত্ব ইত্যাদি ঐশ্বর্য্যের কথা। ইহাই তাঁহার রাজসিকী মূর্ত্তি। রাজসিকতা, সাত্ত্বিকতা ও তামসিকতার মধ্যবর্ত্তীগুণ বলা যাইতে পারে। সেইজন্যই বুঝি কলিকাতার বিদ্যাসাগর মহাশয়, ঢাকার কালীপ্রসন্ন, চট্টগ্রামের নবীনচন্দ্রের নাম করিয়াও খাস চুঁচুড়ায় সশরীরে বিদ্যমান দীননাথ ধর ও ব্রহ্মমোহন মল্লিক মহাশয়ের নাম গৃহীত হয় নাই। সম্মিলনের স্থান হইতে তাঁহাদের অবস্থিতি স্থান দশ মিনিটের পথ না হইলেও সভাস্থলে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

৩। বঙ্গভাষার আকৃতিপ্রকৃতি, প্রাচীন ও আধুনিক আলোচনায় কেবল তামসিক ভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। অভিভাবক সভাপতি সরকার মহাশয় ভাষা-চর্চ্চা সম্বন্ধে যে কথা কয়টী বলিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালাভাষাকে অনন্তরূপিণী বলা হইয়াছে। তাহারই মধ্যে "সাগরী"ভাষা যে একটী রূপ, দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা খোলসা করিয়া দেখাইয়া দেওয়াও হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইতে "অপ্রতিহত প্রভাবে" এই শব্দটী তুলিয়া দেওয়ায় আসল কাজে বিলক্ষণ বিঘ্ন বাধা আনিয়া ফেলিয়াছে। ঐ শব্দটীকে যেমন আছে তেমনি রাখিয়া অর্থাৎ—"রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।" চলিত বাঙ্গালায় উহার ভাব প্রকাশ করিতে হইলে আর "রাম অযোধ্যার রাজা হইয়া বাপে যেমন ছেলেদের পালন করেন, সেইরূপ প্রজাপালন করিতে লাগিলেন" বলিলে চলিত না। এক অপ্রতিহত প্রভাবে কথাটী লইয়া চোকের জলে নাকের জলে হইতে হইত। "সাগরী" ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা "সাগর" মহাশয় মর্ম্মরা বা আরল প্রকৃতির সাগর নহেন, এ সাগর মহাসাগরের বাহু—বঙ্গসাগর, যাহার

অতলস্পর্শতা আছে। তাঁহার ভাষা যে সংস্কৃতবহুলা,—মুটেমজুর, কুলীকালার দুর্ব্বোধ, তাহা তিনি বেশ বুঝিতেন; তবে কথা এই যে, তাঁহার সময়ে লোক-শিক্ষার তরঙ্গটা এত একটানা বহে নাই। তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মী ব্রাহ্মণ, অসবর্ণ সম্মিলনটা তাঁহার নজরে ভাল না লাগিবারই সম্ভাবনা, তাই তিনি ভাষাটাকে সাধু ও অসাধু এই দুইটী জাতিতে পৃথক রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং তখনকার নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদের শিক্ষার আবশ্যকতাকে উপেক্ষা করিয়া সাধু সজ্জনের ভাষাই গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা যে তেলী মালীরা কাশীদাসের—

"দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥"

এই কবিতার অর্থ পরিগ্রহে সমর্থ, যাহারা উহা বুঝিবে, তাহারা ঐ দেখ—"হরশরাসন ভঙ্গবার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী ভগবান ভৃগুনন্দন আমাদের অযোধ্যা-গমন-পথ রোধ করিয়াছেন।" এ কথাই বা না বুঝিবে কেন?

কেবল সরকার মহাশয় যে ভাষাকে লক্ষ্যসিদ্ধির উপযোগিনী করিয়া তুলিতে পাড়িতে পারেন, আর তাঁহারই সে পক্ষে সাধনা আছে, অন্যের নাই, এমন নহে; সাগরের সে শক্তি, সে সাধনার অভাব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগের ভাষা যে লোকশিক্ষার অনুপযোগিনী, এ কথা কেমন করিয়া বলিব?

অভিভাবক মহাশয় কলেজে শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকের বাঙ্গালা ভাষা লইয়া তাঁহাদিগকে বড়ই লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত করিয়াছেন, যথা—"বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রাপ্ত গ্রন্থকারের মত শত শত ছাত্র আছেন, কিন্তু উদ্যম, যত্ন, পরিশ্রমপটুতা, তাঁহাদের নাই; তাই তাঁহাদের সিদ্ধিও মিলিবে না। তাঁহারা পুস্তক প্রকাশ করেন আর মাতৃভাষা লাঞ্ছিত হন।"

"সাহিত্য বা রস রচনা শিখিতে হয়।" অন্যত্র—"বঙ্গীয় যুক্তাক্ষরযুক্ত দ্বিতীয় ভাগ পাঠ করিয়াই বাঙ্গালায় বহী লিখিতে যাওয়া সেইরূপ বিড়ম্বনা ও ধৃষ্টতা। কিন্তু আজ দশ পনর বৎসর দেখিতেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বা ব্যাধিগ্রস্ত যুবক এইরূপেই গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছুক।"

আর এক জায়গায়—"কেবল গ্রন্থপাঠে বা ব্যাকরণ শিক্ষায় চলিত ভাষা শিক্ষা করা যায় না। সেইজন্য বলিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকের কথাবার্ত্তা লক্ষ্য

করিতে হইবে।” এখন বুঝা যাইতেছে রস-রচনা কি, আর লোকশিক্ষার ভাষাই বা কি। বক্তার ভাবে বুঝা যাইতেছে, দুই অভিন্ন। সাগরী ভাষায় যেন রস-রচনা বা লোকশিক্ষা দুইয়ের কিছুই হয় না, যেহেতু উহা সংস্কৃতবহুলা। মাতা-পিতামহী ভাষার অলঙ্কারস্তূপ জীবিতা মাতৃভাষার পক্ষে দুর্ব্বহ।

অন্যদিকে সভাপতি মহারাজ বাহাদুর বলিতেছেন, “সাধারণতঃ সকলপ্রকার ভাষাতে লিখিত ও কথিত দুইটী বিভাগ দৃষ্ট হয়; সাধু ও গ্রাম্য উভয়বিধ শব্দই সকল ভাষায় বিদ্যমান আছে। লিখিত ও কথিত ভাষার এবং সাধু ও গ্রাম্য শব্দের একত্র সন্নিবেশ সুন্দর হয় না।” দুইজন সভাপতি দুইটী পৃথক পন্থা অবলম্বন করিলেন। সরকার মহাশয় যেভাবে বলিয়াছেন, তাহাতে আপোষ-নিষ্পত্তি চলিবার নহে। মহারাজ বরং বলিয়াছেন, “উভয়শ্রেণীর লেখকগণ একত্র সদ্ভাব সমালাপ এবং উপযুক্ত সমালোচনায় বঙ্গীয় গদ্য সাহিত্যের প্রকৃতি বা গুণ নির্দ্ধারণে যত্নবান হউন, ইহাই আমার প্রার্থনা।” বেশ বলা হইয়াছে। শান্তি-প্রিয়তার প্রকৃষ্ট পরিচয় বটে।

সরকার মহাশয় একবারেই সাট কাটিয়া দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে, বলিতেছি,—লিখিত ও কথিত ভাষা চিরদিনই পৃথক। সংস্কৃত নাটকে দেখা যায়, সাধু সজ্জনের ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত, আর নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের ভাষা প্রাকৃত বা গ্রাম্য। এই দ্বিবিধ ভাষারই প্রয়োজনীয়তা আছে। বিশুদ্ধ ভাষা ব্যাকরণের নিয়মাধীন, গ্রাম্য ভাষা তাহা নহে. প্রাকৃত বা সাধারণ লোকে ব্যাকরণ পড়ে না, ভালমন্দ বোঝে না, সহজ ও ত্বরিৎ উচ্চার্য্য ভাষারই তাহাদের প্রয়োজন। তাহাদের ভাষা তেমনি হইয়া থাকে।

মনের ভাব প্রকাশ জন্যই ভাষা, চলিত ভাষায় মনের ভাব যেমন সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয় এবং সহজে বুঝিতে পারা যায়, সংস্কৃতে সেরূপ হয় না। কারণ সাধারণে সংস্কৃতের অর্থ পরিগ্রহে সমর্থ নহে। গ্রাম্য কথায় মনের ভাব সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিতে যখন কুলায় না, তখন শ্রুতিকটুদোষ পরিহারপূর্ব্বক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হয়। শব্দের অর্থ পরিগ্রহ না হইলে আবার তাহা চিত্তস্পর্শী হয় না। কাজেই ঐরূপে একটী একটী করিয়া সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের অভ্যাস জন্মে, সেই রূপেই বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। যদি কেহ বলেন “সে চাকরীর জন্য কত আটুপাটু করিল, মিলিল না।” “আটুপাটু” কথাটায় মনের ভাব যতটা খোলসা বুঝা যায়, আর কোন শব্দের দ্বারা কি সেরূপ

হয়? শ্রোতার চিত্তে বক্তার মনোভাব ততটা বা তেমনটী করিয়া প্রতিঘাতও হয় না। "সে চাকরীর জন্য কত উৎসাহ উদ্যম করিল।" বলিলে কি তেমনটী শুনায়? বরং "সে চাকরীর জন্য কাতরতার সহিত কত চেষ্টা যত্ন করিল" বলিলে কতকটা চলে, কিন্তু চেষ্টা, যত্ন, কাতরতা তিনই সংস্কৃত শব্দ, তবে কথা এই যে, দুর্ব্বোধ নহে—কেন নহে? পুনঃ পুনঃ ব্যবহার দ্বারা শব্দ তিনটী এত মোলায়েম হইয়া আসিয়াছে যে, তাহাদের দ্বারা আটুপাটুর অর্থ কতকটা পরিস্ফুট হয়, শ্রুতিকটুও হয় না এবং আটুপাটু করার ভাবটা মনের মধ্যে কতকটা আনিয়া দেয়।

আমাদের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য যে সকল সংস্কৃত শব্দ আপনাদের ক্ষমতাবলে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিবে, তাঁহাদিগকে তাড়ান যায় না। উপকারীকে আশ্রয় দিতেই হইবে, না দিলে উপায় কি—আপনারাই শব্দসম্পদে বঞ্চিত হইব, মাতৃভাষার দারিদ্র্যদুঃখ ঘুচিবে কেন, এই জন্যই সরকার মহাশয়কে অগত্যা বলিতে হইয়াছে—"তবে কি ঐ সাগরী ভাষা ত্যাগ করিতে হইবে? কে বলিল? আমিত বলি না।" বোধ হয় সরকার মহাশয়ের মনে আছে, বাঙ্গালা ভাষাকে তোলাপাড়াটা আজি নূতন নহে, অনেক—অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কথা মনে পড়েত? তাঁহার শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগের ভাষাটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সে কথা বেশ বুঝা যাইবে। আজিও বাঙ্গালাসাহিত্যে তদ্বিরের প্রতিযোগিতায় যে মদনমোহনের তৃতীয়ভাগ দাঁড়াইয়া আছে—ইহাকে সৌভাগ্য মনে করি, বাঙ্গালার পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনী সমিতি যে একবারে অধঃপাতে যায় নাই, তাহা বুঝিতে পারি।

আমাদের অপ্রীতিকর বিষয়ের আলোচনার প্রবৃত্তি ছিল না, কিন্তু কি করি, সরকার মহাশয় যে পথ দেখাইয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের উপর তিনি যেরূপে কলম চালাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রাবীণ্যের পরিচয় দেওয়া হয় নাই। তাই, বলি তাঁহাকেও তাঁহার ভাষার পরিচয়টা বুঝাইয়া দেওয়া যাউক, ভাষার তর্‌তর্ ভর্‌ভর্ ভাবটা বজায় করিবার জন্য "দেখিয়াছি জরাজীর্ণ তীরস্থ শবদেহের মত বহরমপুরের পশ্চিমতীরস্থ গঙ্গা।" যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি—শিখিলাম কি, কলিকাতার তীরে ভাগীরথী এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম—নদনদীরই তীর থাকে, এখন জানিলাম—গ্রামপল্লী-নগরাদিরও তীর আছে। এইবার হইতে সকলে লিখিব, "কলিকাতার তীরে যে গড়ের মাঠ

আছে, তাহারই এককোণে "ইডেন" নামে বাগান" ইত্যাদি,—

আর এক কথা—"জরাজীর্ণ তীরস্থ শবদেহ।" শব মানেই মৃতদেহ, তাহাতে আবার "জরাজীর্ণ" বিশেষণের শ্রাদ্ধ কেন? ওঃ শুষ্ক গঙ্গায় জল নাই বুঝাইবার জন্য? না কি গঙ্গা বহুকালের নদী—জরা শুধু মানুষকেই ধরিবে কেন, গঙ্গাকেও ধরিয়াছে। জরা যাহাকে ধরিবে তাহাকে শুষ্কশীর্ণ করিবে। এই অর্থে গঙ্গায় চড়া পড়িয়াছে, তাহাতে আবার তিনি মারা গিয়াছেন, কাজেই "শব" হইয়াছেন। জলই যখন নদীর প্রাণ, তখন তিনি জলহীনা বুঝিতেই হইবে। অতঃপর যদি কেহ লেখে "অধুনা পল্লীগ্রামের জলাশয়গুলি জরাগ্রস্ত হওয়ায় মফঃস্বলে মহা জলকষ্ট হইয়াছে।" তাহা হইলে কেহ নাক শিটকাইবেন না। একে ওকে তাকে কটূক্তি না করিয়া কতকগুলি বিষয় নির্দ্দেশপূর্ব্বক আদর্শ ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা দেখাইয়া দিলে ভাল হইত। যদি বলিয়া দিতেন যে, তাঁহার ভাষাই আদর্শভাষা ইহা বলিতে হইবে কেন। তাহা হইলেও আমরা নিরুত্তর হইতে পারিতাম। "তীরস্থ শবদেহ বলিতে কি মুমূর্ষু শবদেহ বুঝিব? তা বই আর কি? ভবিষ্যতে এই সকল উক্তিকে যে মহাজনোক্তি বা আর্ষ্য প্রয়োগ বলিয়া আমাদের উত্তরপুরুষেরা গ্রহণ করিবেন, সরকার মহাশয় তাহারই পথ করিতেছেন না কি?

এই অভিভাষণ পাঠ শ্রবণ করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া সংবাদ-পত্রের বহু সম্পাদকই অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই, ইহা অভিভাষকের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। সেই সকল সংবাদপত্র আবার আপনাপনি কটূক্তিতে যে আপনাদের পরিচালিত সংবাদপত্রগুলিকে কতকটা কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা সাধারণ পাঠকমাত্রেই দেখিতে পাইতেছেন। সম্মিলনে প্রায় হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল, তাঁহাদের সকলেই প্রায় শিক্ষিত ও পদস্থ। এই সকল অকথ্য কথন শুনিয়া তাঁহারা হাস্য সম্বরণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। প্রতিবাদকারিরা দোষপ্রদর্শকদিগের কাহার মুখে সরা চাপা দিবেন। বিদেশাগত মহামহা ব্যক্তিগণ সম্মিলনের মুরুব্বিপন্থীগণের পরিচিত হইতে গিয়াও বিড়ম্বিত হইয়াছেন। (সাহিত্য-সংবাদ ১৮৪ পৃষ্ঠা) তাহার কোন প্রতিবাদ না হইয়া কে 'দ'র স্থানে 'ব' ছাপিল, কে 'নাথের' স্থানে 'চন্দ্র' লিখিল, কে উগ্র-বক্তা, কে মৃদুবক্তা, এই সকল কথা লইয়া এত কটূক্তির বিনিময় দ্বারা ভব্যতার পরিচয় দেওয়া কেন? সম্মিলনের মূল উদ্দেশ্যেই যখন আঘাত লাগিল তখন

আর অন্য কথার প্রয়োজন কি ?

সাহিত্য-সম্মিলনের পরিচালনার ভার পাইয়াছেন বঙ্গীয় সাহিত্য-পারিষদ। পরিষদকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, পরিষদের সভ্যগণ বই, আর কোন ব্যক্তি কি সাহিত্যসেবী নাই ? তাঁহাদিগকে সম্মিলনে যাইবার নিমন্ত্রণ হয় নাই কেন ? যে সকল সংবাদপত্রের সম্পাদক পরিষদের সভ্য নহেন, তাঁহাদিগকে কি সম্মিলনে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করা হয় ? পরিষদ ক্রমেই আত্ম-গৌরব রক্ষায় অবহেলা করিতেছেন। পরিষদের স্থান বাঙ্গালা ভাষার এবং বঙ্গ-বাসীর শিরোদেশে কিন্তু পরিষৎ এ দেশের সমস্ত সাহিত্যসেবীর একটী তালিকা রাখেন কি ? এই আঠার বৎসর মধ্যে রাখিবার চেষ্টাই কি হইয়াছে ? কেবল আমি বড় মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে কর্ত্তব্যতা পালন হয় না। ইহাতে পরি-ষদের দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় হয়।

আর একটা কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সরকার মহাশয় হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খৃষ্টান সকলকেই যখন সম্মিলনে আহ্বান করিয়াছেন, তখন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কথা বলিতে বা কোন ধর্ম্মাবলম্বীর মনে বেদনা লাগিতে দেওয়া ভাল কি ? কেবল ব্রাহ্মণ নিন্দা নহে, ব্রাহ্ম নিন্দাও ঘটিয়াছে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ১৩২ বার চুঁচুড়া গিয়াও কাহাকে স্বমতে আনিতে পারেন নাই বলায় সম্মিলনে যে সকল ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মনে কি বেদনা লাগে না ? কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জামাতা স্বর্গীয় মহারাজ কুচবিহারের ভূপ বাহাদুর পরিষদের আজীবন সভ্য ছিলেন, তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহারই মনে কি কষ্ট হইত না ? তাঁহার কন্যা মহারাণী এখনও জীবিতা, কৃতী দৌহিত্র বর্ত্তমান কোচবিহারের অধীশ্বর, তাঁহারা সরকার মহাশয়ের অভিভাষণ বাক্য শ্রবণ করিলে কি দুঃখিত হইবেন না। তবে ব্রাহ্মসম্প্রদায় স্বভাবতঃ উদার তাই তাহা প্রকাশ করেন নাই, তাহা না হইলে তাঁহারাও হৈ রৈ চৈ করিতে ক্ষান্ত হইতেন না।

কেহ আমাকে ব্রাহ্ম বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাধিগ্রস্ত (!!!) মনে না করেন, আমি দুইয়ের কিছুই নহি। যাহা লিখিলাম তাহা নিরপেক্ষ ভাবেই লিখিলাম, আপনার দোষও আপনি বলিয়াছি। যিনি আমাকে চিনেন, তিনি সে কথা বুঝিবেন।

সরকার মহাশয়ের ভাষার আর গোটাকতক নমুনা দেখাইব—"একটু দুঃখ-নিবৃত্তি পাইল" কে পাইল ? দুঃখ-নিবৃত্তিকে ড্যাস দিয়া একপদ করা হইয়াছে যে, (৬ পৃষ্ঠা)। "প্রায় সমস্ত বঙ্গ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে।" হয় বলিতে হইবে—

'বঙ্গের' না হয় বলিতে হইবে 'ভগ্নস্বাস্থ্য' (১০ পৃষ্ঠা) নয় কি? "উদ্গীরিত শব্দটা যে সম্পূর্ণ ব্যাকরণদুষ্ট, তাহা কি সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় ভুলিয়া গিয়াছেন, কিছুতেই উদ্গীরিত সিদ্ধ হইবার নহে।

"কে বলিবে মেঘনাদবধ বা কপালকুণ্ডলায় অথবা বিল্বমঙ্গলে, যে বুঝিতেপারে, তাহার মাথা খাওয়া যায়? যদি কেহ বলে, সে মিথ্যা কথা বলে!" এ কথাটা বলা কি ভাল হইয়াছে? অন্যদিকে সভাপতি মহারাজ বাহাদুর বলিতেছেন, অধিকাংশ পাঠক গভীর চিন্তাপ্রসূত বা গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস পুরাতত্ত্বের আদর না করিয়া অসার নাটক নবন্যাসাদিতে কালহরণ করেন। তরল সাহিত্যের আদরে ও পরিচর্য্যায় লেখকের ও পাঠকের মস্তিষ্ক এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধি তরল হইয়া পড়ে।" মস্তিষ্ক না গলিলে আর তরল হয় না। প্রকারান্তরে ইহাও মাথা খাওয়া নয় কি? সভাপতি মহারাজ নাটক নবেল গল্পগুচ্ছকে এক দড়িতে বাঁধিয়াছেন, তাঁহার মতে তাহাদের ভালমন্দ ভেদ নাই। সরকার মহাশয় আপনাকে ভুলিয়া আজিকালিকার কলেজের শিক্ষিতগণের উপর অযথা কটূক্তি অনেক করিয়াছেন; বলিয়া এতগুলি কথা বলিতে হইল। তিনি তাঁহার ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব কিছু বেশী করিয়াছেন, তাই তাঁহার ভাষার আলোচনাটা মাত্র করিলাম। ভাবের বেভাব অনেকস্থলেই ঘটিয়াছে, তাহার আলোচনায় ক্ষান্ত হইতে হইল। কারণ তাহার সহিত অন্যের ততটা সংস্রব নাই।*

জনৈক বৃদ্ধ সাহিত্যিক।

গীত।

লেখক,—৺গিরীন্দ্রনাথ মিত্র।

বিভাস,—ঝাঁপতাল।

মন তোমারে চায়, কে ভুলায়ে দেয়,
ধাই তার পিছে পাগলের প্রায়।

* উদ্যোগী পুরুষেরা বহু আকিঞ্চনে বহু অর্থব্যয়ে যে অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কি একটীও শুভানুষ্ঠান লেখকমহাশয়ের নয়ন বা শ্রবণগোচর হয় নাই? জং ভূং সং।

কত কথা কয় কাণে কাণে, কত ভাবি আমি মনে মনে,
শেষে কোথায় লয়ে যায় আমায়॥
আবার, ফেলিয়া আমায়, কোথা চলে যায়;
কাঁদিতে থাকি আমি হয়ে অসহায়।
দেখি না কোন পথ, চলিব কোথায়,
সব অন্ধকারময়, কে আছে কোথায়;—
তখনি মা তুমি এসে হও গো উদয়।
আমি তোমায় এবার, কিছুতেই ভুলিব না আর,
অনুদিন দাস হয়ে, থাকিব চরণে তোমার;
তোমার গুণ গাইয়ে, হৃদয়ে তোমায় ধরিয়ে,
তোমার রূপ হেরিয়ে, হয়ে রব তন্ময়॥

কাফি,—ঝাঁপতাল।

কে তুমি কাছে থাকিতে, যখন আমার কিছুই না ছিল,
এখন কেন থাক না আর, সকলই যখন আসিল।
ভাবিতাম কত আমি, বোঝাতে কত তুমি,
আবার কাঁদিলে কাছে এসে মুছাইতে নয়নের জল।
তোমার মায়া পেয়ে আমার মন তোমায় ভুলিল,
তোমায় না দেখে আমার দুঃখ আরও বাড়িল;
কেন এ সব দিলে তুলি, কে দিতে তোমায় বলেছিল?
সংসারের যত সুখ তোমারি জন্য সকল,
তুমি থাকিলে সকলই ভাল, তুমি গেলে সকলই গেল,
কি সম্পদে কি বিপদে ভরসা তুমি কেবল,
এবার করিব তোমায় আমি জীবনের সম্বল॥

সিন্ধু ভৈরবী,—পোস্তা।

কে গো সে আমার, যে সদাই থাকে কাছে।
মায়ের মতন আদর করে, থাকে পাছে পাছে॥
ছাড়িলেও সে ছাড়ে না আমায়, হাত ধরে থাকে,
বুকে করে আছে সদাই, পড়ে যাই পাছে।
কে গো সে, আমায় কেন চখে চখে রেখেছে,
হেসে হেসে কথা কয়ে প্রাণ আমার তুষিছে,
এবার দেখিব সে কে আমারে এমন যতন করিছে।
তারই প্রেমে ভক্তগণ মোহিত হয়ে রয়েছে॥

ভৈরবী,—ঠুংরী।

সে কি সুখী? যে সকলই পাইয়ে, তোমারে ভুলিয়ে থাকে এ সংসারে?
সে কি দুখী? যে সকলই হারায়ে, বাসনা ত্যজিয়ে, চায় কেবল তোমারে?
তুমি হৃদয়ে জাগিছ যখন, কিসের ভয় ভাবনা তখন,
তোমার প্রসাদ করিয়া ধারণ, ভাসিব আমি সদা আনন্দনীরে।
সুখ দুঃখ চাহিব না কিছু, রেখ কেবল হাত ধরে;
ইচ্ছা হয় মারিতে, মারিও আমারে, রেখে দিও চরণের দাস করে।
যেন বাসনা আর তোমা হতে টানে না মোরে,
তোমায় করে প্রভু আত্মসমর্পণ, সব দুঃখ জ্বালা করিব মোচন,
মনের সুখে হাসিব খেলিব, আলো দেখিব আঁধারে,
যাবনা আমি কার কাছে, থাকিব হেরে তোমারে॥

সমালোচনা।

অবকাশ।—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ প্রণীত, মূল্য আটআনা।

এই পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। ইহাতে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর কবিতা ও গুটিকতক গদ্য প্রবন্ধ আছে,

উভয়ই সুরুচিসম্পন্ন পাঠ করিবার উপযুক্ত। কাব্যতীর্থ মহাশয় কাব্যরচনায় বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। কেবল বাঙ্গালা কবিতার কথা আমরা বলিতেছি না, সংস্কৃত কবিতা রচনাতেও ইহাঁর কবিত্ব লক্ষিত হইল। বেদান্ত ও উপনিষদের ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া এই পুস্তকের আদিভাগে তিনি কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছেন। অবিশেষজ্ঞ পাঠকেরা হয় ত সেই শ্লোকগুলিকে উদ্ভট মনে করিতে পারেন, বস্তুতঃ বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা অবগত হইয়াছি, সেই শ্লোকগুলি কাব্যতীর্থ-মহাশয়ের স্বরচিত। প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নভাগে বঙ্গভাষায় তাহার কাব্যানুবাদ বিরচিত হইয়াছে। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতায় কিরূপ মিষ্টতা রক্ষা হইয়াছে, পাঠকগণের বিচারার্থ তাহার সানুবাদ কিঞ্চিৎ আদর্শ এই স্থলে উদ্ধৃত হইল :—

(২)

সার্দ্ধং যাদঃপতিতনয়য়া সারদায়া বিবাদো
বাদো যোঽয়ং চরতি নিতরামেষ মিথ্যাপবাদঃ।
যস্মাদ্ বাণীং ন কিমু কমলা কণ্ঠদেশে দধাতি
শ্রীহীনা বা ক্বচিদপি পুনর্ভারতী কিং নু ভাতি॥

(২)

ভারতীর সনে নিত্য লক্ষ্মীর বিবাদ
এ কেবল নিন্দুকের মিথ্যা অপবাদ।
যে হেতু, নহে কি ভাষা ইন্দিরার কণ্ঠভূষা,
আর এই বিশ্বমাঝে মুহূর্ত্তের তরে
কে দেখেছে শ্রীবিহীনা দেবী ভারতীরে?

(৩)

মাতর্গঙ্গে! সুবিমল পয়ো-দর্পণে বিম্বিতস্তে
ভূতে ভূতে সমরসইব স্বানুরূপঃ স্বভাবঃ।
গৌরী শ্যামা* তব চ সলিলে মজ্জতী যা চকাস্তি
দৃষ্টৈবং তে প্রভবতি রতিঃ কীদৃশোঽয়ম্বিবাদঃ।

(৩)

মাতর্গঙ্গে! সুনির্ম্মল সলিল দর্পণে
কি করুণা উছলয় সর্ব্বভূতে বরিষয়,

* গৌর বর্ণা শ্যাম বর্ণা স্ত্রীলোক (অপরার্থ)।

বিম্বিত স্বভাব তব রয়েছে কেমনে।
তব জলে স্নান করে হরষ আননে
গৌরি শ্যামা দিবা রাতি, হেরি তা নয়নে।
তুমি তাদের সঙ্গে কত না আনন্দে রঙ্গে
খেলা কর নাচি নাচি, তবে মা কেমনে—
হইল কলহ তব গৌরী শ্যামা সনে?

পুস্তকের নামটি নিতান্ত পুরাতন হইলেও পাঠ্যবিষয়গুলি প্রকৃতই প্রীতি-প্রদ; বিশেষতঃ ধর্ম্মমূলক রচনা হওয়াতে অধিকতর সুন্দর হইয়াছে। পুস্তকের নামটি ধর্ম্মার্থসূচক হইলে ইহার আকর্ষণীশক্তি আরও অধিক হইত সন্দেহ নাই। নূতন উপাধিপ্রাপ্ত কাব্যতীর্থ মহাশয় নূতন কবি, পাঠকমহাশয়েরা নূতন কবির নব রচিত কবিতামালা অবকাশ মতে পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই সন্তোষলাভ করিতে পারিবেন।

নূতন ছবি।—নগরের নিকটবর্ত্তী কাশীপুরের লৌহকারখানার অধিকারী দাস কোম্পানী আমাদিগের নিকটে দুইখানি পরম সুন্দর আল্‌ম্যানাক ছবি উপহার প্রেরণ করিয়াছেন। ছবি দুখানি দর্শন করিয়া নয়নের পরম পরিতৃপ্তি লাভ হয়; ইহা চিত্রবিদ্যার উজ্জ্বল নিদর্শন। প্রথম খানিতে একটী পরম রূপ-লাবণ্যবতী ভক্তিমতী কুমারী ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া করজোড়ে পরমেশ্বরের ধ্যান করিতেছেন। মূর্ত্তির উভয়পার্শ্বে অনেকগুলি পরী (Angel) মূর্ত্তি চিত্রিত। পরীগুলিকে সুন্দরী বলা অত্যুক্তি ও বাহুল্যপাঠ। প্রধানা মূর্ত্তির বর্ণ ও ভক্তিভাব অতিসুন্দর; বিশেষতঃ সুন্দর মুখমণ্ডলে নেত্রপাত করিলে সহসা ভক্তিরসের আকর্ষণ আইসে; নেত্রপুট ওষ্ঠপুট ও ললাটফলকের কোন অংশ কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয় না, পূর্ণাংশে মূর্ত্তিখানি ঠিক যেন দেবীমূর্ত্তি। নিম্নভাগে লেখা আছে, **Abide with me.** ইহার অর্থ এই যে, পরমাত্মার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা হইতেছে, "আমাতে অবস্থান কর।" ছবিখানি দর্শন করিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিলাম।

দ্বিতীয় ছবিখানিতে একটি গৃহস্থকুমারী মূর্ত্তি; চিত্রের ভাব দেখিয়া বুঝা যায় সুন্দরী যুবতী; হস্তে একটি ময়ূরপুচ্ছ। কুমারীর দক্ষিণ হস্তের দিকে অত্যল্প দূরে শুভ্র লোমশ একটি বৃহৎ কুক্কুর শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে, হস্তস্থিত

ময়ূরপুচ্ছটি সেই কুক্কুরের গাত্রে স্পর্শ করিয়া কুমারী আরক্ত ফুল্লবদনে মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে। নিম্নভাগে লেখা আছে "Wake up, Sir!" অর্থাৎ "জাগো বাবা!" এ মূর্ত্তিটিও দিব্য সুন্দরী, ইহাতেও চিত্রনৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় বিদ্যমান। আমাদের বিবেচনায় ছবি দুখানি আদরের জিনিষ বটে।

সহরের সুপ্রসিদ্ধ কেমিষ্ট ও ড্রগিষ্ট শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানীর প্রচারিত একখানি ডায়েরী আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। আখ্যা "Physician's Diary, 1912." এতৎ সংলগ্ন একটী স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায় আমাদের সম্রাট দম্পতির সুরঞ্জিন মনোহর ছবি; চিত্রসৌন্দর্য্য চিত্তাকর্ষক। ডায়েরীতে অর্থাৎ দৈনিক-পত্রাবলীতে বৎসরের মাস, তারিখ ও তিথিগুলি ইংরাজী অক্ষরে ও অঙ্কে নিবদ্ধ। যাঁহারা ডায়েরীতে মন্তব্য লিখিয়া রাখিতে অনুরাগী, তাঁহাদের সুবিধার জন্য শাদা শাদা পাতা রক্ষিত হইয়াছে। এখানি সাংসারী লোকের বিশেষ উপকারে আসিবে।

হিন্দুজীবন।—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী প্রণীত, মূল্য একটাকা।

এই পুস্তকে হিন্দু জীবন তিন ভাগ, কঃ পন্থা, প্রাচীন ভারতে শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা নিরামিষ ভোজন, ব্রতপালন, কর্ম্মজীবন, সংসার-প্রেম, বিবাহ—স্বয়ম্বর, পঞ্চযজ্ঞ প্রকরণ, পঞ্চসূনা জন্মান্তরবাদ, উত্থানপতন, গৃহস্থের মহিমা, ধর্ম্মজীবন, বর্ণাশ্রম, বিশ্বপ্রেম ও ত্যাগজীবন প্রভৃতি অনেকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। এতৎ পুস্তক প্রণয়নে ভারতী মহাশয়ের বহু পরিশ্রম হইয়াছে, বহু প্রত্নতত্ত্বের অন্বেষণ করিতে হইয়াছে, পুস্তকখানি পাঠ করিলেই ধর্ম্মানুরাগী পাঠক-মহাশয়েরা তাহা বুঝিতে পারিবেন। ভাষাও প্রাঞ্জল হইয়াছে। ভারতীমহাশয় একজন বহুদর্শী পণ্ডিত, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও বহুজ্ঞতার পুরস্কারবোধক উপাধি স্মৃতিতীর্থ, সাঙ্খ্যতীর্থ, মীমাংসাতীর্থ।

এই পুস্তকখানি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের প্রকৃত উপযোগী হইয়াছে; সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাকে ধর্ম্মবিপ্লবের যুগ বলিয়া গণনা করিতে হয়, এ অবস্থায় এতাদৃশ পুস্তক প্রচারে বিস্তর উপকার সাধিত হইবে, আমাদেব এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে। ভারতী মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন, সনাতন ধর্ম্মের প্রতি লোকের অবহেলা

হওয়া অবধি হিন্দুসমাজের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। এটিও অবশ্য পাকা কথা. আমরা অনুরোধ করি, ধর্ম্মপিপাসু হিন্দু সন্তানগণ আদরপূর্ব্বক এই ধর্ম্মমূলকগ্রন্থখানি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিবেন।

দময়ন্তী।—শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্র প্রণীত, মূল্য ছয়আনা।

মহাভারতে ও শ্রীহর্ষদেব প্রণীত নৈষধচরিতে নলদময়ন্তী চরিত্র বিশদরূপে বর্ণিত আছে, বাঙ্গালার হিন্দুপরিবারের ঘরে ঘরে বাঙ্গালা মহাভারত বিরাজ করে, সুতরাং নলদময়ন্তীর ইতিহাসটী কি, তাহা বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকাগণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। বাবু রাধানাথ মিত্র মহাভারতোক্ত নলদময়ন্তী চরিত্র চিত্র করিয়া আমাদের রমণীগণকে সতীত্ব শিক্ষা দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, ইহা অবশ্যই আনন্দের বিষয়। আমাদের দেশের ধর্ম্মানুগত পবিত্র চরিত্রগুলি পুনঃ পুনঃ আলোচিত ও পৃষ্টপোষিত হইলে কোন অংশে উপেক্ষণীয় হইবে না, বরং উত্তরোত্তর অধিকতর গৌরব প্রাপ্ত হইয়া সাধারণের শিক্ষাস্থল হইবে, শ্লাঘা করিয়া একথা বলা যাইতে পারে। বাবু রাধানাথের পুস্তকের অবতরণিকাটি সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। পুস্তকের ভাষাও দিব্য সরল হইয়াছে। এই পুস্তকে কয়েকখানি সুন্দর সুন্দর ছবি দেখিয়া আমরা প্রীত হইলাম। আশা করি, আমাদের রমণীগণ রাধানাথ বাবুর দময়ন্তী পাঠ করিয়া পতিপরায়ণা দময়ন্তীদেবীকে আদর্শস্থলে গ্রহণ করিবেন।

তারা।—শ্রীযুক্ত কালীনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, মূল্য একটাকা।

আকাশমণ্ডল গতিশীল, জ্যোতিষ প্রমাণে ইহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, কিন্তু সাময়িক গতিপরিবর্ত্তনে ক্রমশঃ তিথি নক্ষত্র গণনার বিপর্য্যয় ঘটিতেছে, বিজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদেরা ইহাও বুঝিতে পারিয়াছেন। এই পুস্তকের সঙ্কলন কর্ত্তা কালীনাথ বাবু কিছু উর্দ্ধপথে গমন করিয়া আক্ষেপসহকারে বলিতেছেন, নক্ষত্রগণের গতিপরিবর্ত্তনে জ্যোতিষ বচনের সমন্বয় থাকিতেছে না, তজ্জনিত বিপর্য্যয়ে আমাদের পূজাপর্ব্ব, ব্রতনিয়ম, সংক্রান্তি এবং সমাবর্ত্ত বিবাহাদি সংস্কার একপ্রকার পণ্ড হইয়া যাইতেছে। পরাশর সিদ্ধান্তের পর বহুদিনান্তে আর্য্যভট্টের সিদ্ধান্ত,

তাহার পর আর কোন জ্যোতির্ব্বিদ তাদৃশ সূক্ষ্মতত্ত্ব নিরূপণে যত্নবান অথবা সমর্থ হন নাই; পুরাতন জ্যোতিষবচন প্রমাণেই আমাদের পঞ্জিকার গণনা চলিয়া আসিতেছে। নক্ষত্রগতি কিভাবে কতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা নিরূপিত হইতেছে না। অধিক কথা কি, যাহা প্রধান, তাহাতেও বিষম ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সপ্তর্ষিমণ্ডল, ধ্রুবতারা, অরুন্ধতী এবং অগস্ত্যনক্ষত্র কোন পথে উদয় হইয়া কোন পথে গতি করিয়া কোথায় অস্ত যাইতেছে, তাহার গণনা প্রণালী এক্ষণে বিলুপ্তপ্রায়; বিবাহের সময় বরকন্যার অরুন্ধতী দর্শন এ দেশের চির-প্রচলিত প্রথা, অরুন্ধতীর গতি পরিবর্ত্তনে সে কার্য্যে বিলক্ষণ ব্যাঘাত হই-তেছে, ইহা সিদ্ধান্তবাক্য। এইরূপ নানা বিষয়েই বিঘ্ন-সংঘটিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা নক্ষত্র গতি নিরূপণে যথাশক্তি যত্ন করিতেছেন, তাহাতেও সম্পূর্ণতা রক্ষা হইতেছে না; এই শাস্ত্রীয় অভাব কতকপরিমাণে বিমোচনের অভিপ্রায়ে কালীনাথ বাবু বহুতর প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থসংগ্রহ করিয়া সূক্ষ্ম গণনার প্রয়াস পাইতেছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে ও আমাদের পক্ষে আশাপ্রদ ও গৌরবের কথা বটে, তাঁহার কৃতকার্য্যতালাভ হইলে একটি নষ্টকোষ্ঠি উদ্ধার হইতে পারে, আমরা এইরূপ আশা করিতেছি। তাঁহাকে উৎসাহদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে পুস্তকখানির আলোচনা করা যাইতেছে, সেখানি আয়তনে ক্ষুদ্র, এতৎপ্রচারে সন্তুষ্ট না হইয়া কালীনাথ বাবু একখানি বৃহৎ গ্রন্থ যন্ত্রস্থ করিয়াছেন, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উপক্রমণিকাভাগে তাহা দর্শন করিয়া আমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। আমরা আশা করি, সেখানি প্রকাশ হইলে, আমাদের দেশের আধুনিক জ্যোতিষী মহাশয়েরা তাহার সহায়ে আধুনিক গণনাগুলি সংশোধন করিতে যত্নবান হইবেন।

মা।—মাতৃবিয়োগে শোকাকুল হইয়া শ্রীযুক্ত মোহিনীরঞ্জন সেন এই নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিয়াছেন। মাতৃশোকে মাতৃবৎসল পুত্রের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস চিরদিন স্বাভাবিক, ভুক্তভোগী ব্যতীত সে উচ্ছ্বাস অপরের কল্পনায় উদিত হওয়া অসম্ভব। মোহিনীরঞ্জনের কবিত্বশক্তি তেজস্বিনী, কবিতাগুলির প্রত্যেক উচ্ছ্বাস হৃদয় দ্রবকারী, করুণরসে পরিপূর্ণ।

গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকা, ১৩১৯ সাল।—আমরা ইহার একখণ্ড উপহার পাইয়াছি। পঞ্জিকা কখন পুরাতন হয় না, অতএব ইহা নূতন পঞ্জিকা। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই এবং দেবদেবীর চিত্রগুলি সমস্তই উৎকৃষ্ট। এ বৎসর এই পঞ্জিকার সঙ্গে ডাইরেক্টারী সংযোজিত হইয়াছে, ইহাতে সাংসারী লোকেরা নানাবিষয় অবগত হইতে পারিবেন। বর্ষে বর্ষে এই পঞ্জিকার শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। ক্রমশঃ ইহার আরও শ্রীবৃদ্ধি হইলে আমরা অধিক সন্তুষ্ট হইব।

পি, এম, বাক্‌চি কোম্পানীর প্রচারিত নূতন পঞ্জিকাও আমরা উপহার পাইয়াছি। বৎসর বৎসর যেরূপ সুপ্রণালীতে ইহার অঙ্গরাগ সজ্জিত হয়, এ বৎসরেও সেইরূপ হইয়াছে, ইহাতেও ডাইরেক্টারী আছে ; ইহারও মুদ্রণব্যবস্থা, গণনা ও ছবিগুলি উত্তম। অধিকন্তু এ বৎসর পঞ্জিকার আদ্যভাগে ভারতবর্ষের একখানি সুরঞ্জিন মানচিত্র সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; যাঁহারা মানচিত্র দর্শন করিতে জানেন, ভারতের কোন অংশে কোনস্থান, এই মানচিত্র দেখিয়া তাঁহারা তাহা নিরূপণ করিয়া আনন্দিত হইবেন। অনেকগুলি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এই পঞ্জিকার জ্যোতিষ গণনাদি কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এই পঞ্জিকার ব্যবস্থা দর্শনে হিন্দু গৃহস্থ-সংসারের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয়, অতএব উত্তরোত্তর ইহার বিশুদ্ধতা দর্শন করিতে আমরা অভিলাষী।

আয়ুর্ব্বেদ-পঞ্জিকা, ১৩১৯ সাল।—স্বর্গীয় ধন্বন্তরিকল্প কবিরাজ নিশিকান্ত সেন কবিভূষণ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত কালীভূষণ সেন কবিরত্ন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা ১৩১৯ সালের ফুল পঞ্জিকাখানি আকারে বৃহৎ এবং নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ, হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী জনসাধারণের নিত্যব্যবহারের পক্ষে আয়ুর্ব্বেদ পঞ্জিকা অতীব উৎকৃষ্ট হইয়াছে, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। আয়ুর্ব্বেদ সম্মত চিকিৎসা-নৈপুণ্যে কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালীভূষণ সেন কবিরত্নের সুনাম দিন দিন জনসমাজে প্রচার হইতেছে ; আমরা আশা করি, চিকিৎসাকার্য্যে সুবিখ্যাত স্বর্গীয় পিতার সুখ্যাতি ও সুপ্রতিষ্ঠা সংরক্ষণে শ্রীযুক্ত কালীভূষণ সেন কবিরত্ন সমর্থ হইবেন।
